বিদ্রোহে বাঙ্গালী

বা

আমার জীবন চরিত

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

নূতন সংস্করণ :
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭

পাঁচ টাকা
বার আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅজিত ঘোষ
শরৎ-প্রকাশ মুদ্রণী
৬৪।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

ভূমিকা

সিপাহীবিদ্রোহের পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া গেল। সিপাহীবিদ্রোহের কারণ এবং ইহার উদ্দেশ্য ও সফলতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতামতের ভিন্নতার অন্ত নাই। বর্তমান আত্মচরিতখানি সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। এই দিক হইতে দেখিলে ইহা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় রচিত গ্রন্থ।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর ক্ষেত্র অত্যন্ত অপরিসর, বিশেষত উনবিংশ শতকের। বাংলা সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য আত্মচরিত, কিশোরীলাল সরকারের মাতা রাসসুন্দরী দাসীর রচিত। 'সাহিত্যে যথার্থ আত্মজীবনী লেখা সকলের চেয়ে শক্ত ব্যাপার। এখানে পদে পদে অহমিকা ও আত্মপ্রতারণার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই ইহা এত দুরূহ।'[১] প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা আত্মজীবনীর ইতিহাসে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বা উদ্দেশ্য বড় স্পষ্ট। সেগুলিতে আত্মপ্রতারণার ভাব কতখানি আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অহমিকাটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার স্বপক্ষে কোন্ আত্মচরিতখানি না আসিয়া দাঁড়ায়? কেহ বা কাম-জয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।[২] আবার কেহ বা confession-এর পর্যায় মাফিক মদ্যপান ত্যাগের তারিখ উল্লেখ করিয়া তাঁহার জীবনে সম্পাদিত কাজের কয়েক দফা ফর্দ পাঠকসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন।[৩] এ গুলির মধ্য দিয়া নিজেকে সমাজের উচ্চ মঞ্চে স্থাপন করিয়া সকলকে সেই-রূপটি দেখাইবার জন্য যেন আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। আপনাকে অন্য লোকের মত স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পারিলে সাহিত্য হিসাবে আত্মজীবনীর মূল্য যে কতখানি কমিয়া যায় তাহা বলা যায় না। অবশ্য এই সকল আত্মজীবনীর মধ্যে তৎকালীন দেশ এবং দেশবাসীর জীবনচর্যার সামাজিক, অর্থ-

১ কাব্যপরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৮০

২ দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রের আত্মজীবনচরিত। পৃঃ ৪৯। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত

৩। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য)

১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতেই সিপাহীদলের বিরূপ মনোভাব ি করা গেল। সিপাহীদের চাপা অসন্তোষ বিদ্রোহে পরিণত হইল মে ম ৩১শে মে সকাল সাড়ে দশটায় বেরিলির সিপাহী দল বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এ সম্পর্কে লেখকের ভাষায়,—

'অদ্য রবিবার ১৮৫৭ সালের ৩১শে মে। রবিবার হইলেও মাসিক হিসাব-পত্র অদ্য দাখিল করিতে হইবে। কেন না আজ মাসের সংক্রান্তি।......৩১শে মে বেলা সাড়ে দশটার সময় মাসিক হিসাবপত্র লইয়া তৎকালীন এডজুটেন্ট-লেপটেনেণ্ট বীচার সাহেবের বাংলোয় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—সাহেবের অফিসের দরজা বন্ধ। কেহই কোথাও নাই। কিয়ৎক্ষণ জনমানবের দেখা পাইলাম না। খানিক এদিক-ওদিক চাহিয়া সাহেবের বাংলোঘরের অপর প্রান্তে গেলাম। দেখিলাম, সাহেবের একটি সহিস গুড়ি মারিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এমন করিয়া বসিয়া কেন? তোমার সাহেবই বা কোথায় গিয়াছেন এবং আফিসের দরজাই বা বন্ধ কেন?" ভয়-বিহ্বল সহিস কাঁপিতে কাঁপিতে ভাঙা ভাঙা স্বরে উত্তর করিল, "সাহেব ঘোড়ে পর চড়কে ভাগ গেয়া, তুম্ হিয়া ক্যা করত্ হো? তুমহু ভাগে নেই ত মারে যাই হো। তুম্ নেহি জানত হো সিপাহী বিগাড় গয়ে।" [৪]

বেরিলিতে সেনাদল বিদ্রোহী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের সমস্ত ইংরেজগণ নৈনিতালে গিয়া আশ্রয় লইল। ইংরেজ-অনুগৃহীত দুর্গাদাসের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সিপাহীদের সঙ্গে তাঁহার যথেষ্ট খাতির ছিল কিন্তু তবুও বিদ্রোহের ধ্বংসলীলায় তাঁহার প্রাণ পর্যন্ত কয়েকবার বিপন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে, দুর্গাদাসের সঙ্গে ছিলেন তাঁহার অনুজ কাশীপ্রসাদ। দুই ভাইয়ে নৈনিতালের পথে অগ্রসর হইলেন। পথে বখত্ খাঁ-এর অনুচরেরা দুই ভাইকে বন্দী করিল। উদ্দেশ্য এই বিদ্রোহী নেতা বখত্ খাঁ-এর হিসাবরক্ষকের কাজ করানো। কারণ ইংরেজের সুদক্ষ হিসাব-রক্ষক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি সকলেরই জানা ছিল। দুর্গাদাস রাজী হইলেন না। তাহার ফলে জহুরীমল শেঠের বাড়ীতে বন্দী হইয়া থাকিতে হইল। এখানে দিন কয়েক থাকিবার পরেই সিপাহীদের শৃঙ্খলাহীনতার সুযোগ লইয়া

৪ Muallesonএর Indian Mutiny Vol I, P. 311 অনুসারে বেরিলিতে ৩১শে মের বেলা ১১টায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

বা [illegible]দাস কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহ পলাইয়া গেলেন। চতুর্দিকে অনুসন্ধান চলিতে এবং [illegible]গল। এই সময় তিনি বেরিলিতেই নর্তকী পান্নার ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দুর্গাদাস বেরিলি ত্যাগ করিবার পর এ সংবাদ যখন নবাব জানিতে পারিলেন, তখন পান্নার দুর্গতির আর সীমা রহিল না। লেখকের রচনা-নৈপুণ্যের প্রভাবে পান্নার চরিত্রটি বড় মধুররূপে চিত্রিত হইয়াছে।[৫] কালীপ্রসাদকে নিরাপদস্থানে রাখিয়া ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য দুর্গাদাস আবার নৈনিতাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথমবার তিনি সফলকাম হন নাই। দ্বিতীয় বারের যাত্রায় যে অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল তাহা কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। পথ চলিতে চলিতে গভীর অরণ্যের মধ্যে আসিয়া গেলেন। যখন তিনি একথা বুঝিতে পারিলেন তখনই অরণ্য হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাহির হইবার পথের কোন হদিশ পাইলেন না। যাই হোক্, এই অরণ্যের মধ্য দিয়াই তিনি চলিতে লাগিলেন। কত ভয়াবহ দৃশ্যের তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অরণ্যের মধ্যে একদিন নয়, দুই দিন নয়, তিনদিন তিনরাত্রি তিনি কাটাইয়াছিলেন। রাত্রিতে উঁচু ডালের সহিত নিজেকে বাঁধিয়া রাখিতেন। অন্ধকার রাত্রির বুক ভাঙ্গিয়া আসিত হিংস্র জন্তুর ডাক। এই ভয়াবহতা তাঁহার অভিজ্ঞতার একমাত্র সম্বল নয়, সান্ত্বনাও আছে গভীরতর। হরিণের দল অরণ্যের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের স্বাভাবিক ভঙ্গিমায়। একটি মানুষের উপস্থিতি সেখানে কোন ত্রাসের সঞ্চার করে নাই, করিয়াছিল তাহার চীৎকারে। হরিণদলের ভীত-চকিত দৃষ্টি এবং ক্ষণপরেই 'খুর না দিশই'-এর বর্ণনাটি লেখক প্রকৃত শিল্পকর্মে পরিণত করিয়াছেন। নাম-না-জানা অসংখ্য ফল ও ফুলের মোহনীয় দৃশ্যের কথাও বাদ যায় নাই। দুশ্চিন্তার সঙ্গে ক্ষুধার তাড়না লেখককে বিব্রত করিয়াছে। ফলের গাছ দেখিয়াছেন, ফলও দেখিয়াছেন কিন্তু সব ক্ষেত্রে সে সকল গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। ফল তো বিষফলও হইতে পারে? যে ফল [illegible] পর্যন্ত করে না সে ফল লেখক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই জনহীন মহারণ্যের নিঃশব্দ মহিমার সঙ্গে লেখকের বেদনা-রঙীন যাত্রাপথের এই কাহিনী বিন্যাসের তুলনা বোধকরি বাংলা সাহিত্যে আর নাই। চতুর্থদিনে অরণ্য

৫ The Sepoy mutiny and the revolt of 1857—Dr. R. C. Mazumdar, P. 177.

হইতে বাহির হইবার পর যে বৃদ্ধার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার খণ্ডচিত্রটুকু কি সাহিত্যের দিক হইতে, কি মনুষ্যত্বের দিক হইতে উৎকর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আত্মজীবনীর শেষাংশে লেখক নৈনিতালে ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়া কিভাবে বেরিলি অধিকার করিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছেন।

ইংরেজদের সহিত দুর্গাদাসের সম্বন্ধ ছিল প্রভু-ভৃত্যের এবং দুর্গাদাস যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্গাদাস নিজেই লিখিয়াছেন যে পরবর্তীকালে ইংরেজেদের অভিযোগে ইংরেজদের বিচারে তাঁহাকে কারাবাস পর্যন্ত করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ যে বয়সে তিনি আপনার জীবন-কাহিনীর এই অধ্যায়টুকু চিত্রিত করিয়াছেন তখন রাজানুগ্রহ-লাভের চিন্তা তাঁহাকে বিড়ম্বিত করে নাই। তাঁহার সত্যদৃষ্টির সাহায্যে তিনি যে ভাবে এই সিপাহীবিদ্রোহের বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার গুরুত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি ইতিহাস নয়। তথাপি, ইতিহাসের কণ্টকাকীর্ণ পথে সঞ্চরণ না করিয়াও ঐতিহাসিক সত্যের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। যাহা-হউক, এই প্রসঙ্গে দুর্গাদাসের সত্য-দৃষ্টির কিছু পরিচয় লওয়া যাক্।

দুর্গাদাস বলিয়াছিলেন যে, শৃঙ্খলাহীন সিপাহীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছিল নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধি। 'উৎপীড়ন, অত্যাচার, অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা—ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সতীর সতীত্ব রাখা দায় হইয়া উঠিল। অমুকের সহধর্মিণী পরমা সুন্দরী এবং নব-যৌবন-ভূষণে ভূষিতা—এই কথা নবাব বংশীয় কোন নব-যুবকের কানে উঠিল। নব-যুবক অমনি পরস্ত্রীকে পাইবার জন্য ছল বল কৌশল আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তখন দুর্বলের স্ত্রী, বলবান্ কর্তৃক অপহৃত হইতে লাগিল। ধনী ব্যক্তি ধন-লুণ্ঠনের আশঙ্কায় রাত্রে প্রায় নিদ্রা যাইত না। চুরি, ডাকাতি, মারামারি, দাঙ্গা,—শহরে এই সকল ঘটনা নিয়তই ঘটিতে লাগিল। লোক সকল কেমন যেন উন্মত্তপ্রায় হইল; সকলেই স্ব স্ব প্রধান; কেহ কাহাকেও মানে না; কেহ কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না; জোর যার, মুলুক তার। দুর্বল শিষ্টশান্ত প্রজাসমূহ বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া কেমন যেন দিশাহারা হইয়া উঠিল।' দুর্গাদাস তাঁহার আত্মচরিতে এইভাবেই সিপাহীবিদ্রোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন যে, বিদ্রোহীরা ইংরাজ বিতাড়নে মত্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা দেশের স্বাধীনতার জন্য যতখানি, তাহার চাইতে বেশী আপন আপন কাজ গুছাইবার মতলবে।

আর এই নীচতার জন্যই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল ব্যর্থতায়। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই বিদ্রোহের কতখানি যোগ ছিল তাহা দুর্গাদাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন।—'সুখ অসীমই হউক আর স-সীমই হউক, সাধারণ প্রজা কিন্তু এ সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম ছিল না,—সম্মতও ছিল না। প্রজা ভাবে আমি তাঁত বুনি আর খাই,—আমি লাঙ্গল চষি আর খাই, আমি দোকান-পাট করি, খাই-দাই থাকি। তা ইংরেজই আমার রাজা হউক,—মুসলমানই আমার রাজা হউক, আর হিন্দুই আমার রাজা হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমি দু'বেলা কাজকম করিয়া, খাটিয়া খুটিয়া স্ত্রী-পুত্রের পূর্ণমাত্রায় ভরণপোষণ করিতে পারিলেই আমার যথেষ্ট হইল। সুতরাং সাধারণ প্রজা যে, 'ইংরেজ-রাজ্য-লোপ' এই কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল,—তাহা নহে।

আমি স্থির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, মুসলমান প্রজা-সাধারণ ইংরেজরাজ্য লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হয় নাই। বোধহয় তাহারা এইমাত্র ভাবিয়াছিল যে, পাহারার পরিবর্তন হইল মাত্র। কিছুকাল ইংরেজ আমাদের প্রহরী রক্ষকস্বরূপ ছিল, এক্ষণে আবার আমাদের মুসলমান প্রহরী, মুসলমান রক্ষকই আসিল। যে রক্ষক হয় হউক, ভাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলেই হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে উপজীব্য করিয়া সেকালে যে কয়জন দেশীয় লেখক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাশীর সৈয়দ আহমদ খান, কানপুরের নানকচাঁদ, এলাহাবাদের ভোলানাথ চন্দর এবং বাংলাদেশের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যে এই বিদ্রোহকে উপজীব্য করিয়া কয়েকখানি ইতিহাস এবং উপন্যাস রচিত হইয়াছে কিন্তু আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে দুর্গাদাসের 'আমার জীবনচরিত' বা 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' দ্বিতীয়রহিত গ্রন্থ। 'জন্মভূমি' পত্রিকায় যখন এই গ্রন্থটি ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন দুর্গাদাসের এই জীবন-কথা বিপুলভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। দুর্গাদাস সম্পর্কে তৎকালীন জনসমাজের ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। গ্রন্থের প্রারম্ভে দুর্গাদাস বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গবাসী পত্রিকার যোগেন্দ্রচন্দ্রের আগ্রহের ফলেই তিনি গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হইলেন। ইহা ছাড়া, যোগেন্দ্রচন্দ্র রচনার ভাষা সংশোধন করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার কালে (১৯৩১) 'বঙ্গবাসী'র

মুদ্রাকর এবং প্রকাশক নটবর চক্রবর্তী গ্রন্থটির 'উপসংহার' অংশে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'দুর্গাদাসবাবুর বঙ্গবাসী-অফিসে চাকুরী হইল। চাকুরীর প্রথম কাজ হইল, তাঁহার জীবন-কথা যোগেন্দ্রবাবুর নিকট গল্প করা, আর যোগেন্দ্রবাবু সেই গল্প লইয়া নিজের অসাধারণ ভাষায় 'আমার জীবনচরিত' নাম দিয়া দুর্গাদাসবাবুর স্বাক্ষরে "জন্মভূমি"তে ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানির ভাষা-বিচার করিলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অপরাপর রচনাবলীর সহিত একটি সহজ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় এবং আমার বিশ্বাস যে ইহা যোগেন্দ্রচন্দ্রেরই রচনা, বক্তা—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গবাসী'র কার্যোপলক্ষে দুর্গাদাসকে একবার মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের তৎকালীন রাজা নরেন্দ্রলাল খানের নিকট যাইতে হয়। নরেন্দ্রলাল ইঁহার 'আমার জীবনচরিত' পড়িয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ইঁহাকে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ দিয়া কাছে রাখিলেন। রাজা নরেন্দ্রলাল যখন মেদিনীপুরের বোমার মামলায় ধরা পড়েন তখন দুর্গাদাস পেন্সন লইয়া যুক্তপ্রদেশের মজফর নগরে তাঁহার পুত্র নীলরতন-বাবুর নিকট জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। নীলরতনবাবু যখন এটোয়ায় চাকুরী করেন সেইখানেই দুর্গাদাসবাবুর কালাজ্বর হয় এবং তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন বা ১৩২১ সালের ১২ই শ্রাবণ লোকান্তরিত হন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ দুর্গাদাসের জীবন-কথা আজিকার জাতীয় জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করিয়া আনে। কোন্ অদৃশ্য জীবনশিল্পী তাঁহার জীবন-পাত্রটিকে আনন্দ-বেদনার রসে ভরপূর করিয়া দিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু সাধারণের ভিড়ে এই অনন্যসাধারণ চরিত্রের বিচিত্র কাহিনীটি যে অশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

—নিরঞ্জন চক্রবর্তী

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[বাঙ্গলা ১২৯৮ সালের 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকা হইতে গৃহীত ।]

তয়ফা নাচ

[বাঙ্গলা ১২৯৮ সালের 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকা হইতে গৃহীত ।]

মুখবন্ধ

১২৯৭ সালে,—বিগত কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমাদের সাক্ষাতের স্থল,—প্রয়াগের মহাতীর্থ,—গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম-ক্ষেত্র। বসুজা মহাশয় ৺পূজার বন্ধের উপলক্ষে দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

তিনি এলাহাবাদে পরিচিত বন্ধুর বাসায় বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই; এমন সময় আমি সেই বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া বসুজা মহাশয় আমার আপাদ-মস্তক তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি দৈর্ঘ্যে খর-খর ছয় ফীট। আপাতত দেহের সহিত মাংসের কিছু সম্পর্ক কম হইয়াছে;—কেবল মোটা মোটা হাড় এবং শিরার সমাবেশ। কাজেই আমাকে কিছু অধিক লম্বা দেখায়। আমি ভাবিলাম, বসুজা বুঝি আমার বিতিকিচ্ছি চেহারা দেখিতেছেন। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

বসুজা। মহাশয়ের নাম?

আমি। শ্রীদুর্গাদাস দেবশর্ম্মা—উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসুজা। আপনার কথা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আপনাকে দেখিতে পাইয়া আজ আমাকে ধন্য বলিয়া ভাবিলাম,—অধিক কি,—আজ যেন আমার সার্থক জীবন বলিয়া মনে হইল।

আমি। আমাকে আর কি দেখিবেন বলুন? আমি আর আমাতে নাই বলিলেই হয়। চিন্তা এবং বার্দ্ধক্য,—তাহার উপর দৈহিক পীড়া আমাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। আমাকে এক্ষণে অর্দ্ধদগ্ধ শুষ্ক অথচ চলৎশক্তিবিশিষ্ট লম্বা বাঁশের খুঁটা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত জাগিয়া বসুজা আমার উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। পরদিনও বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমার গল্প চলিল। তখন বসুজার অনুরোধ যে—"আপনি আপনার জীবন-চরিত লিখুন।" আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আপনি বঙ্গবাসীতে ছাপাইবেন না-কি? আমার জীবন-চরিত বঙ্গবাসীতে ছাপা হইলে, আপনার কাগজের গ্রাহক বোধ হয় কমিবে। আমি মিল্—না—ডিকুইন্সী যে, সর্ব্বসাধারণের জন্য আমার নিজের জীবন-চরিত আমি নিজে লিখিব? লোকে কি মনে করিবে? আমার সে ধৃষ্টতাও নাই, সে অভিলাষও নাই। বিশেষ, আমি ভাল বাঙ্গালা লিখিতে পারিব না।"

বসুজা। আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া লিখিতেই হইবে। ভাল বাঙ্গালার জন্য আসিয়া যাইবে না। ভাষা খারাপ হয়, আমি বা অন্য কেহ তাহা সংশোধন করিলেই চলিবে। সে যাহা হউক, আপনি যেরূপ মনোহররূপ গল্প করিলেন, সেই গল্পের কথাতেই যদি আপনি লেখেন, তাহা হইলে আপনার জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে পারে।

আমি। আমার ত সবই গিয়াছে। এ বুড়া বয়সে আমাকে আর গ্রন্থকার করিবেন না। দোহাই আপনার!—ঐটী আমাকে ক্ষমা করিবেন।

বসুজা। তাহা কখনই হইবে না।

এই কথা বলিয়া তখন তিনি আমাকে আরও অনেকরূপ বুঝাইতে লাগিলেন।

প্রকৃতই আমার এই জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা ছিল না। এ সংসারে যেমন আসিয়াছি, তেমনি চলিয়া যাইব;—কাগজে কলমে নাম ও রূপ অঙ্কিত করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজা মহাশয় তাহা ঘটিতে দিলেন না। তাঁহার কথায়, তাঁহার উপদেশে, তাঁহার আগ্রহে উৎসাহিত হইয়া, আমি অগত্যা আমার জীবন-চরিত লিখিতে বসিলাম।

এক

আমার নাম শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার নাম ৺শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার পৈতৃক বাস হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া-আঁটপুর গ্রামে। কিন্তু এক্ষণে আমাদের দেশের বাস একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। বাস্তু-ভিটা আছে কি না তাহাও জানি না। আমি এখন এলাহাবাদে বাস করিতেছি।

আমি যেমন সামান্য লোক, আমার কাহিনী তদনুরূপ সামান্য নহে। আমার জীবন অতিশয় বিচিত্রতাময়। এই জীবন-চক্রের নানা আবর্ত্তে পড়িয়া কত ভয়ানক, কত অদ্ভুত, কত শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। কত বিপদে পড়িয়া, কত অসমসাহসিক—কত দুঃসাহসের কাজ করিতে হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। এক সময়ে এরূপ বিপদ্-জালে জড়িত হইয়াছি যে, তাহা হইতে জীবন রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু অদৃষ্টে অনন্ত ক্লেশ, অনন্ত দুঃখ আছে বলিয়াই, বোধ হয় সে-সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

ইংরেজের জন্য সিপাহী-যুদ্ধের কালে রণক্ষেত্রে আমি শাণিত তরবারি হস্তে অশ্বে আরোহণ করিয়া সিপাহী সৈন্যের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কখনও বা যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ-রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া আমি নিজে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। অস্ত্রাঘাতের নানারূপ চিহ্ন আমার অঙ্গে এখনও বর্ত্তমান। কখনও বা সিপাহীগণ আমাকে বন্দী করিয়াছে ;—আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবার হুকুম হইয়াছে ;—কেবল ভগবানের কৃপায় আমি প্রাণ পাইয়াছি। একদিন আমার গায়ে ভীমের ন্যায় বল ছিল। বড় বড় পালোয়ান গোরা আমার কাছে একদিন ঘেঁসিতে ভয় করিত। আমি যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশারদ বলিয়া একদিন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষগণ আমার নাম কীর্ত্তন করিতেন। একদিন আমিই নাইনিতালে একদল নূতন রেশলা সৈন্য গঠিত করি,—তাহাদিগকে সমরবিদ্যায় সুনিপুণ করি। সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে, একদিন বেরিলির কালেক্টার মিঃ ইংলিস সাহেব আমাকে বলেন,—"দুর্গাদাসবাবু! আপনার যদি অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে গবরমেণ্টে লিখিয়া আপনাকে জায়গীর দেওয়াইতে পারি।" আমি উত্তর দি,—"জায়গীর আমি চাহি না,—ইংরেজের নুণ খাইয়া আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি ;—কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া পুরস্কার লইতে নাই।" ২১ বৎসর পূর্ব্বে জেনারেল ট্রূপ (C. Troup) আমাকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহা এই,—

"Mr. Alexander promised to give Durgadas a Tosildarship, but as his services were required to assist in the raising of a new cavalry corps at the foot of the Hills, he was made over to Colonel Crossman, with whom he was present at the actions of Churpoora, Sittargunje, Buharee, and Russolpoor,—and was wounded. I have never heard of a Bengali being so brave. He is a respectable, honest and clever man. I can recommend him for the highest situation in any office."

উপরোক্ত ইংরেজীটুকুর স্থূল ভাবার্থ এইরূপ,—"ক্রস্‌ম্যান সাহেবের সঙ্গে ইনি অনেকানেক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন ; যুদ্ধে ইনি আহত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী যে এরূপ সাহসী হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে আমি কখনও শুনি নাই। দুর্গাদাসবাবু সচ্চরিত্র, কার্য্যদক্ষ, সম্ভ্রান্ত ইত্যাদি।"

আজ আমি দরিদ্র, সুতরাং বৃদ্ধ এবং অক্ষম বটি,—কিন্তু এ জীবনে একদিন সুখ ছিল, স্বচ্ছন্দতা ছিল, মান ছিল, সম্ভ্রম ছিল, ভাগ্যলক্ষ্মীও একদিন আমার অনুগত ছিলেন। তাঁহার কৃপায় বিপুল সুখ, অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। আমি পথে বাহির হইলে, আগে-পিছে আমার, অশ্বারোহী সৈন্যও একদিন ছুটিত। আমার গাড়ী ছিল, ঘোড়া ছিল,—আমার একটি ঘোড়ারই মূল্য ছিল চারি হাজার টাকা। গবর্ণমেণ্টের তনখা-প্রাপ্ত একজন নবাব আমাকে সেতার শিখাইতেন। বাসায় আমার দুবেলা পঞ্চাশজন লোকের পাত পড়িত। কিন্তু আজ সেই ভাগ্যদেবীর বিড়ম্বনায় সে সুখ, সে ঐশ্বর্য্য, সে বিভব, সে মান, সে মর্য্যাদা সকলই চলিয়া গিয়াছে। গত-জীবনের কথা মনে হইলে এখন তাহা সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়।

ইংরেজের অভিযোগে, ইংরেজের আদালতে, ইংরেজের বিচারে, আমি শেষ-দশায় ইংরেজের কারাগারেও বাস করিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবনের ঘটনা অতি অদ্ভুত।

পিতাঠাকুর কার্য্যোপলক্ষে পশ্চিমে আইসেন। তিনি ৬ সংখ্যক ইরে-গুলার অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে কাজ করিতেন। রেজিমেণ্ট এক স্থানে স্থায়িরূপে থাকিত না। কাজেই পিতাকে নানা স্থানে ঘুরিতে হইত। ১৮৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসে যখন তাঁহার রেজিমেণ্ট কুরুক্ষেত্র হইতে তিন ক্রোশ অন্তর কর্ণাল

নামক স্থানে ছাউনি করিয়াছিল, তখন আমার জন্ম হয়। তথা হইতে নিমাচ;—নিমাচ হইতে সাকার-বাকার;—তথা হইতে কাশীধামে আসি। তথায় কিছুদিন থাকিয়া শান্তিপুরে যাইতে হয়। সেখানেও অধিক দিন থাকা ঘটে নাই, তাহার পর পুনরায় কাশীতে উপস্থিত হই। এখানে আমার আত্মীয় ছিলেন, তথায় থাকিয়া আমি বেনারস কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ১৮৪৮ সালে পিতা দমোতে বদলি হন; আমাকেও তথায় যাইতে হয়। সেখানে দুই বৎসর থাকিয়া আমাকে পুনরায় কাশী আসিতে হয়। দুর্ভাগ্য-ক্রমে ১৮৫১ সালে আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পিতৃদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। আমরা তিন সহোদর ছিলাম। আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পিতার লোকান্তর হইলে অবশ্যই সংসারের সকল ভার প্রায় আমার উপর পড়িল। তখন আমার তরুণ বয়স, জ্ঞান বুদ্ধি সকলই অপরিণত। এদিকে সম্মুখে অপার অনন্ত সংসার-সমুদ্র। কিরূপে এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র পার হইব, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইলাম।

দুই

আমি জানিতাম না যে, মৃত্যুকালে পিতৃদেব কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। যে টাকা তখন জননীর হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে আমার চাকুরি না হইলেও, আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারিত। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ ছিল, হদ্দ মায়ের হাতে পঞ্চাশ-ষাট টাকা নগদ আছে; আর তাঁহার গহনাগুলি আছে; ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের নাই। মা আমার তখন কেবল কাঁদিতেন কাটিতেন এবং আমার পানে চাহিয়া আপনা-আপনি বলিতেন,—"কেমন ক'রে এ সংসার চালাবো?" আমার তখন বয়স অল্প, পনের বৎসর মাত্র। মায়ের চক্ষে অবশ্যই তখন খুব ছেলেমানুষ। বোধ হয়, এই কারণেই আমাকে পিতৃসঞ্চিত টাকার কথা ঘুণাক্ষরেও বলেন নাই।

একদিন মাকে বলিলাম,—"মা! আমি চাকরির চেষ্টায় আছি। আমার যদি ২০৲ কুড়ি টাকাও মাহিনা হয়, তাহা হইলেই আমাদের সংসার এক রকম চ'লে যাবে।" মা ঠিক এই কথাগুলি বলেন,—"না বাছা! তুই দুধের ছেলে,—তুই এর মধ্যে চাকরি কি করবি? তুই এর মধ্যে কি শিখলি যে, চাকরি

করতে পারবি? তোর এখন কিছুতেই চাকরি করা হবে না। যতদিন আমার এই গহনা-গাঁটিগুলি আছে, ততদিন তুই একটু বড় হ,—একটু লেখাপড়া বেশী করে শেখ্‌—তারপর চাকরি করিস এখন। তা আমার যা গহনা আছে, তাতে তিন বৎসর বেশ চলবে। তোর কোন ভাবনা নেই।

চাকরি সম্বন্ধে জননীর সহিত আর কোন বাদানুবাদ করিলাম না। কারণ আমি বুঝিলাম, আমি আর বেশী কথা কহিলেই মা কাঁদিয়া হাট করিবেন।

যাহা হউক, চাকরি করার লালসা মনে বড়ই বলবতী হইল। লেখা-পড়ায় জলাঞ্জলি দিলাম। মনে মনে বলিলাম,—"আমি কি এমনই কাপুরুষ যে, মায়ের গায়ের গহনা-বেচা টাকায় আমাকে উদর পূরণ করিতে হইবে? তাহা কখনই হইবে না। চাকরি আমি অবশ্যই করিব।" কাশীতে ৺পিতৃ-দেবের পরিচিত দুই-একজন বন্ধুর নিকট গিয়া চাকরির কথা বলিলাম; কিন্তু সুবিধা কোথাও হইল না। ক্রমে একে, ওকে, তাকে—নানা লোককে বলি,—কিন্তু চাকরি মিলিল না। প্রত্যহ সমুদয় সহরটী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, কিন্তু চাকরি খুঁজিয়া পাইলাম না। তখন আমার তপ, জপ, তন্ত্র, মন্ত্র—এ সমস্তই চাকরি হইল। বলা বাহুল্য, জননীর অগোচরে এই চাকরির চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

সেই সময় বেনারস হইতে ৭ ক্রোশ দূরে সুলতানপুর নামক স্থানে ৮ সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহী সৈন্য ছাউনী করিয়াছিল। শুনিলাম, তথাকার এডজুটেণ্ট আফিসে একটি চাকরি খালি আছে। আমি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া, কাহারও সহিত কোন পরামর্শ না করিয়া, একেবারে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমে এডজুটেণ্ট আফিসের বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্ম্মখালির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"চাকরি খালি ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে লোক ভর্ত্তি হইয়াছে। এখন আর কোন কর্ম্ম খালি নাই।" এত দূর আসিয়া কোন ফল দর্শিল না দেখিয়া বড় হতাশ হইলাম। ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়াই বিবেচিত হইল। এমন সময়ে হঠাৎ মনে হইল, যদি কষ্ট করিয়া এত দূরে আসিলাম, তবে এই রেজিমেণ্টের সেনানায়কের সঙ্গে কেন একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাই না? এই স্থির করত বড় সাহেবের বাঙ্গালার সমীপে উপস্থিত হইয়া আরদালিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সাহেবের নাম লেপ্টেনেণ্ট বীচার; আর তখন তিনি স্নানে

নিরত আছেন। আমি সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যখন বাড়ী হইতে যাত্রা করি, তখন একখানি দরখাস্ত, স্কুলে যে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম তাহার একখানি সার্টিফিকেট এবং পিতারও দুইখানি প্রশংসা-পত্র সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলাম। এইমাত্র সম্বল লইয়া আমি চাকরি পাইবার প্রত্যাশায় উমেদারি করিতে আসিয়াছি। যাহা হউক, অতি উৎকণ্ঠার সহিত সাহেবের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় বীচার সাহেব স্নানাদি করিয়া বাহিরে আসিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিলাম। সাহেব আমাকে বলিলেন, "What do you want boy?" অর্থাৎ "বালক! তুমি কি চাও?" আমি বলিলাম—"আমি চাকরির প্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া তাঁহার হাতে সার্টিফিকেট-শুদ্ধ দরখাস্ত দিলাম। সাহেব দরখাস্তখানি এবং পিতার সার্টিফিকেট পড়িয়া বলিলেন, "তুমি শিবচন্দ্রের পুত্র? তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। শিবচন্দ্র আমার নিকট অনেক দিন চাকরি করিয়াছিল। যাহা হউক, কোথাকার চাকরি খালি আছে?" আমি বলিলাম,—"এডজুটেণ্ট আফিসে একটি কর্ম্ম খালি আছে।"

সাহেব,—"এ সংবাদ কি তুমি নিশ্চয় জান?"

আমি,—"আজ্ঞা হাঁ।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া এডজুটেণ্ট-লেপ্টেনেণ্ট মেকেঞ্জী সাহেবের 'বাঙ্গালা'য় উপস্থিত হইলেন। চাকরি খালির কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় মেকেঞ্জী সাহেব বলিলেন, তাঁহার আফিসে একটি কর্ম্ম খালি ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে একজন লোক নিযুক্ত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া বীচার সাহেব বলিলেন, "যে লোকটীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, সে কিরূপ উপযুক্ত তাহা কি দেখিয়া লওয়া হইয়াছিল?" বীচারের কথায় মেকেঞ্জী সাহেব কিছু অপ্রস্তত হইয়া বলিলেন, "আমার আফিসের বড়বাবু তাহাকে আনিয়াছেন, তাহাকে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া বীচার সাহেব বলিলেন, "তোমার বাবুকে এবং আমার বাবুকে পরীক্ষা করা হউক, যে উপযুক্ত হইবে, তাহাকেই নিযুক্ত করা উচিত।" পরীক্ষার কথা শুনিয়া আমার মনে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, "পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অবশ্যই চাকরি পাইব।" যাহা হউক, আমরা উভয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য বসিয়া গেলাম। বীচার সাহেব একখানি পুস্তক হইতে শ্রুতিলিখনের জন্য কয়েক ছত্র

বলিলেন। আমি সকল কথা লিখিয়া সাহেবকে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার তাহাতে কোন ভুল ছিল না। আর ওদিকে এডজুটেণ্ট আফিসে নব-নিয়োজিত বাবু শ্রুতি-লিখনের প্রথম আর শেষ কথাটি লিখিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বীচার সাহেব তাঁহার কাগজ দেখিয়া, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"দেখ মেকেঞ্জী! তোমার বাবু কি করিয়াছে! যে কিছুই জানে না, এমন লোককে রাখিবার প্রয়োজন কি? যাহা হউক, তুমি এই বালক দুর্গাদাসকে নিযুক্ত কর।" বীচার সাহেবের কথানুসারে মেকেঞ্জী সাহেব তাঁহার আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনে আমাকে নিযুক্ত করিলেন।

১৮৫১ সালের অক্টোবর মাসের শেষে আমার এই প্রথম চাকরি হইল। বলা বাহুল্য, এই নূতন চাকরি পাইয়া মনে মনে যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। তখন মনে কত যে সুখের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহা এখন কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু ওদিকে এডজুটেণ্ট আফিসের বড়বাবু শ্রীযুক্ত যদুনাথ বসু মনে মনে কিছু চটিলেন। তাঁহার আশ্রিত লোকের চাকরি না হইয়া আমার হইল, ইহাতে ত তাঁহার বিরক্ত হইবারই কথা। কিন্তু তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিবার উপায় নাই। একে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, তাহাতে আবার আমি বড় সাহেবের আনীত লোক; কাজেই তাঁহার মনের আক্রোশ মনেই চাপিয়া রাখিতে হইল। আমার ত সেখানে কর্ম্ম হইল, কিন্তু সেই দিনই হুকুম আসিল যে, আমাদের রেজিমেণ্টকে সুলতানপুর হইতে পঞ্জাবের অন্তর্গত হান্সী যাইতে হইবে। ১৮৫১ সালে ৮ই নবেম্বর আমাদের তথায় যাইবার দিন স্থির হইল। মেকেঞ্জী সাহেব আমাকে তখনি ডাকাইয়া বলিলেন, "রেজিমেণ্টকে হান্সী যাইবার হুকুম হইয়াছে, তুমি কি সেখানে যাইবে?" বাল্যকালাবধি পিতার সঙ্গে নানা দেশ-দেশান্তরে গিয়াছি। অনেক দেশ, অনেক নগর ইহার মধ্যে দেখিয়াছি। বিশেষত বাল্যকাল হইতেই শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য ছিল, সাহসও কিঞ্চিৎ ছিল, সুতরাং মেকেঞ্জী সাহেব বলিবামাত্র আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম। হান্সী যাইতে ত স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু নিজের কাছে তখন টাকা-কড়ি কিছুই ছিল না। এমন কি একটি পয়সাও নিকটে ছিল না। আমি সাহসে ভর করিয়া সাহেবকে বলিলাম,—"যদি বেতনের স্বরূপ অগ্রিম কিছু পাই, তাহা হইলে আমার বিশেষ সুবিধা হয়।" এই কথা শুনিয়া সাহেব আমাকে তিন মাসের বেতন একেবারে দিতে আদেশ করিলেন। ওদিকে বড় সাহেব (চার্লস বীচার) নিজ হইতে ৩০৲ ত্রিশ টাকা

দিলেন। চাকরির টাকা আমার সেই প্রথম হাতে পড়িল। একেবারে ১৫০৲ দেড় শত টাকা পাইয়া মন বড়ই প্রফুল্লিত হইল। তখন আমার মনে কত ভাব, কত কথা উদয় হইতে লাগিল, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

আমি মাতার সহিত একবার দেখা করিব বলিয়া, সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলাম। এদিকে বাটিতে কান্না-কাটনা পড়িয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র যে, আমি পলাইয়া গিয়াছি, সন্ন্যাসী সাজিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি। জননী ত একেবারে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। প্রথমে বাড়ী ঢুকিয়াই মাতাকে প্রণাম করিলাম, দেড় শত টাকা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম, "মা! আমার এই চাকরির টাকা—তুমি লও।" মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"আমার টাকায় কাজ নাই, তুই আমার বেঁচে থাক্।" মাতা একটু প্রকৃতিস্থা হইলে, তাঁহার নিকট আমার চাকরির সকল কথা আদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনি শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইলেন। এত অল্প বয়সে, বিদেশে অপরিচিত স্থানে যাইতে দেওয়া তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে,—"আমার এখন চাকরি করিবার এবং তাঁহাদের সকলকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহাতে অনেক দিন আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে, এক্ষণে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই।" আমি মাতাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম এবং বলিলাম, হান্সী যাইবার জন্য সাহেব আমাকে অগ্রিম বেতন দিয়াছেন এবং কর্ম্মস্থানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং আমাকে যাইতেই হইবে। মাতার তখন বিশেষ প্রতীতি হইল—আমি নিশ্চয়ই চাকরি করিতে যাইব, সুতরাং অনর্থক বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। মা ভাবিলেন—"যদি আমি সম্মতি না দিই, তবে ছেলে আমায় আবার না বলিয়া পলাইয়া যাইবে।" কাজেই এবার মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অনুমতির লক্ষণ প্রকাশ করিলেন। বাস্তবিক এবার মায়ের অনুমতি না পাইলে কিছুতেই যাইতে পারিতাম না। কারণ, প্রথমবার পলায়নের পর, মায়ের যেরূপ অবস্থা আসিয়া দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, আমি কি নিষ্ঠুর! শেষে মা বলিলেন,—"তুই যদি একান্তই যাবি, তবে আর একটি দিন থেকে যা। আমি তোকে ভাল করে খাওয়াব, মাখাব, দেখব।" মা সেদিন মনের সাধে প্রায় পঁচিশ রকম তরকারি রাঁধিলেন, পায়স,

পিষ্টক, ক্ষীর, দই—সমস্তই প্রস্তুত করিলেন। আমরা তিন ভাই একত্র বসিয়া আহার করিলাম।

৭ই নবেম্বর কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিলাম। আমি নিজের খরচের জন্য কিছু টাকা মায়ের নিকট হইতে লইয়া সুলতানপুরে উপস্থিত হইলাম। পরদিন রেজিমেণ্ট হান্সী যাত্রা করিল। একদিন আমরা আলিগড়ে ছাউনি করিয়া আছি, লেপটেনেণ্ট বীচার সাহেব আমাকে বলিলেন,—"বাবু! আমার নিজের কিছু হিসাবপত্র আছে, তাহা তুমি রাখিতে পারিবে?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে আদেশ করিলে রাখিব।" সাহেব বলিলেন, "তবে তুমি আজ হইতে আমার হিসাব রাখিও, আমি তোমাকে মাসিক ১৫৲ পনের টাকা দিব।" সেই দিন হইতে আমি সাহেবের নিজের হিসাবপত্র রাখিতাম। কয়েক দিন মধ্যে রেজিমেণ্ট দিল্লী পঁহুছিল। বীচার সাহেব আমাদের রেজিমেণ্টের ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন,—তাঁহার হাসপাতালের হিসাব কে রাখে? ডাক্তার সাহেব বলিলেন,—"নেটিব ডাক্তার সেরূপ উপযুক্ত নহে, কাজেই তাঁহাকে সকল হিসাব রাখিতে হয়।" সাহেব বলিলেন,—"তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমার এক বাবু আছে, সে বেশ উপযুক্ত, মাসিক তাহাকে কিছু দিও, সে তোমার হাসপাতালের লেখাপড়ার কাজ করিয়া দিবে।" এই কথা হইবামাত্র সাহেব আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সার্জ্জন মেজর সাহেবের সম্মুখে বলিলেন,—"এই বাবুকে মাসে মাসে ১৫৲ পনের টাকা দিও, তোমার সকল কাজ করিয়া দিবে।" সেইদিন হইতে আমি হাসপাতালেরও কেরাণী নিযুক্ত হইলাম। দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আমরা রোহিতক উপস্থিত হইলাম। প্রায় প্রতি রেজিমেণ্টে একটি করিয়া মেস থাকে; সেখানে ইংরেজ কর্ম্মচারীরা আহারাদি করিয়া থাকেন। আমাদের রেজিমেণ্টেও একটি মেস ছিল। মেকেঞ্জী সাহেব তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। আমরা যখন দিল্লীতে ছিলাম, একদিন বড় সাহেব মেকেঞ্জী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মেসের হিসাবপত্র কে রাখে?" তিনি উত্তর করিলেন,—"আমিই রাখিয়া থাকি।" বড় সাহেব বলিলেন,—"কেন দুর্গাদাসকে দিলে হয় না?" মেকেঞ্জী সাহেব কহিলেন,—"হাঁ, এখন হইতে দুর্গাদাসই ঐ কাজ করিবে এবং তজ্জন্য তাহাকে মাসিক ১৫৲ পনের টাকা দিব।" আবার আমার ১৫৲ পনের টাকা বাড়িল। পথে যাইতে যাইতে আমার ৪৫৲ পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। ইহা যে

বাঁচার সাহেবের অনুগ্রহ এবং অশেষ দয়ার জন্য হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। আমার প্রতি সাহেবের এতাদৃশ অনুকম্পার জন্য তাঁহাকে কত ধন্যবাদ দিলাম, তাহা বলিতে পারি না।

যথা সময়ে আমরা হান্সীতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে পঁহুছিয়া যথা-সাধ্য পরিশ্রম করত আমি সকল কাজ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। কিসে সাহেব সন্তুষ্ট থাকেন, কিসে আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়, এই চিন্তা অহরহঃ আমার মনে জাগরিত থাকিত, সে জন্য কাজ-কর্ম্মের কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিত না। আমি যখন যে কাজ করিতাম, তখন ঠিক নিজের ঘরের কাজ করিতেছি মনে করিয়াই প্রাণপণে তাহা করিতাম; —বেতনভোগী চাকরের ন্যায় কখনও কাজে গোঁজামিল দিতাম না। কাজ করাতেই আমার আনন্দ ছিল। এইরূপে অভিনব উৎসাহ, অগাধ পরিশ্রম এবং নূতন অধ্যবসায়ের সহিত আমি কাজ করিতে লাগিলাম। এইভাবে তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। তখন পূজনীয়া মাতাকে আমার নিকট আনিলাম। তিনিও স্বচ্ছন্দে হান্সীতে বাস করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে রেজিমেণ্টে এইরূপ নিয়ম ছিল, দেশীয় সৈনিকদের চিঠিপত্রের উপর বড় সাহেব দস্তখত করিয়া দিলে বিনা মাশুলে তাহা যথাস্থানে পৌছিত। আমাদের আফিসের বড় বাবু (বাবু যতুনাথ বসু) সেই সকল পত্রের উপর (Frank) লিখিতব্য বিষয় লিখিয়া দিতেন; তাহাতে সাহেব দস্তখত করিতেন। যতু বাবুর সময় ছিল না, আর তাঁহার মেজাজও কিছু রুক্ষ ছিল, সিপাহীরা তাঁহার নিকট গেলে তিনি বড় বিরক্ত হইতেন, এজন্য তাহারা তাঁহার নিকট না যাইয়া আমার কাছে আসিত, আমি তাহাদের পত্রের উপর লিখিয়া দিতাম। এতদিনে সাহেব আমার লেখা অবশ্যই বেশ চিনিতেন। একদিন সাহেব অডারলী-গৃহে এই সকল পত্রে স্বাক্ষর করিতে করিতে দেশীয় কর্ম্মচারী-দের জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই সকল পত্রে বড় বাবুর লেখা থাকে না, ছোট বাবুর লেখা থাকে কেন?" তাহারা বলিল, "বড়ে বাবুকা মেজাজ শক্ত হ্যায়, আওর ছোটে বাবুকে মেজাজমে মোলামিয়েৎ হ্যায়, ইস্ বায়স্ সিপাহীলোগ উন্‌কে পাস যাতে হেঁ।" এ কথা শুনিয়া সাহেব হুকুম দিলেন, এই কাজের জন্য বড় বাবুকে যে ২০৲ কুড়ি টাকা দেওয়া হইত, তাহা আজ হইতে ছোট বাবুকে দেওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এই কথা শুনিয়া যতু বাবু আমার উপর মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতে আমার কোন দোষই ছিল না।

পরম সুখে হান্সীতে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। বড় সাহেবের ভালবাসা কখনও ভুলিবার নহে। সিপাহীগণের সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। বিশেষ আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া সকল সিপাহী আমাকে মান্য করিত। তাহাদের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার সমর খেলা হইত। আমার অশ্বারোহণ, তরবারি সঞ্চালন, বন্দুক ধারণ দেখিয়া সিপাহীগণ চমৎকৃত হইত। ক্রমশঃ সিপাহীদের সঙ্গে নানারূপ সম্পর্ক পাতাইতে আরম্ভ করিলাম, কেহ ভাই, কেহ দাদা, কেহ খুড়া, কেহ ঠাকুরদা,—এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত হইলাম। এখন যেমন রেজিমেণ্টে সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকই প্রবেশ করে—পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তখন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় উচ্চবর্ণের হিন্দু-সন্তান সামরিক বিভাগে প্রবেশ করা গৌরব মনে করিতেন। তাঁহাদের শরীরে শক্তি যেরূপ, মনের বলও তদনুযায়ী। আহারীয় কোন ভাল সামগ্রী পাইলে, তাঁহারা অগ্রে আমাকে তাহার অংশ দিতেন। আমাকে বলবান্ দেখিয়া তাঁহারা অধিকতর ভাল-বাসিয়াছিলেন। আমি তখন সর্ব্বদা হিন্দুস্থানী বেশে সজ্জিত থাকিতাম; কথা কহিতাম ঠিক হিন্দুস্থানীর ন্যায়; হঠাৎ দেখিলে, আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া কেহ চিনিতে পারিত না। কোন কোন সিপাহী আমাকে বলিত,—"বাবু! আপ বাঙ্গালী মালুম নেহি হোতে, বাঙ্গালীমে এতনি কুবৎ (বল) নেহি হোতি। ক্যায় আপ সচ মুচ বাঙ্গালী হেঁয়?" আমি হাসিয়া এই-ভাবে উত্তর দিতাম,—"নাহেঁ বাপু! আমি বাঙ্গালীই বটি। কেন, বাঙ্গালীর গায়ে কি জোর হ'তে নাই? আমা অপেক্ষা আরও অধিক বলবান্ বাঙ্গালী আছেন। তাঁহারা এক একজনে তোমাদের দশ বিশ জনকে এক এক কীলে নিকাশ করিতে পারেন।" আমার এই রঞ্জিত কথা শুনিয়া সিপাহীগণ বিস্মিত হইত এবং পরস্পর মুখ চাহা-চাহি করিত। আমি মনে মনে হাসিয়া ইহাদের মজা দেখিতাম।

বালককাল হইতেই ঘোড়া চড়িবার আমার খুব সখ ছিল। হান্সীতে সৈন্যদের জন্য ঘোড়া-চড়া শিক্ষা করিবার তখন একটি স্কুল ছিল। বীচার সাহেবকে বলিয়া আমি সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। এক বৎসর কাল আমি ঘোড়া-চড়া প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা করি। স্বয়ং বীচার সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত আমাকে ঘোড়-দৌড় শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অশ্বারোহণে এরূপ পারদর্শী হইলাম যে, সৈন্যদল মধ্যে আমার সমান অশ্বারোহী আর কেহই তখন রহিলেন না। আমি অশ্বারোহণে সিদ্ধ হইলাম। বড় বড় দুরন্ত ঘোড়া সোজা

করিতে লাগিলাম। রেজিমেণ্টের সাহেব, বিবি, সিপাহী—দেখিয়া শুনিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

মা আমাকে মনের সাধে স্বয়ং রাঁধিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন;—আমি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ হইতে লাগিলাম। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

তন

এক প্রবন্ধে আমি বড় লোক। আষাঢ় মাসের 'জন্মভূমি'তে এক প্রবন্ধ,—তারপর 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে সেই এক প্রবন্ধ—সুতরাং এক্ষণে আমি বড় লোক।

আমি বড় লোক,—কেন না, অনেক ব্যক্তি আমার ঠিকানা জানিতে চাহিতেছেন। এলাহাবাদের কোন্ পাড়ায়, কোন্ গলিতে, কোন্ ক্ষুদ্র ঘরে আমি থাকি,—আমি এখন কি খাই, কি পরি, কি করি, এ সকল বিষয়ের প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য জন্মভূমির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি পত্র আসিয়াছে। পত্রে কেহ আমাকে অর্থসাহায্যের আশা দিয়াছেন। কেহ-বা আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। কেহ-বা আমাকে আপন বাটিতে লইয়া গিয়া আমার মুখে গল্প শুনিতে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

সকলকে বিনীতভাবে বলি, আমার আর ঠিকানা জানিয়া কি করিবেন? আমি আজ এখানে, কাল ওখানে, আজ এ-পাড়ায়, কাল ও-পাড়ায়, আজ এ-বাটীতে, কাল ও-বাটীতে। আমার পাকা ঠিকানা,—সেই অনন্তধাম—সেই শমন-সদন। এ বয়সে ইহসংসারে আর কাহারও সহিত আলাপ প্রণয় করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দেহে বল নাই, মনে বল নাই, মেজাজ ঠিক নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, এখন এ ভব-বন্ধন হইতে যত শীঘ্র আমি মুক্ত হইতে পারি, ততই আমার পক্ষে মঙ্গল। তাই নিবেদন, আমাকে কেহ পীড়াপীড়ি করিবেন না।

যাঁহারা এই দীন-দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া, অর্থ-সাহায্যে মুক্তহস্ত, তাঁহাদের আমি মহৎ হৃদয়ের ভূয়সী প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁহাদের দান করিবার শক্তি থাকিলেও আমার গ্রহণ করিবার শক্তি কৈ? দেওয়া সহজ, লওয়া কঠিন। আমার ললাট-লিপিতে বিধাতা এ সময় অর্থোপার্জ্জন লিখিয়া না রাখিলে ত আমি আর এখন টাকা লইতে পারিব না? কিন্তু

সকলেরই জানা উচিত, এক্ষণে আমার পোড়া শোল মাছ পলাইবার সময় উপস্থিত। এ সময় আমার হাতে টাকা আসিবে কেন? এ দারুণ দুঃসময়ে আমার এমন কি অভাবনীয় স্বর্গীয় শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা আমি টাকা গ্রহণে সমর্থ হইব? টাকাই যদি আমার হাতে আসিবে—তবে এত টাকা—সেই অতুল বিভব,—সেই বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট হইবে কেন? আমি টাকার সমুদ্র দেখিয়াছিলাম,—আমি সুবর্ণপ্রদায়িনী কামধেনু পাইয়াছিলাম,—যদি এক্ষণে পুনরায় আমার হাতে অর্থাগম হওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ছিল, তবে সে সমুদ্র শুকাইবে কেন,—সে কামধেনু পলাইবে কেন? বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, তবে কিঞ্চিদধিক এক বৎসর হইল, আমার উপযুক্ত পুত্র—সাতাইশ বৎসরের পুত্র অকালে কালগ্রাসে নীত হইবে কেন? একদিনের একটা ঘটনা শুনুন। এই এলাহাবাদে কোন নবাগত ব্যক্তি আমার অভাব জানিয়া আমাকে কয়েকটি টাকা দেন। আমি সে টাকা হাতে করিয়া লইয়াও তাঁহাকে ফিরিয়া দিলাম,—বলিলাম,—"থাক্, এখন থাক্—আমার বিশেষ কষ্ট হইলে আপনার নিকট পত্র লিখিয়া ঐ টাকা আনাইব।" ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট ঐ গল্প করিলাম। স্ত্রী বলিলেন—"বেশ, আজ যে আমার হাতে কিছুই নাই—একটীও পয়সা নাই—যদি ওবেলা আটা আর ঘি ধারে না পাওয়া যায়, তবে সকলকে উপবাস করিতে হইবে।"

আমি। কৈ, তুমি একথা পূর্ব্বে আমাকে বল নাই কেন? তোমার হাতে যে একটীও পয়সা নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব?

স্ত্রী। তোমাকে সারাদিন পয়সার কথা বলিয়া লাভ কি? এইজন্যই বলি নাই। আজ এমন সুযোগ ঘটিবে জানিলে কি বলিতাম না? আচ্ছা, তুমি হাতে টাকা পাইয়া ফেরত দিলে কেন? জান ত, আমাদের বারমেসে অভাব।

আমি। জানি সব,—বুঝি সব; —কিন্তু টাকাগুলা হাতে পাইয়া আমার বুকটা কেমন ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সে সময়ে কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল যে, হঠাৎ টাকাগুলি ফেরত দিলাম। সেই ভদ্রলোকটীও একটু অপ্রস্তুত বা বিরক্ত হইলেন।

দিন যেমন করিয়া হউক চলিয়া গেল। দিন কখন অচল থাকে না। তবে আধ-পেটা—পুরা-পেটা আর সিকি-পেটা—এই যা তারতম্য। পরদিন আমি সেই বাবুর বাসায় আহারাদির পর পুনরায় উপস্থিত হইলাম। ইচ্ছা ছিল,—তাঁহার নিকট হইতে টাকাগুলি আমি চোক-কান বুজিয়া চাহিয়া লইব। কিন্তু

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম—বাবু নাই,—কোন গুরুতর কার্য্যানুরোধে হঠাৎ স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন।

তাই বলিতেছিলাম—টাকা দেওয়া সহজ, কিন্তু লওয়া কঠিন।

সে যাহা হউক, অর্থ-সাহায্য ছাড়া, আমাকে কেহ কেহ দেখিতে চাহিয়াছেন। সঙ এবং দেবতা—এ উভয়ই দর্শনীয় সামগ্রী। আমি অবশ্যই দেবতা নহি; তবে কি আমি সঙ? সকলের নিকট নিবেদন, আমি ওরূপ ভাবে কাহারও নিকট দেখা দিতে পারিব না। লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা স্বতন্ত্র জিনিষ—এবং সহজ কাজ। কিন্তু এই যে দেখানো বা দেখাইয়া বেড়ানো বড়ই গুরুতর কর্ম্ম। আমি রমাবাঈ নহি যে, অমুক রাজা বাবুর মজলিসে বসিয়া মধুর রবে শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। আমি মওলাবক্সও নহি যে,—সঙ্গীত-রসে লোকের মন মজাইতে সক্ষম হইব। আমাকে দেখিয়া বা আমাকে লইয়া, লোকের যে কি হইবে, তাহা আমি বুঝি না। কেহ কেহ হয়ত মনে করিয়াছেন—আমি একজন মস্ত বীর। আমার মাথা আকাশে ঠেকিয়াছে, আমার পদভরে মেদিনী কাঁপিতেছে, বস্তুত এসব ব্যাপার কিছুই নয়। সুতরাং আমাকে সঙ দেখার মত দেখিয়া লাভ কি? আমি ক্ষুদ্র জীব—ক্ষুদ্র মানুষ।

জন্মভূমির সম্পাদক কলিকাতা যাইবার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, এমন কি পাথেয় পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এখন (১৪ই আষাঢ় ১২৯৮) বড় গরম। আমি শ্রাবণ মাসে যাইব। সেই সময় সকলেরই সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইবে।

বাজে কথা ফুরাইল, এখন জীবন্-চরিত শুনুন।

চার

আবার জননী লইয়া গোলযোগ বাধিল। ১৮৫৩ সালের শেষে গবর্ণমে হইতে এই হুকুম আসিল, আমাদের রেজিমেণ্ট ব্রহ্মদেশে যাইবে। এই সংব রেজিমেণ্ট মধ্যে প্রচার হইল। আমি বাসায় আসিয়া মাতাকে এ সংব দিলাম। তিনি ইহা শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চাকুরিতে ইস্ত দিবার জন্য আমাকে বারংবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম,—ব্রহ্মদেশে গেলে আমার ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। আমার উন্নতির পথ রোধ করা তাঁহার উচিত নহে। বিশেষত বড় সাহেব আমাকে সমধিক যত্ন করেন। যখন তাঁহার সঙ্গে যাইতেছি, তখন আর ভয়ের কোন কারণ নাই; তিনি নিশ্চিন্তান্তঃকরণে আমাকে বিদায় দিন এবং আশীর্ব্বাদ করুন, আমি সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাগত হইয়া আবার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব।

কিন্তু মায়ের মন ইহাতে শান্ত হইবে কেন? তিনি চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। বিশেষ, তখনকার (১৮৫৩ সালের) ব্রহ্মদেশ, আর এখনকার (১৮৯১ সালের) ব্রহ্মদেশ অনেক তফাৎ। তখন ব্রহ্মদেশ প্রকৃতই মগের মুলুক ছিল;—সমুদ্র পার হইয়া, জাহাজে চড়িয়া তখন অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীই ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে এখন যেমন ইংলণ্ড, তখন তেমনি ব্রহ্মদেশ ছিল। আরও এক কথা, আমি তখন ছিলাম পঞ্জাবের অন্তর্গত হান্সী নগরে। হান্সী হইতে বাঙ্গালা দেশ তখন তিন মাসের কম আশা যাইত না। কারণ সে সময়ে রেলপথ হয় নাই,—হাঁটা-পথে আসিতে হইত। এখন বুঝুন —হান্সী হইতে ব্রহ্মদেশ কতদুর? সুতরাং মায়ের চোখের জল আসিবে না কেন? মায়ের তখন ইচ্ছা আমার বিবাহ দিয়া বউ লইয়া ঘর করেন। এদিকে কোথা বিবাহের সম্বন্ধ, ওদিকে কোথা ব্রহ্মদেশ! কাজেই জননী দিশা-হারা হইলেন। কিন্তু এদিকে আমার দেশভ্রমণের বাসনা বলবতী;—মগের দেশ, মগের বেশ, মগের মেয়ে-পুরুষ, মগের রীতি-নীতি দেখিবার ও জানিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত;—বিশেষ চাকরী ছাড়িয়া ঘরে নীরবে বসিয়া থাকিবই বা কিরূপে? আর ওদিকে বড় সাহেবের অকৃত্রিম স্নেহ। এই সব নানা কারণে আমি ব্রহ্মে যাওয়াই স্থির করিয়া মাতাকে অনেক বুঝাইলাম,—বলিলাম,—"ভয় কি মা? আমি আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মে

কোন যুদ্ধ-হাঙ্গামা নাই ;—সুতরাং প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। বিশেষ, পল্টনের সমস্ত সৈন্য এবং বড় সাহেব আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।" এইরূপে মাতাকে আমি বুঝাইলাম এবং আরও অনেকে বুঝাইলেন। অগত্যা জননী তখন প্রসন্ন হইলেন। এত অল্প বয়সে আমার এ প্রকার অসঙ্গত সাহস এবং বিদেশ যাইবার ইচ্ছা ঈদৃশ বলবতী দেখিয়া মাতা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং অগত্যা ব্রহ্মে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

বিদায় লইলাম বটে, কিন্তু মন বড় খারাপ হইল। মায়ের চোখের জল দেখিয়া হু হু শব্দে আমার চোখ দিয়াও জল পড়িতে লাগিল। মা বলিলেন,— "বাছা, খাওয়া মাথার কখনও কষ্ট করিও না,—সময়ে আহার করিও— তোমার শরীর যাহাতে ভাল থাকে, তাহা করিও।" আমি মনে করিলাম,— "মা, তোমার মত এত যত্ন, এত আদর করিয়া বিদেশে আমাকে কে খাওয়াইবে বল?" মুখে মাতাকে বলিলাম,—"হাঁ, তা ভাল খাইবার চেষ্টা করিব বৈ কি?—ভাল করিয়া না খাইলে শরীর টিকিবে কেন?" আমার বিশ্বাস, মাতা যেমন উত্তম রন্ধন করিতে পারিতেন, তেমন উত্তম রন্ধন একালে আর কেহই করিতে পারেন না। এখন 'মহারাজ' আছেন, 'ঠাকুর' আছেন, 'পূজারী' আছেন, বিধবা বামনী আছেন, এখন আড়ম্বর অনেক হইয়াছে,— খরচ দ্বিগুণ চৌগুণ হইয়াছে,—কিন্তু রন্ধন আর তেমনটী হয় না। এখন রন্ধনের পুস্তক হইয়াছে,—সেই পুস্তক পড়িয়া নববধূগণ রন্ধন শিক্ষা করেন,— হাওড়া হিতকরী সভায় বালিকাগণ কাগজে লিখিয়া রন্ধনের পরীক্ষাও দেন,— তাই বলি, জাঁকজমক এখন অনেক হইয়াছে, কিন্তু তেমন রন্ধনটী আর হয় না। মা আমার ইংরেজী জানিতেন না, বাঙ্গালাও জানিতেন না, কখন কোন পাক-প্রণালীর কেতাবও পড়েন নাই, কখন কোন রন্ধনের পরীক্ষাও দেন নাই,—অথচ তিনি যেমন শীঘ্র-হস্তে সহজে ও স্বল্প সময়ে সুমিষ্ট রন্ধন করিতেন, তেমনটী আর কেহই পারেন না। যাহা হউক, এখন আর সে দুঃখ করিলে কি হইবে? সে দিন, সে কাল গিয়াছে।

এদিকে ব্রহ্মদেশে যাইবার জন্য রেজিমেণ্টে সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। বাবু যদুনাথ বসু ব্রহ্মে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দুই মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিলেন। তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার সকল কাজ আমাকে করিবার আদেশ হইল। আমি সে কাজ করিতেও

পশ্চাৎপদ হইলাম না। যদু বাবু মথুরায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথুরায় আমার কোন আত্মীয় থাকিতেন। আমি এই সুযোগে মাতা, ভগিনী এবং দুইটী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে মথুরায় পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। গত ১৮৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের রেজিমেণ্ট ব্রহ্মে যাইবার জন্য কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল।

পাঁচ

আমাদের রেজিমেণ্ট স্থানে স্থানে ছাউনী করিয়া শেষে তিন মাসের মধ্যে কলিকাতায় গঙ্গাতীরে শিবির সন্নিবেশিত করিল। তথায় আমাদের প্রায় এক মাস কাল অবস্থান করিতে হয়। আমাদের রেজিমেণ্টে ৫৮৪ জন সওয়ার এবং চারি জন পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীও ছিলেন। ইহা ব্যতীত আর অনেক লোক-লস্কর ছিল। আমাদের কলিকাতায় অবস্থানকালীন এক একবার এক একখানি ষ্টীমার আসিয়া এক শত বা ততোধিক সিপাহী লইয়া যাইত। এইরূপে পাঁচবারে পাঁচখানি জাহাজে আমাদের রেজিমেণ্টের অধিকাংশ লোক চলিয়া গেল। শেষ জাহাজে প্রায় এক শত জন সিপাহী এবং লেপ্টেনাণ্ট মেকেঞ্জী সাহেব যাত্রা করেন। এই জাহাজে আমি ছিলাম।

ব্রহ্মে যাইবার সময় হিন্দু সিপাহীরা বড়ই বিভ্রাট বাধাইয়াছিল। জাহাজে জলপূর্ণ পিপে ছিল, সেই জল তাহাদের পান করিবার কথা হয়। হিন্দু হইয়া সেই ছত্রিশ জাতি-স্পৃষ্ট জল পান করিতে তাহারা কোনমতে স্বীকৃত হইল না। সিপাহীগণ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া প্রকাশ্যতই বলিল,—আমরা কোম্পানীর লুণ খাইয়াছি সত্য, কোম্পানীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু জাতি কিছুতেই দিব না। ইহার জন্য মহা হুলস্থূল বাধিয়া যায়। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করা হইল। তিনি এই আদেশ দিলেন, হিন্দু সিপাহীরা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় তাহাই যেন করা হয়। তদনুসারে তাঁবার কুপোর ন্যায় বড় বড় জালা কিনিবার হুকুম হইল। সিপাহীরা জাহাজের একটি প্রকোষ্ঠ গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া তাহারা আপন হস্তে ভাগীরথীর পূত সলিল জালাতে পূর্ণ করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিল। আর একজন সিপাহী সশস্ত্র সেই প্রকোষ্ঠদ্বারে পাহারা দিতে লাগিল। এই গোলযোগের জন্য সকল হিন্দু সিপাহীদের

সর্ব্বশেষে ব্রহ্মে যাইতে হয় এবং মুসলমান ও অন্যান্য সিপাহীরা অগ্রেই গিয়াছিল।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, এখন যেমন কোন সিপাহীকে নিযুক্ত করিতে হইলে তাহাকে এ প্রকার শপথ করান হয় যে, সরকার বাহাদুর যেখানে যাইতে বলিবেন,—সমুদ্রের এ পার কিংবা অপর পারেই হউক—তাহা বিনা আপত্তিতে যাইতে হইবে, পূর্ব্বে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সিপাহী নিযুক্ত করিবার নিয়ম ছিল না। বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর হইতেই এই নিয়ম প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, আমরা যে জাহাজে ব্রহ্মে যাই, তাহার নাম 'আগাবাকা'। আমাদের জাহাজ আর একখানি বাষ্পীয় পোতের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। সেই বাষ্পীয় পোত আমাদের জাহাজকে টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জাহাজখানি অতি প্রকাণ্ড; তিন-চারি তলা বাড়ীর ন্যায় উচ্চ এবং তদনুরূপ প্রশস্ত। দেখিলে ছোট-খাট গ্রাম বলিয়া ভ্রম হয়। জাহাজের প্রথম তলে জিনিষপত্র আর ছোট-বড় ১২৫টা ঘোটক, তাহার সহিত সওয়ারও থাকিত। উপরে অনেক প্রকোষ্ঠ ছিল। তাহা পদস্থ কর্ম্মচারী এবং জাহাজের অধ্যক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি বাসের জন্য উহার একটি কামরা পাইয়াছিলাম। পূর্ব্বোল্লিখিত বাষ্পপোতে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ মেকেঞ্জী সাহেব থাকিতেন।

ষ্টীমারস্থ লোকের সঙ্গে আর আমাদের জাহাজের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার এক উপায় ছিল। উভয় জলযানে এক-একখানি বোর্ড বা তক্তা ছিল। ষ্টীমারের লোক যদি আমাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সেই বোর্ডে লিখিলে খালাসিরা তাহা ষ্টীমারের উপর ধরিত, আমাদের জাহাজের খালাসিরা তাহা দেখিতে পাইয়া সাহেবকে সংবাদ দিত। উত্তর দিবার সময় সাহেবও তদনুরূপ বোর্ডে লিখিয়া খালাসিদের দিতেন, তাহারা তদনুরূপ দেখাইত। এইরূপে আমাদের উভয় পোতে কথা হইত। যাহা হউক, যে দিবস আমাদের জাহাজ কলিকাতা পরিত্যাগ করিবে, সেইদিন আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম; দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, কলিকাতাস্থ কোন আত্মীয়ের বাসায় গিয়া যে আহারাদি করিব, সে অবকাশও হইল না। অনাহারে জাহাজে উঠিলাম। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজের একটি প্রকোষ্ঠ আমি পাইয়াছিলাম। পাছে আমার সামুদ্রিক পীড়া হয়, এই জন্য সাহেব আমাকে

সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু আমি আপনার জিনিষপত্র কামরায় রাখিয়া ডেকের এক পার্শ্বস্থ একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য ইতস্তত চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি জাহাজের পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, একখানি ছিপ তাহাতে বাঁধা রহিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কিছু নিকটবর্ত্তী হইলাম। ছিপে কয়েকজন লোক বসিয়া আছে। তাহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত, তপসে মাছ ধরিবার জন্য কোথায় যাইতেছে। কথা প্রসঙ্গে তাহারা জানিল, আমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনাহারী আছি। ইহা শুনিবামাত্র তাহারা আমাকে তাহাদের ছিপে আসিতে অনুরোধ করিল। আমি কাষ্ঠের সিঁড়ি দিয়া অবতীর্ণ হইলাম। সেখানে যাইবামাত্র তাহারা আপনাদের রন্ধন করিবার স্থান গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া আমার রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দিল। সমস্ত দিনের পর অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। আহারান্তে তাহারা বলিল, যে স্থানে তাহারা মৎস্য ধরিয়া থাকে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র আমি তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিতে গেলাম। অর্দ্ধেক সিঁড়ি উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, ছিপখানি প্রায় ৫০০ শত হাত দূরে রহিয়াছে। দেখিবামাত্র মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিলাম। অতি কষ্টে জাহাজে উঠিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।

আমাদের জাহাজ ঘোর রবে অনন্তদেশব্যাপিনী ভাগীরথীর বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে অনন্ত ক্রীড়াময়ী স্রোতস্বিনীও যেন অনন্ত সাগর-সম্ভাষণাভিলাষে আমাদের সঙ্গে কল-কল রবে চলিতে লাগিল। অবধারিত সময়ে আমরা ডায়মণ্ডহারবার পার হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়িলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখন সমুদ্র দেখি নাই। সেই গম্ভীরনাদী জলধিশোভা দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিমোহিত হইয়া রহিলাম। জগৎ-সংসারকে মলিন করিয়া দিনমণি অস্তমিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা তিমিরাবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দেখা দিল। রজনী শশি-শোভনা ছিল বলিয়া, অন্ধকার দৃশ্য অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সম্মুখে সুদূরবিস্তৃত গাম্ভীর্য্যময় সফেন উত্তাল তরঙ্গ-শোভিত গর্জ্জনপ্রিয় স্ফীত-বক্ষ বারিধি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত। ওদিকে মস্তকোপরি সুনীল অম্বরে নক্ষত্রমালাপরিশোভিত শশিকলা আপন সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর। বিভিন্ন সময়ে অম্বুধির বিভিন্ন শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এক দিন হঠাৎ

একটি ঘোড়া-খুলিয়া গিয়া বড় গোল বাধাইয়াছিল। ঘোড়াটী জাহাজের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সাহস করিয়া কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইহার কিরূপ বিহিত করা যাইবে তাহা জানিবার জন্য আমরা বোর্ডে লিখিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে জানাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটীকে গুলি করিবার হুকুম দিলেন। একজন সিপাহী তাহাকে গুলি করিল। গুলির আঘাতে ঘোড়াটী ডেকের উপর পড়িয়া গেল; কিন্তু তখনও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। তাহাকে সেই অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ঘোড়াটী ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত সাগরে গিয়া মিলিল। এ দৃশ্য দেখিয়া আমার মন অতিশয় ব্যথিত হইল। আর এক দিন সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপর দুর-প্রান্তে একটী জলস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইল। জলস্তম্ভ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দেখিলাম, একটী বাষ্পময় শুণ্ডাকৃতি স্তম্ভ মেঘে মিলিত হইয়াছে। এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। অতি ত্বরায় এ সংবাদ জাহাজের অধ্যক্ষকে দেওয়া হইল, তিনি ইহা বিশিষ্টরূপে অবলোকন করিয়া জলস্তম্ভের উদ্দেশে কামান ছুড়িতে বলিলেন। কামানের গোলা লাগিয়া জলস্তম্ভ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, তাহাব পর আর কিছুই দেখা গেল না। এইরূপে বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্য ইংরেজের কামানে পরাস্ত হইল। আমি আমাদেব জাহাজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জল-স্তম্ভে গোলা মারিয়া কি লাভ হইল? তিনি হাসিয়া বলিলেন, ঐ জলস্তম্ভ আমাদের জাহাজ অনায়াসে বিপর্য্যস্ত কবিযা দিতে পারিত। আমি শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। জলস্তম্ভের যে এত ক্ষমতা আছে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আর এক দিন সমুদ্রে সামান্য ঝড় উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত আর আমরা কোনরূপ আধি-দৈবিক পীড়ায় প্রপীড়িত হই নাই।

সমুদ্রপোত যখন হেলিতে দুলিতে ঘোর রবে বারিধি-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যাইতেছিল, তখন ঝাঁকে ঝাঁকে উড্ডীন মৎস্য এক স্থান হইতে উড়িয়া অপর স্থানে যাইতেছিল। ঘর ঘর শব্দে জাহাজের চাকা জল কাটিয়া যাইতেছিল, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়াতে শত-সহস্র মণিমুক্তা-প্রবালমালা সমুদ্ভূত হইয়া বারিধিতে আবার বিলীন হইতে লাগিল। এই সকল নয়নাভিরাম শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা ১১ দিবসে রেঙ্গুনে পঁহুছিলাম। সেখানে আমাদের ১০।১৫ দিন অপেক্ষা কবিতে হইল। তাহাব পর ছোট ষ্টীমারে ছোট জাহাজ

বাঁধিয়া ইরাবতী নদী দিয়া গিয়া ব্রহ্মদেশের থিয়েটমউ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করা হইল। ইতিপূর্ব্বে মগের মুল্লুকের নাম মাত্র শুনিয়াছিলাম, কখন দেখি নাই, কখন আসিও নাই ; এ স্থানের সকল জিনিষ নূতন, সকল বিষয়ই আমার অপরিচিত। কিন্তু সুখের বিষয় এই, সেখানে পদার্পণ করিবামাত্র কোন্নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় হইল। তিনি সেখানে কমিসেরিয়েট ষ্টেশন গোমস্তা ছিলেন। কোন বাঙ্গালী সেখানে গেলে তিনি অতি সযত্নে তাঁহাকে আপনার বাড়ীতে আনিতেন। আমিও তাঁহার বাড়ীতে অতি সাদরে গৃহীত হইলাম।

ছয়

আজ প্রায় ৩৭ বৎসর অতীত হইল আমি ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলাম। সে দেশের চাল, চলন, রীতি, নীতি যাহা তখন দেখিয়াছিলাম, তাহার আভাস এ স্থলে দিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্রহ্মদেশবাসীদের বস্ত্রাদি পরিধান প্রথা কিছু আশ্চর্য্যজনক, দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারা যায় না। পুরুষদের ধুতির পরিসর প্রায় ২ ফুট, আর দৈর্ঘ্য ১৫।১৬ হাত। ঐ ধুতিকে তাহারা 'পছো' বলে। সেই পছো লইয়া প্রথমে কোমরে একটী গ্রন্থি বা গাঁইট দেয়, তাহার পর এক ফের তাহাতে জড়াইয়া সমুদয় কাপড় সম্মুখে একটী পুঁটুলি করিয়া বাঁধিয়া রাখে। অবশ্য ইহা দেখিতে কিরূপ হাস্যোদ্দীপক তাহা সহজেই অনুমেয়। মগেরা উল্কি পরিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ইহাদের জানু হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত উল্কি চিত্রিত। উল্কি এরূপ ঘনসন্নিবেশিত যে, যদি কেহ উলঙ্গ হইয়া থাকে, তাহা হইলে দূর হইতে এরূপ বোধ হইবে যে, সে নীল রঙ্গের জাঙ্গিয়া পরিয়া রহিয়াছে। উক্ত উল্কি দ্বারা তাহারা নানা প্রকার যন্ত্র জঙ্ঘাতে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—"এই যন্ত্র থাকিলে সাপে কামড়ায় না, এ যন্ত্র থাকিলে জলমগ্ন হয় না, এ যন্ত্র থাকিলে অগ্নিতে দাহ হইবে না।" এ প্রকার বহুবিধ চিত্র অঙ্কিত আছে। আবার ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে উল্কি বিভিন্ন রঙ্গের আছে। কাহার বা লাল, কাহার বা নীল বর্ণের উল্কি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নীল রঙ্গের উল্কি অধিক। মগেরা যে কেবল জঙ্ঘাতেই উল্কি পরে এমন নহে, অনেকে

আবার হাতে বক্ষঃস্থলেও পরিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে আর একটি প্রথা দেখিলাম। ইহারা গোফ-দাড়ি রাখিতে বড়ই অনিচ্ছুক। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, যেই গোফ-দাড়ি উঠিতে লাগিল, অমনি তাহারা সোন্না দিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। কাজেই গোফ-দাড়ি আর উঠিতে পায় না। সুতরাং পুরুষের মুখ রমণী-মুখের ন্যায় বোধ হয়। তবে এমন কথা বলিতেছি না যে, পুরুষমাত্রেরই গোফ-দাড়ি নাই। তাহাদের মধ্যে যদি শতকরা দুই-এক জন শ্মশ্রুল হইল, তাহা হইলে যথেষ্ট হইল বলিতে হইবে। ওদিকে আবার পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের ন্যায় মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখে এবং তাহাদের চুলের প্রতি যত্নও অসামান্য। সর্ব্বদাই চুলগুলিকে পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যদি কোন মগ অতি দুরবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনার মাথার চুল বাঁধা দিয়া দুই-তিন টাকা আনে; অবস্থা ভাল হইলে তাহা পরিশোধ করে। পুরুষেরা মাথার চুল একখানি ৩।৪ হাত বুক মসলিনের চাদর দ্বারা মাথার চারিদিকে একত্র করিয়া রাখে। ঐ চাদরের নাম 'গঁ ও বঁ ও'। তাহাদের চুল কবরীর ন্যায় বাঁধা থাকে না,—খোলাই থাকে।

ব্রহ্মের স্ত্রীলোকদের পরিধেয় বস্ত্রের নাম 'থমি'। সে কাপড় অধিকাংশই রেসমের হইয়া থাকে। তাহাদের কাপড় পরিবার রীতি এইরূপ,—তাহারা তিন খণ্ড কাপড় লয়, প্রথম এবং শেষ খণ্ড লাল কিংবা বেগুণী রঙ্গের সালুর, আর মধ্যের খণ্ড রেসমের হয়। এই তিন খণ্ড কাপড় একত্র সেলাই করিয়া তাহারা পরিধান করিয়া থাকে। একটি সন্তান হইলে, বুকে ফের দিয়া কাপড় পরে না, কটির কাপড় পূর্ব্বমত রাখে। তখন হইতে তাহাদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত থাকে। কেহ কেহ মেরজাই পরে। তাহার হাতা কিছু বড় রাখে, এমন কি, হাত হইতে এক বিতস্তি ঝুলিতে থাকে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে লজ্জা-সরম কিছুই নাই; স্ত্রীর স্বামীকে দেখিয়া লজ্জা নাই, ভাসুর ভ্রাতৃবধূ এক স্থানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, মাথায় কাপড় দিয়া লজ্জা নিবারণের প্রয়োজন হয় না, সবই একাকার। স্ত্রীলোকদের কবরী পশ্চাৎ দিকে বাঁধা থাকে। তাহাতে বাহার দিবার জন্য সপুষ্প ডাল গুঁজিয়া দেওয়া হয় এবং এক-একখানি রঙ্গিন রেসমের বা সূতার রুমাল হাতে কিংবা গলায় বাঁধিয়া ব্রহ্ম-রঙ্গিণীরা বাহার দিয়া থাকে।

এদেশে খাদ্য-সামগ্রী অধিকাংশই পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মবাসীদের আহার অতি জঘন্য। তাহারা মৎস্যকে পচাইয়া কাদার ন্যায় করে, তাহাকে তাহারা

'নপি' বলে। ইহার এরূপ-ভয়ানক দুর্গন্ধ যে, মাতৃদুগ্ধ পর্য্যন্ত বমন হইয়া যায়, কিন্তু মগেদের নিকট এই 'নপি' অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। ইহারা মসলার পরিবর্ত্তে এই 'নপি' সকল তরকারীতে দিয়া থাকে। আম, জাম, কাঁটাল, বাঁশ এবং আরও নানা প্রকার গাছের কচি কচি পাতা লইয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইলে লবণ এবং নপির গোলা দিয়া অতি উৎকৃষ্ট আহার্য্য প্রস্তুত করে।

মগেদের অভক্ষ্য কিছুই নাই। এমন পক্ষী নাই যে, তাহারা যাহার মাংস খায় না এবং এমন স্থলচর বা জলচর জীব নাই যে, যাহাদের মাংসে তাহারা জঠরানল তৃপ্ত না করে। হাতী, ঘোড়া, উট, গাধা, শূকর, গো, মেষ, মহিষ—যত প্রকার জন্তু বিশ্বস্রষ্টা স্বজন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এই মগেদের খাদ্যের জন্যই হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, তাহারা মরা পাইলে আর মারিয়া খাইতে চাহে না। আমাদের রেজিমেণ্টে ঘোড়ার পীড়া হইয়া প্রত্যহই ২।৪টি করিয়া ঘোড়া মরিতে লাগিল। ওদিকে প্রাতঃকাল হইবামাত্র দেখি, প্রায় ২০০ শত মাংসলোলুপ মগ দা হাতে করিয়া অশ্বশালার নিকট বসিয়া আছে। ঘোড়া আস্তাবল হইতে ফেলিয়া দিবামাত্র তাহারা দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া কাটারী দ্বারা খণ্ড খণ্ড করত আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত। কখন কখন কমিসেরিয়েটের হাতী বা বয়েল মরিলে তাহারা ঐরূপেই বিভাগ করিয়া লইত। তাহারা যদি সাপ পাইত, তাহা হইলে তাহার মাথা কাটিয়া আগুনে পোড়াইয়া উদরসাৎ করিত। মগেরা অতিশয় অন্নপ্রিয়, রুটি কাহাকে বলে তাহা জানিত না। আমি যখন ছিলাম তখন দেখিয়াছি,—তাহারা অতি প্রত্যূষে, সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই এক হাঁড়ি ভাত ও অন্য হাঁড়িতে পাতার ঝোল লয়। গালার কলাই-করা কাষ্ঠের থালে সেই ভাত মন্দিরের ন্যায় বাড়ে। কয়েকটী কাঁচের বাটিতে নানা প্রকার পাতার ঝোল থালের চারিদিকে রাখিয়া বাড়ীর বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, পুত্র কন্যা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া আহার করিতে বসে। আমি হিন্দু এবং আমাদের দেশের প্রথা অতি স্বতন্ত্র, সুতরাং এ দৃশ্য আমার ভাল লাগিত না। ইহারা পান ও সুপারি খাইতে অতিশয় ভালবাসে।

ব্রহ্মদেশবাসীদের ঘর-বাড়ী তখন বাঁশ এবং ঘাসের দ্বারাই নির্ম্মিত দেখিয়াছিলাম। ঘরের মেজে অতিশয় সিক্ত বলিয়া তাহারা মঞ্চ বা মাচার উপর শয়ন করিত। একখানি বড় ঘরে পিতা মাতা, পুত্র পুত্রবধূ, ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ

একত্র শয়ন করে ; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের এক-একটী অতি পুরু মশারি মাত্র ব্যবধান থাকে। মশারি এত পুরু যে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, সেগুলি এক-একটী প্রকোষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। তাহাদের পিতল কাঁসার তৈজসপাত্র, সিন্দুক, বাক্স কিছুই নাই। আসবাবের মধ্যে কেবল এক-একটী মোটা কাপড়ের থলি গলদেশে ঝোলানো থাকে। শয়নকালে তাহা বিছানায় রাখিয়া নিদ্রা যায়; সুতরাং তাহাদের চোর-ডাকাতের বিশেষ ভয় নাই। যাহা হউক, তাহারা ঘাসের ঘরগুলি এত সন্নিকটে করে যে, একখানি ঘরে আগুন লাগিলে সকল ঘরগুলি পুড়িয়া যায়। ঘরে আগুন লাগিলে মগেদের ভয়ের বা ভাবনার কোন কারণ নাই। ঘরে আগুন লাগিবামাত্র সেই মহামূল্য দ্রব্য-পূর্ণ থলি এবং মশারিটী লইয়া তাহারা বাহিরে বৈশ্বানরের রঙ্গ দেখিয়া হাসিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে ঘাসের ঘর একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া যায়, কোন প্রকার চিহ্ন থাকে না। দুই-চারি দিবস পরে দেখিবে, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় আবার ঘাসের নূতন ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রীস্বাধীনতা যথেষ্ট আছে। অধিকাংশ কর্ম্ম স্ত্রীলোকেই সম্পাদন করিয়া থাকে। বাজারে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় তাহারাই করে, আর পুরুষেরা মজুরী করে। আমি যে সময়ে গিয়াছিলাম, তখন দুগ্ধ টাকায় ৪ পাইট পাওয়া যাইত। সে দেশে গাভী অনেক, কিন্তু দুগ্ধ দোহন পদ্ধতি তাহারা অবগত ছিল না। মণিপুর হইতে কয়েক জন ময়রা গিয়াছিল, তাহারা দুগ্ধ দোহন এবং মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। মগেরা ঘৃতকে যে যারপরনাই ঘৃণা করিত, এ কথা আমি শুনিযাছিলাম। একদিন কতকগুলি মগ কুলী আমাদের বাসায় কাজ করিতেছিল। আমি কৌতুক দেখিবার জন্য একটুকু ঘি আনিয়া একজন কুলীর নাকে লাগাইয়া দিলাম, সে তৎক্ষণাৎ 'তে নান্দে তে নান্দে' (বড় দুর্গন্ধ) বলিয়া উঠিল এবং না জানি কি দুর্গন্ধময় জিনিষ তাহার নাকে দেওয়া হইয়াছে, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া নাসিকা বার বার ধৌত করিতে এবং মুছিয়া ফেলিতে লাগিল। অতি দুর্গন্ধময় 'নপি' যাহাদের উৎকৃষ্ট আহার্য্য, তাহাদের নিকট ঘৃতের ঈদৃশ অবমাননা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহার পর, আমি তাহাকে একটুকু পরিষ্কার চিনি আনিয়া খাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলাম। সে ভাবিল, হয়ত আমি আবার ঘৃতের মত কোন দ্রব্য আনিয়া থাকিব, এজন্য সে তাহা

খাইতে কোনমতে সম্মত হইল না। শেষে যখন আমি জোর করিয়া তাহার মুখে চিনি ফেলিয়া দিলাম, সে তখন তাহার স্বাদ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আরও খাইতে চাহিল এবং বলিল যে, ইহা তাহারা জীবনেও কখন খায় নাই। আমি যে সময়ে তথায় গিয়াছিলাম, তখন তথায় তালের গুড় ভিন্ন আর কোন প্রকার মিষ্ট দ্রব্য পাওয়া যাইত না।

সাত

আমি প্রায় সর্ব্বদাই ইরাবতী নদীর তীরে বেড়াইতে যাইতাম, কখন বা পার হইয়া অপর পারেও যাইতাম। সেখানে জঙ্গলের দৃশ্য অতি রমণীয়, অতি শোভাময়, অতি চিত্তামোদী। দেখিলে নয়ন এবং মন তৃপ্তি লাভ করে। সুপ্রশস্ত জঙ্গলের ভূভাগে ছোট ছোট সমশির কতই পুষ্পবৃক্ষ, মাটি হইতে ৩।৪ ইঞ্চি উচ্চ, তাহাতে অধিক পাতা নাই, কেবল স্তবকে স্তবকে মনোহর পুষ্প-সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, বসুন্ধরা অঙ্গে বহুদুর-বিস্তৃত নানা বর্ণের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে, আর সেই শোভাময়ী বসুমতী প্রফুল্ল ফুলশয্যায় শয়ন করিয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মে নানা স্থানে উচ্চ নিরেট মন্দির (pagoda) দেখিতে পাওয়া যাইত। অনেক মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে স্থান খনন করা হইয়াছে। তাহার ভিতর হইতে সোনার বা রূপার বুদ্ধ-দেবের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয়, স্থপতিরা মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সময় এক-একটি মূর্ত্তি দিয়া তাহা গাঁথিয়া যায়। আমি সেখানে অতি আশ্চর্য্য একটি মন্দির দেখিয়াছিলাম। তাহার নাম এক্ষণে আমার ঠিক স্মরণ নাই, বোধ হয় সয়াসাণ্ডো কিংবা সোয়েডেগঁও হইবে। তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল অতি বিচিত্র এবং আশ্চর্য্যজনক। মন্দিরটী অতি উচ্চ, তাহার চারিদিকে সুপ্রশস্ত রোয়াক, তাহার উপর এই মন্দিরটী নির্ম্মিত। সেই রোয়াকের উপর উঠিতে প্রায় ৭০।৮০টী সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি আবলুষ কাষ্ঠের স্তম্ভের উপর রক্ষিত। স্তম্ভগুলি অতি সুন্দর সোনালীর কাজ করা। মন্দিরটী যে কত উচ্চ, সে কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তাহার রোয়াক এত উচ্চ যে, তাহার উপর হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মস্তক ঘূর্ণিত হয়। উক্ত মন্দিরে এক অতি বৃহদাকার ঘণ্টা আছে। এ প্রকার ঘণ্টা

আমরা জীবনে কখনও দেখি নাই। ঘণ্টার আয়তন এত বড় যে, তাহার ভিতর ৪০।৫০ জন লোকের স্থান অনায়াসে হইতে পারে এবং ২০।২২ জন লোক হাতাহাতি করিয়া ধরিলে তাহার আয়তন পায় না। ঘণ্টাটী প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি পুরু এবং বোধ হয় ৫০।৬০ মণ কিংবা ততোধিক ভারি হইবে। আমি যে দিন এই মন্দির দেখিতে যাই, সে দিন আমার সঙ্গে একজন সওয়ার যায়, তাহার সঙ্গে তাঁবুর খোঁটা গাড়িবার একটী মুগুর ছিল। সেই মুগুরের দ্বারা ঘণ্টায় আঘাত করাতে এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হয় যে, তাহাতে আমার কর্ণ একেবারে যেন বধির হইয়া গিয়াছিল। সেখানে আরও একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ঘণ্টা ছিল। ইংরেজেরা তাহা লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঘণ্টাটী জাহাজে উঠাইবার জন্য কপিকল লাগান হইয়াছিল, উঠাইবার জন্য কপিকলে বলপ্রয়োগ করিলে জাহাজের এক দিক নামিয়া বসিয়া গেল, তথাপি ঘণ্টা এক হাত মাটি হইতে উত্থিত হইল না। নদীতীরে একটি পিল্লায় ঘণ্টাটী টাঙ্গান ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে নদীর ধারে পড়িয়া যায়, সেটীকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য হাতী পর্য্যন্ত নিয়োজিত করা হইয়াছিল, তথাপি তাহার কিছুই করিতে পারে নাই। মগেদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, নিশীথ সময়ে মন্দিরের চূড়ায় কথনও কথনও আলো জ্বলিয়া থাকে। তাহা যে কোথা হইতে এবং কি প্রকারে হয় তাহার স্থিরতা নাই। যাহা হউক, গভীর রাত্রে মন্দির-চূড়ে আলো জ্বলিয়াছে, এ কথা রাষ্ট্র হইবামাত্র মগেরা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মন্দিরোদ্দেশে মুখ করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে থাকে।

ব্রহ্মদেশে বিবাহের প্রথা আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। অধিকাংশ স্থলে পিতা-মাতাকে রাজি করিয়া কিছু অর্থ দিলে, তাহারা তাহাদের কন্যাদের অপরের হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে। আবার স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বস্বামীকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া পুনরায় পিতা-মাতার নিকট আসিতে পারে। আমাদের রেজিমেণ্টে প্রায় দুই শত সওয়ার উক্তরূপ মগ-রমণীকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকের আবার সন্তানাদিও হইয়াছিল। কিন্তু এদেশে আসিবার সময় তাহারা আপনাপন পিতামাতার নিকট চলিয়া গেল। আর রেজিমেণ্টে এরূপ হুকুম হইয়াছিল যে, কেহই ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও কেহ মগ-রমণীকে লইয়া যাইতে পারে নাই। কেবল রেসালদার নিজাম খাঁ, সাহেবদের অনেক

বলিয়া কহিয়া একটী স্ত্রীলোক লইয়া যাইতে পারিয়াছিল। ব্রহ্মে বড় বড় ঘোড়া দেখিতে পাই নাই; ছোট ছোট টাটু (Pony) ঘোড়া অধিক। ঐ সকল ঘোড়া এত দ্রুতগতিতে কদমে যায় যে, আমাদের ঘোড়া দৌড়িয়াও তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারে না। ব্রহ্মদেশ হইতে আসিবার সময় আমি দুইটী ঘোড়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম। একটীর মূল্য ৮০৲, অপরটির মূল্য ১২০৲ টাকা। ব্রহ্মে যে ঘোড়াটী ৮০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম, বেনারস কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ রবার্ট ব্যালেনটাইন এল. এল. ডি. সাহেবকে ৭০০৲ টাকায় সেটীকে বিক্রয় করি। অপরটী নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছিলাম। রাজস্থানের সওদাগর এবং দালালেরা ঐ ঘোড়ার দাম চারি হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি তখন তাহাদের দিতে সম্মত হই নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শেষে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একজন বিদ্রোহী সিপাহী আমার বাড়ী লুণ্ঠনের সময় সে ঘোড়াটী লইয়া প্রস্থান করে।

ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালীন আমি একদিন ইরাবতী নদীর তীরে কষ্টম কলেক্টর লো সাহেবের আফিসে গিয়াছিলাম। টেবিলের উপর কতকগুলি হিসাবের বহি পড়িয়াছিল। আমি দুই-একখানি বই দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। লো সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম,—"হিসাবের বহিতে মিল নাই, ভ্রমে পরিপূর্ণ।" সাহেব নিজে আসিয়া সেই সকল বহি দেখিয়া বলিলেন,—"সত্য বটে, হিসাবে সব ভুল রহিয়াছে।" তদনন্তর সাহেব আমাকে বলিলেন, "বাবু! যদি তুমি এখানে আসিয়া প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া এই সকল হিসাব দেখ, তাহা হইলে আমি তোমাকে মাসিক ১০০৲ এক শত টাকা করিয়া দিতে সম্মত আছি।" সাহেবের এ অনুরোধ আমি যে অতি সন্তোষের সহিত রক্ষা করিয়াছিলাম এ কথা বলাই বাহুল্য। এইরূপে ব্রহ্মে আসিয়া আমি মাসিক ৩৬৫৲ টাকা পাইতে লাগিলাম। ১৮৫৬ সালে আমাদের রেজিমেণ্টকে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ হইল। এবার আমাদের ট্যানগুপ পর্ব্বত দিয়া আসিতে হয়। অবধারিত সময়ে আমরা কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে বারাকপুর যাইতে হয়। তথায় প্রায় আড়াই মাস অবস্থান করিলে পর পুনরায় আমরা সুলতানপুরে যাইবার আদেশ পাইলাম। সুলতানপুরে আমরা তিন-চারি মাস থাকি। এই সময়ে আমি বেনারসে আসিয়া প্রথম দার-পরিগ্রহ করি। রেজিমেণ্ট এখানে অধিক দিন থাকিতে না থাকিতে

আমাদের বেরিলি যাইবার হুকুম হয়। ১৮৫৬ সালে নবেম্বর মাসে উক্ত স্থানে উপস্থিত হই ; সেখানে প্রায় তিন বৎসরের জন্য ছাউনি করিতে হয়।

আট

ভূগোলে কিঞ্চিৎ বিদ্যা না থাকিলে সবই যেন অন্ধকারময় বোধ হয়। ভারতবর্ষের কোথায় কোন্ প্রদেশ বা কোন্ নগর অবস্থিত,—কোন্ পর্ব্বত হইতে কোন্ পুণ্যবতী নদী বহির্গত হইয়া কোন্ সমতল ক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, কোথায় কোন্ দুর্গম গিরি-সঙ্কট, কোন্ ফল-পুষ্প-সমন্বিত উর্ব্বর উপত্যকা-অধিত্যকা আছে, কোথায় কোন্ রণভূমে পূর্ব্বকালে রুধিরের নদী বহিয়াছিল, লেখাপড়া-অভিজ্ঞ অভিমানী ব্যক্তি মাত্রেরই এ সব বিষয় জানা উচিত।

পূর্ব্বে আমার মনে মনে ধারণা ছিল, ইংরেজী লেখাপড়া জানা লোকের ভারতের ভূগোল বুঝি প্রায়ই কণ্ঠস্থ আছে ; ধারণা ছিল, এন্ট্রেন্স, এ-ল, বি-এ পাস করিলেই বুঝি বিদ্যা হয়,—ধারণা ছিল, বুঝি প্রদেশের নাম করিলেই প্রধান নগরের নাম লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার সে ধারণা অনেকাংশে ভুল। কেহই যে কিছুই জানেন না, তাহা আমি বলি না। অভিজ্ঞ অল্প ব্যক্তি, অনভিজ্ঞ বহু লোকে।

আমার জীবন-চরিত মধ্যে দুই-এক স্থলে হান্সি নগরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। জন্মভূমির একজন পাঠক আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন, "উহা হান্সি নহে, ঝান্সি হইবে। বোধ হয়, ছাপার ভুলে ঝান্সি স্থানে হান্সি হইয়া থাকিবে।" আর একজন পাঠক স্থিরনিশ্চয় হইয়া লিখিয়াছেন, "মহাশয়! ভারতে হান্সি বলিয়া কোন নগর নাই। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ঝান্সি নামে এক নগর আছে, তথায় আমার দাদা চাকরি করিতেন।"

এবার যখন আমি এলাহাবাদ হইতে রেলগাড়ীতে কলিকাতায় আসি, তখন রেলগাড়ীতে কয়েকটা বাবু আমার বিষয় আলোচনা করেন। তাঁহারা যে কামরায় ছিলেন, আমি তাহার ঠিক পাশের কামরায় ছিলাম। তাঁহাদের কাছে দুই-তিনখানি জন্মভূমিও ছিল। বলা বাহুল্য, আমিই যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। আমি প্রচ্ছন্নভাবে গুটিসুটি মারিয়া এক কোণে বসিয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে কেবল এক-একবার তামাক

খাইতেছিলাম এবং বাবুগণকে খাওয়াইতেছিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল। একজন বাবু আপন ব্যাগ হইতে কয়েকখানি জন্মভূমি বাহির করিলেন। প্রথমেই আমার বিষয় আরম্ভ হইল। আমি গতিক বড় সুবিধা নয় দেখিয়া মুখ লুকাইলাম। কোন বাবু বলিলেন,—"দুর্গাদাস বাবু একজন ভারী বীর পুরুষ, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন বীর আর দেখা যায় না।" কোন বাবু বলিলেন,—"দুর্গাদাস বাবু বাঙ্গালীর গৌরবস্বরূপ" অর্থাৎ প্রথমারম্ভে আমার খুব প্রশংসাবাদ চলিল। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের মধ্যে আমাকে কেহই চেনেন না। না চেনা সত্ত্বেও তাঁহারা, বীরপুরুষ এবং দেশের গৌরবস্বরূপ বলিয়া কেন যে আমার নাম কীর্ত্তন করিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেন-না, জন্মভূমিতে আমার যুদ্ধ-বিক্রমের কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এ সব কথা শুনিয়া আমার মনে বড়ই হাসির সঞ্চার হইল।

ইতিমধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন—"আপনারা কি মনে করিয়াছেন,—দুর্গাদাসের কথা সত্য? উহা গল্প মাত্র, উপকথা মাত্র, উপন্যাস মাত্র!" উত্তর হইল—"সে কি কথা? জন্মভূমিতে স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে,—তিনি এক্ষণে এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া-আঁটপুর, সৈন্যাধ্যক্ষ তুরুপের সার্টিফিকেট ছাপা হইয়াছে,—ইত্যাদি কত প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, তথাচ আপনি বলিতে চান দুর্গাদাসের কথা সত্য নয়, উহা উপকথা মাত্র?"

এইরূপে তুমুল ঝগড়া বাধিল। এক পক্ষের যুক্তি এই,—"ইংরেজী এবং ফরাসী এমন অনেক উপন্যাস আছে, অল্পবুদ্ধি লোকে যাহা পাঠ করিলে মনে করে যে, ইহা জীবন-চরিত, উপন্যাস নহে। সেই সকল উপন্যাসের অনুকরণেই দুর্গাদাসের উপন্যাস লিখিত হইতেছে। যদি কেহ বিশেষ মনোযোগের সহিত দুর্গাদাসের এই জীবন-চরিত পড়িয়া থাকেন, গ্রাম ও নগরের নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এই জীবন-চরিত উপন্যাস মাত্র। সহরের নাম দেখুন না কেন? —সকার-বকার!! আহা! এমন নাম কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? আর সহরের নাম পিলিভিট, নিমচ, হান্সি ইত্যাদি।" (হো হো হাসিয়া) "হান্সি কি বাবা! আমি অনেক জিওগ্রাফি এবং হিস্‌টরি পড়িয়াছি,—কিন্তু হান্সি নাম ত কখনও শুনি নাই! আমি ঝান্সি জানি, ইংরেজী কথা ফ্যান্সি জানি,—কিন্তু কৈ, কস্মিন্‌কালে হান্সি কথা ত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই।" (পুনরায়

হাস্য) "আমি বাজি রাখিতে প্রস্তুত আছি;—দুর্গাদাসের কথা যদি উপকথা না হয়, তাহা হইলে আমি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিব।"

অন্ত পক্ষের যুক্তি বিশেষ কিছু দেখিলাম না;—তবে কথা এইরূপ,—'হান্সি' কথাটি ঝান্সি হইবে। ছাপার ভুলে 'ঝ' স্থানে 'হ' হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা পুস্তকে এমন অনেক ছাপার ভুল ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যে দুর্গাদাসের কথা উপকথা—তাহা কখনই হইতে পারে না। এই ত ৺তারকেশ্বরের কাছে তড়া-আঁটপুর গ্রাম, চলুন আমরা সেখানে যাই,—তথায় গেলে নিশ্চয়ই আপনার ভ্রম প্রতিপন্ন হইবে। আমিও শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, দুর্গাদাস বাবুর কথা যদি উপকথা হয়, তাহা হইলে আমিও ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিব, চলুন, তড়া-আঁটপুরে।"

অপর পক্ষ তখন ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"আগে একবার হান্সি গেলে হয় না? হান্সি,—হান্সি,—সে জায়গা ভাল!" রেলগাড়ীর মধ্যে হাসির তরঙ্গ উঠিল। আমিও খুব খানিক হাসিলাম।

আমার একবার মনে হইল, এইবার আমি যদি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলি,—"আমিই শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়;—আমিই হান্সিতে (হাস্য) ছিলাম, সত্য সত্যই আমিও আছি, হান্সিও আছে,—" তাহা হইলে ইঁহারা কি মনে করেন? সত্য সত্যই যে আমি আছি,—আমার জীবন-চরিত যে উপন্যাস নয়—এ কথা বোধ হয় ইঁহাদের ধারণায় কিছুতেই আইসে না; ইঁহারা আমাকে হয় জুয়াচোর, না হয় ভূত বলিয়া ভাবেন। ইঁহারা একদিন আমার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু হান্সি নগরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবেন না। অতএব এরূপ স্থলে নীরব থাকাই উচিত।

ক্রমশঃ সকলে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। আমি গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি? আমিই মূর্খ, ইহাই আমি জানিতাম; কিন্তু আমা অপেক্ষাও যে মূর্খ আছে, আজ আমার বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইল।

সে যাহা হউক, আমার অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক,—হান্সি নগরের অস্তিত্ব যে নিশ্চয় আছে, ইহা সকলের জানা ভাল। হান্সি নগর পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত—হিসার জেলার অধীন। হান্সি কলিকাতা হইতে প্রায় ১০৮১ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষে হান্সি নগর এককালে ধ্বংস হয়,—জনশূন্য শ্মশানের ন্যায় কিছুদিন এই নগর পড়িয়া থাকে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। সেই সময় হইতে ইংরেজ সৈন্যগণ ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করে। হান্সি ক্ষুদ্র সহর। বার-চৌদ্দ হাজার লোকের অধিক বাস হইবে না। এই নগর চারি দিকে উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। গোলাগুলি চালাইবার জন্য মাঝে মাঝে ঐ দেওয়ালের গায়ে গর্ত্ত কাটা আছে। প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া একটী খাল প্রবাহিত। খালের তটদেশে বৃক্ষশ্রেণী সজ্জিত। প্রভাতে ঘোড়ায় চড়িয়া আমি প্রায়ই খালের ধারে ধারে বেড়াইতাম। প্রভাত সমীরণ সেবনে মন-প্রাণ প্রফুল্ল হইত। নগরের উত্তরভাগে একটা পুরানো ভাঙ্গা কেল্লা আছে। পথসমূহ প্রশস্ত এবং বেশ সোজাভাবে চোস্ত হইয়া চলিয়াছে;—অর্থাৎ পথের বেশী ঘুর-পাক বা বাঁক নাই; এখানকার জলবায়ু ভাল।

এই ত হান্সী সহর। এখন যদি কাহারও সখ হয়, তবে তিনি হাওড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলগাড়ীতে চড়ুন;—দুই দিন মধ্যে হান্সি পৌঁছিবেন।

নয়

বেরিলি উত্তর-পশ্চিমের অন্তর্গত রোহিলখণ্ডের রাজধানী। বেরিলি এলাহা-বাদ হইতে ৩১১ মাইল দূরে অবস্থিত। বেরিলি দিল্লী হইতে ১৫২ মাইল দূরবর্ত্তী। বেরিলি কলিকাতা হইতে ৭৮৮ মাইল পথের ন্যূন নহে। বেরিলি কোথায়, কিভাবে কতদূরে অবস্থিত তাহা বুঝিলেন কি?

মানচিত্রে জ্ঞান না থাকিলে, এ সব তত্ত্ব বুঝাইয়া উঠা বিষম দায়। কলিকাতা হইতে বেরিলি যাইতে হইলে দিল্লী বা এলাহাবাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। কলিকাতায় টিকিট কিনিয়া রাত্রি ৯।৷০ সাড়ে নয়টার সময় ডাকগাড়ীতে উঠ; পরদিন বেলা এগারটার সময় তোমাকে মোগল-সরাই ষ্টেশনে নামাইয়া দিবে। তৎপরে ঐ ষ্টেশনের অপর দিকে দেখিবে, আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের গাড়ী দণ্ডায়মান আছে,—বেরিলির টিকিট লও,—সেই গাড়ীতে উঠ,—পরদিন প্রভাতে তোমাকে বেরিলি ষ্টেশনে নামাইয়া দিবে।

আমি যখন কলিকাতা হইতে বেরিলি গিয়াছিলাম, তখন রেল-জালে ভারত বেষ্টিত হয় নাই। রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ পড়িয়াছিল। আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল (৮ নং) হাঁটা-পথ (গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড) দিয়াই সুলতানপুরে

কিছুদিন থাকিয়া বেরিলি গিয়াছিল। এই যাত্রার নাম—'রেসালার কুচ্'। কিরূপ শৃঙ্খলার সহিত, সুকৌশলে এবং ধীরভাবে এই কুচ্-কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সর্ব্বরকমে প্রায় এক সহস্র লোক, সর্ব্বরকমে প্রায় এক সহস্র ঘোড়া প্রত্যহ যথানিয়মে পথ চলিবে, বিশ্রাম করিবে, আহারাদি করিবে, ঘুমাইবে—ব্যাপার বড় সহজ নয়। শুধু কি ইহাই ? রেসালার সঙ্গে উট আছেন, গাধা আছেন, গোরু আছেন,—সকলকেই সঙ্গে সঙ্গে সুশৃঙ্খলে যাইতে হইবে। ইহার উপর, মেমসাহেব আছেন, পুত্র-কন্যা আছেন, আয়া আছেন। তস্য উপর ছক্কর গাড়ী আছেন, একা আছেন, গো-শকট আছেন। এক দিনে দুই শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে, কিরূপ হাঁক-ডাক করিতে হয়, কিরূপ হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, তাহা বোধ হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। পঁচিশ জন ভদ্রলোক বরযাত্র গেলে, তাহাদের শয়নস্থান এবং শয্যার জন্য কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়, ভুক্তভোগীই তাহা জানেন। কিন্তু ইহা এক দিন নয়, দুই দিন নয়,—ক্রমান্বয়ে এক মাস, দুই মাস, কখনও তিন মাস কাল, শীত গ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে, প্রত্যহ হাজার লোকের আহারের বন্দোবস্ত, শয়নের বন্দোবস্ত চাই। প্রত্যহ হাজার ঘোড়ার আহারের বন্দোবস্ত, শয়নের বন্দোবস্ত চাই। প্রত্যহ বহু সংখ্যক উট, গাধা, গোরুর আহারের বন্দোবস্ত চাই, শয়নের বন্দোবস্ত চাই। ভাবুন দেখি, কিরূপ কুরুক্ষেত্র কাণ্ড !

সুশৃঙ্খলা সুনিয়ম ছিল বলিয়া, সকলেই এক সেনাপতির আজ্ঞাধীন এবং বশ ছিল বলিয়া, এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সম্পন্ন হইত। আমাদের ৮ নম্বর অশ্বারোহী দলে ৫০৪ জন সওয়ার ছিল। ইহা ছাড়া, ইংরেজ এবং দেশীয় আফিসার ছিলেন। তদুপরি জমাদার, দফাদার, উর্দ্দী মেজার, কোত-দফাদার, ডাক্তার দল, বাদক দল, ভিস্তি দল, মেথর দল, বাহক দল ছিল। প্রত্যেক দুই জন সওয়ারের এক জন করিয়া সহিস এবং প্রত্যেক সহিসের একটী করিয়া ছোট টাটু ঘোড়া ছিল। সওয়ারগণ আপন আপন বড় বড় নির্দ্দিষ্ট ঘোড়ায় চড়িয়া যাইত। সহিসগণ সেই টাটুর উপর প্রত্যেক দুই জন সওয়ারের আসবাব তাঁবু প্রভৃতি বহিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করিত। ইংরেজ আফিসারদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত। তাঁহাদের প্রত্যেকের তিন-চারিটী করিয়া বড় বড় ঘোড়া থাকিত। সাত-আট জন সহিস থাকিত। পাঁচ-ছয়টা টাটু থাকিত। সাহেবদের তাঁবু উটের পৃষ্ঠে বোঝাই হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিত। প্রত্যেক

সাহেবের প্রায় পাঁচ-ছয়টা করিয়া তাঁবু থাকিত। দেশীয় আফিসারদেরও জাঁকজমক নিতান্ত কম ছিল না। কোন কোন রেসালদার মেজার, ইংরেজ আফিসারদের সঙ্গে সমান খুঁট দিয়া চলিতেন। আমাদের সঙ্গে ৫০৪ জনের অধিক সওয়ার ছিল না বটে, কিন্তু ইংরেজ ও দেশীয় আফিসার এবং অন্যান্য লোকলস্কর লইয়া হাজার মানুষের কম হইবে না; টাটু ও বড় ঘোড়া লইয়া হাজার ঘোড়ার কম হইবে না; হাজারের অধিক হইবে, তবু কম হইবে না। যখন ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাগত হইয়া কলিকাতায় আসি, তখন আমার চারিটী তাঁবু, একখানি বয়েল গাড়ী, দুইটী বড় ঘোড়া, তিনটী টাটু, চারি জন সহিস, এক জন খানসামা এবং এক জন রসুয়ে ব্রাহ্মণ ছিল। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও এত আসবাব আমার সঙ্গে যাইত;—সাহেবদের সঙ্গে যে কত জিনিষ যাইত, তাহার ইয়ত্তা করিবে কে?

কলিকাতা হইতে আমাদের কুচ্ করিবার প্রায় ২০ দিন পূর্ব্বে, প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল রিচার্ডসনের নিকট এক-খানি 'পথের বিবরণ পুস্তিকা' ডাকে আসিল। কলিকাতা হইতে কোন্ পথ দিয়া বেরিলি যাইতে হয়, কলিকাতা হইতে বেরিলি পর্য্যন্ত কত চটি বা আড্ডা আছে, এক চটী হইতে অন্য চটী কত মাইল দূর, কোন্ চটীতে পানীয় জল কিরূপ পাওয়া যায়, ঘোড়ার জন্য ঘাস কিরূপ পাওয়া যায়, সৈন্যদের কোন্ দিন কত মাইল পথ চলিতে হইবে, ইত্যাদি সকল কথাই সেই পথের বিবরণ-পুস্তিকাতে আছে। কোন্ কোন্ চটী কোন্ জেলার অধীন, কোন্ কালেক্টারের এলেকাভুক্ত, কোন্ জমিদারের জমিদারীর অন্তর্গত, ইহা সেই বিবরণ-পুস্তিকাতে আছে। কোন্ তারিখে কোন্ চটীতে এই অশ্বারোহী দল উপনীত হইবে, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ সেই বিবরণ পুস্তিকাতে প্রত্যেক চটীর নামের গায়ে তাহা লিখিয়া দিলেন। কুচ্ করিবার আর ১৪ দিন বাকি আছে, এমন সময়ে বড় সাহেব প্রত্যেক কালেক্টারেব নিকট এক একখানি পত্র পাঠাইলেন। যে যে কালেক্টারের এলাকায় আমাদের চটী পড়িয়াছে, কেবল সেই সেই কালেক্টারের নিকটই পত্র ডাকযোগে রওনা হইল,—অন্য কোন কালেক্টারের নিকট অবশ্যই নহে। সেই পত্রে এইভাবে লিখিত হইল,—"আমাদের লোক এত, ঘোড়া এত, অন্যান্য পশু এত,—এত ঘি, এত আটা, এত দানা, এত ডাল, এত চাল, এত তেল, এত মুরগীর ডিম, এত হাঁসের ডিম, এত মুরগী, এত ভেড়া, এত পাঁঠা,—ইত্যাদি চাহি। আমরা অমুক তারিখ অমুক সময়ে উক্ত স্থানে গিয়া পৌঁছিব।

তাহার পূর্ব্বেই রসদ মজুত থাকা চাহি।" কালেক্টার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় তহশীলদার বা জমিদারের উপর রসদ যোগাইবার ভার দিলেন। ভার দিলেন বটে, কিন্তু নিজে নিশ্চিন্ত রহিলেন না,—তহশীলদার ঠিক সময়মত রসদ যোগাইতে পারেন কি না, তদ্বিষয়ে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কুচ্ হইবার পূর্ব্ব দিন, দুই দল অশ্বারোহী প্রথম চটীতে অগ্রগামী হইল। এক দলের নাম লাইন-ডুরি গার্ড, অন্য দলের নাম রসদ গার্ড। লাইন-ডুরি গার্ড গিয়া সর্ব্বোত্তম স্থানে সৈন্যাধ্যক্ষেব তাঁবু খাটাইল, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, খাট তাঁবুর ভিতর সাজাইল। স্নানাগার প্রভৃতিব জন্য স্বতন্ত্র তাঁবু তোলা হইল। বড় সাহেবের পার্শ্বে অন্যান্য সাহেবগণের তাঁবু পড়িল। তারপর নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে দেশীয় অফিসারদের তাঁবু খাটানো হইল। প্রত্যেক তাঁবুর পাশে এক এক ধ্বজা প্রোথিত হইল। কাহার কোন্ তাঁবু, সেই ধ্বজা দ্বারা বুঝা যায়। যিনি যখন আসিলেন, তিনি অমনি নীরবে আপন আপন তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিবার অপেক্ষা রহিল না।

ও দিকে সাহেবদের রন্ধনকার্য্যের জন্য এক প্রকাণ্ড তাঁবু পড়িয়াছে; তাহার সম্মুখে একটী সামিয়ানা টাঙ্গান হইযাছে। সামিয়ানাটী আটচালাবৎ। সেই আটচালায় এক বৃহৎ টেবিল এবং তাহার চারি ধারে প্রায় কুড়িখানি চেয়ার সজ্জিত। এ দিকে বাবুর্চ্চিগণ অগ্রে আসিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে।

এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া লাইনডুরি গার্ডদল ঘোড়া থাকিবার স্থান ঠিক করিল। সারি সারি হইয়া ঘোড়া থাকিবে, সেইরূপ হিসাবে খোঁটা পুঁতিতে লাগিল এবং একগাছি মোটা দড়া লম্বা করিয়া সেই খোঁটায় বাঁধিল। এমনধারা ১৫।১৬টী সারি করিল। প্রত্যেক সারিতে ৭০।৮০টী করিয়া ঘোড়া বাঁধা যাইতে পারে এমন বন্দোবস্ত হইল।

তারপর দেশীয় অফিসারদের তাঁবু পড়িল। তাহার পাশেও ধ্বজা পোঁতা হইল। বড় বড় উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্ম্মচারিগণের জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক, তৎসমস্তই তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইল। কিন্তু সওয়ারগণের তাঁবু কেহ টাঙ্গাইল না; তাহারা নিজে আসিয়া নিজের তাঁবু টাঙ্গাইবে, ইহাই বন্দোবস্ত ছিল। তাহারা প্রথম আসিয়াই আগে ঘোড়াব তত্ত্বাবধান করিত, তারপর তাঁবু খাটাইত, তারপর বিশ্রাম, অবশেষে রন্ধন-উদ্যোগ,—ইত্যাদি।

রসদ গার্ডের কার্য্য ছিল,—আহারীয় সামগ্রী অগ্রে সংগ্রহ করা। তাহাদের সঙ্গে ছয় জন হিন্দুস্থানী বেনিয়া মুদি থাকিত; বেনিয়া আসিয়া তহশীল-

দারের লোকের নিকট হইতে চাল, ডাল, আটা, ঘি, মুগ, প্রভৃতি—যাহা যাহা আবশ্যক হইত সমস্তই কিনিত। কিনিয়া ছয় স্থানে জড় করিয়া রাখিত। সওয়ারগণ আসিয়া যাহার যত আবশ্যক, সে তত সামগ্রী লইয়া যাইত। বলা বাহুল্য, সওয়ারগণকে নগদ টাকা দিয়া কোন জিনিষ কিনিতে হইত না; তাহারা কেবল বেণের খাতায় সহি করিয়া জিনিষপত্র লইয়া যাইত। যে ব্যক্তি সহি করিতে জানিত না, তাহার হইয়া অন্য ব্যক্তি সহি করিয়া দিত। মাস-কাবারে বেণিয়া বিল করিত; সওয়ারগণের মাহিনা কাটিয়া সবকারী খাজনা-খানা হইতে এই টাকা বেণিয়াকে দেওয়া হইত। এইরূপে সাহেবদের খাবারও সেই বেণিয়া কতক যোগাইত; কিন্তু যে সকল জিনিস বেণিয়ার অস্পৃশ্য ছিল, তাহা অবশ্যই বেণিয়া খরিদ-বিক্রয় করিত না, অন্য মুসলমান খানসামা দ্বারা সে কাজ সম্পন্ন হইত। নির্দ্দিষ্ট বাজার-দর যাহা হইত, সেই হিসাবে উক্ত বেণিয়া মুদি তহশীলদার বা তাহার গোমস্তাকে ক্রীত দ্রব্যের মূল্য চুকাইয়া দিত।

প্রত্যহ আমাদিগকে দশ-বারো মাইল চলিতে হইত। পাঁচ-ছয় ক্রোশ পথ গেলেই একটা চটী পাওয়া যাইত। তবে কোন কোন দিন ৮।৯ ক্রোশ পথও যাইতে হইত। যে চটী যেমন দূরে পড়িয়াছে, সেই হিসাবে আমাদিগকে যাইতে হইত। যে দিন ১০ মাইল পথ চলিতে হইবে, সে দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া গুটি গুটি চলিতাম। যে দিন ১৭ বা ১৮ মাইল পথ যাইতে হইত, সে দিন রাত্রি ৩॥০ সাড়ে তিনটার সময় উঠিযা সকলে রওনা হইতাম। ঘোড়ার উপর যাইতাম বটে, কিন্তু দৌড় কাটিবার নিয়ম ছিল না, সহজ অবস্থায় ধীর-কদমে ঠুক ঠুক করিয়া যাইতাম। সাধারণত বেলা ৯টা-১০টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিতাম। পৌছিযা, অবশিষ্ট দিন এবং রাত্রি বিশ্রাম—আহারাদি ও নিদ্রায় পর্য্যবসিত হইত। আমরা যেমন এক চটিতে পৌছিলাম, অমনি সেই অগ্রগামী অশ্বারোহী দল বেণিয়া মুদিগণকে সঙ্গে লইয়া (দেড় ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পরে) অন্য এক চটীর অভিমুখে যাত্রা করিল। সে চটীতে গিয়া তাহারা আবার পূর্ব্বমত রসদ খরিদ এবং তাঁবু খাটানো কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

সঙ্গে আমাদের সর্ব্বরকমে প্রায় চারি-পাঁচ শত সহিস ছিল, চারি-পাঁচ শত টাটু ইহাদের অধীন ছিল। ইহাদের প্রধান কার্য্য—ঘোড়ার ঘাস করা। রেসেলা আসিয়া কোন এক চটীতে পৌছিল, সহিসগণ ক্ষণকাল পরেই অমনি টাটুর উপর চড়িয়া দূরবর্ত্তী বা অদূরবর্ত্তী মাঠে ঘাস করিতে চলিল।* সঙ্গে ইহাদের পাহারা-স্বরূপ দশ-পনের জন অশ্বারোহী সৈন্যও চলিল। এই

সহিসগণ সাধারণত বড় দুষ্ট ; একে নীচ-জাতীয়, তাহার উপর মাহিনা কম ; খাই খাই করিয়া ইহারা সদাই বিব্রত। পাছে কোন লোকের উপর উপদ্রব করে, মাঠের শস্য নষ্ট করে বা কোন সুরম্য বাগানে ঢুকিয়া পড়ে, এই জন্য ১০।১৫ জন অশ্বারোহী সৈন্য ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। কিন্তু চারি-পাঁচ শত সহিস একত্র হল্লা করিয়া যাত্রা করিয়াছে, ১০।১৫ জন সওয়ারে তাহাদিগকে দমনে রাখিবে কিরূপে ? সুতরাং সময়ে সময়ে এই সহিসগণ দ্বারা বিলক্ষণ অত্যাচার ঘটিত। আখের ক্ষেতে পড়িলে, একেবারে ইহারা কাহন কাহন আখ ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিত। মূলা, বেগুন, কলা, আম, কাঁটাল—কিছুই ইহাদের এড়াইত না। আমাদের অধ্যক্ষ সাহেব এরূপ অত্যাচারের কথা শুনিলে একেবারে রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইতেন। সহিসদের মাঝে মাঝে জরিমানা করিতেন এবং অল্প-স্বল্প বেত্রাঘাতরূপ শরীরের দণ্ডও দিতেন। একদিন হুগলি, কি বর্দ্ধমান জেলায়—আমার ঠিক স্মরণ নাই—আমাদের রেসেলা আসিযা এক চটীতে অবস্থিতি করিল। বৈকালে সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব এবং আমি উভয়ে ঘোড়ায় চড়িয়া নদীর ধারে পাখী শিকার করিতে বহির্গত হইয়াছি। শিকার-উপযুক্ত পাখী বড় দেখিলাম না। কিছুক্ষণ পরে দূরে কতকগুলি বক দেখিলাম। আমি সাহেবকে বলিলাম,—"ঘোড়া হইতে নামিযা যাওয়াই ভাল ; কেন-না, ঘোড়ায় চড়িয়া গেলে পাখীগুলা ভয়ে পলাইয়া যাইবে।" সাহেব এবং আমি উভয়ে ঘোড়া হইতে নামিলাম। পাখী-মারা ছোট বন্দুক হাতে লইয়া আমরা উভয়ে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রতি পাদক্ষেপে আমাদের মনে হইতে লাগিল, পাখীগুলা আমাদিগকে দেখিয়া অথবা পদশব্দ পাইয়া এখনি উড়িয়া পলাইয়া যাইবে। ফল কথা, পাখীগুলা তখনও অনেক দূরে ছিল, পদশব্দ তাহাদের কর্ণে যাইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। যাহা হউক, আমরা খুব সতর্কতার সহিত নীরবে যাইতেছি, এমন সময়ে দেখি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, সঙ্গে একটি বার-তের বছরের ছেলেকে লইয়া আমাদের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমি হাত তুলিয়া সেই স্ত্রীলোকটিকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলাম,—তুমি এদিকে আসিও না। বৃদ্ধা জানে না যে, আমরা এখন পাখী-শিকারে বহির্গত হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি,—যেন একটী কথা কহিলেই আমাদের মহা সর্ব্বনাশ হইবে। বৃদ্ধা আমার ইঙ্গিত বুঝিল না, সে আরও বেগে আমাদের সম্মুখে আসিতে লাগিল। সে তখন উচ্চরবে চীৎকার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—

"দোহাই বাবা! আমাকে রক্ষা কর,—আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" সাহেব সেই বৃদ্ধার আর্ত্তনাদ শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন,—তাহার ভাবনা—বৃদ্ধার চীৎকারে বকগুলা পলাইবে। সে যাহা হউক, বৃদ্ধা ত আসিয়া দড়াম করিয়া সাহেবের পদপ্রান্তে পড়িল। সাহেব বড়ই বিরক্ত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী কি চায়?" আমি সাহেবকে ইংরেজীতে বুঝাইয়া বলিলাম, "এ কি চাহে, তাহা আমি জানি না, তবে এ বলিতেছে যে, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমাকে রক্ষা কর।" আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় বকগুলা আপনা-আপনিই হউক, অথবা আমাদের গোলযোগ শুনিয়াই হউক, উড়িয়া পলাইল। সাহেব সেই উড়ন্ত পাখী-ঝাঁকের উপর এক গুলি করিলেন, কিন্তু একটিও পাখী মরিল না। সাহেব শিকার পলাইল দেখিয়া ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ এবং বিষণ্ণ হইলেন। আমি ইত্যবসরে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার কি হইয়াছে, তুমি কাঁদিতেছ কেন?" বুড়ী বলিল,—"আমার এক বিঘা মূলার জমিতে খুব মূলা হইয়াছিল। পল্টনের সিপাহী আসিযা সব মূলা উপড়াইয়া লইয়া গিযাছে। আমি এ বছর খাই কি এবং রাজাব খাজনাই বা দি কিরূপে?" আমি বৃদ্ধার অনুযোগের কথা সাহেবকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। সাহেবের রাগ এতক্ষণ বুড়ীব উপর ছিল; আমার কথা শুনার পর সাহেবের নিদারুণ রাগ হইল, সেই ঘাস-কাটা সহিসগণের উপর। সাহেব বলিলেন, "দুর্গাদাস! আমাদের দ্বারা যদি প্রজাদের উপর এত অত্যাচার হয়, তাহা হইলে প্রজাগণ আর কাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিবে?—আজই এখনি ইহার সমুচিত দণ্ড দিব।" আমরা উভয়ে গিযা ঘোড়ার উপর চড়িলাম। বুড়ীকে ঘোড়াব সহিসের জিম্মা করিয়া দিয়া সাহেবের আদেশমত আমি বলিলাম,—"ইহাকে বড় সাহেবের তাঁবুতে লইয়া চল।" ঘোড়াব সহিসেব সঙ্গে যাইতে বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ কবাতে আমি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মা! তোমাব কোন ভয় নাই,—তুমি ইহার সঙ্গে ছাউনিতে আইস।"

তখন সাহেব এবং আমি তীববেগে ঘোড়া ছুটাইলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেসালায় গিযা পৌছিলাম। সাহেব আপন তাঁবুতে না গিয়া, সহিসগণ যেখানে স্তূপাকাব কবিয়া ঘাস জমা রাখিয়াছে সেইখানে গেলেন। ঘোড়া হইতে নামিযাই সাহেব অমনি স্বহস্তে ঘাসের বোঝা সবাইতে লাগিলেন। আমিও সাহেবেব দেখাদেখি সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। দেখিয়া শুনিয়া

রেসালার সকল লোক অবাক্ হইল। ক্রমশঃ অন্যান্য সাহেবগণ এবং সুবেদার মেজারগণ আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বড় সাহেবের অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ তখন তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। বড় সাহেবকে নীরবে কেবল ঘাস উটকাইতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। অবশেষে বড় সাহেব ঘাসের তলা হইতে এক বোঝা মূলা বাহির করিলেন,—আমিও সেই সঙ্গে চারি-পাঁচ বোঝা মূলা ঘাসের মাঝখান হইতে বাহির করিলাম। ক্রমে অন্যান্য অধস্তন সাহেবগণ এ কার্য্যে যোগ দিলেন। কেবল মূলাই বাহির হইতে লাগিল। শেষে যত ঘাস তত মূলা বাহির হইল। সাহেব মূলা-সমষ্টিকে তাঁহার তাঁবুর সম্মুখে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। রহস্য প্রকাশিত হইল। প্রায় পাঁচ শত সহিসকে সারি বাঁধিয়া সম্মুখে দাঁড় করানো হইল। প্রত্যেকের চারি আনার হিসাবে জরিমানার হুকুম হইল। সেই জরিমানার টাকা বৃদ্ধাকে দেওয়া হইল। বৃদ্ধা ১১২৲ টাকা নগদ পাইল, এবং মূলাগুলাও পাইল। শেষে সহিসগণের প্রতি আদেশ হইল যে,—"তোমরা মাথায় করিয়া এই সমস্ত মূলা বৃদ্ধার বাটীতে পৌছিয়া দিয়া আইস। বৃদ্ধা আনন্দ-অশ্রুতে দেহ সিক্ত করিতে করিতে স্বগৃহে গিযা পৌছিল।

এইরূপে প্রায় দেড় মাস পরে আমাদের পল্টন ৺কাশীধামের নিকট সুলতানপুরে আসিয়া ছাউনি করিল। আমি বিবাহ করিব বলিয়া, সাহেবের নিকট এক মাসের ছুটী লইয়া কাশীতে আসিলাম। জননীর পদপ্রান্তে প্রাণ ভরিয়া প্রণাম করিলাম। মাতা শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মা সৎকুলোদ্ভবা একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ঠিক করিয়া আমার বিবাহ দিলেন। পরম সুখে মনের আনন্দে কাশীতে এক মাস-কাল থাকিয়া, সুলতানপুরে প্রত্যাগত হইলাম। সুলতানপুরে কিছুদিন থাকিয়াই আমরা বেরিলিতে আসিলাম।

১৮৫৬ সালের শেষভাগে আমরা বেরিলিতে পৌঁছিলাম। আমার বয়স তখন একুশ বৎসর। কিন্তু শরীরের গঠন, আকার-প্রকার দেখিয়া লোকে ভাবিত, আমার বয়স ২৭ বা ২৮ বৎসরেব কম নহে। এখানে আসিয়া সুখ, স্বচ্ছন্দতা এবং স্ফূর্ত্তি দ্বিগুণিত হইল।

বেরিলি প্রাচীন সহর বটে, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ বেরিলিতে ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু বেরিলি সহর গড়বন্দী নহে, প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিতও নহে। সুদৃঢ় সুবৃহৎ কেল্লাও বেরিলিতে নাই। যেখানে তোপখানার ছাউনি হইয়াছে, তাহার নিকটেই একটী ক্ষুদ্র কেল্লা আছে, তাহাকে খেলা-ঘরের কেল্লা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সে কেল্লায় সিপাহী সৈন্য কেহ কখনও থাকিত না—গোল্লা-বারুদ বা অস্ত্র-শস্ত্র কখনও কখনও রক্ষা কবা হইত।

বেরিলি সম্বন্ধে, সেনা-নিবাস বা দুর্গ-সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতেছি, তৎসমস্তই ১৮৫৬ সালের কথা। এখন যদি কিছু নূতন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহার বিষয় আমি অবশ্যই জানি না। সহর হইতে এক মাইল দূরে সেনা-নিবাস বা সৈন্যদলের শিবির সংস্থাপিত। এখানে তখন তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য ছিল। এক রেজিমেণ্ট অশ্বারোহী, এক রেজিমেণ্ট পদাতি এবং এক দল তোপখানা। সহরের মধ্য রাস্তা দিয়া গেলে ঠিক পদাতি সৈন্য মধ্যে পড়িতে হয়, সহরের বামের রাস্তা অশ্বাবোহী দলের শিবিরে সম্মিলিত হইয়াছে, দক্ষিণের পথে তোপখানায় যাওয়া যায়।

আমি অশ্বারোহী দলে চাকরী করিতাম বটে, কিন্তু বাসা লইলাম ঠিক পদাতি সেনা-নিবাসের পশ্চাতে। তথায় বাস-উপযোগী ছয়খানি বাড়ী ছিল। তন্মধ্যে ৫৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় আমি একটা বাড়ী ভাড়া লইলাম। আমার বাড়ীটী অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া ভাড়া কিছু বেশী দিতে হইল। নইলে, ২৲ বা ২॥০ টাকা মাসিক ভাড়ায় ঘর পাওয়া যায। আমার দুইটা আস্তাবল ছিল; চাকরদের থাকিবার একটা ঘর, রসুই ঘর, গোসলখানা ছিল। ইহা ব্যতীত অন্দরে আমার থাকিবার ঘর দুইটী এবং বাহিরে একটি বৈঠকখানা ছিল।

সে সময় বার-চৌদ্দ জন মাত্র বাঙ্গালী বেরিলিতে ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জন আমার বাটীর নিকটস্থ বাসাগুলিতে বাস করিতেন,—অবশিষ্ট বাঙ্গালীরা সহরে থাকিতেন। সকলের নাম এখন মনে নাই,—যাঁহাদের নাম মনে আছে,

তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল। হরদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহারা দুই সহোদর। কমিশনর আফিসে চাকরি করিতেন। ইঁহাদের আদি বাড়ী ছিল কলিকাতা বাগবাজারে। ইঁহাদের পিতা ৺কাশীবাস করেন; ৺কাশীধামেই ইঁহাদের জন্ম। সম্পর্কে ইঁহারা আমার দাদা হইতেন। কৃষ্ণচন্দ্র পাল বেরিলির পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন, আরও তিন জন বাঙ্গালী তখন পোষ্ট আফিসে কাজ করিত। ভারতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্রিগেডার আফিসের বড় বাবু ছিলেন। হরিমোহন সরকার পদাতি সৈন্যদলের বড় বাবু। অশ্বারোহী সৈন্যের বড় বাবু আমি। আমার ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ তখন বেরিলিব কমিশনর আফিসে কাজ করিত। আর কালেক্টারীতে ছিলেন মুখুর্য্যে মহাশয়। ইঁহার নামটী আমি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু ইঁহার মত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু আমি কখন দেখি নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কারাগাবে নিক্ষিপ্ত হইলেন—অনাহারে দিন যাইতেছে, অন্যান্য বাঙ্গালী বাজারের লুচি, সন্দেশ, তরকারী লুকাইয়া খাইয়া জীবনধারণ করিতেছেন, কিন্তু মুখুর্য্যে মহাশযের তাহা হইবার যো নাই। তিনি সেই যে দাঁতে দাঁত দিয়া মুখটী বুজিয়া পড়িয়া আছেন, আর সদা হাতে পৈতা জড়াইযা 'দুর্গা দুর্গা' নাম জপ করিতেছেন, কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে বাজারের জিনিষ বা অন্য কোন অখাদ্য খাওয়ায়? এইরূপ চারি দিন তাঁহার উপবাসে যায। পঞ্চম দিনে বহু কষ্টে কাঁচা ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া-দিলাম। তাহাই তিনি কাপড়ে ভিজাইয়া খাইতেন। এইরূপে তিনি এক মাসকাল অতিবাহিত করেন, ধন্য তাঁহার কঠোর ব্রত। মুখুর্য্যে মহাশয়ের অধীনে কালেক্টারীতে আরও দুই জন বাঙ্গালী ছিলেন। আর ছিলেন, আমার ঠাকুর্দ্দা রামকমল চক্রবর্ত্তী। তিনি তখন ১৫৲ টাকা করিয়া পেনশন পাইতেন। পূর্ব্বে কালেক্টারী আফিসের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। গৌরবর্ণ—বিলম্বিত দাড়ি, পক্ক কেশ। তাঁহাকে দেখিতে মুনিঋষি বলিয়া ভ্রম হইত। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

এই সকল বাঙ্গালীর মধ্যে পরস্পব বেশ সদ্ভাব ছিল। সদা আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-পরিহাসে দিন কাটিত। এখন যেমন কি উত্তর, কি পশ্চিম, কি পঞ্জাব, কি বিহার প্রদেশ—অনেক স্থানে দেখিতে পাই বাঙ্গালীর মধ্যে পরস্পরে বিচ্ছেদ, দলাদলি, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। সংখ্যার অল্পতা প্রযুক্তই সদ্ভাব গাঢ় হইয়াছিল।

আমার বাসাটী একটী যেন আড্ডাঘর ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই তথায় একত্র হইতেন। গান, বাজনা, খেলা, গল্প—সন্ধ্যার

পূর্ব্বে হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত হরদম চলিত। পান, তামাক, আতর, গোলাপ, হরদম চলিত। আমার ঘরে তখন স্ত্রীলোকের সম্পর্ক নাই,—আমি তখন নব-বিবাহিত,—মাতা নববধূকে লইয়া ৺কাশীধামে থাকিতেন। প্রতি শনিবার আমার বৈঠকখানায় তয়ফার নাচ হইত,—যেদিন আমোদের মাত্রা কিছু বেশী চড়িত, সেদিন শনিবার রবিবার দুই দিনই তিন-চারি দল নর্ত্তকী আমার বাটীতে নৃত্য করিত। প্রায় প্রতি শনিবার আমার গৃহে বেরেলিস্থ বাঙ্গালীগণের ভোজ হইত, কালিয়া, পোলাও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

আমি খাইতাম খুব, খাওয়াইতামও খুব। বেরেলির তখন জল-বায়ু উৎকৃষ্ট, জিনিষ-পত্র সস্তা। ক্ষুধাও যেমন হইত, আহারীয় সামগ্রীও তেমনি সহজে পাওয়া যাইত। এখন দু'মুঠা চাল ছোলা-ভাজা খাইলে পেট কামড়ায়, রাত্রে পোলাও খাইলে সকালে পেট ভার থাকে, এখন কথায় কথায় অম্বল হয়, কথায় কথায় সর্দ্দি হয়, কথায় কথায় জ্বর হয়। তখন সে সব আপদ-বালাই কিছুই ছিল না। আকণ্ঠ পূর্ণ করিযা খাও, এক ঘটী মিঠা কূপের জল উদরস্থ কর,—একটু বেড়াইয়া আইস, অমনি এক ঘণ্টা মধ্যেই দেখিবে আবার তোমার ক্ষুধা হইয়াছে। এখন হইয়াছে, কেমন যেন জীবন্মৃত অবস্থা! এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহাদের মধ্যে কেবল ডিস্‌পেপ্সিয়া! বুঝি ডিস্-পেপ্সিয়া রোগ-ভোগের জন্যই ইঁহাদের জন্ম। কোন স্থানে শুনিতে পাই, তাঁহাদের কেবল ডায়াবিটিসের পূর্ব্ব-লক্ষণ। কোথাও কেবল ধাতুদৌর্ব্বল্য। কোথাও কেবল শিরোঘূর্ণন। কোথাও কেবল অগ্নিমান্দ্য। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া ত হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৫৬ সালে বেরিলিতে যখন আমি ছিলাম, মানুষ সর্ব্বদাই এত বোগ ভোগ করিতে পারে, তাহা আমাব তখন আদৌ ধারণাই ছিল না। অক্ষুধা কাহাকে বলে জানিতাম না। অতি প্রত্যূষে একটু-আধটু আঁধার থাকিতে থাকিতেই, উঠিয়াই গৃহপালিত গাভীর এক সের কাঁচা দুধ খাইতাম। এ দুধটুকু না খাইলে যেন দাঁড়াইতে পারিতাম না, তৎপরে ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় আট মাইল পথ এক ঘণ্টার মধ্যে বেড়াইয়া আসিতাম। তাবপর স্নান, আহ্নিক এবং জলযোগ। সে বিষম জলযোগের কথা এখন আর কি বলিব? পরম-হিন্দু মুখুর্য্যে মহাশয় আমাকে অস্নাত অবস্থায় এবং আহ্নিকের পূর্ব্বে দুধ খাইতে নিষেধ করেন। আমি এক সপ্তাহকাল দুধ বন্ধ করিয়া প্রকৃতই আমাশয়গ্রস্ত হইয়াছিলাম। তারপব আবার কাঁচা দুধ ভক্ষণ আবস্ত কবিলাম।

আমার বাটীতে মা-কালীর নামে প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগ বলিদান হইত। দুই সের করিয়া মাছের বরাদ্দ ছিল। ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মাখন—এ সকল চালাও ছিল। খাইতাম আমরা দুই ভাই। এত বড়-মানুষি সত্ত্বেও যে মাসিক খরচ খুব বেশী হইত তাহা নহে। তখন বেরিলিতে এক শত সিক্কার ওজনে এক টাকায় আড়াই সেব ভাল ঘৃত পাওয়া যাইত। আমার চাউল আসিত অতি উৎকৃষ্ট। পিলিভিটেব নিকট নিউরিযা নামক এক স্থান আছে; তথাকাব চাউল প্রসিদ্ধ,—মিহি চাল, লম্বা লম্বা দানা—সম্মুখে সেই চালের ভাত বাড়িয়া দিলে মল্লিকা ফুলেব সুগন্ধে যেন সে স্থান আমোদিত করিত। সেই চালের মণ ছিল ৩॥০ টাকা। এখন সে চাল ১২৲ টাকা মণেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। রাশি চাল ১॥০ টাকা বা ২৲ টাকা মণ ছিল। উৎকৃষ্ট আটা ১৲ টাকায় ৩২ সেব পাওয়া যাইত। খাঁটি দুধ টাকায় ৩০ সের। বাজারে দুধ (মহিষেব) এক পয়সা সের। হিন্দুস্থানীবা মাছ-মাংস বড় অধিক খাইত না। বেবিলির মুসলমানগণ মাছ-মাংসের বিশেষ ভক্ত। মাছেব সের ⁄০, কখন ৵০। রুই, কাতলা, পুঁটী মাছ মিলিত। পাঁঠা একটার মূল্য ॥০ হইতে ১৲ টাকা। আলু, বেগুণ, মূলা, সীম, কপি, ঝিঙ্গে, ধন্দুল পাওযা যাইত। এ সমস্ত জিনিষ কিঞ্চিৎ মহার্ঘ বলিয়া বোধ হইত। হিন্দুস্থানীবা তরকাবী বড় খাইত না—ডাল আব রুটী হইলেই তাহাবা সন্তুষ্ট। বেগুণ এক পয়সা সেব। বড বড় মূলা পয়সায় ৬।৭টা। নাইনিতাল পাহাড়ে আলু হইত, তাহার সেব দুই পয়সা। ফুল-কপি ও বাঁধা-কপির মূল্য প্রায় এক ছিল—৻১৫ বা ⁄০ কবিযা একটা। ভিণ্ডী অজস্র। পটল খুব কম। বেবিলিতে কাঁঠাল, কলা, নাবিকেল নাই, কিন্তু আম খুব। বেবিলি সহরে, সহবেব প্রান্তভাগে, পল্লীগ্রামে, মাঠে, বাটে, ঘাটে সর্ব্বত্রই আমগাছ—আমের বড় বড বাগান। পঞ্চাশ বিঘা, এক শত বিঘা ব্যাপিয়া এক-একটা আমের বাগান। এক-একটা আম গাছ যেন অশ্বত্থ বৃক্ষেব ন্যায় প্রকাণ্ড। এখানে আষাঢ শ্রাবণ দুই মাস আমেব মাস। এই সময় সাধাবণ লোকে আম খাইয়া জীবনধারণ কবে। নিকৃষ্ট ও মধ্যম আম এক পয়সা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত দরে এক শত বিক্রীত হইযা থাকে। ভাল আম চাবি আনায় বা পাঁচ আনায় এক শত। খুব খাস আম আট আনা শ'য়েব উর্দ্ধে কৈ আমি কখন দেখি নাই। গাড়ী গাড়ী আম বোঝাই হইয়া বাজারে আসিতেছে,—বাজাবে আম রাখিবার স্থান নাই,—তথাচ আমেব গাডী আসাব কামাই নাই। আম পচিয়া

বাজারে দুর্গন্ধ উঠিয়াছে, পুলিস হইতে আমের আমদানি বন্ধের হুকুম হইয়াছে, তথাচ আম-বোঝাই গাড়ী অগ্রসর হইতেছে। সে এক বিরাট বিতিকিচ্ছি ব্যাপার। তখন এক পয়সায় দুই শত বা পাঁচ শত পর্য্যন্ত আম বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রতি বৎসর ঘটে না। একবার এক পয়সায় দুই শত আম দর হইল। সঙ্গে আমার একটী চাকর আছে। বিক্রেতাকে একটী পয়সা দিলাম,—চাকর আমের বাজরা মাথায় উঠাইল। বিষম ভারে চাকরের কাঁধ দমিয়া গেল। চাকর আমাকে বলিল,—"বাবু সাহেব! ইহাতে দুই শত আমের অধিক আছে; দোকানদার লুকাইয়া তিন শত গণিয়া দিয়াছে।" আমি বলিলাম,—"তাও কি কখন সম্ভব হয়? আমি কিনিলাম দুই শত, আর দোকানদার দিবে তিন শত?"

চাকর কাঁধে আমেব বাজরা রাখিতে অক্ষম হওয়ায় আমি তাহা ধরিয়া নামাইলাম। তখন আমার চাকর গিয়া বিক্রেতার সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিল। বলিল,—"তুমি বড় বদ লোক, লুকাইয়া তিন শত আম দিয়াছ; —এখনি আমার কাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত।" পরস্পর তর্ক-বিতর্ক হইয়া আমের গণনা আরম্ভ হইল। দেখা গেল, সমুদায়ে ২৪৯টী আম আছে। দোকানদার বলিল, —"ঐ ৪৯টী আম ফাও দিয়াছি।" চাকব বলিল, "ঐ ৪৯ আমে আমার কাজ নাই।" দোকানদার উত্তর দিল,—"ঐ ৪৯টী আম তোমাকে লইতেই হইবে, —আমি ও আম কোথায় রাখিব?" বিবাদ কিছু গুরুতর বাধে দেখিয়া আমি প্রায় ত্রিশটা আম একটা কাপড়ে বাঁধিয়া লইলাম। কিন্তু এই ব্যাপার দেখিয়া আমি অবাক্! চাকরকে জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম,—পুলিস হইতে হুকুম হইয়াছে, বাজারে যত আম আছে, সমস্ত এক দিন মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। যাহার আম না বিক্রয় হইবে, তাহার আম পুলিস লইয়া গিয়া রামগঙ্গার বালিতে পুঁতিয়া ফেলিবে। আমার এই আম-খরিদের ঘটনা ১৮৫৮ সালে ঘটে।

একটা কথা বলিয়া রাখি,—বেরিলিতে এক বৎসর অন্তর আম জন্মে। এক বৎসর কোথায় কিছুই নাই—জনসাধারণ আমের মুখটী দেখিতে পায় না, তার পর-বৎসর অমনি ভরপুব আম, কুকুরের ল্যাজে আম—আমে ছি ছি পড়িয়া যায়। যে বৎসর আম জন্মে না,—সে বৎসর যে একটীও খাইতে পাওয়া যায় না, এমন নহে। অতি কম আম জন্মে। চারি বা পাঁচ টাকা করিয়া 'শ' হয়। ধনবান্ লোকেই সে আম খাইয়া থাকে। ফল কথা, আমটা বেরিলিতে এক বৎসর অন্তরই হইয়া থাকে।

যেখানে এত সুলভ মূল্যে আহারীয় সামগ্রী পাওয়া যায়, যেখানে স্বয়ং অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা বলিলে অত্যুক্তি হয় না,—সেখানে আমাদের আহারের কষ্ট হইবে কেন? আমরা থাকিতাম রাজভোগে।

বেরিলিতে যখন আমি আসি, তখন আমার হাতে মজুদ প্রায় ৩২ হাজার টাকা। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ৭৫৲ টাকা মূল্যে এক লৌহ-সিন্দুক কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেই সিন্দুকের ভিতর বেরিলির বাসায় আমার টাকা থাকিত। মোহর, টাকা, নোট এই তিন রকমে ৩২ হাজার টাকা ছিল। তখন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার প্রথা তত প্রবল ছিল না; কোম্পানীর কাগজের সুদ অতি কম বলিয়া আমি ঐ টাকায় কোম্পানীর কাগজ কিনি নাই। নগদ টাকা তোড়া-বন্দী করা সিন্দুকে থাকিত।

ব্রহ্মদেশে সর্ব্বরকমে আমার মাসিক কিছু কম চারি শত টাকা মাহিনা ছিল। ব্রহ্মদেশে আমার এক পয়সাও খরচ ছিল না। মাহিনার টাকা সমস্তই জমিত। আমার বাসা-ভাড়া ছিল না, খাই-খরচ ছিল না, পোষাক-খরচ ছিল না; অথচ থাকিতাম আমি ভাল বাসায়, খাইতাম উত্তম সামগ্রী, পরিতাম উৎকৃষ্ট পোষাক। আমি ব্রহ্মে প্রথম গিযাই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাসায় আড্ডা করি। তিনি কমিশেরিয়েট গোমস্তা ছিলেন। তাঁহার দান-শক্তি অদ্ভুত ছিল। গবরমেণ্টের কনট্রাক্ট লইয়া তিনি বড়-মানুষ হন। তাঁহার বাসায় পাঁচ-সাত দিন থাকিয়া আমি অন্য বাসা করিতে চাহিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে স্বতন্ত্র বাসা করিতে দিলেন না। ছয় মাস পরে আবার স্বতন্ত্র বাসা করিতে উদ্যত হইলাম, তাহাতে কৃষ্ণনাথ বাবু মহা রাগ করিয়া উঠিলেন এবং আমাকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন। তাঁহার পোষাকের সঙ্গে আমার পোষাক তিনি ফরমাইস্ দিতেন, দাম দিতে গেলেই তিনি আমার পিঠে কীল মারিতেন, কিছুতেই বস্ত্রের দাম লইতেন না। একবার টাকায় এক মণ দশ সের করিয়া তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকার চাউল কিনিয়া গুদামে মজুদ করিয়া রাখিলেন। তাহার পরবৎসর ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। টাকায় আধ-মণ চাউল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। এক জন বন্ধু কৃষ্ণনাথ বাবুকে বলিলেন, "আর কোন্ সময়? এই বেলা চাউল বিক্রয় আরম্ভ করুন।" তিনি বলিলেন, "একটু থামো, আরও চাউল কিছু মহার্ঘ্য হউক।" ক্রমে চাউলের দর টাকায় পনের সেরে উঠিল। সেই ব্যক্তি আবার বলিলেন, "আর বিলম্ব করিতেছ কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আরও ১৫ দিন দেখি।"

অবশেষে টাকায় আট সের দশ সের চাউল বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। চাউল দুষ্প্রাপ্য হইল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বাসায় প্রত্যহ পাঁচ-সাত শত ভিখারী আসিত; কৃষ্ণনাথ বাবু বাজার হইতে চাউল কিনিয়া প্রত্যেককে এক পোয়ার হিসাবে চাউল দিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ যখন টাকায় দশ সের চাউল বিক্রয় আরম্ভ হইল, তখন প্রত্যহ ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন কৃষ্ণনাথ বাবু গুদাম হইতে চাউল আনিয়া প্রত্যেক ভিখারীকে বৈকালে আধ সেরের হিসাবে বণ্টন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ—দশ হাজার মগ ভিখারী এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে চাউল পাইতে লাগিল। এইরূপে লক্ষ টাকার চাউল তিনি দান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের লোকে তাঁহাকে 'হাতী বাবু' বলিত। আমি ব্রহ্মদেশে যাইবার পূর্ব্বেই এ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় আমি বার হাজার টাকা আনিয়াছিলাম। পৈতৃক সম্পত্তিও এইবার আমার হাতে আসিল। যাহা হউক, সর্ব্বরকমে আমার নিকটে বেরিলিতে প্রায় ৩২ হাজার টাকা মজুদ রহিল। বেরিলিতে তখন আমার মাসিক মাহিনা ছিল ১৬৫৲ টাকা। কিন্তু মাহিনায় করে কি? আমি ৩২ হাজার টাকার উপরে বসিয়া। একুশ বৎসর বয়সে আমার কি কম গরম হইয়াছিল? সংসারে যে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, অনশন আছে, অর্দ্ধাশন আছে, তাহা আমি তখন জানিতাম না। এইরূপেই হাসিয়া খেলিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে দিন কাটিবে, ইহাই ধারণা ছিল।

আমার সেতার শিখিবার সখ জন্মিল। পনের টাকা মাসিক বেতনে এক জন ওস্তাদ রাখিলাম। ওস্তাদ জাতিতে মুসলমান। নাম ঠিক মনে নাই—বোধ হয় ঝম্মন খাঁ। বাড়ী মুরাদাবাদ। এ ব্যক্তি পেশাদার সেতার বাজিয়ে। শিক্ষাকার্য্যে বেশ সুপটু,—অনেক রকম গৎ জানিত। অল্পদিনের মধ্যেই আমি অনেকগুলি গৎ শিখিলাম। ক্রমশঃ আরও দুই-এক জন বন্ধু আমার বাসায় সেতার শিখিতে আসিতে লাগিলেন। আমি নিজ ব্যয়ে তাঁহাদিগকে এ কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য দুইটি সেতার কিনিয়া দিলাম। আমার নাম-ডাক পড়িয়া গেল। আমি খুব দাতা এবং ভাল লোক—ইহা সহরময় রাষ্ট্র হইল। অথচ দান করিয়া যে কাহার কখনও দুঃখ দূর করিয়াছি, তাহা আমি জানি না। ফল কথা, আমার 'মুখ মিষ্ট' ছিল;—আহারে, আমোদে, লোককে আপ্যায়িত করিতাম। হিন্দুস্থানী মহলেও বেশ পসার হইল। রাজা নহবৎ রায়, মিশির বৈজনাথ, লালা লছমীনারায়ণ, রায় চেৎরাম, রায় লেখরাজ

প্রভৃতি—বেরিলি সহরের ইঁহারা মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ, নবাব হাফিজ নিয়ামৎ খাঁ, হাকিম সাহাদৎ আলি খাঁ, আলতাফ আলি প্রভৃতি ইঁহারা মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান। সকলের সহিত নানা সূত্রে আমার আলাপ-পরিচয় হইল। তবে ভাব কাহারও সঙ্গে বেশী, কাহারও সঙ্গে কম।

মিশির বৈজনাথ—জমিদার এবং মহাজন। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা—বড় বড় বাগান ছিল। ধনী, নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। ইহার সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মিযাছিল। বৈজনাথ বৃদ্ধ, রঙ ফর্সা, একটিও দাঁত নাই। পরিধানে চুণটওয়ালা জামা। সদাই পূজা-আহ্নিকে ব্যাপৃত। ঘোড়া ১৬টা এবং গাড়ী ৮খানি ছিল। ইনি ইংরেজের বিশেষ অনুগত ও প্রিয় ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহেব সময় ইনি ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করেন। বিদ্রোহ দমন হইলে ইনি ইংরেজের নিকট হইতে জায়গীর-স্বরূপ বহু আযের ভূ-সম্পত্তি এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রামলীলায়, দোলে, বিবাহ উৎসবে, সকল শুভ কর্ম্মেই বৈজনাথ আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন।

লালা লছমীনারায়ণ টাকার সমুদ্র। দিল্লী এবং বেরেলির গবর্ণমেণ্টের খাজনাখানার ইনি কর্ত্তা ছিলেন। দেখিতে সুপুরুষ। কাশ্মীরি বাগ নামক ইঁহার এক বাগান বেরিলিতে ছিল। এমন উদ্যান আমি দেখি নাই। অনেক সাহেব-সুবা, রাজা-বাজড়া এই বাগান দেখিতে আসিতেন। ইঁহার প্রায় ৪০টী ঘোড়া ছিল।

রাজা নহবৎ রায় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব। ইঁহার পিতা খুব প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমানগণ ইহার পিতার ভয়ে থরথর কাঁপিত। কোন মুসলমানই ইহার পিতার আমলে হিন্দুর উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সক্ষম হইত না। বেরিলির কয়েক জন গুণ্ডা-মুসলমান ইঁহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া হত্যা করে। একদিন গালিচা বেচিবার ভাণ করিয়া এক জন সুন্দরকায ভদ্র মুসলমান ইঁহার পিতার বৈঠকখানায় উপস্থিত। প্রহরিগণ কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া এই মুসলমানকে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতে দিযাছিল। গালিচা দেখাইতে দেখাইতে সেই মুসলমান তাঁহার পেটে এক ছোরা মারিয়া ফেলিল। তিনি অমনি কাৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। হত্যাকারী মুসলমানের অবশ্যই ফাঁসি হইল। তাঁহার পুত্র নহবৎ রায়ের প্রকৃতি ধীর এবং শান্ত। উঁহার ন্যায নিষ্ঠাবান পরম ভক্ত হিন্দুস্থানী হিন্দু বেরিলিতে আর কেহ

ছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার শরীরের রঙ টক্‌টক্ করিতেছে, লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু সদাই ঢল ঢল করিতেছে। মুখ যেন চন্দ্রকে উপহাস করিতেছে। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, ইনি মানুষ নহেন, দেবতা। মনে হইত, ইঁহার চরণতলে বসিয়া ইঁহার পাদপদ্ম অনুক্ষণ পূজা করি। ইঁহার জমিদারিতে অনেক লক্ষ টাকা আয় ছিল। ইঁহার বাড়ী বড়ই জাঁকজমক-বিশিষ্ট। ইঁহার হাতী, ঘোড়া, উট ছিল। অনেক রকম গাড়ী ছিল। প্রায় এক শত বন্দকধারী সিপাহী ছিল। ইহা ব্যতীত অনেক কুস্তিগীর পালোয়ান এখানে প্রতিপালিত হইত। দেবসেবা, অতিথিসেবা, সদাব্রত, দান-ধ্যানের ধূম দেখে কে?

খাঁ বাহাদুর খাঁ প্রাচীন নবাববংশ হইতে উদ্ভূত। ইঁহার পিতামহ হাফিজ রহমৎ খাঁ এক সময রোহিলখণ্ডের নবাব ছিলেন। পিতামহ যুদ্ধে ও সন্ধি-বিগ্রহে পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজের সাহায্যে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা উক্ত হাফিজ রহমৎ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রোহিলখণ্ড ইংরেজ-রাজের হস্তগত হয়। বর্ত্তমান বাহাদুর খাঁ, নবাব হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্র বলিয়া সকলেই নবাব উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন করিত। ইংরেজ-রাজও তাঁহার এক্ষণে বেশ সম্মান রাখিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মাসিক প্রায এক শত টাকা তন্‌খা দিতেন। ইহা ছাড়া, তাঁহাকে সদরালাগিরি চাকরিও দিয়াছিলেন। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর আয় ছিল মাসিক পাঁচ-ছয় শত টাকার কম নহে। ১৮৫৬ সালে যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি বৃদ্ধ হইযাছেন এবং সদরালাগিরি চাকরি ছাড়িয়া দিয়া পেনসন লইযাছেন। খাঁ বাহাদুর খাঁর বৃহৎ পাকা দাড়ি ছিল,—খোনার স্থায় একটুকু নাকি-সুরে কথা কহিতেন। আমার সহিত ইঁহার সামান্যই আলাপ হইয়াছিল।

বেরিলিতে তখন নিয়ামৎ খাঁ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। ইনিও নবাব-বংশীয। খাঁ বাহাদুর খাঁর ইনি খুড়তুত ভাই। ইঁহারা উভয়ে একান্নবর্ত্তী পরিবার নহেন। ইঁহাদের বাটী স্বতন্ত্র। নিয়ামৎ খাঁও গবরমেণ্ট হইতে মাসিক ৭৫ টাকা তন্‌খা পাইতেন। ইহা ছাড়া, অন্য রকমে ইঁহার মাসিক দুই শত টাকা আয় ছিল।

নিয়ামৎ খাঁর জোষ্ঠ পুত্রের নাম চুন্না মিঞা। বয়স ২৫ বৎসর। সুন্দর সুপুরুষ; মুখে কিন্তু বসন্তের দাগ ছিল; হউক বসন্তের দাগ, কিন্তু তেমন

সুন্দর, সুগোল, সুঠাম মুর্ত্তি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইঁহার বৈষয়িক কোন কাজকর্ম্ম ছিল না, সর্ব্বদা কেবল সেতার বাজাইতেন। ওস্তাদ না হউন, সেতারে কিন্তু হাত খুব মিষ্ট ছিল। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভেই আমার বাটীতে সেতার বাজনার খুব ধুম লাগিয়াছে। এদিকে চুন্না মিঞাও বড়ই সেতার-প্রিয়। চুন্না মিঞা মধ্যে মধ্যে সহর ত্যাগ করিয়া, বৈকালে বায়ু-সেবনার্থ মাঠের দিকে সেনা-নিবাসে বেড়াইতে আসিতেন। পদাতি সৈন্যদলের পশ্চাৎ-ভাগেই আমার বাসা ছিল। এক দিন বৈকালে আমার বাসায় সেতার বাজনা হইতেছে, ওস্তাদজী মধুর স্বরে রাগ আলাপ করিতেছেন, চুন্না মিঞার কানে এ স্বর প্রবিষ্ট হইল। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া আমার বাটীর দরজার নিকট আসিয়া কান পাতিয়া সেতার শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার চক্ষু চুন্না মিঞার দিকে গেল। আমি ভদ্রলোক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ঘরে আনিলাম। চুন্না মিঞা ওস্তাদজীর বিশেষ পরিচিত। তখন ওস্তাদজী তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন।

চুন্না মিঞাকে আর একদিন আমার বাসায় আসার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি আসিলেন। তাঁহার মিঠা হাতের সেতার শুনিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ্য জন্মিল।

চুন্না মিঞা প্রত্যহ আমার বাসায় আসিতে লাগিলেন। তিনি সহর হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিতেন। তিনি নবাব-বংশীয় বটেন, কিন্তু এক্ষণে দরিদ্র-দশাপন্ন। আমি তাঁহাকে সহর হইতে আনিবার জন্য প্রত্যহ আমার গাড়ী পাঠাইতে লাগিলাম। মাসের মধ্যে দশ দিন তিনি আমার বাটীতে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে পোষাকাদি খরিদ করিয়া দিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার জন্য মাসে প্রায় আমার ত্রিশ টাকা খরচ হইত।

চুন্না মিঞা বড়ই সচ্চরিত্র সুজন ছিলেন। সদা অমায়িক ভাব, মান অভিমান ছিল না। তাঁহার চিত্ত যেন দয়ায় মাখা। খল-কপটতা নাই, গর্ব্ব অহঙ্কার নাই, যেন সাধু-পুরুষ। বলাই বাহুল্য, চুন্না মিঞার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

চুন্না মিঞার ছোট ভ্রাতার নাম নন্নে খাঁ। বয়স ১৯ বৎসর। তিনিও মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসিতেন। যখন তাঁহার দাদা থাকিত না এবং আমি বৈঠকখানা হইতে অন্দর-বাটীতে যাইতাম, তখন তিনি একটা সেতার লইয়া পিড়িং পিড়িং করিতেন, আর ওস্তাদজীকে বলিতেন,—"দুর্গাদাস বাবু যতক্ষণ

না আসিতেছেন, ততক্ষণ মধ্যে আমাকে একটা গৎ শিখাইয়া দাও।” আমি তাঁহার দাদার বন্ধু বলিয়া তিনি আমাকে মান্য ও ভক্তি করিতেন।

খাঁ বাহাদুর খাঁর এক পরম রূপবতী এবং গুণবতী কন্যা ছিল—বড়ই আদরের এবং সোহাগের কন্যা। কন্যার লক্ষ আবদার পিতা সহ্য করিতেন। পাছে দূরে বড়লোকের ঘরে বিবাহ দিলে কন্যাকে সহজে দেখিতে না পান, এই জন্য পিতা খাঁ বাহাদুর উক্ত নন্নে খাঁর সহিত কন্যার বিবাহ-কার্য্য সমাধা করিলেন।

ক্রমশঃ চুন্না মিঞার পিতার সহিত আমার বেশ আলাপ হইল। ক্রমশঃ সহরের প্রায় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানের সহিত (বিশেষ আলাপ না হউক) জানা-পরিচয় হইল।

১৮৫৭ সালে আমি টাকাকে টাকা জ্ঞান করিতাম না। পথের পাথর-কুচিরও মূল্য ছিল, কিন্তু তখন আমার নিকট টাকার মূল্য ছিল না। আদর করিতে, যত্ন করিতে, ভক্তি করিতে শিখি নাই, তাই বুঝি মা-লক্ষ্মী ক্রমশঃ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

আমি থাকিতাম একা,—কিন্তু গাড়ী ছিল দুইখানা। ঘোড়া ছিল তিনটা। চাকর (মায় সহিস) ছিল এগার জন।

আমার নিকট যে ৩২ হাজার টাকা ছিল, তন্মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ধার দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কি অশ্বারোহী, কি পদাতি, কি তোপখানা, সকল পল্টনের সাহেবগণই আমার নিকট টাকা কর্জ্জ লইতেন। না দিলে কেহই ছাড়িতেন না ; পিঠ চাপড়াইয়া, করমর্দ্দন করিয়া, প্রায় সকলেই আমার নিকট হইতে ধার লইতেন। এ দিকে সিপাহীগণ, সুবেদারগণও টাকা ধার লইতেন। আমি যে যেমন ব্যক্তি সেইরূপ বুঝিয়া তদুপযুক্ত টাকা দিতাম। হাণ্ডনোট লওয়ার রীতি ছিল না, একটা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম ; তাহার গায়ে, যিনি টাকা লইতেন, তিনি সহি করিতেন। খাতার মলাটে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল,—“বন্ধুত্বের খাতিরে ধার দেওন।”

অনিচ্ছাসত্বেও এরূপভাবে ধার দেওয়ায় আমার লোকসান কিছু ছিল না। আমি মাসিক প্রায় আট-নয় শত টাকা সুদ পাইতে লাগিলাম। আর, কি ইংরেজ, কি হিন্দুস্থানী, কি সৈন্যাধ্যক্ষ, কি ভিস্তিওয়ালা—সকলেরই নিকট মান্য ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইলাম। সিপাহীগণ জানিত,—সাহেবদের সহিত দুর্গাদাস বাবুর এক প্রাণ এক দেহ। সাহেবরা জানিতেন,—যত সিপাহী আছে, সকলেই দুর্গাদাসের গোলাম। বড় মজাই হইয়াছিল।

এগার

অনেকে হয়ত মনে করিতেছেন, আমি বড় বাজে কথা বকিতেছি। বস্তুত কথা একটিও বাজে নয়,—সমস্তই আবশ্যকীয়, ভবিষ্যতে নিতান্ত দরকার বলিয়াই, নগর এবং নগরবাসীর কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

বাজে কথা কিন্তু এখনও ফুরায় নাই। গোড়া-পত্তন ভাল করিয়া না করিলে, বনিয়াদ পাকা না হইলে, তাহার উপর কখনই সুপ্রকাণ্ড সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন,—"মহাশয়! এইবার আপনি সিপাহী-বিদ্রোহের কথা আরম্ভ করুন। ঘোর যুদ্ধে আপনার বীরত্ব-কাহিনী কীর্ত্তন করুন।"

সিপাহী-যুদ্ধের কথা শুনিতে হইলে, আগে সিপাহী সৈন্য কিরূপে গঠিত হইত তাহা শুনা উচিত। সিপাহীদের রীতি-নীতি আচার-পদ্ধতি কিছু জানা উচিত।

১৮৫৭ সালে মিউটিনির পূর্ব্বে যেরূপ নিয়মাদি ছিল, আমি তাহাই লিখিতেছি। এক্ষণে সে নিয়মের একটু-আধটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি যাহা লিখিতেছি তৎসমস্তই স্মৃতিশক্তির সাহায্যে। সূক্ষ্ম হিসাব ধরিলে হয়ত একটু-আধটু ভুল হইতে পারে। কিন্তু স্থূলত প্রকৃত তত্ত্বে ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

বেরিলিতে তখন এক দল দেশীয় পদাতি সৈন্য ছিল। ইংরেজীতে এই ধরণে বলিতে হয়,—"বেরিলিতে এক রেজিমেণ্ট নেটিব ইন্‌ফাণ্ট্রি ছিল।" এক রেজিমেণ্টের ভাবার্থ এক দল। এই রেজিমেণ্ট বা দল আট ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে 'কোম্পানী' কহে। এইরূপ চারি 'কোম্পানী'তে এক অর্দ্ধ দল বা 'উইং' হয়। প্রথম চারি কোম্পানীকে 'রাইট্ উইং' বা দক্ষিণ অর্দ্ধ দল বলে। দ্বিতীয় চারি কোম্পানীকে 'লেফট উইং' বা বাম অর্দ্ধ দল বলে। আমি যাহা লিখিতেছি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন ত?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রত্যেক পদাতি রেজিমেণ্ট আট ভাগে বা 'কোম্পানী'তে বিভক্ত। প্রত্যেক কোম্পানীতে নিম্নলিখিত লোকগুলি আছেন,—এক জন সুবেদার, এক জন জমাদার, ছয় জন হাবিলদার, ছয় জন নায়েক, এক জন বিলাতী বংশীবাদক এবং ৮০ জন সিপাহী। সুতরাং ৮ কোম্পানীতে বা এক রেজিমেণ্টে এতগুলি লোক আছেন,—

১ × ৮ = ৮ সুবেদার
১ × ৮ = ৮ জমাদার
৬ × ৮ = ৪৮ হাবিলদার
৬ × ৮ ৪৮ নায়েক
১ × ৮ – ৮ বংশীবাদক
৮০ × ৮ – ৬৪০ পদাতি সৈন্য

৭৬০ জন।

সুবেদার এক কোম্পানী সৈন্যের অধিনায়ক। জমাদার সেই কোম্পানীর দ্বিতীয় অধিনায়ক।

পদাতি সৈন্যের সহিত এক দল ইংরেজী বাদ্য আছে৷ বাদ্যকরগণের সংখ্যা সর্ব্বরকমে ২৫ জনের কম নহে। দেশীয় খৃষ্টান বা ফিরিঙ্গীগণ সাধারণত বাদ্যকর দলভুক্ত হন। এই বাদ্যকরগণকেও কিছু কিছু যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হয়।

এই সমুদয় রেজিমেণ্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা একজন ইংরেজ,—ইংরেজীতে তাঁহাকে 'কমাণ্ডিং অফিসার' অর্থাৎ সেনাপতি বলে। রেজিমেণ্টে আর এক জন ইংরেজ আছেন, তাহাকে বলে দ্বিতীয় সেনাপতি। তৃতীয় ইংরেজকে বলে এডজুটাণ্ট। চতুর্থ ইংরেজটী ডাক্তার (সাব্‌জন মেজার)। ইহা ব্যতীত দুই জন ইংরেজ নন্-কমিশণ্ড আফিসার আছেন—এক জনের নাম সার্জেণ্ট মেজার এবং অপরেব নাম কোয়াটার-মাষ্টার সার্জেণ্ট। সৈন্যদের কাওযাজ প্রভৃতি শিক্ষার পরিদর্শনের ভার সার্জেণ্ট মেজারের উপর। তাঁবু, গোলা, গুলি, বারুদ. বন্দুক প্রভৃতি রক্ষার ভার কোয়াটার-মাষ্টার সার্জেণ্টের উপর। প্রত্যেক পদাতি রেজিমেণ্টে মোট ছয় জন মাত্র তখন ইংরেজ ছিলেন।

ঐ যে ইংরেজ ডাক্তারের কথা বলিয়াছি, উনি পল্টনের হাসপাতাল বিভাগের কর্ত্তা। ইহার অধীনে দুই জন নেটিব ডাক্তার, এক জন কম্পাউণ্ডার, এক জন ড্রেসার আছেন। এই স্থানে আহত বা পীড়িত সৈন্য বহনের জন্য দুইখানি ডুলি এবং আট জন বেহারা আছে।

প্রতি রেজিমেণ্টে আট জন ভিস্তি এবং আট জন মেথর আছে।

প্রত্যেক সিপাহী সৈন্যের মাসিক বেতন ৭৲ সাত টাকা; ক্রমশঃ উহা ৮৲ আট টাকা হয়, অন্তিমে ৯৲ নয় টাকায় দাঁড়ায়। নয় টাকার পর আর

বেতনের বৃদ্ধি নাই। এই বেতন হইতে গবরমেণ্ট পোষাকের দরুণ মাসিক নির্দ্দিষ্ট টাকা কাটিয়া লন।

বাজার বিভাগে এক জন বাজার-চৌধুরী নিযুক্ত। তাঁহার বেতন মাসিক ১১৲ এগার টাকা। তাঁহার অধীনে এক জন মুৎসুদ্দী ও দুই জন চাপরাসী আছে।

প্রত্যেক কোম্পানীতে এক জন করিয়া বেণিয়া মুদি আছে। সুতরাং প্রত্যেক পদাতি রেজিমেণ্টে আট জন করিযা মুদি থাকে। কেন না, এক রেজিমেণ্ট ৮ কোম্পানীতে বিভক্ত। এই মুদিগণই সিপাহীদিগকে রসদ যোগায়। সেনা-নিবাস সাধারণত দূরস্থ মাঠে হয়, সহরের ভিতর হয় না। কাজেই সিপাহীদের রসদ যোগাইবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়। তাহাতেই প্রত্যেক সেনা-নিবাসে বেণিয়া মুদি রাখিতে হইয়াছে।

ঐ চৌধুরী রেজিমেণ্টের বাজার পরিদর্শন করেন। জিনিষ ভালমন্দ কি না, বাটখারা ঠিক কি না, আবশ্যকীয় সামগ্রী বাজারে আছে কি না, এই সকল দেখিয়া বেড়ানো চৌধুরীর কাজ। রেজিমেণ্টের বাজারে যে সে আসিয়া দোকান করিতে বা জিনিষ-পত্র বিক্রয় করিতে পারে না। সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম হইলে তবে দোকানদার রেজিমেণ্টে দোকান করিতে পায়। নির্দ্দিষ্ট আজ্ঞা-প্রাপ্ত গোয়ালা ব্যতীত অন্য কোনও গোয়ালা রেজিমেণ্টে দুধ বেচিতে পাইবে না। প্রায় সকল রকমেরই দোকান রেজিমেণ্টে থাকে। সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম মতে বাজারে দশ-পনের জন বা কুড়ি-পঁচিশ জন বেশ্যা থাকিতে স্থান পায়। কিন্তু কোন কোন সৈন্যাধ্যক্ষ বাজারে বেশ্যা থাকিতে দেন না। রেজিমেণ্টের প্রত্যেক লোকের প্রতি এই আদেশ হয়, তাহারা যেন রেজিমেণ্টের বাজার হইতেই কাপড়, জামা, জুতা প্রভৃতি খরিদ করে। সহরের বাজারে কোন সিপাহী ধারে কোন সামগ্রী কিনিতে পারে না। কিনিলে তাহার দণ্ড হয়। আর দোকানদার সেই ধারের দরুণ সিপাহীর নামে আদালতে নালিস করিলে ডিক্রী প্রাপ্ত হয় না। সেই জন্য কোন কোন সৈন্যাধ্যক্ষ, কোন সহরে নূতন পল্টন আসিলে, সহরে এই বলিয়া ঢেডরা পিটাইয়া দেন যে,—"কোনও দোকানদার যেন কোন সিপাহীকে ধারে জিনিষ না দেয়; ধারে দিলে, সে টাকা সে আর ফেরত পাইবে না।"

রেজিমেণ্টের কোনও দোকানদারের হঠাৎ বাজার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার যো নাই। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে দোকান খোলা ও দোকান বন্ধ হইয়া থাকে।

বেণিয়া মুদিগণ ধারে সিপাহীদিগকে রসদ দিয়া থাকে। এক মাস পূর্ণ *হইলে প্রত্যেক সিপাহী মুদির নিকট গিয়া আপন আপন আহারীয় সামগ্রীর হিসাব করিয়া আইসে। সিপাহীদের সহিত যখন মুদির হিসাব-পত্র হয়,* তখন বাজার-চৌধুরী বা মুৎসুদ্দি তথায় উপস্থিত থাকিয়া, হিসাব দেখিয়া, তাহার ভুলচুক ঠিক করেন। এইরূপে হিসাব-পত্র ঠিক হইলে, সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ অনুসারে বেণিয়াগণ সিপাহীদের মাহিনা হইতে আহারীয় সামগ্রীর বাবদ টাকা পাইয়া থাকে। পোষাক প্রভৃতির টাকা, রসদের টাকা মাহিনা হইতে কাটিয়া লইয়া যে টাকা বাকী থাকে, তাহাই সিপাহীগণ নগদ হাতে পাইয়া থাকে। এইরূপে কোন সিপাহী মাসে নগদ ১॥০ টাকা বা ১৲ টাকা পায়; কেহ ॥০ আনা পায়; কেহ বা চারি পয়সা পায়; কেহ বা কিছুই পায় না। কেবল অমুক মাসের মাহিনা শোধ হইল, ইহা শুনিয়াই সে শূন্য হস্তে আপন স্থানে চলিয়া আইসে।

যে যে জিনিষের যেরূপ দর, তাহা মাজিষ্টর সহরে জানিয়া এবং যাচাই করিয়া প্রত্যহ রেজিমেণ্ট-বাজারে চৌধুরীর নিকট পাঠাইয়া থাকেন। বেণিয়া মুদিগণ সেই দরের উপর টাকা-প্রতি এক আনা হিসাবে লাভ পায়। মাজিষ্টরের দর দেওয়ায় ভুলভ্রান্তি হইলে, মুদিগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করে, এবং দ্বিতীয়বার দর যাচাই আরম্ভ হয়।

অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষের সময় যখন দ্রব্য-সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হয়, তখন সিপাহীগণকে সে সময়ের বাজার-দরে জিনিষ কিনিতে হয় না। তাহারা সামরিক বিভাগের নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট হারে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্ত হয়।

সৈন্যদের সাধারণ আহার ডাল রুটী। মাছ মাংস নাই, কালিয়া পোলাও নাই, আলু বেগুণ পটল মূলা নাই; কেবল সেই ডাল আর রুটী অনন্তকাল চলিয়াছে। উপযুক্ত ডাল রুটী পাইলেই সিপাহী সন্তুষ্ট। সিপাহী প্রত্যহ বেণিয়া মুদির নিকট হইতে সিধা আনিতে যায়। কেহ তিন পোওয়া, কেহ এক সের, কেহ বা পাঁচ পোওয়া আটা লয়; ডাল আধ পোওয়া, ঘি এক ছটাক, লবণ সিকি ছটাক লয়; আর নগদ লয় দুইটী পয়সা। এই দুই পয়সায় কাঠ মসলা প্রভৃতি ক্রয় করে। যদি কোন সিপাহী ইহা অপেক্ষা অধিক খাইতে চায়, তবে তাহাকে কিঞ্চিৎ অধিক আটা ও ঘৃত দেওয়া হয়, কিন্তু মাসিক সে যত টাকা মাহিনা পাইবে, তত টাকার অধিক সামগ্রী বেণিয়া

মুদি কিছুতেই সিপাহীকে দিবে না। যখন খুব সখ হয়, তখন সিপাহী এক-আধ দিন তরকারী খায়। 'কচু'ই সিপাহীর প্রধান তরকারী। আলু বেগুণও সিপাহী কখন কখন খাইয়া থাকে। ঐ যে মুদির নিকট হইতে প্রত্যহ দুইটি করিয়া পয়সা পায়, সিপাহী ঐ পয়সা হইতে কিছু কিছু জমাইয়া এক-আধ দিন তরকারী কিনিয়া থাকে। জ্বালানী কাঠ অনেক সময়ে কুড়াইয়া সিপাহী কার্য্যোদ্ধার করে।

পূরবীয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীগণ সাধারণত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত জাতি-ভুক্ত। আহীর (গোয়ালা), গড়েড়িয়া (মেষপালক) এরূপ জাতিও আছে। ইহারা মাছ-মাংস স্পর্শ করে না। গুর্খা সৈন্য মাছ-মাংস খায়। জঙ্গলী শূকর অর্থাৎ বরাহের মাংস ইহাদের বড় প্রিয়। গুর্খাগণ সাধারণত ভাত খায়, আটার রুটীতে ইহাদের রুচি কিছু কম। ভাতের ফেন না গড়াইয়াই ইহারা ফেনে-ভাতে খাইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী পূরবীয়া সৈন্য এক বেলা খায়; শিখ সৈন্য দুই বেলা খায়। শিখ সিপাহী ছাগমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু বাজারের মাংস খায় না—আপনারা ছাগ বলি দিয়া সেই ছাগের মাংস খায়। মুসলমান সৈন্য দু বেলা আহার করে।

অনেকে মনে করেন, সিপাহীগণের কোন কাজ-কর্ম্ম নাই;—তাহারা বসিয়া বসিয়া খায়, আর বসিয়া বসিয়া মাহিনা লয়। সিপাহীগণ যেন গবরমেণ্টের পেন্‌সন-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী। দিব্য মজা করিয়া, পায়ের উপরে পা দিয়া, বার মাস সিপাহী বসিয়া আছে, কবে কালে-ভদ্রে বিশ বৎসর পরে হয়ত একটা যুদ্ধ বাধিবে, তখন সিপাহীকে একবার বন্দুক ঘাড়ে করিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইবে। এমন সিপাহীও অনেক দেখা গিয়াছে যে, তাহাকে এ জীবনে কস্মিন্‌কালে যুদ্ধ করিতে হয নাই;—যৌবনে সিপাহী কার্য্যে প্রবেশ করিয়া, শেষে বৃদ্ধ হইয়া, পেন্‌সন লইয়া আনন্দমনে স্বগৃহে প্রস্থান করিয়াছে।

বস্তুত সিপাহী-জীবন বিশেষ সুখের জীবন নহে। অতি প্রত্যূষে একটু-আধটু ঘোর ঘোর থাকিতে থাকিতেই উর্দ্দি বাজিতে আরম্ভ হয়। উর্দ্দির ইংরেজী নাম 'ট্যাটু'। উহার বাঙ্গালা নাম নাই। অর্থাৎ, খুব ভোরে বিউগাল বা বাঁশী বাজিতে থাকে, সিপাহীগণকে শয্যা হইতে অমনি তাড়া-তাড়ি ধড়মড় করিয়া উঠিতে হয়। বংশী-বাদন যেমন বন্ধ হইল, তৎক্ষণাৎ অমনি দামামা-ধ্বনি হইতে লাগিল। সিপাহীগণ তখন সত্বর হইয়া প্রাতঃ-

কৃত্য সমাপন করিল। পোষাক পরিল। বন্দুক হাতে ধরিল। কিছুক্ষণ পরে, আবার দ্বিতীয় বার বিলাতী বাঁশী বাজিল। সিপাহীগণ অমনি প্যারেড করিতে বাহির হইল, অর্থাৎ, সমর-কৌশল শিখিবার জন্য ময়দানে গমন করিল। যে দিন প্যারেড থাকে না, সে দিন আর দ্বিতীয় বার বংশীধ্বনি হয় না। কিন্তু শীত কালে প্রায় প্রত্যহই প্যারেড হয়। কেবল রবিবারে ও বৃহস্পতিবারে প্যারেড হয় না। প্যারেড-ভূমিতে গিয়া বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, হাঁটা-হাঁটি, ছুটাছুটি, সে বড় কম পরিশ্রমের কাজ নহে। শীত কালেও এ কাজে দেহ বিশেষ ঘর্ম্মাক্ত হয়। আর, তেমন তেমন কঠিন প্যারেডে কোন কোন সিপাহীর কখন কখন হাত-পাও ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে।

সিপাহীগণকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে গার্ড-(পাহারা) স্বরূপ নিযুক্ত থাকিতে হয়। যেখানে অস্ত্রাগার, সেখানে কতকগুলি সিপাহী দিন-রাত পাহারা-স্বরূপ কাজ করিতেছে। যেখানে ইংরেজগণের ‘মেস্’ (খানা খাইবার ঘর), সেখানে কতকগুলি সিপাহী দিবারাত্রি পাহারা দিতেছে। যেখানে তাঁবু প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে, সেখানেও পাহারা চাই। রেজিমেণ্টের খাজনাখানায় পাহারা আছে। পল্টনের বাজারেও পাহারা আছে। সমুদয় পল্টনকে রক্ষা করিবার জন্য পাহারা আছে। আরও নানা স্থানে পাহারা আছে। পালা অনুসারে সকল সিপাহীই ক্রমান্বয়ে পাহারা দিয়া থাকে। প্রত্যেক সিপাহীকে প্রত্যহ আট ঘণ্টার হিসাবে পাহারা দিতে হয়। প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর পাহারা বদল হয়। একজন সিপাহী দুই ঘণ্টা পাহারা দিল, চারি ঘণ্টা বিশ্রাম করিল, আবার দুই ঘণ্টা পাহারা দিল। এইরূপে দিনরাত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ ঘণ্টা কাল প্রত্যেক সিপাহীকে পাহারা দিতে হইবে।

পাহারা দেওয়া বড় কঠিন কাজ। একটু এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। সামান্য একটু নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই অমনি (কোর্ট মার্শালে) সামরিক আদালতে সিপাহীর বিচার হইয়া থাকে। বন্দুকটাকে বুকের নিকট ঠিক সোজাভাবে উঁচু করিয়া ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিতে নির্দ্দিষ্ট পাদবিক্ষেপে সিপাহীকে কেবল পাদচারণ করিতে হইবে। এইরূপে পা-চালি করিতে করিতে সিপাহী যদি একবার বসে, তাহা হইলে সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইল। তখন একবার ঠেস দিয়া কোথাও দাঁড়াইবার যো নাই। দাঁড়াইলেই বিষম দোষ। তখন কাহারও সহিত বৃথা কথা কহিবার হুকুম নাই। কথা কহিলেই কুরুক্ষেত্র। পাহারার কাজ বড় কঠিন কাজ।

সিপাহীগণকে উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারিগণের 'অর্ডারলি' হইতে হয়। অর্ডারলির ভাবার্থ আরদালি, অর্থাৎ পত্রবাহক, পিয়ন। যিনি প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, তাঁহার প্রত্যহ ছয় জন বা আট জন অর্ডারলি আবশ্যক। এইরূপে কেহ পাঁচ জন, কেহ চারি জন, কেহ দুই জন, কেহ বা এক জন অর্ডারলি পাইয়া থাকেন। সিপাহীগণকে পালা করিয়া এইরূপে পিয়নের কাজ করিতে হয়।

এইরূপে গড়ে প্রায় দুই শত আড়াই শত সিপাহী প্রত্যহ গার্ড এবং অর্ডারলির কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট যে সকল সিপাহী থাকে, তাহারাই প্যারেড-ভূমিতে গিয়া রণ-কৌশল শিক্ষা করে। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিলেই প্রথমে ঠিক হয়, অদ্য গার্ড বা অর্ডারলির কাজ করিবার জন্য কাহার কাহার পালা পড়িয়াছে। ফল কথা, মোটের উপর খাটিতে হয় খুব। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া বসিয়া, জামাই-আদরে খাইয়া মাখিয়া, কোনও সিপাহী মাহিনা প্রাপ্ত হয় না। সিপাহীকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয়, তবে তাহার ডাল-রুটী মিলে।

সেনা-নিবাসে সিপাহী-জীবনে আনন্দও আছে। যে দিন কাজ নাই, সে দিন আহারাদির পর কেহ সুর করিয়া তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছে, আর বিশ জন সিপাহী তাহাকে বেষ্টন করিয়া তাহা একাগ্রমনে শুনিতেছে। শুনিয়া, কখন কাঁদিতেছে, কখন হাসিতেছে, কখন ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতেছে, "দুষ্ট নিশাচর রাবণ এখনি নিপাত হউক।".

কোন দিন দেখি, ঢোলক, মন্দিরা, তানপুরা লইয়া সিপাহীগণ গান আরম্ভ করিয়াছে। শত শত সিপাহী দর্শক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কোথাও দেখি, কুস্তি খেলা হইতেছে। সে দিন সিপাহীগণের আগ্রহ উৎসাহ দেখে কে? পদাতি পল্টনের মধ্যে অনেক পালোয়ান ছিল। এক এক জনের দেহ যেন মৈনাক পাহাড়ের ন্যায়। দেহ দেখিলে মনে হয়, যেন কলিকালে পুনরায় অসুরাবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। অলৌকিক দৈহিক বল দেখিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ এইরূপ পালোয়ান সিপাহী ভর্ত্তি করিতে ভালবাসিতেন। পালোয়ান সিপাহীগণ প্যারেড করিত বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদৃশ যেন মনোযোগ ছিল না। তাহারা মুগুর ভাঁজিতে, দহন ফেলিতে, লৌহ ধনু টানিতেই বিশেষ অনুরক্ত। আহারাদির পর বেলা ২টা বা ৩টার সময় যখন কোন কাজ না থাকিত, তখন তাহারা কুস্তি করিত, অন্যান্য সিপাহীগণকে কুস্তির প্যাঁচ শিখাইত।

সংবাদ আসিল, সহরে অমুক বড়লোকের বাড়ী দুই জন কুস্তিগীর পালো- য়ান আসিয়াছে। অমনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পল্টনে আনা হইল। আহারাদির পর হাসি-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ হইল। তার পর, পল্টনের কোন সিপাহীর সহিত তাহাদের মধ্যে একজনের কুস্তি খেলিবার প্রস্তাব করা হইল। উভয়ে সম্মত হইলে, সৈন্যাধ্যক্ষকে এ কথা জানান হয়। এ সব কাজে আমিই অগ্রণী। সৈন্যাধ্যক্ষের এ বিষয়ে যদি কোন কারণে অমত থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার মত করাইয়া আসি। ফল কথা, সৈন্যাধ্যক্ষও সাধারণত খুব উৎসাহী। তিনি প্রায় নিজে ২৫৲ বা ৩০৲ টাকা দিয়া বলেন, "যে পালোয়ান জয়লাভ করিবে সে ঐ টাকা পাইবে।"

যখন বড় সাহেবের হুকুম হইল, তখন মাঠে কুস্তি খেলার এক স্থান ঠিক করিলাম। সহরের যত সাহেব-সুবা আছেন, সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট হইতে তাঁহাদের নামে এক নিমন্ত্রণ-পত্র বাহির করিয়া লইলাম। সদরালা, মুন্সেফ, উকীলগণও নিমন্ত্রিত হইলেন। আর, সিপাহীগণ, অশ্বারোহিগণ, ইহারা ত আসিবেই। সহরে যেখানে যত বেঞ্চ চেয়ার আছে, সমস্ত আমি জড় করিয়া মাঠে সাজাইলাম। স্থানে স্থানে গালিচা সতরঞ্চ পাতিয়া দিলাম। যে স্থানে কুস্তি খেলা হইবে, সে স্থানটী বালুকাময় করিলাম। কাঠের বেড়ায় তাহার চারিদিক ঘেরিলাম। কেবল একটীমাত্র দ্বার রহিল। সৈন্যদল মধ্যে এমন উল্লাস এবং উৎসাহের দিন বুঝি আর হইবে না।

কার হার, কার জিৎ হইল, ইহার মীমাংসা করিবার জন্য ৩ জন, ৫ জন, বা ৭ জন মধ্যস্থ বসিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে গোলযোগও হইত—জয়-পরাজয়ের ঠিক হইত না। উভয় পক্ষই বলিত, "আমার জয়, আমার জয়।" এই ব্যাপার লইয়া কখন বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিবার উপক্রম হইত। সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব তখন উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া উভয় পক্ষকে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতেন।

সিপাহী-জীবন সুখেরও নহে, দুঃখেরও নহে, সুখ-দুঃখে মিশ্রিত। মনুষ্য-জীবন সর্ব্বত্র এইরূপই।

সিপাহী আপন গৃহে আপন সমাজে সম্মানিত। যোদ্ধার কার্য্য, গৌরবের কার্য্য বলিয়া গণ্য। এইরূপ নানা বিষয়ে সিপাহী লাভবান্।

বার

পদাতি সৈন্যদলের কথা কথঞ্চিৎ কহিলাম। এইবার অশ্বারোহী সেনার কথা কিছু বিবৃত করিব। যাহা বলা হইল, তাহা অতি সংক্ষেপ জানিবেন। সমুদায় বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে গেলে, এক পদাতি সৈন্যের কথাতেই একখানি গ্রন্থ হইতে পারে। অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যাপার অপেক্ষাকৃত কিছু বিস্তৃত। কিন্তু ইহাও খুব সংক্ষেপে কহিব। কেহ বিরক্ত হইবেন না;—বাজে কথা বলিয়া এ সব কথাকে কেহ উপেক্ষা করিবেন না। এরূপ কথা বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন,—অন্তত নূতনত্বের খাতিরেও ইহা পাঠ করা উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পদাতি রেজিমেণ্ট আট দলে (কোম্পানীতে) বিভক্ত। অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট ছয় দলে (টুরুপে) বিভক্ত।* এখানে কতগুলি ইংরেজ আছেন দেখুন,—(১) সৈন্যাধ্যক্ষ, (২) দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ, (৩) এক জন আড্‌জুটাণ্ট, (৪) এক জন ইংরেজ ডাক্তার।

কতগুলি দেশীয় লোক আছেন দেখুন,—১৩ জন নেটিব আফিসার, ৫৪ জন নন-কমিশণ্ড আফিসার, ছয় জন ভিস্তি, ছয় জন বংশীবাদক এবং ৫০৪ জন অশ্বারোহী সৈন্য। তের জন নেটিব আফিসারের মধ্যে তিন জন রেসালাদার আছেন। ইঁহাদের পদ খুব উচ্চ। ১ম রেসালাদারের মাসিক বেতন ৩০০৲, ২য় রেসালাদারের মাসিক বেতন ২৫০৲; ৩য় রেসালাদারের মাসিক বেতন ২০০৲। ১ম রেসালাদার 'রেসালাদার মেজার' নামে অভিহিত হন। তিনি মাহিনা ব্যতীত আরও ৩০৲ টাকা মাসিক আলাউএন্স-স্বরূপ অধিক পাইয়া থাকেন। তিন জন রেসাইদার আছেন। প্রথম রেসাইদারের মাসিক বেতন ১৫০৲; দ্বিতীয়ের বেতন ১৩৫৲; তৃতীয়ের বেতন ১২০৲ টাকা। ছয় জন জমাদার আছেন। প্রথম দুই জন জমাদারের বেতন মাসিক ৮০৲ টাকা হিসাবে; দুই জনের ৭০৲ টাকা হিসাবে; বাকী দুই জনের ৬০৲ টাকা হিসাবে। এক জন 'উর্দ্দী মেজার' আছেন, তাঁহার পদ রেসাইদারের তুল্য,—মাসিক বেতন ১৩৫৲ টাকা। সর্ব্বশুদ্ধ এই তের জন নেটিব আফিসার।

৫৪ জন নন্‌-কমিশণ্ড আফিসারের হিসাব। ৬ জন কোৎ-দফাদার; প্রত্যেকের বেতন মাসিক ৪৭৲ টাকা। ৪৮ জন দফাদার; মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৩৮৲ টাকা।

---

* পরে অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট আট টুরুপে বিভক্ত হয়।

ছয় জন যে বংশীবাদক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মাহিনা মাসিক ৩০৲ টাকা। এই ছয় জনের মধ্যে এক জন কর্ত্তা থাকে, তিনি ৫৲ টাকা আলাউ-এন্স-স্বরূপ অধিক পান।

প্রত্যেক ভিস্তির বেতন মাসিক ৫৲ টাকা।

সওয়ার বা অশ্বারোহী সেনা যখন প্রথম ভর্ত্তি হয়, তখন সে মাসিক ২৭৲ সাতাইশ টাকা করিয়া মাহিনা পায়। ছয় বৎসর পরে ঐ বেতন ২৮৲ টাকা হয়। দশ বৎসর পরে ঐ বেতন ২৯৲ টাকা হয়। ১৫ বৎসর পরে ঐ বেতন ৩০৲ টাকা হয়। বস্—আর বেতনের বৃদ্ধি নাই। সৈন্যগণের যদি স্বভাব-চরিত্র ভাল হয়, যদি উত্তমরূপ কাজ-কর্ম্ম করে,—তাহা হইলেই উপরোক্ত নিয়মে বেতন বৃদ্ধি হয়, নচেৎ নহে।

সওয়ারগণের কস্মিন্‌কালে আর কোন উপায়েই যে বেতন বৃদ্ধি হয় না, তাহা নহে। এই সওয়ার হইতেই সে সর্ব্বোচ্চপদস্থ রেসালাদার মেজার হইতে পারে। তখন তাহার বেতন হয় মাসিক ৩০০৲ টাকা। যেমন জয়েণ্ট-মাজিষ্টার হইতে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায়, সেইরূপ সওয়ার হইতে রেসালা-দার মেজার হওয়া যায়। গুণাগুণ দেখিয়া সওয়ারগণের ক্রমশঃ পদোন্নতি হয়। ৩০৲ টাকা বেতনের সওয়ার প্রথম উন্নতিতে দফাদার হন। দফাদার হইতে কোৎ-দফাদার হন। কোৎ-দফাদার হইতে জমাদার হন। এইরূপ পদবৃদ্ধি হইতে থাকে।

অন্তিমে যাহাই হউক, প্রথমে সওয়ারকে ভর্ত্তি হইতে হয় মাসিক ২৭৲ টাকায়। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, এক জন পদাতি সৈন্যের বেতন ৭৲ টাকা, আর এক জন সওয়ারের বেতন ২৭৲ টাকা! কেন এত পার্থক্য হইল? পদাতির অপেক্ষা অশ্বারোহীর বেতন না হয় দ্বিগুণ হউক,—এ একেবারে প্রায় চতুর্গুণ কেন?

সওয়ারের বেতন শুনিতে সাতাইশ বটে, কিন্তু বস্তুত মাহিনা খুব কম। সওয়ার ২৭৲ টাকায় ভর্ত্তি হন সত্য, কিন্তু ঘোড়ার খরচ বলিয়া ঐ বেতন হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। ঐ ১৫৲ টাকা হইতে ঘেসেড়া সহিসের বেতন, ঘোড়ার দানা, ঘোড়ার শীতবস্ত্র, কম্বল, ঘোড়া-বন্ধনের আগাড়ী-পিছাড়ী দড়ি, ইত্যাদি ইত্যাদি গবরমেণ্ট ক্রয় করেন। এই ১৫৲ টাকা ছাড়া আরও ২৷৷৵০ গবরমেণ্ট মাসিক কাটিয়া লন। ইহার নাম খরচা ফণ্ড। এই ২৷৷৵০ হইতে সওয়ারের জন্য তাঁবু খরিদ, বস্ত্র খরিদ এবং বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি

মেরামত হয়। ধোপা, নাপিত, মেথরের খরচ,—ঐ ২॥৶০ হইতে হয়। যখন ঐ ২॥৶০ আনায় উপরোক্ত খরচ না কুলায়, তখন মাসিক ৩৲ বা ৩॥০ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইয়া থাকে। সাধারণত একজন সওয়ার মাসিক বেতন পায় ৯।৶০।

সওয়ারদের আরও একটি ফণ্ড আছে। তাহার নাম আমানত ফণ্ড। তাহাতে প্রত্যেক সওয়ার দেড় মাসের মাহিনা জমা দিতে বাধ্য। শুধু সওয়ার কেন, ঐ ফণ্ডে সকলেই, মায় রেসালাদার মেজার পর্য্যন্ত ঐ দেড় মাসের মাহিনা জমা দিয়া থাকেন। যিনি এককালে ঘর হইতে আনিয়া ঐ দেড় মাসের মাহিনার টাকা আমানত ফণ্ডে ফেলিয়া দিতে না পারেন, তিনি মাসে মাসে এক-আধ টাকা করিয়া দিয়া ক্রমশঃ ঐ দেড় মাসেব মাহিনা পূরণ করেন। এইরূপে কোন কোন রেজিমেণ্টে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজাব টাকা জমিয়া যায়। যদি পুত্র-কন্যার বিবাহ বা পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধ, গৃহনির্ম্মাণ বা অন্য কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যে সিপাহীর টাকা কর্জ্জের দরকার হয়, তবে সিপাহী ঐ আমানত ফণ্ড হইতে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ লয। টাকা কর্জ্জ লইতে হইলে প্রথমত সৈন্যাধ্যক্ষকে দরখাস্ত করিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম হইলে সওয়ার টাকা কর্জ্জ পায, হুকুম ব্যতীত টাকা পাইবার যো নাই।

কোন সওয়ার যখন পেন্‌সন লইযা অথবা নাম কাটাইযা ঘরে যায়, তখন ঐ দেড় মাসেব মাহিনা আমানত ফণ্ড হইতে ফেবত পায, কিন্তু সুদ পায না। ঐ ২৫।৩০ হাজার টাকা গবরমেণ্ট সুদে খাটান। রেজিমেণ্টের বেণিয়া মুদিগণ শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা সুদে প্রায় ৯ হাজাব টাকা কর্জ্জ লইয়া থাকে। আবও নানারূপে ঐ টাকা সুদে খাটে। এইরূপে খাটিতে খাটিতে কোন কোন রেজিমেণ্টে ৭০।৮০ হাজাব টাকা মজুদ হয। সওয়ারদের টাকা এইরূপে আমানত ফণ্ডে গিযা, সুদে সুদে যতই ফাঁপিয়া উঠুক না কেন, সওয়ারদিগকে যখনই টাকা কর্জ্জ লইতে হইবে তখনই শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা সুদ দিতে হইবে। অর্থাৎ নিজেব টাকা সুদ দিয়া নিজেকেই কর্জ্জ লইতে হইবে।

অনেক রকম পরীক্ষা দিয়া সিপাহী ভর্ত্তি হয। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির কম লম্বা হইলে তাহাকে পদাতি সৈন্য মধ্যে লওয়া হয় না। পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা লোক সওয়াব হইতে পারে। তবে অতিশয় লম্বা, যথা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি হইলে তাহাকে অশ্বারোহী দল মধ্যে কেহ গ্রহণ করে না। এইরূপ বুকের নির্দ্দিষ্ট মাপ আছে। এই সব মাপ-জোখ ঠিক হইলে, ডাক্তার সাহেব তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অবশেষে বুক পিঠ হাত পা টিপে-টুপে

দেখা হয়। তাহার চক্ষের তেজ দেখিবার জন্যে তাহাকে দূরে দাঁড় করাইয়া লাল নীল রঙ্ দেখান হয়, অঙ্গুলি দেখান হয়। ফল কথা, বড় বিষম পরীক্ষা। রেজিমেণ্টের ডাক্তার সাহেব এ বিষয়ের পরীক্ষক।

সওয়ার ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট ভর্ত্তি হইবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রথমে আবেদন করে। আবেদন কালে সৈন্যাধ্যক্ষ একবার তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করেন। তীব্র দৃষ্টিতে এইরূপ পরিদর্শনের পর ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"রূপেয়া মজুদ হ্যায়?" সে ব্যক্তি উত্তর দেয়—"হাঁ, খোদাবন্দ! মজুদ হ্যায়।" টাকা নাই, বা কম আছে, যদি এইরূপ উত্তর সে ব্যক্তি দেয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়। টাকা মজুত আছে জানিলে, তবে সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে পরীক্ষার জন্য ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার সাহেব তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ বিষম অগ্নিপরীক্ষা করিয়া, পছন্দ হইলে লেখেন,—'উপযুক্ত', অপছন্দ হইলে লেখেন, 'অনুপযুক্ত'। 'অনুপযুক্ত' কর্ম্মপ্রার্থী অবশ্যই শূন্য মনে ঘরে ফিরিয়া যায়।

সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ম্মপ্রার্থী সওয়ারকে প্রথম দর্শনেই যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রূপেয়া সব মজুদ হ্যায়?" এ কথার অর্থ কি? রহস্য কেহ বুঝিয়াছেন কি? অশ্বারোহী হইবার জন্য চাকরীপ্রার্থী হইয়া আসিলে, সঙ্গে করিয়া নগদ প্রায় আড়াই শত বা পৌনে তিন শত টাকা আনিতে হইবে। অশ্বারোহীকে নিজের ঘোড়া নিজে কিনিতে হয়। অশ্বারোহীর ঘোড়া গবরমেণ্ট নিজে খরচায় কিনিয়া দেন না। প্রথমে ঘোড়া খরিদ দরুণ সেই কর্ম্মপ্রার্থীর নিকট নগদ ২০০৲ শত টাকা লওয়া হয়। ঐ দুই শত টাকা 'চাঁদা ফণ্ডে' জমা হয়। ঐ দুই শত টাকা লইয়া গবরমেণ্ট সেই সওয়ারকে একটি ঘোড়া দেন। গবরমেণ্টের অনেক ঘোড়া খরিদ হইয়া, শিক্ষিত হইয়া, আস্তাবলে মজুত আছে। সেই মজুদী ঘোড়া হইতে সওয়ারকে একটি ঘোড়া দেওয়া হইল। ঘোড়ার জিন, লাগাম এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম খরিদ করিবার জন্য আরও ৭০।৮০৲ টাকা সেই ব্যক্তিকে জমা দিতে হয়। এই ৭০।৮০৲ টাকা একান্ত নগদ না দিতে পারিলে, ধারে কাজ চলে। অর্থাৎ সওয়ার মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা উহার জন্য দিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট টাকা শোধ হইলে, তখন আর কিছুই দিতে হয় না। পেন্‌সন লইয়া বা নাম কাটাইয়া সওয়ার যখন ঘরে ফিরিয়া যায়, তখন ঐ ২০০৲ শত টাকা এবং ৭০।৮০৲ টাকা পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সে ব্যক্তি ঐ গচ্ছিত অর্থের জন্য সুদ কখনও কিছুই পায় না।

প্রতি দুই জন সওয়ারের একটী করিয়া সহিস চাকর থাকে। প্রত্যেক সহিসের একটি করিয়া টাটু ঘোড়া আছে। এই টাটু লইয়া সে মাঠে ঘাস খাওয়াইতে যায়। রেসালা যখন অন্য স্থানে 'কুচ' করে, তখন সওয়ারদের তাঁবু ইত্যাদি ঐ টাটু দ্বারা বাহিত হয়। সওয়ারদের তাঁবু ক্ষুদ্র, নাম মাত্র তাঁবু। সহিস এবং টাটুর জন্য খরচপত্র সওয়ার-প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত ১৫৲ টাকা হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

অশ্বারোহী সৈন্য সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু স্থানাভাবে সকল কথা লিখিতে পারিলাম না।

অশ্বারোহী সৈন্যদল-মধ্যে মাঝে মাঝে মহাসমারোহে তযফার নাচ হইত। বড় সাহেব, ছোট সাহেব, সকলেই নর্ত্তকীর নৃত্য দর্শনে উৎসুক। বেরিলি অঞ্চলে পরমাসুন্দরী নাচনে-ওয়ালী পাওয়া যাইত। তাহাদের হাব ভাব, তাল মান, সুর গান, বড়ই মনোমোহকর। কথাবার্ত্তায়, আলাপ আপ্যায়িতে ইহারা সিদ্ধা। এমন মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী কামিনী সচরাচর অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। পুরাণের অপ্সরাবংশীয় বলিয়া ইহারা বিখ্যাত। নাইনিতাল এবং কুমাযুনের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। তথায় ইহাদের সম্প্রদায় 'রামজানি' নামে অবিহিত হয়। ইহারা হিন্দুধর্ম্মই মান্য করে। ইহারা হর-পার্ব্বতীর সেবিকা। সুন্দরীগণের আচার, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠা—সমস্তই প্রকৃত হিন্দুর ন্যায়। মুসলমানের সহিত একাসনে বসিয়া ইহারা পান তামাক খায় না। মুসলমানস্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্নান করে। এই মধুরভাষিণীগণ প্রভাতে উঠিয়া শিব বা দুর্গাপূজায় প্রায় দুই-এক ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করে। ইহাদের ব্যাপার কতকটা গৃহস্থের ন্যায়, কতকটা বারবিলাসিনীর ন্যায়। মা বাপ ভাই—ইহারা গৃহস্থ, অন্দরে থাকেন, আর কন্যা নর্ত্তকীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাহিরে বৈঠকখানায় অবস্থিতি করেন,—এবং পরপুরুষের গৃহে নৃত্য-গীতাদি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই রামজানি জাতির রহস্য এই,—কন্যা হইলেই সাধারণত নর্ত্তকী হয়, আর পুত্র হইলে সেই পুত্র গৃহস্থ হয়,—যথাসময়ে পুত্রের বিবাহ হয়, —তখন পুত্রবধূর ঘোমটার ঘোর-ঘটা দেখে কে? এক একখানি ঘোমটা প্রায় আড়াই হাত লম্বা। বধূ পরপুরুষের মুখটি পর্য্যন্ত বুঝি কস্মিন্‌কালে দেখিবেন না;—অধিক কি, সূর্য্যেরও মুখ বুঝি কখন অবলোকন করিবেন না।

আমাদের রেজিমেণ্টের বড় সাহেব এই জাতীয় নর্ত্তকীর নৃত্য দেখিতে ভালবাসিতেন। রেসেলায় যে দিন বড় সাহেবের আজ্ঞায় নাচ হইত, সে দিন

মহা ধূম পড়িয়া যাইত। জজ, মাজিষ্টর, জমিদার, মহাজন সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন। আমি পালোয়ানের কুস্তি-খেলার দিন যেমন বিব্রত হইতাম, নাচের দিন আমাকে তদপেক্ষা অধিক বিব্রত থাকিতে হইত। কারণ, সমারোহ নাচের দিন লোকের জনতা বেশী হইত। তয়ফা-নাচের সমস্ত বন্দোবস্তের ভার আমার উপর নির্ভর ছিল। আতর গোলাপে মজলিস মাৎ হইয়া উঠিত। কখন কখন কোন কোন রাত্রে চারি দল বা ছয় দল তয়ফা নৃত্য করিত। নাচের বিরাম নাই, সমস্ত রাত্রিই নাচ চলিতেছে, দর্শকবৃন্দেরও বিরক্তি নাই, সমস্ত রাত্রিই ঠায় বসিয়া আছেন। প্রভাত হইল, তবু অনেকের ইচ্ছা আরও খানিক নাচ চলুক। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে এইরূপ অপূর্ব্ব আমোদেই আমার দিন কাটিতে লাগিল।

তের

১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতেই সিপাহীগণের মেজাজ কিছু গরম বলিয়া বোধ হইল। একটু বাকা বাঁকা চাহনি, একটু বাঁকা বাকা কথা, একটু বাঁকা বাঁকা চলন সিপাহীদল মধ্যে দৃষ্ট হইল। আমি ইহার মর্ম্ম তখন ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মার্চ্চ মাস এইভাবেই কাটিল।

এপ্রেল মাসে অশান্তির লক্ষণ আরও কিছু অধিক মাত্রায দেখা দিল। সিপাহীগণ কথায় কথায তেরিয়ান হইতে লাগিল, কথায কথায চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভ্রূভঙ্গী করিতে আরম্ভ করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কেহই কোন কথাই বলে না।

হঠাৎ একদিন জনরব উঠিল, ইংরেজ-রাজ হিন্দু এবং মসলমান উভয়েরই জাতিকুল নাশার্থে উদ্যত হইয়াছেন। এই কথা হাটে, বাজারে, সহরে, পল্টনে, রেসালায় কেবল জল্পনা হইতে লাগিল। রাষ্ট্র হইল, ইংরেজ গো এবং শূকরের চর্ব্বি-সংযুক্ত টোটা সিপাহীদের দ্বারা দাঁতে কাটাইযা তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টায আছেন। এ কথা আমি অশ্বারোহী এবং পদাতি সৈন্যদিগের মুখেই শুনিলাম। কিন্তু কেহ যে উক্ত টোটা দাঁতে কাটিয়াছে, বা কাহাকেও যে দাঁতে কাটিতে কেহ দেখিয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারে না। অথচ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ করিল।

ব্যাপার ক্রমশঃ গুরুতর হইবার উপক্রম হইল। কোন কোন পদাতি সিপাহী প্রকাশ্যতই বলিতে আরম্ভ করিল,—"আমরা আর বন্দুক ঘাড়ে করিয়া প্যারেডে বাহির হইব না।" শুনিলাম, কতকগুলা সিপাহী ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষগণের আবাস-বাটী জ্বালাইয়া দিবার কল্পনা করিয়াছে। আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষকে গিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। শেষে এই-ভাবে উত্তর করিলেন,—"দেখুন দুর্গাদাস! আমি এ সকল কথাই জানি। গুপ্তচর দ্বারা আমি এ সকল সংবাদই লইতেছি। কিন্তু কি করি, উপায় কি আছে? আপনার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। তাই আপনাকে বলি, শুধু বেরিলিতে নহে, অন্যান্য স্থানেও সিপাহীগণ এইরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে। সিপাহীদিগকে শান্ত করিবার কোন উপায় আপনি স্থির করিতে পারেন কি?"

আমি। আমাদের অশ্বারোহী দল তত খারাপ হয় নাই। কিন্তু পদাতি ও তোপখানার সিপাহীগণ যেন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। আমি সে দিন এক দল পদাতি সিপাহীকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম, "কেন তোমরা বৃথা গোলযোগ করিতেছ? ইংরেজ তোমাদের জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই।" আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রোধে যেন ধূ-ধূ জ্বলিয়া উঠিল। এক জন বলিল, "বাঙ্গালী এবং ইংরেজ উভয়ে এককাট্টা হইয়াছে।" আমি ব্যাপার বুঝিয়া আর কথা কহিলাম না।

বড় সাহেব। তবে কি আপনি বিবেচনা করেন, সিপাহীরা সত্য সত্যই বিদ্রোহ করিবে?

আমি। আমার বিশ্বাস, তোপখানা ও পদাতি দলের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইবে, কিন্তু অশ্বারোহী দল বিদ্রোহী হইবে না।

বড় সাহেব। গুপ্তচরগণ বলিতেছে, এখানে যত ইংরেজ আছেন, তাঁহা-দের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকেই স্থানান্তরিত করা উচিত হইয়াছে। আপনি কি বলেন?

আমি। আমার মতে স্ত্রীলোকদিগকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত।

বড় সাহেব। যদি এখন স্ত্রীলোকদিগকে অন্য স্থানে পাঠাই, তবে সিপাহীগণ ভাবিবে, ইংরেজ-রমণীগণ পলাইতেছেন। ইহাতে তাহাদের সাহস এবং উৎসাহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে।

আমি। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত, নাইনিতালও নিরাপদ্ স্থান। সুতরাং গ্রীষ্মের ভাণ করিয়া স্ত্রীগণকে নাইনিতালে পাঠাইয়া দিন না কেন?

বড় সাহেব। আপনার কথা অযৌক্তিক নয়।

বেরিলি সহরে যে কয় জন ইংরেজ ছিলেন, তাঁহারা পরদিন একত্র হইয়া গোপনে এক সভা করিলেন। সেই গুপ্ত সভায় আমিও ছিলাম। নাইনিতালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে পাঠানোই সভায় স্থির হইল। সভার চার দিন পরে রমণীগণ নাইনিতাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চৌদ্দ

মে মাস আসিল। সিপাহীগণ ক্রমশঃই অধিক মাত্রায় মাতিয়া উঠিতে লাগিল। ইংরেজগণ ভয়ে সশঙ্কিত হইলেন। আমিও প্রমাদ গণিলাম। প্রায় ষোল হাজার টাকা ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষগণকে এবং সিপাহীগণকে বন্ধুত্ব-সূত্রে ধার দিয়াছিলাম। সিপাহীগণের নিকট টাকা শোধ চাহিলে এখন তাহারা সে কথা বড় আর কানে শোনে না। টাকার জন্য কাহারও নিকট যদি কিঞ্চিৎ পীড়াপীড়ি করি, তাহা হইলে সে অমনি হুমকি দেখায়। এ দিকে সাহেবগণ বিপদ্‌গ্রস্ত, তাঁহাদের কাছেই বা টাকা চাই কিরূপে! ফল কথা, আমি বড় বিব্রত হইলাম।

মে মাসের প্রারম্ভেই এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে আমাদের অর্ডারলী-গৃহে এক সভা আহূত হইল। সেই সভায় পদাতি, অশ্বারোহী, তোপখানার ইংরেজ অধ্যক্ষগণ এবং অশ্বারোহী সৈন্যের উচ্চপদস্থ দেশীয় অধ্যক্ষগণ মিলিত হন। এই দেশীয় উচ্চপদস্থ অধ্যক্ষগণকে বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত বোধে সভায় আহ্বান করা হইয়াছিল। সভায় প্রথমে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল যে, সৈন্যমাত্রেই কি শীঘ্রই বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে? অশ্বারোহী সেনার প্রধান দেশীয় অধ্যক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"না, তাহা কথনই হইবে না; আমি শীঘ্র বিদ্রোহ ঘটিবার কোন কারণ দেখি না। সিপাহীগণ কতকটা উন্মত্তপ্রায় বটে, কিন্তু এখনও তাহারা বিদ্রোহের দিকে এক পদ অগ্রসর হইয়া দশ পদ পশ্চাৎপদ হইতেছে। তাহাদের পরস্পরের এখনও মতের মিল হয় নাই। সর্ব্বাগ্রে মাথা দিতে কেহই স্বীকৃত হইতেছে না, সুতরাং বিদ্রোহ ঘটিতে

এখনও বিলম্ব আছে। আর, আমাদের অশ্বারোহী সেনাদল মধ্যে আদৌ বিদ্রোহ ঘটিবে না, ইহা আমি নিশ্চয় বলিতেছি। আমি প্রত্যেক সওয়ারের এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় অবগত আছি; সুতরাং আপনারা চিন্তিত হইবেন না। আমাদের প্রাণ থাকিতে আপনাদের প্রাণের কোনও আশঙ্কা নাই।"

অশ্বারোহী সেনার রেসেলদার মেজার মহম্মদ সফী কহিলেন,—"কোন ভয় নাই। যদি পদাতি সৈন্য বিদ্রোহী হয়, তবে আমরা পাঁচ-ছয় শত সওয়ার ভীম বেগে তাহাদের উপর পড়িব এবং তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব।"

সাহেবগণ এই আশ্বাস-বাক্যে কতকটা আনন্দিত হইলেন। সভা ভঙ্গ হইলে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। আমিও আমার বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আপন আলয় অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

পনের

আমাদের বড় সাহেব পরদিনই গবরমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন,—"আমাদের অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট কখনই বিদ্রোহী হইবে না, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস।" গবরমেণ্ট এই উত্তর লিখিলেন—"যদি এ প্রকার বিশ্বাস হইয়া থাকে যে, অশ্বারোহী সৈন্যদল বিদ্রোহী হইবে না, তাহা হইলে অশ্বারোহী সৈন্য-সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণিত করা আবশ্যক। কেন-না, এক হাজার রাজভক্ত অশ্বারোহী থাকিলে, বেরিলি অঞ্চল নিরাপদ্ থকিতে পারে।" এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র, দলে দলে অনেক লোক আমাদের রেজিমেণ্টে নিযুক্ত হইবার জন্য আসিতে লাগিল।

এরূপ দলে দলে এককালে বহু লোক আসিবার এক বিশেষ কারণও ছিল। কর্ম্মপ্রার্থী প্রত্যেক লোককে ঘোড়া কিনিবার জন্য দুই শত করিয়া টাকা নগদ দেওয়া হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কর্ম্মপ্রার্থিগণকে ঘর হইতে দুই-তিন শত টাকা আনিয়া অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে ভর্ত্তি হইতে হইত; কিন্তু এক্ষণে সে নিয়ম উল্‌টিয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষই সরকারী খাজনাখানা হইতে উক্ত কর্ম্মপ্রার্থীকে এককালে দুই শত টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহা অপেক্ষা আর কি মজা আছে বলুন! এরূপ স্থলে

লোক জমিবে না কেন? লোকের ভিড়ই বা না হইবে কেন? কর্ম্মপ্রার্থিগণের নিকট হইতে এই দুই শত টাকার একটা করিয়া জামিন লওয়া হইত, কিন্তু তখন সে জামিন নাম মাত্র।

আমি এই টাকা বণ্টন কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। তখন ডাক্তার সাহেবের কর্ম্মপ্রার্থীর দেহপরীক্ষার আর তত আঁটাআঁটি রহিল না। প্রত্যহ পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তর জন করিয়া সওয়ার নিযুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ক-এক দিন মধ্যে প্রায় সাত শত লোক ভর্ত্তি হইয়া, নাম লিখাইয়া, ঘোড়া কিনিবার জন্য দুই শত টাকা নগদ লইয়া, আপন আপন ঘরে প্রস্থান করিল। আমরা এ দিকে পথ চাহিয়া বসিয়া আছি, সওয়ারগণ ঘোড়া কিনিয়া কখন প্রত্যাগত হইবে। কিন্তু হা হতোস্মি! অনেকে ফিরিল না। দুই শত টাকা নগদ হাতে পাইয়া, দিব্য পায়ের উপর পা দিয়া, মজা করিয়া ডাল রুটী খাইতে লাগিল। ইহার মধ্যে দুই শত আন্দাজ লোক ফিরিয়াছিল। কিন্তু ফিরিলে কি হইবে? তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অকর্ম্মণ্য। দুই শত টাকার বদলে কেহ পঞ্চাশ টাকা দিয়া এক রোগা ঘোড়া কিনিয়াছে। কাহারও ঘোড়া খোঁড়া। কাহারও ঘোড়া এক চক্ষুহীন। ক্রমশঃ এক হাস্যরসের ব্যাপার হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া বড় সাহেব বড়ই চিন্তিত হইলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ প্রত্যেক কর্ম্মপ্রার্থীকে দুই শত করিয়া টাকা দাদন কালে আমার পরিশ্রম বড়ই বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত দিন রাত্রি খাটিয়াও সুচারু মত কাজের আনজাম করিতে পারি না। এ দিকে রেজিমেণ্টে আমার যে নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল, তাহা ত আছেই, তাহার উপর এই টাকা দাদন কার্য্য বৃদ্ধি হইল। কে আসিল, কে না আসিল, কে কোথায় লুকাইল, কাহার ঘোড়া ভাল, কাহার ঘোড়া মন্দ, এ সকল বিষয়েও তত্ত্বাবধান ভার আমার ঘাড়ে পড়িল। আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ কালীপ্রসাদ বেরিলির কমিশনার অফিসে চাকরি করিত; তাহাকে বলিলাম—"ভাই! তোমার ও কাজ দিন কতক স্থগিত রাখ, আমার সহিত কাজ কর।" ভ্রাতার সাহায্যে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আমি রেজিমেণ্টের কার্য্যোদ্ধার করিতে লাগিলাম। বড় সাহেব আমার কার্য্য-তৎপরতা এবং অগাধ পরিশ্রম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। এক দিন স্পষ্টতই আমাকে বলিলেন,—"দুর্গাদাস, আপনার পাহাড়ের ন্যায় সবল শরীরের মধ্যে বিষয় কার্য্যে এরূপ তৎপর বুদ্ধি আমি অল্প লোকেরই দেখিয়াছি।" আমার বয়স তখন ২১ বৎসর মাত্র।

ষোল

আর থাকে না। আগুন ও বারুদ সংমিশ্রিত হয় হয় হইয়াছে। কখন কোন্ সময়ে কোন্ সন্ধিক্ষণে এক মহা সংঘর্ষ, এক অলৌকিক অগ্নি-উৎপাত হইবে, লোকসমূহ তখন কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছে। সাহেবগণ সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কোন কথা প্রকাশ না করিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যে বিরাম ছিল না। কিন্তু মনের ভাব সহজে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। যুক্তি-পরামর্শ, সভা-সমিতি সমস্তই বন্ধ হইল। আমি যদি কোন ইংরেজের কাছে গিয়া ভাবী বিদ্রোহ-বিষয়ক কোন কথা পাড়িতাম, তাহা হইলে তিনি প্রকারান্তরে সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা কহিতে আরম্ভ করিতেন। আমি ক্ষুণ্ণ-মনে ঘরে ফিরিয়া আসিতাম।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কেন এমন হইল? সাহেবগণ আমার উপর হঠাৎ কেন এমন আড়-আড়, ছাড়-ছাড় হইয়া উঠিলেন। এ দিকে শুনি এবং দেখি, প্রত্যেক সাহেবের অশ্বশালায় একটী বা দুইটী ঘোড়া সর্ব্বদাই সুসজ্জিত হইয়া আছে, যেন চড়িলেই হয়। কোন কোন সাহেবের জিনিষপত্র প্যাকবন্দী হইয়া ঘরে পড়িয়া আছে, যেন শীঘ্রই কোথায় যাত্রা করিতে হইবে। আমি চারিদিকেই বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম।

অদ্য রবিবার, ১৮৫৭ সালের ৩১শে মে। রবিবার হইলেও মাসিক হিসাবপত্র অদ্য দাখিল করিতে হইবে। কেন না, আজ মাসের সংক্রান্তি। আমরা দুই ভাই—কালীপ্রসাদ এবং আমি, ৩১শে মে বেলা ঠিক সাড়ে-দশটার সময় মাসিক হিসাবপত্র লইয়া তাৎকালিক এড্জুটেণ্ট লেপ্টেনেণ্ট বীচার সাহেবের বাঙ্গলায় উপনীত হইলাম। দেখিলাম, সাহেবের আফিসের দরজা বন্ধ। কেহই কোথাও নাই। কিয়ৎক্ষণ জনমানবের দেখা পাইলাম না। খানিক এ দিক ও দিক চাহিয়া সাহেবের বাঙ্গলা-ঘরের অপর প্রান্তে গেলাম। দেখিলাম, সাহেবের একটী সহিস গুঁড়ি মারিয়া চুপটী করিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এমন করিয়া বসিয়া কেন? তোমার সাহেবই বা কোথায় গিয়াছেন এবং আফিসের দরজাই বা বন্ধ কেন?" ভয়-বিহ্বল সহিস কাঁপিতে কাঁপিতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে উত্তর করিল,—"সাহেব ঘোড়ে পর চড়কে ভাগ গেয়া, তুম্ হিয়া ক্যা করত্ হো?

তুমহু ভাগে নেই ত মারে যাই হো। তুম্ নাহি জানত্ হো, সিপাহী বিগাড় গয়ে?" এই কথা শুনিয়াই আমি একটু বিচলিত হইলাম। কি করিব, কোথায় যাইব, ভাবিতে লাগিলাম। বাসায় ফিরিয়া যাই, কি অন্য স্থানে পালাই, অথবা এইখানেই একটু অপেক্ষা করি,—মনোমধ্যে এই সকল চিন্তাই উদিত হইতে লাগিল। সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই নাই,—বন্দুক নাই, তরবারী নাই, পিস্তলটী পর্য্যন্তও আজ আনি নাই। হাতে আছে কেবল মাত্র একগাছি সরু বেতের ছড়ি। পকেট টিপিয়া দেখিলাম, একটী মাত্র টাকা আছে। বিদ্রোহীরা এখন কি করিতেছে, তাহারা এখন কোথায় কিভাবে আছে, তাহারও বিন্দু-বিসর্গ জানি না। একবার ভাবিলাম, বিদ্রোহীদের কাছেই যাই, আমাকে তাহারা ভালবাসে, ভক্তি করে, অবশ্যই আমাকে প্রাণে মারিবে না। বিদ্রোহীদের ভাব-ভক্তি দেখিয়া তাহার পর না-হয় পলায়ন চেষ্টা করা যাইবে। শ্রীমান্ কাশীপ্রসাদকে এ কথা বলিলাম। কাশী বলিল,—"দাদা! তাহা হইবে না। সিপাহীরা এখন ভাঙ্গ খাইয়া মাতোয়ারা হইয়া আছে। সদাই মার মার কাট কাট শব্দ করিতেছে, এমন সময় কি তাহাদের কাছে যাইতে আছে?"

আমি। তাতে ভয় কি? আমাদিগকে তাহারা কিছুই বলিবে না।

কাশী। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, সেখানে এখন কিছুতেই যাওয়া হইবে না। আমাদের এখন বাসায় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। আইরন্‌চেষ্টে নগদ বার-চৌদ্দ হাজার টাকার তোড়া-বন্দী আছে, সেগুলিকে আগে রক্ষা করা চাই। ঘোড়া কয়টীকে রক্ষা করা চাই। শেষে তেমন তেমন বুঝি ত, দুই ভাইই ঘোড়ায় চড়িয়া এ দেশ হইতে পলাইব।

কাশীপ্রসাদের কথায় বাসায় ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। বিশেষ, আমার সেই ব্রহ্মদেশীয় ঘোড়াটীর উপর মায়া অত্যন্ত ছিল। তেমন ঘোড়া আমি আর কখনও দেখিব না—যেমন সুবোধ শান্ত, তেমনই বেগগামী এবং তেজস্বী। তাহার সুপ্রশস্ত পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাও, তোমার ঘুম আসিবে। তাহার উপর চড়িয়া তামাক খাইতে খাইতে চলিয়া যাও, কোন অসুবিধা হইবে না। এমন মনোমোহকর কদম চাল আমি অন্য কোন ঘোড়ার কস্মিন্‌কালে দেখি নাই। অথচ কতই দ্রুতগামী! বলিলে কেহ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, রাজপুতনার সওদাগরগণ এই ঘোটকটী পঞ্চ সহস্র মুদ্রায় খরিদ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমি এ ঘোড়া বেচি নাই। টাকা-কড়ি, জিনিষ-পত্রের জন্য তত নহে, যত ঐ ঘোড়াটীর জন্য আমি বাসায় প্রত্যাগত হইতে স্থির-সঙ্কল্প হইলাম।

সতের

গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আর একবার সহিসের কাছে গেলাম। সহিসকে জিজ্ঞাসিলাম, "তোমার সাহেব কোন্ পথে গেলেন, তুমি কি জান? সাহেব একা গেলেন, না, সঙ্গে আর কেহ ছিল?" সহিস এই কথার উত্তর দিতে না দিতেই এক বজ্র-নিনাদে দুম্ করিয়া তোপধ্বনি হইল। অসময়ে হঠাৎ তোপের ভীষণ শব্দ শুনিয়া আমি ইতস্তত চাহিতে লাগিলাম। বুঝিলাম তোপখানা হইতেই এই তোপ দাগা হইয়াছে। কাশীপ্রসাদ জিজ্ঞাসিল, "দাদা, গতিক কি? বারটার সময় প্রত্যহ তোপ পড়ে, আজ এগারটা না বাজিতে বাজিতেই তোপ দাগিল কেন? এবং তোপের এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দই বা কেন?" আমি বলিলাম, "ভাই! ভয় করিও না, সত্য সত্যই বিপদ্ সমুপস্থিত।" দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে চারি দিক্ হইতে বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের গুলি এ দিক হইতে ও দিক শন্ শন্ শব্দে চলিতে লাগিল। আমার সম্মুখ দিয়া, মাথার উপর দিয়া, পার্শ্বদেশ দিয়া গুলি চলিতে লাগিল। চারি দিক্ ধূমময় হইয়া উঠিল। এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখিতেছি, এমন সময় সাহেবদের বাঙ্গলা-গৃহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আবার গুড়ুম গুড়ুম শব্দে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। প্রলয় কালের যেন মহা-কল্লোল সমুত্থিত হইল। শ্রীমান্ কাশীপ্রসাদ ভীত হইয়া আমার পশ্চাদ্দেশে আসিয়া দাড়াইল। দেখিলাম সাহেবদের খানসামা, চাকর, মেথর, ভিস্তি প্রভৃতি চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া পলাইতেছে, তাহারা স্ত্রী পরিবার লইয়া বিব্রত। কোন চাকর বলিতে লাগিল, "চল ভাই! গাঁও-মে চলে।" কেহ বলিল, "সহর-মে চলে।" কাহারও মাথায় মোট, কাহারও ঘাড়ে মোট, কাহারও কাঁধে মোট। কেহ স্ত্রীর হাত ধরিয়া শিশু-সন্তানকে বগলে করিয়া দৌড়িতেছে। দৌড়িতে দৌড়িতে কেহ পড়িয়া যাইতেছে। কাহারও পায়ে আসিয়া গুলি লাগিতেছে, সে দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া খুঁড়াইয়া খুঁড়াইয়া চলিতেছে। কাহারও রগে গুলি লাগায় সে এক মহা চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িতেছে। একটা বিকট ব্যাপার উপস্থিত।

ব্যাপার বড়ই ভীষণ দেখিয়া আমি ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে বলিলাম, "ভাই! বাসায় ফিরিয়া যাইয়া আর কি করিব? বিদ্রোহীরা হয়ত এতক্ষণ বাসা লুঠ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া থাকিবে। সুতরাং বাসায়

যাওয়া নিরাপদ্ নহে। চল আমরা সেনা-নিবাসেই যাই। সেখানে গেলে সকল বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব।” কালীপ্রসাদ অগত্যা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। মাসকাবারি হিসাব-পত্রের কাগজ তাহার হাতেই ছিল। সে কাগজ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া আর ফল কি? সাহেবের কাগজ সাহেবের ঘরেই থাকুক, এই ভাবিয়া, আমি সাহেবের আফিসের সার্সির একখানি কাচ ভাঙ্গিয়া টেবিলের উপর কাগজ-পত্র ফেলিয়া দিলাম। সেনা-নিবাসের দিকে ক-এক পা অগ্রসর হইলাম, কিন্তু যাই কেমন করিয়া, গুলিবৃষ্টি তখনও থামে নাই। সুবিধার মধ্যে গুলি চালাইবার নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না। কখন দুই-চারিটা গুলি আমার দিকে আসিল, কখন বা অন্য দিকে গেল, কখন বা কোথাও কিছু নাই। ফল কথা, গুলি দুম-দাম শব্দে চলিতেই লাগিল। ভাবিলাম, এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বা কি করিব? এখনই বিদ্রোহীরা এই বাঙ্গলায় আগুন দিতে আসিবে। কালীপ্রসাদকে বলিলাম, “কোনও ভয় করিও না, তুমি আমার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আইস।” তখন ‘জয় দুর্গা’ বলিয়া দুই ভাই গুলিবৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া, সেনা-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সৌভাগ্যবশত আমাদের কাহারও গায়ে গুলি লাগিল না। গুলি ঠিক মাথার উপর দিয়া যাইতেছে, মাথায় আগুনের ঝাঁঝ লাগিয়া দুই-একগাছি চুলও পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু মাথায় গুলি পড়িতেছে না। ইহা সৌভাগ্য নয় ত কি? অনতিবিলম্বে আমাদের সেনা-নিবাসে গিয়া দেখি কেহই কোথাও নাই। তথায় জনপ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ভাবনা দ্বিগুণ হইল। এই সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য ইহারই মধ্যে কোথায় গেল? বাস্তবিকই এই সময় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই জনশূন্য সেনা-নিবাসে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

কালীপ্রসাদ বলিল, “দাদা! বাসায় ফিরিয়া যাই চলুন। আমার বোধ হয়, বিদ্রোহীরা এখনও আমাদের বাড়ী লুঠ করে নাই।” এমন সময় হঠাৎ এক জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সকল অশ্বারোহী সৈন্যই অদূরস্থ একটী আম-উদ্যানে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে। সহরে যত ইংরেজ ছিল, বেলা দশটার সময় প্রায় সকলেই ঐ বাগানে আসিয়া মিলিত হন। আমার তখন আমবাগানে যাইবার অভিলাষ জন্মিল। আমবাগানও বেশী দূর নহে। কালীপ্রসাদ বলিল, “আমার প্রাণ থাকিতে আপনাকে উক্ত আমবাগানে যাইতে দিব না।” অগত্যা ভ্রাতার অনুরোধে বাসা অভিমুখে

চলিতেই বাধ্য হইলাম। প্রত্যাবর্ত্তন কালে দেখি, পথিপার্শ্বে বিগ্রেডিয়ার সি-বন্ডের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিষম গুলি লাগিয়াছে। তখনও রক্তধারা যেন বহিতেছে। কিন্তু প্রাণবায়ু তখন আর ছিল না। ব্রিগেডিয়ার সি-বন্ড তোপখানার প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

অল্প পথ যাইতে না যাইতেই আমরা অদূরে দেখিলাম যে, সেই বৃহৎ নিবিড় আম্র-কানন হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য ফিরিয়া আসিতেছে। আমার একান্তই ইচ্ছা হইল যে, দৌড়িয়া তাহাদের নিকট যাই এবং বিদ্রোহের সকল সংবাদ জানিয়া আসি। কিন্তু ভ্রাতা কালীপ্রসাদ আমায় যাইতে দিল না। যাহা হউক, সেই অশ্বারোহীদের এক জন সহিসের সঙ্গে আমার দেখা হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সকল অশ্বারোহী সৈন্যই সাহেবদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য, সাহেবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সেই আম্র-কাননে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সাহেবগণ ইহাদিগকে বিপক্ষ পক্ষ বিবেচনা করিয়া ইহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই বেগে পার্ব্বত্য পথে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং স্বচক্ষে ঘটনা দেখি নাই, কিন্তু এ বিষয়ের সংবাদ এইরূপ শুনিয়াছি,—সাহেবগণ প্রাতঃকালে গুপ্তচরের দ্বারা সংবাদ পান যে, অদ্য সিপাহীগণ সত্য সত্যই প্রকাশ্যত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। বেলা ১০৷৷০টার পর নির্দ্দিষ্ট তোপ দাগা হইলে লুঠপাট আরম্ভ হইবে। তাই তাঁহারা ঠিক বেলা ১০টার সময় বাইশ জন অতি বিশ্বাসী প্রভুভক্ত দেশীয় অফিসার সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে ঐ আম্রকাননে আসিয়া লুক্কায়িত হন। আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল সাহেবদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ঐ আমকাননে অনুগমন করে, কেন না, আমাদের রেজিমেন্ট তখনও বিদ্রোহী হয় নাই। ইহাদের ইচ্ছা ছিল যে, ইহারা পূর্ব্ববৎ রাজভক্তই থাকিবে। কিন্তু যেমন ইহারা আমকাননের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, সাহেবগণ অমনি মনে ভাবিলেন, "এই রে! এইবার উহারা আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে।" সাহেবেরা আর পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, নাইনিতালের পথে তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। যখন রেসেলাদার মহম্মদ সফীর সহিত আমাদের রেজিমেন্ট আম-কাননে উপস্থিত হইল, তখন সাহেব সম্প্রদায় অর্দ্ধ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। মহম্মদ সফী ভাবগতিক বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিয়া সাহেব-দের সঙ্গ লইবার জন্য সদলে বিপরীত বেগে অশ্ব ছুটাইল। সাহেবগণ মনে করিলেন, "বুঝি মহম্মদ সফী আমাদিগকে ধর ধর্ করিয়া ধরিতে আসিতেছে।"

সুতরাং তাহারাও প্রাণপণ চেষ্টায় দ্রুতগতিতে ঘোড়দৌড় করাইলেন। এইরূপ এক ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত উভয় দল চলিল। শেষে মহম্মদ সফী বুঝিল,—"সাহেবেরা আমাদিগকে বিপক্ষ ভাবিয়া প্রাণভয়ে পলাইতেছে।" তখন সে মিত্রতাসূচক লাল রুমাল ঘুরাইতে লাগিল। কিন্তু সে রুমাল ঘুরানো আর দেখে কে! সাহেবগণ একটীবারও পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া প্রাণের দায়ে নাইনিতালের পথে সমভাবেই ছুটিতে লাগিলেন।

মহম্মদ সফী খানিক থমকিয়া দাঁড়াইল; ভাবিল,—"আমি এই পাঁচ শত অশ্বারোহী লইয়া পার্ব্বত্য পথে কোথায় যাইব? ঘোড়া এবং সওয়ারের রসদ মিলিবেই বা কোথায়? আর বহুকষ্টে যদি সাহেবদের সম্মুখীনও হইতে পারি তখন সাহেবেরা আমাদিগকে শত্রু ভাবিয়া সম্ভবত গুলি চালাইতেও পারেন। গুলি গায়ে লাগিলে আমাদিগের সওয়ারগণ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। তখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। সম্ভবত সাহেবদল সমূলে নির্ম্মূল হইবে। আমাদের শুভ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।" এইরূপ নানা বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া আপন দল-বল-সহ মহম্মদ সফী প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ঘটনা যাহাই হউক, অদূরে চাহিয়া দেখিলাম, পদাতি ও তোপখানার গোলন্দাজ সৈন্যেরা আপন আপন আবাস গৃহে আগুন লাগাইয়া দিতেছে। যখন আপন আপন ঘর ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহারা নিজ নিজ জিনিষ-পত্র ও আসবাব লইয়া প্যারেড-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম, এ কি রকম বিদ্রোহ! নিজের ঘরে নিজেই আগুন দেয় কেন? নিশ্চয়ই ইহারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়াছে! নিশ্চয়ই ইহারা রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! পাঠকগণ জানেন, পদাতি সেনা-নিবাসের পাশে আমার বাসাবাটী ছিল। ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ বলিল,—"দাদা! দেখুন, আমাদের বাসাটাও ঐ জ্বলিতেছে।" আমি মোদ্দা—কোন্‌টা আমাদের বাসা, কোন্‌টা অন্যের বাসা, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তখন সমগ্র ময়দান এক অগ্নিক্ষেত্র এবং ধূমক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই আমরা আর বাসার দিকে গেলাম না। অতি গোপনভাবে অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই বীচার সাহেবের বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ঘরখানিতে তখনও কেহ আগুন দেয় নাই, বোধ হয় আগুন দিতে ভুলিয়া গিয়া থাকিবে। সাহেবের সেই সহিসটাকে আর জীবিত দেখিলাম না; তাহার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া এক গুলি দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে তখন অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত।

আঠার

দুই ভাই বিষন্নমনে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি,—কি করি? কোথায় যাই? কি উপায় অবলম্বন করিলে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছিতে পারি? কোন্ স্থান নিরাপদ, কোন্ স্থান সাপদ্, তাহাও ভাল ঠিক করিতে পারিতেছি না। এ সময়ে কে শত্রু কে মিত্র, তাহাও ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। যে অশ্বারোহী সৈন্য দল আমাকে ভক্তি করিত, ভালবাসিত, তাহারা আজ অনুকূল কি প্রতিকূল, তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব? এখন সকলেই উন্মত্ত, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানহীন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা বীচার সাহেবের বাঙ্গলার বারান্দার থামের পাশে উপবেশন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার এক জন সহিস একটা ঘোড়া লইয়া দূরে আসিতেছে। এই সহিসের নাম ভবানী। আমি এদিকে বাঙ্গলার থামের আড়ালে আছি, আমি ভবানীকে বেশ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু ভবানী আমায় দেখিতে পায় নাই। এই সময় এই বাঙ্গলার কিছু দূর দিয়া প্রায় ত্রিশ জন অস্ত্রধারী সিপাহী যাইতেছিল। তাহারা একটা মহা কলরব উত্থাপিত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ পঞ্চমে গান ধরিয়াছে, কেহ ইংরেজকে কটু অশ্লীল ভাষায় গালি দিতেছে, কেহ আপনা-আপনি বকাবকি করিতেছে, কেহ 'আলি আলি' শব্দ করিয়া লাফাইয়া উঠিতেছে। কেহ নাচিতেছে, কেহ তাহার পার্শ্বস্থ সহচরকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে। কাহারও দুই হাতে দুইখানি তরবারী; কাহারও এক হাতে বন্দুক, এক হাতে ছোরা; কেহ বা একটি বর্শা লুফিতে লুফিতে চলিয়াছে। কাহারও হাতে আগুনের মশাল। সে এক পৈশাচিক সমর-রঙ্গ! কাহারও হি-হি-হি হাসি, কাহারও বিকট বদন-ব্যাদান, কাহারও ভীষণ দন্ত-কিড়িমিড়ি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, বুঝি শমন দূতগণ এবার সত্য সত্যই আমাদিগকে সংহার করিতে আসিতেছে। কাশী বলিল,—"দাদা! ঐ দেখুন, আসিতেছে। এবার আর রক্ষা নাই। এইবার উহারা বাঙ্গলায় আগুন দিবে, আর আমাদিগকে খুন করিবে।" আমি বলিলাম,—"তুমি এই থামের আড়ালেই লুকায়িত থাক, আমি সিপাহীদের অগ্রে সম্মুখীন হই। সিপাহীরা এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সিপাহীদের কাছে যাওয়াই ভাল।" কাশী আমার কাপড় ধরিয়া বলিল, "তাহা হইবে না, ঐ ভীষণ রাক্ষসদের সম্মুখে আপনাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।" এইরূপ

আমাদের কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় আমার সহিস এবং ঘোটকের উপর উক্ত সিপাহীগণের প্রথম দৃষ্টি পড়িল। ঘোড়া দেখিয়াই সিপাহীগণ একটা মহা হল্লা করিয়া ঘোড়া লুঠ করিবার জন্য ভবানীর দিকে দৌড়িল। ভবানী বিষম বলিষ্ঠ ব্যক্তি। সহজে সে ঘোড়া ছাড়িল না। দৃঢ় মুষ্টিতে ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া রহিল। ঘোড়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। ভবানী লাথির চোটে ২।৪ জন সিপাহীকে ধরাশায়ী করিল। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। ইচ্ছা হইল আমি এক লম্ফে সিপাহীদের নিকট উপস্থিত হই। কিন্তু এ দিকে ভায়া কাশীপ্রসাদ আমার কাপড় ধরিয়া আমাকে টানিয়া রাখিয়াছে। আমাকে কোনও কথা কহিতে দিতেছে না। কথা কহিলেই আমার মুখে হাত চাপা দিতেছে। কথার শব্দ পাইয়া পাছে সিপাহীগণ এদিকে আসিয়া পড়ে ইহাই কাশীপ্রসাদের ভয়। মুহূর্ত্তমধ্যে দেখিলাম, ভবানী যেন অচেতন অবস্থায় পথিপার্শ্বে পড়িয়া গেল, আর সিপাহীগণ আনন্দ উল্লাসে ঘোড়া লইয়া এক দিক্ পানে ছুটিল। তাহারা বীচার সাহেবের বাঙ্গলায় আর আগুন দিল না। বোধ হয়, ঘোড়া-প্রাপ্তির আনন্দে তাহারা আগুন দেওয়া কার্য্য ভুলিয়া গেল।

সিপাহীগণ চক্ষুর বাহির হইলে কাশী আমার কাপড় ছাড়িল। আমি তখন আস্তে আস্তে বাহির হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি ভবানী উঠিয়াছে। ক্রমে সে দাঁড়াইল। আমাকে দেখিতে পাইল। সে খুঁড়াইয়া খুঁড়াইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঘোড়া কাড়াকাড়ির যখন গোলযোগ হয়, ঘোড়াটা তখন একবার ভয়ঙ্কর লাফাইয়া উঠে। ঘোড়ার খুরে ভবানীর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী একেবারে ফাটিয়া গিয়া পা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ক্রমে আমি ভবানীর সহিত একত্রে মিলিত হইলাম। ভবানী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"বাবু! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সিপাহীরা ঘোড়া ছিনিয়া লইয়াছে।" আমি বলিলাম,—"ঐ থামের আড়াল হইতে সমস্তই আমি দেখিয়াছি।" ভবানীর কাটা পা দিয়া হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "বাসার খবর কি?" সে বলিল, "বাসায় পদাতি সিপাহীরা প্রবেশ করিয়াছে।"

আমি। আমার সে ভাল ঘোড়াটী কোথায়?

কাশী। সিন্দুকের টাকা-কড়ি কি হইল?

ভবানী। সিপাহীগণ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র আমি এই ঘোড়া লইয়া আপনার নিকট চলিয়া আসিতেছি। তথায় কি ঘটিয়াছে তাহা আমি

ঠিক জানি না। আমি রামদীন সহিসকে আপনার ভাল ঘোড়া আনিবার কথা বলিয়া আসিয়াছি।

দেখিতে দেখিতে রামদীন সহিস আসিয়া পৌঁছিল। সে বলিল, "বাবু, সিপাহীলোগ ঘরমে ঘুস্‌কর সিন্দুক তোড়কে সব রোপেয়া আওর সব আসবাব লুঠ লিয়া। আওর ঘরমে আগ লাগায় দিয়া। কুছ নেহি বাঁচা। পানি পিনেকো লোটাতক ভী নহি ছোড়া।" এই কথা বলিয়া সে আমার একটী ভাঙ্গা সেতার ও একটী বাঁয়া আমার হাতে দিতে আসিল। আমি বলিলাম, "এ দ্রব্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার ইচ্ছা হয় ত তুমি ইহা লইতে পার।"

দুই জন সহিসকে বিদায় দিলাম, বলিলাম, "তোমরা এক্ষণে যেখানে সুবিধা বুঝ সেইখানে গমন কর।" তাহারা অশ্রুপূর্ণ লোচনে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

আমি আবার সেই বাঙ্গলার থামের আড়ালে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—কোথা যাই? কি করি? মনোমধ্যে নানারূপ চিন্তা-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। মনে হইল, এক পক্ষে আমি পরম সৌভাগ্যবান। এ সময় যদি আমার পরিবারবর্গ বেরিলিতে থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের যে কি শোচনীয় পরিণাম হইত তাহা বলিতে পারি না। তাহারা তখন ৺কাশীধামে ছিল, তাই রক্ষা। ইহাকেই সৌভাগ্য বলি। এত দিন বহু কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, বিদ্রোহীরা তাহা লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের সাধের ঘোড়াটীও লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে দুঃখ করিলে কি হইবে। অদৃষ্টে থাকে, পুনরায় টাকা ও ঘোড়া পাইতে পারি, কিন্তু স্ত্রী-কন্যার একবার অপমান হইলে প্রতিশোধ লইবার আর উপায় নাই। তাই আমাকে সৌভাগ্যবান্ বলি।

বসিয়া বসিয়া সেই ব্রহ্মদেশীয় ঘোড়াটীর জন্য মন ক্রমশ বড়ই আকুল হইল। ইতিপূর্ব্বে রামদীনের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, পদাতি সিপাহীগণ আমার ঐ ঘোড়া লইয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, ঐ ঘোড়ার অন্বেষণে একবার পদাতি সৈন্যের সেনা-নিবাসে যাইলে হয় না? কালীপ্রসাদের এ বিষয়ে কষ্টে মত করিয়া দুজনেই পদাতি সেনা-নিবাসে গমন করিলাম। গিয়া দেখি, তথায় জন-মানব নাই। সিপাহীগণের ঘর জ্বলিতেছে। ঘোড়া অবশ্যই খুঁজিয়া পাইলাম না। শুষ্কমুখে প্রত্যাগমনকালে পল্টনের এক জন গুর্গার সহিত দেখা হইল। বিশ জন বা পঁচিশ জন সিপাহী লইয়া এক-এক জন বাসনমাজা ও ঘর

পরিষ্কারের চাকর থাকিত। সেই চাকরকে গুর্গা বলে। এই গুর্গা আমার কতকটা পরিচিত ছিল। সে তখন আপন জিনিষপত্র লইয়া দেশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি আমার সেই ভাল ঘোড়াটীর কোন খবর বলিতে পার কি?" সে বলিল, "তোমারা ঘোড়া সিপাহী-লোগ লুঠ লিয়া।"

আমি। তুম্‌নে দেখা, হামারা ঘোড়া কোন্ সিপাহী লে গেয়া হ্যায়?

গুর্গা একটু পরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "বাবুজি ভাগো, জান লেকে ভাগো! ঘোড়েকো কেয়া পুছতে হো! তোমারা ঘোড়া সুবেদার সাহেবকে সওয়ারীমে গিয়া হ্যায়।"

সর্ব্বস্বই গেল। এখন আছে কেবলমাত্র প্রাণ। সেই প্রাণ-রক্ষার উপায় করিতে হইবে। আমরা তখন দুই ভাই সেই জনশূন্য অথচ বিপদ্‌সঙ্কুল প্রান্তরে দাঁড়াইয়া প্রাণরক্ষার ভাবনা ভাবিতে লাগিলাম। তখনও গুলি চলা বন্ধ হয় নাই। থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে চারিদিকেই গুলি-বৃষ্টি হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে গুড়ুম-গুড়ুম শব্দে তোপের আওয়াজ হইতেছে। কোন্ দিক নিরাপদ্ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় কেবল ভাবিতেই লাগিলাম। শ্রীমান্ কাশীপ্রসাদ সঙ্গে ছিল বলিয়া আমার ভয়-ভাবনা দ্বিগুণিত হইল। আমি একা থাকিলে এরূপ চিন্তা-যুক্ত হইতাম না।

উনিশ

বেরিলির পদাতি সেনা নিবাস হইতে ধোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির এক মাইল দূরবর্ত্তী। নিজ বেরিলি সহর হইতে এই মন্দির পৌনে-দুই ক্রোশের কম নহে। হিন্দু সৈন্যদল প্রায়ই এই মহাদেবের পূজা দিতে যাইত। আমিও প্রতি সপ্তাহে না হউক, প্রতি পক্ষে একবার করিয়া বাবার মন্দিরের নিকট যাইয়া গরীব-দুঃখীকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতাম, প্রাণ ভরিয়া অনাদি অনন্ত শিবলিঙ্গের পূজা করিতাম, আর প্রত্যাগমনকালে প্রধান পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা দিয়া আসিতাম। ফল কথা, ধোপেশ্বর মহাদেব মন্দিরে আমার একটু পসার ছিল।

১৮৫৭ সাল ৩১শে মে, রবিবার বেলা প্রায় দুইটা ;—আমরা দুই ভাই সেই জনশূন্য মাঠ মধ্যে প্রাণরক্ষার মহা ভাবনায় নিমজ্জিত আছি, এমন সময় আমার মনে কেমন উদয় হইল,—ধোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গেলে হয় না ? সে স্থান অবশ্যই নিরাপদ্ হইবে।

ভাই কাশীকে বলিলাম,—"চল, আমরা দু জনে ধোপেশ্বর মহাদেব মন্দিরে যাই। সে দেবতার স্থানে আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই।

কাশী। সেখানে যে কোন ভয় নাই ইহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ? পাণ্ডারা যদি বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তবে উপায় ?

আমি একটু বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "দেখ ভাই ! এ সময় এত ভয় করিলে চলিবে কেন ? একটু সাহস অবলম্বন কর। এখানে ভয়, ওখানে ভয়—সব দিকেই যদি তোমার ভয়, তবে তুমি যাবেই বা কোথায় ? এই মাঠের মাঝে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে আরও ভয়, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ? আমার কথা শুন, ধোপেশ্বর মন্দিরে চল, সেই মহাদেবের মন্দিরই আমাদের পক্ষে নিরাপদ্ স্থান হইবে।"

শ্রীমান্ কাশীপ্রসাদ অগত্যা আমার কথায় স্বীকৃত হইল। তখন সর্ব্বস্বহীন দুই ভাই দ্রুতপদে অপথ কুপথ দিয়া ধোপেশ্বর মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইলাম। সোজা পথে না গিয়া বাঁকা পথ ধরিলাম। তখন সূর্য্যদেব প্রখর কিরণজালে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছিলেন। মাটী কুলকাঠের আগুনের ন্যায় বিষম উত্তপ্ত হইয়াছে। হাওয়া যেন আগুনের হল্কা। রৌদ্রের ঝাঁজে আমরা দুই ভাই অর্দ্ধ-দগ্ধ হইয়াছি। তখনও আমাদের বিরাম নাই;—ধোপেশ্বর মন্দিরাভিমুখে ছুটিতেছি। কিন্তু কাশীপ্রসাদের পা আর চলে না। তাহার দেহ যেন অবসন্ন হইতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাশী ! যদি বড়ই কষ্ট বোধ হয় ত বল, আমরা ঐ বৃহৎ নিমগাছের তলায় খানিক বিশ্রাম করিয়া লই।" কাশী বলিল,—"দাদা ! তবে তাহাই চলুন।" তখন উভয়ে আমরা নিম্ববৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইলাম। কাশীপ্রসাদ কাতর হইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার দেহ ঘর্ম্মময় হইয়া উঠিল। কাশী শুইয়া কেবল বলিতে লাগিল,—"দাদা ! তৃষ্ণায় প্রাণ যায়,—একটু জল আনিয়া দাও।"

এ দিকে ও দিকে চাহিয়া দেখিলাম জল কোথাও নাই,—জনশূন্য প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। আর এ সময় জল মিলিলেও, কাশীকে তাহা হঠাৎ খাইতে

দেওয়া উচিত নহে, কারণ, সর্দ্দিগর্ম্মি হইতে পারে। সুতরাং এ সময় আমি ভায়াকে কেবল মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। বলিলাম,—"একটু অপেক্ষা কর, জল দিতেছি। জলের ভাবনা কি ?"

আমরা যদি সোজা সাধারণ পথ দিয়া মন্দিরাভিমুখে আসিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ মন্দিরে পৌঁছিতাম। পাছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পথে দেখা হয়, পাছে গুলি-গোলা গায়ে লাগে, এই ভয়ে আমি উল্টা পথ ধরিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি যে স্থানে ছিলাম, তথা হইতে ধোপেশ্বর এক পোয়া পথের কিছু বেশী হইবে। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর কাশীর সেই ছট্‌ফটানি ভাব কতক ঘুচিল। তখন কাশীকে আমি বুঝাইয়া বলিলাম,—"ভাই! ধোপেশ্বর আর অধিক দূর নয়,—ধীরে ধীরে তথায় যাইতে পারিবে না কি ?"

কাশী। না। একটু জল খাইতে না পারিলে আমি উঠিতে পারিব না। দেখুন খুঁজিয়া এই মাঠে যদি কুয়া থাকে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম,—কূপ থাকিলেই বা জল তুলিব কিরূপে ? ঘটী কোথায় ? দড়ি বা কোথায় ? আমার যদি বাঙ্গালীর বেশ থাকিত—যদি ধুতি চাদর তখন পরিয়া থাকিতাম,—তাহা হইলে চাদর বা কাপড় ভিজাইয়া জল আনিতে পারিতাম। কিন্তু পরিধানে তখন ইজার চাপকান এবং মাথায় টুপি। হিন্দুস্থানীর বেশে তখন আমি সজ্জিত।

এদিকে ভায়া নাছোড়-বন্দ। কি করি, ভাবিতে ভাবিতে মাঠের মধ্যে কতক দূর অগ্রসর হইলাম। কূপ কোথায়ও দেখিলাম না। একবার স্থির করিলাম, ধোপেশ্বরে দৌড়িয়া গিযা, তথা হইতে জল আনিয়া ভায়াকে খাওযাই। আবার ভাবিলাম, কাশীকে একা রাখিয়া এতখানি পথ যাওযা আমার উচিত হয় না। মন বড়ই খারাপ হইল। যদি জল না লইয়া ভাযার কাছে যাই, তাহা হইলে ভায়া হয়ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। বড় বিষম বিপদে পড়িলাম।

এমন সময দূর হইতে দেখিলাম কাশীপ্রসাদ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। ভায়া তখন ছোট একটি নিমের ডাল ভাঙ্গিবার চেষ্টায আছে। ভায়াকে এ অবস্থায় দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। আমি তখন দৌড়িয়াই কাশীর নিকট গেলাম। কাশী বলিল,—"আমি বুঝিযাছি, জল এখানে পাওয়া যাইবে না; তাই ধীরে ধীরে উঠিযা একটী নিম-ডাল ভাঙ্গার উদ্‌যোগে আছি। ডালটী মাথায় দিয়া ধোপেশ্বর গেলে রোদে তত কষ্ট হইবে না।"

ভায়াকে আর কষ্ট করিতে হইল না। আমি তৎক্ষণাৎ এক টানে এক মোটা ডাল ভাঙ্গিলাম। তাহাই ভায়াকে ছত্ররূপে ধারণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বে ধোপেশ্বর মহাদেব মন্দিরে উপনীত হইলাম।

মন্দিরটী ক্ষুদ্র। মন্দির মধ্যে এক অনাদি অনন্ত শিবলিঙ্গ। মন্দিরের সম্মুখে এক পাথরে বাঁধানো পাথরের গজগিরি করা পুষ্করিণী। পুকুরের চারি ধারে প্রস্তরময় চাতাল। তাহার উপরে সন্ন্যাসী, অতিথি ও যাত্রিবর্গ বসিয়া থাকেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ অশ্বত্থ, আম্র এবং নিম্ব বৃক্ষে পূর্ণ। মন্দিরের নিকটস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। এত গ্রীষ্ম এবং প্রখর রৌদ্র সত্ত্বেও তিনি সম্মুখে আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। আমরা দুই ভাই তাঁহাকে প্রথমেই ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "বাবা, আপনার নিকট ঠাণ্ডা জল আছে কি?"

সন্ন্যাসী ঠিক এইভাবে উত্তর দিলেন, "বেটা! আজ সবই গরম, ঠাণ্ডা কোথা পাইবে?" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী হা হা রবে বিকটরূপে হাসিতে লাগিলেন। আমি কাতর হইয়া বলিলাম,—"ঠাকুর! পিপাসায় আমার এই ভ্রাতার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, যদি একটু ভাল ঠাণ্ডা জল থাকে, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক দিন।"

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) কেবল পিপাসায় কখনও প্রাণবায়ু বহির্গত হয় না। আত্মার যখন দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হয় তখন বিনা পিপাসাতেও তাহা ঘটিয়া থাকে। এই ভোগ-দেহের মুক্তি হইলেই ত মঙ্গল। কিন্তু সে শুভদিন সহজে আসে কৈ?

সন্ন্যাসী এই ভাবের অনেক কথা কহিলেন, অনেক সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ বলিলেন, শেষে ভায়ার গায়ে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমিই কি তৃষ্ণাতুর হইয়াছ?" কাশীপ্রসাদ বিনয়-নম্র বচনে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

সন্ন্যাসী তখন তাঁহার কমণ্ডলু উত্তোলন করিয়া কাশীকে কহিলেন,— "হাঁ কর।" কাশী মুখব্যাদান করিল। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে সযত্নে সেই কমণ্ডলুস্থ পবিত্র পানীয় জল কাশীর মুখে ঢালিতে লাগিলেন। খানিক খাইয়া, হস্ত নাড়িয়া কাশী বুঝাইয়া দিল,—"আর না,—আর জল খাইব না।" জলপান শেষ হইলে কাশী বলিল,—"এমন সুস্বাদু শীতল জল ত আমি ইহজীবনে আর কখনও পান করি নাই। এ জলে বোধ হয় সুধা ঢালা

আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, এই এক কমণ্ডলু জলে আমার বোধ হয় কুলাইবে না; কিন্তু কয়েকবার এই জল উদরস্থ হইলে মনে হইল, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি সমস্তই দুর হইয়াছে।" আমারও কিঞ্চিৎ জলতৃষ্ণা পাইয়াছিল। কাশীর কথায় সন্ন্যাসীর সেই কমণ্ডলুস্থ জল পান করিতে ইচ্ছা হইল। সন্ন্যাসী হাসিয়া আমার মুখেও আবার জল ঢালিতে লাগিলেন। পানকার্য্য শেষ হইলে আমার শরীর যেন রোমাঞ্চিত হইল। প্রকৃতই এমন মিঠা পানি আমি কখনও খাই নাই।

আমি তখন যোড়হাতে সন্ন্যাসীকে বলিলাম, "বাবা! আমরা বড় বিষম বিপদে পড়িয়াছি। আমাদের প্রাণরক্ষার উপায় কিছু বলিয়া দিতে পারেন কি?"

সন্ন্যাসী। এ সংসারে বিপদ্‌ও নাই, রক্ষাও নাই।

আমি। বাবা! আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি; এক্ষণে প্রাণ লইয়া টানা-টানি। এখন কোথায় যাইব, কি করিব—আপনি বলিয়া দিউন।

সন্ন্যাসী। যেখানে যাইবার সেইখানেই যাইতে হইবে। যাহা করিবার তাহাই করিতে হইবে। আত্মা—প্রাণ কাহারও আয়ত্তাধীন নহে; আগুনে ইহা দগ্ধ হয় না, তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা ইহা দ্বিখণ্ডিত হয় না; শত কামান দাগিলেও ইহার এক কোণ ক্ষয় না। তবে এত ভয় কেন?

এই কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী এক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

আমি বেগতিক বুঝিয়া সন্ন্যাসীকে অন্য এক কথা জিজ্ঞাসিলাম,—"ঠাকুর! এই যে ইংরেজগণ পলাইয়াছেন, আর সিপাহীগণ দেশ অধিকার করিয়াছেন, ইহার ভবিষ্যৎ ফল কি হইবে, আপনি আমাকে বলুন।"

সন্ন্যাসী। বেটা। মন্দিরে গিয়া বিশ্রাম কর গে। আমাকে আর বিরক্ত করিও না।

আমি। এ কথা না বলিলে আমি আপনার পদপ্রান্ত ছাড়িব না।

সন্ন্যাসীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িতে লাগিল। তিনি যেন কোপান্বিত হইয়াই আমাকে বলিলেন,—"মূর্খ! কেশরী পলাইবে, আর কুকুর শৃগালে রাজত্ব করিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়? যাও—যাও মন্দিরে গিয়া ভগবানের সেবা কর।"

আমরা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বিশ

বহুৎ দূর অগ্রসর হইয়াছি,—অমনি পথেই পাণ্ডা বা প্রধান পুরোহিতের সহিত দেখা হইল। পাণ্ডার নামটী ভুলিয়া গিয়াছি। তাঁহার বয়স ৬০ বৎসরের কম নহে। গৌরাঙ্গ। গলদেশ রুদ্রাক্ষ মালায মণ্ডিত। হাস্য-বদন। আমাকে দেখিয়াই পাণ্ডা কহিলেন, "বাবু সাহেব! আপনি পাগল সন্ন্যাসীর সহিত কি তর্ক করিতেছিলেন?" আমি বলিলাম, "সন্ন্যাসী ত পাগল নহে, দিব্য জ্ঞানী পুরুষ বলিযা বোধ হইল। সে যাহা হউক,—আমরা বড় বিপদে পড়িযাছি। আমবা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি,—আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।"

পাণ্ডা। সিপাহীগণ কি আপনারও ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি লুঠ করিয়াছে?

আমি। লোহার সিন্দুকে প্রায় চৌদ্দ-পনের হাজার টাকা নগদ মজুত ছিল, তাহা লইযাছে; সহিসদিগকে মারিয়া ধরিয়া আমার সমস্ত ঘোড়া কাড়িয়া লইযাছে; জল-খাবার একটী ঘটী পর্য্যন্ত তাহারা আমার বাটীতে রাখিয়া যায় নাই। শেষে ঘরে আগুন লাগাইয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলিয়াছে।

পাণ্ডা। সিপাহীগণ ত বড়ই বেইমান! আপনি উহাদিগকে কত ভাল-বাসিতেন, কত আব্দার সহিতেন, বিবাহে শ্রাদ্ধে গৃহনির্ম্মাণে আপনি উহা-দিগকে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতেন,—কিন্তু তাহারা আপনাকে আজ তাহার সমুচিত প্রতিফল দিল।

আমি। গত-কর্ম্মের জন্য শোক করা বৃথা। সকলি অদৃষ্টমূলক। এক্ষণে আমাদের প্রাণরক্ষার আপনি উপায় বলিযা দিউন।

পাণ্ডা। কেন, সিপাহীগণ আপনাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টায় আছে না কি?

আমি। কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। সিপাহীদের চরিত্র গতি-মতি প্রবৃত্তি এক্ষণে উত্তমরূপ উপলব্ধি হইবার নহে। তাহাদের পৈশাচিক রাক্ষসী মূর্ত্তি দেখিলে এখন আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

পাণ্ডা। সিপাহীদের এখন কে কর্ত্তা হইয়াছেন জানেন কি?

আমি। না।

পাণ্ডা। অদ্য যে মহামারী উপস্থিত হইবে, তাহা আপনি পূর্ব্বে জানিতেন না কি?

আমি। না। আমি যদি কিছু পূর্ব্বে সংবাদ পাইতাম, তাহা হইলে আমার ভাবনা কি ছিল ?

পাণ্ডা। শুনিতেছি, ইংরেজের খাজনাখানা প্রভৃতি সমস্তই লুণ্ঠিত হইয়াছে। অনেক গৃহ দগ্ধ হইয়াছে। খাঁ বাহাদুর খাঁ নবাব হইবার চেষ্টায় আছেন। আমি এ সকল বিষয়ের প্রকৃত সংবাদ আনিবার জন্য দুই জন চর সহরে পাঠাইয়াছি। তাহারা ফিরিয়া আসিলে গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিব।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে মন্দিরের অভ্যন্তরে উপনীত হইলাম। শিবলিঙ্গকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলাম, "বাবা গো, রক্ষা কর।" পাণ্ডা বিল্বপত্র আমার রুমালে বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই। এখন আমার বাটীতে আসুন, বিশ্রাম করুন এবং কিছু আহারাদি করুন।"

আমরা উভয়ে পাণ্ডার সহিত তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা একখানি লুই পাতিয়া দিতেন, তাহাতে আমরা বসিলাম। অদূরস্থ বাগানে কলাগাছ ছিল। কলার ডাঁটায় পাণ্ডাজী আমার হুঁকা তৈয়ার করিয়া দিলেন। পাণ্ডার এক জন চেলা তামাক সাজিল। পরম সুখে আমি ধূমপান করিতে লাগিলাম। আমার তামাক খাওয়া শেষ হইলে কাশীকে তাহা রাখিতে দিলাম। কাশী অন্তরালে গিয়া তামাক খাইয়া আসিল। তখন বাতাসা আমাদের জল-খাবার হইল। পাণ্ডাজী মিঠাইয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লুঠপাটের ভয়ে দোকান-পাট তখন সমস্তই বন্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডার গৃহস্থিত বাতাসাই তখন জল-খাবারের একমাত্র সম্বল হইল। সেই এক এক-খানি বাতাসার দাম এক এক টাকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্ষুৎপিপাসা শ্রম দূরীভূত হইল। কাশী সেই লুইয়ের উপর শুইয়া পড়িল। আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলাম। কাশীর নিদ্রাকর্ষণ হইল ; ক্রমশঃ সে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। আমার স্বভাব চিরদিনই চঞ্চল। ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। স্বয়ং স্বহস্তে তামাক সাজিয়া আবার খাইলাম। বেলা বোধ হয় তখন চারিটা বাজিয়া থাকিবে। রৌদ্রের তেজ তখনও বিলক্ষণ আছে, তবে কতকটা যেন নরম পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আমি পাণ্ডাজীর কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া নিকটস্থ আম্রকাননে ভ্রমণচ্ছলে প্রবেশ করিলাম। খানিক এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলাম। দুই-একটী ছোট আম পাড়িলাম। একটা বড় আম গাছের শীর্ষদেশে কয়েকটী অপেক্ষাকৃত একটু বড় বড় আম ঝুলিতেছে দেখিলাম। ঢিল মারিলাম, কিন্তু সে বড় আম

পড়িল না। তখন আমার বালক বয়স, গাছে উঠিয়া আম পাড়িবার সাধ হইল। গাছে উঠিলাম, আমের নিকট গেলাম। অনেক দুর আমার দৃষ্টিপথে পড়িল। বেরিলির সেনা-নিবাসের মাঠ, বাট, বাজার—সমস্তই দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তখনও ইংরেজগণের গৃহ সমস্ত দগ্ধ হইতেছে। আম কয়েকটা পাড়িয়া পকেটে লইলাম। নামিবার সময় আর একবার চারি দিক্ দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম পাঁচ জন অশ্বারোহী সৈন্য প্রবল বেগে ধোপেশ্বর মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির হইল। আমার মনে হইল নিশ্চয়ই ইহারা আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিলাম। দৌড়িয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। পাণ্ডাকে ডাকিলাম। ভায়াকে উঠাইলাম। বলিলাম,—"বিপদ্ নিকটবর্ত্তী। পাঁচ জন সওয়ার বেগে এদিকে আসিতেছে। আমাদিগকে ধৃত করাই নিশ্চয়ই ইহাদের উদ্দেশ্য বোধ হইতেছে। পাণ্ডাজী, এখন কি উপায় বল ?" দেখিলাম, পাণ্ডা একটু ভীত হইয়াছেন। তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন,— "তাই তো, এখানে লুকাইয়া থাকিবার স্থান দেখি না। আপনি এক কর্ম্ম করুন। এক ক্রোশ দূরে একখানি গ্রাম আছে ; আপনারা ঐ পশ্চাতের পথ দিয়া শীঘ্র ঐ গ্রামে চলিয়া যাউন। সে গ্রামে হিন্দু এবং ব্রাহ্মণের বসতি আছে। সেখানে গেলে আপনারা নিরাপদে থাকিতে পারিবেন।" আমি বলিলাম,—"সে কর্ম্ম আমার নয। বার বার পলাইতে আমি অক্ষম। কোন্ দুঃখে পলাইব ? আমাদেরই রেসেলার সওয়ার আসিতেছে। তাহারা আসিয়াই কিছু আমাদের মাথাটা কাটিয়া লইবে না। তাহাদের সহিত এখন একবার সাক্ষাৎ করা একান্ত উচিত হইয়াছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় ঐ পাঁচ জন সওয়ারের অশ্বখুর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। আমি কাশীকে বলিলাম,—"ভাই ! তুমি এইখানে ব'স। আমি অগ্রে গিয়া দেখি উহারা কি করে।" কাশীপ্রসাদ চীৎকার করিয়া বলিল,—"দাদা ! তাহা হইবে না, তোমার কিছুতেই যাওয়া হইবে না।" আমি এবার কাশীকে ধমক দিলাম, বলিলাম,—"ভয় নাই, তুমি চুপ করিয়া থাক ; খবরদার তুমি আর আমায় পেছু ডাকিও না।" কাশী কাঁদিতে লাগিল। আমি লম্ফ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। পাণ্ডাজী আমার ভ্রাতার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি এক বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেই বৃক্ষের প্রায় দুই রশি দূরে সেই পূর্ব্ব-পরিচিত সন্ন্যাসী ধূনী

জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। আমি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু সন্ন্যাসী আমায় দেখিতে পাইতেছেন না। এমন সময় অশ্বারোহী দল সেই সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপনীত হইল। সেই পাঁচ জন অশ্বারোহীর মধ্যে চারি জন সওয়ার, এক জন দফাদার; এই পাঁচ জনই আমার সুপরিচিত। পাঁচ জনই আমার ভক্ত। এই পাঁচ জনই আমার নিকট ঋণগ্রস্ত। কিন্তু তখন ইহাদের সে সৌম্য সাধু মূর্ত্তি নাই। ইহারা কেমন এক রণোন্মত্ত রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। দফাদার অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াই সন্ন্যাসীকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ক্যারে ফকির! তুম্‌নে রেসালেকে বাবুকো ইধার যাতে দেখা?"

ফকির হাসিয়া উঠিলেন। দফাদার অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—"কেয়া হাঁসতা হ্যায় রে, কুছ হাঁসি মোকরর কিয়া? ঠিক ঠিক বাতাও, নেহি তো—"

সন্ন্যাসী আরও উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"নেহি তো ক্যা হোগা বাবা, জান্‌সে মার ডালোগে? মার ডালোগে তো বহুৎ আচ্ছা হোগা। ইস্ দুনিয়াকে জঞ্জালসে ছুট যাযেঙ্গে! লেকিন বাবা, তোম্ হাম্‌কো নেহি মার সেকোগে! কেঁও কি তোমারে তলওয়ারমে এতনি জোর আভি নেহি হ্যায়।" এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী পূর্ব্বমত হাসিতে লাগিলেন। তখন দফাদার ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া চক্রবৎ ঘূর্ণিত চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া কটিবন্ধে বিলম্বিত অসিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে চক্ষুর পলক না পড়িতে পড়িতে সেই তীক্ষ্ণধার তরবারি চর্ম্মাবরণ হইতে নিষ্কাশিত হইযা দফাদারের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল। তাহার উপর সূর্য্যালোক পতিত হওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে তাহা যেন বিদ্যুদ্‌বৎ চমকাইতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর তখনও কিন্তু হাসি ফুরায় নাই। দফাদার সেই হাস্যমুখ সন্ন্যাসীকে রূঢ় স্বরে কহিল,—"কেও, তলওয়ারমে জোর হ্যায় কি নেহি দেখলাওঁযে? ফের হাম তোমকো পুছতে হেঁ ঠিক ঠিক বাতলাও—কি, বাবুকো দেখা হ্যায় কি নেহি,—নেহিতো, টুক্‌ড়ে টুক্‌ড়ে কর ডালুঙ্গা।"

এই কথা বলিতে বলিতে দফাদার সন্ন্যাসীর উপর যেন তরবারি আঘাতের উদ্‌যোগ আরম্ভ করিল।

আমি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার ভয় হইল, বুঝি বা আমার জন্য এখনই সন্ন্যাসী হত্যা হয়।

আমি ধীর পাদবিক্ষেপে দফাদারের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন উভয়ের মধ্যে প্রায় বিশ হাত ব্যবধান আছে, তখন আমি দফাদারকে সম্বোধন করিয়া তাহার নাম ধরিয়া বলিলাম, "কি, রেসালাকা বাবু ইয়ে মৌজুদ হায়। ফকির কো কেঁও সাতাতে হো? আগর শির কাটনেকো আয়ে হো তো হামারা শির মৌজুদ হায়।" এই কথা বলিয়া আমি দফাদারের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দফাদার আমাকে দেখিয়াই সেলামপূর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। আমিও তাহাকে সেলাম করিলাম। অবশিষ্ট সওয়ার চারি জন, সেলাম করিয়া ঘোড়া হইতে নামিল। আমিও তাহাদিগকে সেলাম করিলাম। দফাদার বলিল,—"বাবু সাহেব! আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? এই তরবারি আপনার পদপ্রান্তে রাখিলাম। ইচ্ছা হয় আপনি আমার শির কাটিতে পারেন।" এই বলিয়া সে ঘাড় নোয়াইয়া দিল।

আমি। তোমার কথায় আমি অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হইলাম। তোমার তরবারি তুমিই লও।

এই বলিয়া সেই তরবারিখানি লইয়া দফাদারকে দিলাম। দফাদার তাহা লইয়া আপন অসি-আবরণ মধ্যে রাখিয়া দিল।

একুশ

এক অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় সেই পাথর-বাঁধানো পুকুরের চাতালের উপর আমি উপবেশন করিলাম। দফাদার আমার পাশে বসিল, এক জন সওয়ার আমাদের অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। বাকি তিন জন সওয়ার নিকটস্থ কয়-একটা আম গাছে ঐ ঘোড়া পাঁচটী বাঁধিয়া তাহার হেপাজাতে নিযুক্ত রহিল।

পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া দফাদারের সহিত আমার অনেকরূপ কথাবার্ত্তা হইল। আমি এইভাবে তাহাকে প্রথমত প্রশ্ন করিলাম,—"তোমরা আমাকে এরূপভাবে অন্বেষণ করিতেছ কেন? আমি যে এ পথে আসিয়াছি, তাহাই বা জানিলে কিরূপে? তোমরা কাহার হুকুমেই বা এখানে আমার নিকট আসিয়াছ? এরূপ রণসাজে সজ্জিত হইয়া এই দেবতার স্থানে আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি?"

দফাদার ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল,—"তোপখানার মেজার বথ্‌ত খাঁকে আপনি অবশ্যই চেনেন; তিনি সকল অপেক্ষা বয়সে বড়, উচ্চপদস্থ সর্ব্বপুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়া, তাঁহাকেই আমাদের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছি। তিনিই এক্ষণে আমাদের কর্ত্তা বা রাজার স্বরূপ হইয়াছেন। আমাদের রেজিমেণ্টের রেসালাদার মেজার মহম্মদ সফীও এখন তাঁহার অধীনস্থ। অদ্য তাঁহার নিকট প্রায় দশ লক্ষ টাকা মজুদ হইয়াছে। সেই টাকা হইতে কিছু কিছু ব্যয়ও আরম্ভ হইয়াছে। টাকার হিসাবপত্র রাখিবার জন্য এক জন উপযুক্ত লোকের আবশ্যক। হিসাবপত্র রাখা বিষয়ে আপনার চিরদিনই তিনি সুখ্যাতি শুনিয়া আসিয়াছেন। তাই বথ্‌ত খাঁ আপনাকে তলব করিয়াছেন। আজ বেরিলি সহরে নানা স্থানে আমাদের গুপ্ত চর নিযুক্ত আছে। তাহাদের দ্বারাই সংবাদ পাইযাছি যে, আপনি এখানে আশ্রয় লইয়াছেন।"

আমি। তোমাদের নূতন সেনাপতি আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করিবার কথা বলিতেছেন, সে কাজ আমার দ্বারা কিছুতেই হওয়া সম্ভব নহে। আমি কেবলমাত্র ইংরেজী জানি। সুতরাং ইংরেজীতে হিসাবপত্র রাখিলে বথ্‌ত খাঁ বুঝিবেন কিরূপে? অতএব আমাকে বথ্‌ত খাঁর নিকট লইয়া যাইয়া তোমার কোন ফল নাই।

দফাদার। বাবু সাহেব! আপনি ক্ষমা করিবেন। আমার প্রতি হুকুম হইয়াছে, আপনাকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহার নিকট হাজির করা। আপনি সে কাজ করিতে সক্ষম কি অক্ষম, তাহার জবাব আমাদের সেনাপতির নিকটই দিবেন। বাবু সাহেব! আপনার কোনও ভয় নাই, চলুন আমার সঙ্গে।

এই কথা শুনিয়া আমি মনে মনে বুঝিলাম, যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে আমার উপর গ্রেপ্তারেরই হুকুম নিশ্চয় হইয়া থাকিবে। যদি আমি সহজে না যাই, তবে উহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। দফাদার মুখে ভদ্রতা দেখাইতেছে বটে, কিন্তু আসল কাজে ঠিক আছে। উহার সহিত বিবাদ বা মারামারি না করিয়া বথ্‌ত খাঁর নিকট যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এরূপ ভাবিয়া আমি দফাদারকে বিশেষ আপ্যায়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম, "তুমি যখন বলিতেছ কোন ভয় নাই, তখন আমি অবশ্যই আর কাহাকেও ভয় করি না। তবে এক কথা এই, বথ্‌ত খাঁর সমীপে উপস্থিত

হইবার পূর্ব্বে আমাকে একবার আমাদের রেসেলাদাঁর মেজার মহম্মদ সফীর সহিত দেখা করাইয়া দিইও।

দফাদার বলিল, সে কোন্ আশ্চর্য্য কথা! আপনি যাহা বলিবেন, সাধ্য থাকিলে এ গোলাম তাহাই করিতে প্রস্তুত আছে।

আমি। আচ্ছা, এক কথা জিজ্ঞাসা এই, তোমরা সকলে বর্ত্তমান থাকিতে আমার ঘর-বাড়ী ওরূপভাবে লুণ্ঠিত হইল কেন?

দফাদার। এ বিষযে আমাদের কোন দোষ নাই। আমরা এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানি না। যথন আমরা ইংরেজগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য আম্রকাননে যাই, সেই সময়ে কযেক জন বদমাইস পদাতি সৈন্য একত্র হইয়া আপনার বাড়ী লুঠ করে ও জ্বালাইয়া দেয। মহম্মদ সফী ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। বখ্ত খাঁর কানেও এ কথা উঠিয়াছে। কোন্ কোন্ সিপাহী আপনার ঘর-বাড়ী লুঠ করিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

আমি। আমার সেই ভাল ঘোড়াটী কোথায় জান?

দফাদার। সুবেদার মেজার বখ্ত খাঁর আস্তাবলে তাহা আছে। আপনি চাহিলে বখ্ত খাঁ অবশ্যই আপনাকে ঘোড়া ফেরত দিবেন।

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময ভ্রাতা কালীপ্রসাদ এবং পাণ্ডাজী আমাদের নিকট উপস্থিত হইল।

কালীপ্রসাদ ম্লানমুখে বাঙ্গালা ভাষায় আমাকে বলিল, "দাদা! তবে কি আমরা বন্দী হইলাম?" আমি হাসিয়া বলিলাম "না, বন্দী কেন হইবে? তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার সঙ্গে আইস।" কালী উত্তর করিল,—"আমি আপনা ছাড়া আর কবে আছি? কিন্তু দাদা! আপনি আমার একটী কথা রাখিবেন, বিদ্রোহীদের অধীনে কথনই চাকরি স্বীকার করিবেন না।" কালীর কথা শুনিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। কথাবার্ত্তায় প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইল। আমি ভাবে বুঝিলাম, দফাদার যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। বলিলাম, "আর এথানে বিলম্বের প্রয়োজন কি? চল আমরা যাই।"

দফাদার একটু বিব্রত হইল। আমরা চলিয়া যাইব, আর তাহারা পাঁচ জনে অশ্বারোহণে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, দফাদারের চক্ষে ইহা বড়ই বিষম দেখাইল। কিন্তু উপায নাই, আমাদের জন্য আর দুইটী বেশী ঘোড়া আর কোথায় মিলিবে? তাই দফাদার ভদ্রতা করিয়া বলিল, "বাবু সাহেব! আপনারা দুই জনে এই দুইটী ঘোড়ায় চড়ুন, আমরা দুই জনে হাঁটিয়া

যাইতেছি।” আমি বলিলাম,—“তাহা কখনই হইতে পারে না। তোমরা ঘোটকারোহণে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস, আমরা অগ্রে অগ্রে যাইতেছি। বিশেষ কথা এই যে, আমরা যদি অশ্বারোহণে যাই, আর তোমরা দুই জনে যদি পদব্রজে চলিয়া যাও, আর এই কথা যদি তোমাদের নূতন মনিব বখ্‌ত খাঁর কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তিনি বিরক্ত হইতে পারেন।”

দফাদার উত্তর দিল,—“সে যাহাই হউক, আপনি মাটিতে পা দিয়া চলিয়া যাইবেন, আর আমরা ঘোড়ার উপর যাইব—এ বিষম দৃশ্য আমি কখনই দেখিতে পারিব না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“দফাদার সাহেব! তোমার কথায় বড়ই অনু-গৃহীত হইলাম। কিন্তু আমি কিছুতেই অশ্বে আরোহণ করিতেছি না। ইহাতে ভবিষ্যতে তোমার বিপদ্ ঘটিতে পারে।”

দফাদার আর কোন কথা কহিল না, নীরব হইয়া রহিল।

আমরা দুই ভাই আগে আগে পদব্রজে চলিলাম। দফাদার এবং চারি জন অশ্বারোহী ধীর কদমে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

বাইশ

সর্ব্বপ্রথমে আমরা রেসালাদার মেজার মহম্মদ সফী্র নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত চেয়ারে বসাইলেন। এ কথা ও কথার পর, তিনি বলিলেন,—“আপনারা আমার কাছে না আসিয়া হঠাৎ পলাইলেন কেন?”

আমি। আপনার নিকট আসিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু কি করি, উপায় ছিল না। চারি দিকেই তখন গুলি-গোলা বৃষ্টি হইতেছে, বদমাইসগণ লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। আপনি তখন কোথায়,—অনুসন্ধানে তাহাও জানিতে পারি নাই। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া ধোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরাভিমুখে চলিয়া আসিলাম।

মহম্মদ সফী। বাবু সাহেব! আপনার অবস্থা আমি সমস্তই শুনিয়াছি। কে আপনার বাড়ী-ঘর লুঠ করিল তাহার অনুসন্ধান হইতেছে। কিন্তু কেহই কবুল যাইতেছে না। যাহা হউক, আগামী কল্য আরও এ বিষয়ের বিশেষ

অনুসন্ধান করাইব। এক্ষণে আপনি আমার সহিত একবার বখ্‌ত খাঁর নিকটে চলুন। কোন বিশেষ কথা আছে, সেইখানেই সে কথা শুনিবেন।

বিশেষ কথাটা কি, তাহা অবশ্যই আমি মনে মনে বুঝিলাম। কিন্তু মহম্মদ সফীর সাক্ষাতে সে কথা ভাঙ্গিলাম না। বিদ্রোহীদের অধীনে চাকরী লইব, কি লইব না, এ বিষয়ের কোন উচ্চ-বাচ্য না করিয়াই মহম্মদ সফীকে বলিলাম,—"এটী আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আমি বখ্‌ত খাঁর নিকটে কিছুতেই যাইব না, আপনি আমাকে মারুন কাটুন, কয়েদ করুন, তাহাতে রাজী আছি, কিন্তু বখ্‌ত খাঁর সমীপবর্ত্তী হইতে কিছুতেই রাজি নহি।"

মহম্মদ সফী। কেন, কেন ?

আমি। বখ্‌ত খাঁকে আপনি কি চেনেন না? সে লোকটা বড়ই গোঁয়ার, দাম্ভিক এবং আত্মসুখপরায়ণ। কি হিসাবে যে আপনারা তাঁহাকে আজ প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিনের কথা কি মনে নাই ? আমাদের রেসালায় তয়ফার নাচ হইতেছে; বখ্‌ত খাঁরও নিমন্ত্রণ ছিল, তিনি আসিয়াছিলেন; কিন্তু ভিড়ে ঢুকিতে একটু কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তিনি চলিয়া যান। আমি এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পথে আটকাইলাম। কত অনুনয়-বিনয় করিলাম, শেষে দুইটা হাতে ধরিলাম, তথাচ তিনি ফিরিলেন না। শেষে আপনিও ত তাঁহাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন কৈ ? আমার বিশ্বাস,—বখ্‌ত খাঁ লোক ভাল নহে। গরজ পড়িলে হয়ত মুখে আপ্যায়িত বেশ করিবেন, কিন্তু অন্য সময় একেবারে যেন পাষাণের ন্যায় কঠিন হৃদয়। আপনারা তাঁহাকে সেনাপতি করিয়াছেন করুন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই,—কিন্তু ভবিষ্যতে উঁহার সহিত আপনাদের কিরূপ বনিবনাও হইবে, কেবল তাহাই আমি ভাবিতেছি।

মহম্মদ সফী এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খানিক নীরব রহিলেন। শেষে গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে; আমরা দৃঢ় কঠোর প্রতিজ্ঞাসূত্রে বিষম আবদ্ধ আছি। প্রাণান্ত হইলেও সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না। অতএব আমাকে এ সময় কোন কথা বলা আপনার বৃথা।"

আমি। বৃথা, তাহা আমি জানি। কিন্তু মন বুঝে নাই বলিয়াই এ কথা বলিলাম।

মহম্মদ সফী। দেখুন, বাবু সাহেব! আমি সাহেবদের সহিত মিলিত *হইবার জন্য প্রায় এক ক্রোশ পথ ছুটিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সাহেবেরা* একবারও আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। দৈব-বিড়ম্বনা অবশ্যই বলিতে হইবে। কাজেই শেষে আমি বখ্‌ত খাঁর সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে আপনি একবার আমার সহিত বখ্‌ত খাঁর নিকটে চলুন। আপনার কোন ভয় নাই। আমি জীবিত থাকিতে আপনার কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। বাবু সাহেব! আপনি জানেন, সামরিক-বিভাগের নিয়ম হইতেছে, কর্ত্তব্য পালন। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন,—আমার সঙ্গে বখ্‌ত খাঁর নিকটে চলুন। আপনার তথায় ভালই হইবে, মন্দ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। মন্দই যদি ঘটে, তবে এইমাত্র বলিতে পারি, আগে আমার প্রাণ যাইবে, তৎপরে আপনার প্রাণ যাইবে।

আমি আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া, মহম্মদ সফীর সহিত ধীরে ধীরে পদব্রজে বখ্‌ত খাঁর দরবারে চলিলাম। উপনীত হইয়া দেখিলাম, বখ্‌ত খাঁ মহা-সমারোহে এক মঞ্চোপরি বসিয়া আছেন। কয়েক জন সৈনিক পুরুষ তরবারের খাপ খুলিয়া পাহারা দিতেছে। আতর গোলাপের গন্ধে মজলিস ভুর ভুর করিতেছে। বখ্‌ত খাঁ স্বয়ং সুবর্ণ-খচিত এক লাল পোষাক পরিধান করিয়াছেন। বখ্‌ত খাঁর বয়স ৬৫ বৎসরের কম নহে। কিন্তু তখনও শরীরে সামর্থ্য বিলক্ষণ আছে। চুল আধ-পাকা, বেশ দোহারা মোটা জুয়ান। শরীর খর্ব্বও নয়, দীর্ঘও নয়। দাড়ি বিলম্বিত, চক্ষুর্দ্বয় তেজোব্যঞ্জক। কিন্তু মুখে যেন দারুণ দুষ্টামির ভাব কেহ মাখাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের আগমন মাত্র বখ্‌ত খাঁ আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া নিকটে বসাইলেন। এক জন যোদ্ধৃপুরুষ আসিয়া পান দিল, আতর দিল, গোলাপ জল ছড়াইল। বখ্‌ত খাঁ প্রথমত আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বাবু সাহেব! আপনার ত কোন কষ্ট হয় নাই?" আমি অম্লান বদনে উত্তর দিলাম,—"না।"

বখ্‌ত খাঁ। আপনার যখন যাহা অভাব হইবে, তাহা আমাকে জানাই-বেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিব। আর এই রাজত্ব এখন আমা-দেরই হইয়াছে। দিল্লীর বাদশাহকে পুনরায় আমরা দিল্লীতে স্থাপন করিব এবং আমাকে বাদসাহের অধীনে এক প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিব স্থির করিয়াছি। আপনি যে বিশেষ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি তাহা আমি অবগত আছি। আপনি জানেন, আপনাকে অনেক দিন হইতেই আমি বড় ভালবাসি।

আমি। আপনার ভালবাসা থাকিলে আমার চিরদিনই মঙ্গল হইবে।

বখ্‌ত খাঁ। দেখুন, ইংরেজ-লোক পলাইয়াছে। সম্ভবত পথে অনাহারে তাহারা প্রাণে মরিবে। আর, যে সকল ইংরেজ সহরে ছিল তাহারা সকলেই হত হইয়াছে। সুতরাং এ রাজত্ব এখন সম্পূর্ণ আমাদেরই আয়ত্তাধীন। ইংরেজ অধিকৃত প্রায় দশ লক্ষ টাকা আমার হস্তগত হইয়াছে। আরও নানা স্থান হইতে টাকা ও লোক-লস্কর আসিয়া আমার নিকট পৌছিতেছে। প্রত্যহ প্রায় দশ হাজার লোকের আহার ব্যয় আমাকে যোগাইতে হইবে। ঘি, আটা, ছোলা, ছাতু—এই সকল প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে। গোলা-গুলি বারুদও তৈয়ারী করিতে হইবে। যাহাতে সুচারু-মতে এই সকল কার্য্য চলে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার আপনাকে লইতে হইবে। টাকাকড়ির আমদানি রপ্তানী এবং হিসাব-পত্র এ সকলও আপনি পরিদর্শন করিবেন। আমরা দুই সপ্তাহ-কাল এখানে থাকিয়া আট-দশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, এ স্থান হইতে দিল্লী প্রস্থান করিব। আগামী কল্য মোরাদাবাদ, সাজেহানপুর ও পিলিভিত হইতে খাজনা আসিবে, তাহাতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা হইবে। টাকার হিসাব-পত্রও রসদ-সংগ্রহ লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইয়াছি। আপনি আমার সহায় হউন।

আমি। এক্ষণে আমি শারীরিক অসুস্থ আছি, সুতরাং আমাদ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। বিশেষতঃ আমি ইংরেজী ভিন্ন আর কোন ভাষা জানি না, ইংরেজীতে হিসাব-পত্র রাখিলে আপনারা বুঝিবেন কিরূপে?

আমি যে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা বলিলাম, তাহা বখত খাঁ বুঝিতে পারিল। তখন তাহার চক্ষুর্দ্বয় লাল হইয়া উঠিল। অথচ সে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "বাবু সাহেব। আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আমি বিশেষরূপে শুনিয়াছি, আপনি পাঁচটী ভাষা জানেন। বাঙ্গালা, ইংরেজী, ফার্সী, উর্দ্দু এবং হিন্দী—এই পাঁচ ভাষাতেই আপনি অভিজ্ঞ। আপনার কি কোনরূপ আশঙ্কা হইতেছে? আমাদের কাছে আপনার কোন ভয় নাই। আর, ইংরেজগণও কখনও ফিরিয়া আসিবে না, ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন। তবে আপনার ভয় কাহাকে? আমি কোরান ছুঁইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতেছি,—অদ্য হইতে আপনাকে মাসিক এক হাজার টাকা করিয়া বেতন দিব। আর দিল্লী পৌছিলে ঐ বেতন দ্বিগুণ হইবে। আপনার সহিত এক শত সওয়ার প্রহরিস্বরূপ থাকিবে। অর্থাৎ, আপনি এক শত সওয়ারের অধিনেতা হইবেন। আপনি অশ্বারোহণে, শত্রু আক্রমণে, যুদ্ধাদি কার্য্যে

বিশেষ পটু—তাহাও আমি শুনিয়াছি। আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি চাকরী গ্রহণ করুন।"

আমি তখন যোড়হাতে কাতর হইয়া বলিলাম, "আমাকে এ যাত্রা ক্ষমা করুন। প্রকৃতপক্ষেই এই পীড়িত শরীরে এখন আমি এই গুরুভার লইতে অক্ষম। অধিক কি,—মারিয়াই ফেলুন, আর যাহাই করুন, আমি উপস্থিত কোন মতেই আপনার এ চাকরী লইতে পারিতেছি না।"

এই কথা শুনিয়া বখ্‌ত খাঁ ক্রোধাগ্নিতে যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভীষণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—"ইংরেজ আওর বাঙ্গালী সব এক হ্যায়, তুমকো নেহি মালুম হ্যায়, কি, হাম অভি তুমারা গর্দন কাটনেকা হুকুম দে সকতে হেঁ। নিমক হারাম। বেইমান। হাজার রূপেয়া তনখা ভি কবুল নেহি কর্‌তা? খুব মালুম হ্যায় কি ইংরেজোকে সাথ তুমহারী সাজিস হ্যায়।"

এই সময় মহম্মদ সফী কোরকর্ত্তি বখ্‌ত খাঁর কানে কানে কি কথা বলিলেন। বখ্‌ত খাঁ তখন দাড়ি মোচড়াইতে মোচড়াইতে আমার প্রতি এই হুকুম দিল,—"ইসকো লাইনকে গারদমে হিপাজৎসে রাখ্‌খো।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা দুই ভাই বন্দী হইলাম। ও দিকে যথাসর্ব্বস্ব লুন্ঠিত হইল, এ দিকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলাম। জানি না, ১৮৫৭ সালের ৩১ মে রবিবার দিনে আমার কতগুলি গ্রহই বিরুদ্ধ হইয়াছিল।

তেইশ

ঐরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া প্রধান সেনাপতি রাজরাজেশ্বর বখ্‌ত খাঁ দরবার ভঙ্গপূর্ব্বক অন্য স্থানে উঠিয়া গেলেন। চারি জন প্রহরী আমাদের হাতে হাতকড়ি দিতে আসিল। মহম্মদ সফী প্রহরিগণকে বলিলেন,—"আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ হাতকড়ি দেওয়া বন্ধ থাকুক।" এই বলিয়া তিনি বখ্‌ত খাঁ যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া প্রহরিগণকে বলিলেন,—"ইহাদের হাতে হাতকড়ি দিতে হইবে না। তোমরা স্বস্থানে চলিয়া যাও। ইঁহাদিগকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।' প্রহরিগণ মহম্মদ সফীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহম্মদ সফী বিদ্রোহী সেনাদলের দ্বিতীয় অধিনায়ক।

পদাতি সেনা-নিবাসে ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শেঠের এক সুবৃহৎ বাঙ্গলা-ঘর ছিল। সেনাগণ মধ্যে, সেনা বাজারের মুদিগণ মধ্যে এবং ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ মধ্যে ইনি টাকাকড়ি ধার দিতেন। প্রত্যেক রেজিমেণ্টের মধ্যেই টাকা কর্জ্জ দিবার এইরূপ এক এক জন শেঠ প্রধান সেনাপতির অনুমতি অনুসারে থাকিত। হীরানন্দ শেঠ মস্ত ধনী লোক। দিল্লীর নিকট ভীমানি নগরে ইঁহার নিবাস। ভারতের নানা স্থানে ইঁহার কারবার। বেরিলির ছাউনীতে ইঁহার প্রায় দুই লক্ষ টাকার লেন-দেন ছিল। হীরানন্দ স্বয়ং বেরিলিতে থাকিতেন না; তাঁহার পুত্র জহুরীমল্ল শেঠ পিতার নামে কারবার চালাইত। অদ্য জহুরীমলের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত হয় নাই বটে, দগ্ধও হয় নাই বটে, কিন্তু প্রায় এক শত বন্দুকধারী সিপাহীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক জহুরীমল বন্দী হইয়াছেন, কিন্তু একটু ভদ্রভাবে, অর্থাৎ তাঁহাকে সাধারণ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয় নাই। তিনি আপন গৃহে থাকিতে পাইয়াছেন, আপন চাকর-বাকর পাইয়াছেন, কিন্তু আছেন অবশ্যই প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া, গৃহের বাহির হইবার যো নাই।

মহম্মদ সফী আমাকে উক্ত জহুরীমল শেঠের ভবনে লইয়া গেলেন। বলিলেন, "আপনাকে গারদে থাকিতে হইবে না, হাতে হাতকড়িও দিতে হইবে না; আপনি এইথানেই থাকুন, এইথানেই আহারাদি করুন।"

আমি। বন্দী হইয়াছি বলিয়া আমি দুঃখিত হই নাই। কিন্তু আপনাদের নূতন সেনাপতির ব্যবহারে বড়ই কষ্ট বোধ হইয়াছে। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে। সেই জন্যই এখানে আসিবার কালীন আপনাকে বলিয়াছিলাম,—"মারিতে হয় আপনিই মারুন, কয়েদ করিতে হয় আপনিই করুন,—বখ্‌ত খাঁর নিকটে আমি যাইব না।" যাহা হউক, এখন গতানুশোচনা করিলে ফল নাই।

মহম্মদ সফী। দোষ আমারই হইয়াছে বটে। এরূপ আগে জানিলে আপনাকে এখানে আসিতে দিতাম না। তবে এক কথা আমার সত্য বলিয়া জানিবেন,—আমার দেহে প্রাণ থাকিতে আপনার প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। আপনি দুই-এক দিন এখানে কষ্ট করিয়া থাকুন, শীঘ্রই আপনার উদ্ধারের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।

আমি। এ সম্বন্ধে আমি আর আপনাকে অধিক কি বলিব, সমস্তই আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর।

মহম্মদ সখী সজল নয়নে আমাকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহাকে সেলাম করিয়া জহুরীমলের পাশে গিয়া বসিলাম।

চব্বিশ

জহুরীমল শেঠ যুবা পুরুষ। গৌরকান্তি। আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন। মুখশ্রী সুন্দর। হৃষ্ট-পুষ্ট, সদাহাস্যময় বদন।

জহুরীমল আমাদের দুই ভাইকে দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন,—"আমার বড় সৌভাগ্য যে, এই দুঃসময়ে আপনার সহিত মিলিত হইলাম। কেহ নাই,—একা,—আর বাটীর চারি দিকে এক শত প্রহরী। যে ক-একটী ভৃত্য আছে, তাহারা ত ভয়ে মৃতের ন্যায় হইয়াছে, ডাকিলে উত্তর দিতে সাহস করে না। যাহা হউক, এক্ষণে আপনাকে পাইয়াছি, আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াও অনেক শান্তি পাইব। বলিতে কি, আপনাকে দেখিয়াই আমি দ্বিগুণ বল পাইয়াছি।'

আমি। আমারও দ্বিগুণ বল সঞ্চার হইয়াছে। বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত এই ১০ ঘণ্টাকাল আশ্রয়হীন হইয়া বেড়াইতেছিলাম। এক্ষণে আশয়ের সহিত আপনাকে পাইলাম।

জহুরীমল। (চমকিয়া) কেন কেন? আপনার ঘর-বাড়ী কি হইল?

আমি। ঐ গুণধর সিপাহীগণ সমস্তই লুঠ করিয়াছেন, সমস্তই পোড়াইয়াছেন। এখন আমি বখ্‌ত খাঁর হুকুমে বন্দী হইয়াছি,—এইখানেই আমার থাকিবার আদেশ হইয়াছে। আমার কথা থাক। আপনার এমন অবস্থা কেন হইল, বলুন।

জহুরীমল। আজ যে বিদ্রোহ ঘটিবে, তাহা ঘুণাক্ষরেও আমি জানিতে পারি নাই। হঠাৎ সাড়ে দশটার সময় এক তোপ পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অমনি পঁচিশ জন সিপাহী আসিয়া, বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে চাবি লইয়া লোহার সিন্দুক খুলিল। প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা নগদ ছিল, তাহা লইল। তাহার পরই প্রায় শতাধিক লোক আসিয়া আমার গৃহ বেষ্টন করিয়া রহিল। এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী আসিয়া আমাকে বলিল,—"বখ্‌ত খাঁর হুকুমে তুমি বন্দী হইয়াছ। তবে তুমি যদি বখ্‌ত খাঁর সহিত দিল্লী যাও, তাহা হইলে তিনি

তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন। আর দিল্লীতে পৌঁছিয়া তোমার ভীমানির কুঠী হইতে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা বখ্ত খাঁকে দিতে হইবে।”

হুকুম শুনিয়া আমি অবাক্। আমি সৈনিক কর্ম্মচারীকে এ বিষয়ের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। সেই অবধি আমি মহা চিন্তায় নিমগ্ন আছি।

আমি। ভাবনা করিলে কেবল শরীর ক্ষয়; উহাতে আর কোন কাজ হয় না। বিপদ্‌কালে ধৈর্য্য ধরুন, সাহস অবলম্বন করুন, আর ভগবানকে ডাকুন। আপনার মুখ বড় শুষ্ক দেখিতেছি, দিবসে আহারাদি হইয়াছিল ত?

জহুরীমল। না। আমার আহারাদি প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় মুসলমান সিপাহীগণ হল্লা করিয়া বাটীতে প্রবেশ করে। রন্ধনশালায়ও তাহারা ঢুকিয়াছিল। কাজেই সব নষ্ট হইল।

আমি। এখন ত আর কোন গোলযোগ নাই; রুটী তৈয়ারী করিতে বলুন না কেন? ঘরে আটা ঘি আছে ত?

জহুরীমল। যে আটা ঘি আছে, তাহাতে কোন কাজ হইবে না, সম্ভবত সমস্তই মুসলমান-স্পৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

আমি। আচ্ছা, আমি ঐ প্রহরী জমাদারকে বলিয়া আটা ঘি হিন্দু দ্বারা আনাইয়া দিতেছি।

জহুরীমল। না না, উহাকে এ কথা বলিয়া কাজ নাই; উহারা ইতর লোক, কি জানি কি গোল বাধাইবে।

আমি। আপনার কোন চিন্তা নাই, দেখুন, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া দিতেছি। বিশেষ শ্রীমান্ কাশীপ্রসাদের ক্ষুধা পাইয়া থাকিবে; আমারও ক্ষুধা নিতান্ত কম নহে। আর, আপনার এখানে তামাকের বন্দোবস্ত আছে ত? না থাকে, বলুন তাহাও আনাইতেছি।

জহুরীমল। তামাক আছে, হুঁকা নাই। যে একটি ব্রাহ্মণের হুঁকা আছে, তাহাতে আপনার চলিবে কি না, জানি না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি দুই জন হিন্দু সৈনিক পুরুষ আমাদের জন্য পাঁচ সের আটা, দুই সের ঘৃত এবং এক সের আন্দাজ ডাল লইয়া উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহা মহম্মদ সফীর প্রেরিত। আহারীয় সামগ্রীর প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমার মনে আনন্দের উদয় হইল। বিদায় হইবার কালে বাহকগণকে বলিলাম, “দেখ ভাই! কাল যদি সুবিধা হয়, আমার জন্য

কিছু ভাল তামাক আনিও।" বাহকগণ 'আনিব' বলিয়া, স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে খুঁজিয়া দেখি, জহুরীমলের পাচক ব্রাহ্মণটী গৃহের এক নিভৃত স্থলে, এক কোণে জড়-সড় হইয়া শুইয়া আছে। তাহাকে ডাকিলাম,—সে প্রথমে সাড়া দিল না। নাড়িলাম, তাহাতেও সে বড় উচ্চ-বাচ্য করিল না। ভাবিলাম, এ ব্যক্তি মৃত না জীবিত? পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম জীবিত অবশ্যই বটে। তবে সাড়া দেয় না কেন? শেষে তাহার গায়ে হাত দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া বলিলাম, "ওহে! তোমার কোন ভয় নাই; উঠ, উঠ। শেঠজীর জন্য ভাল রুটী তৈয়ারী করিতে হইবে। আর আমাকেও কোন্ তুমি না চেন? আমার নাম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

পাচক ব্রাহ্মণ তখন গা ঝাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "বাবু সাহেব! আপনি আসিয়াছেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, সিপাহী-লোক বুঝি আমায় ধরিতে আসিয়াছে। আজ যদি বেলা এগারটার সময় আমি রান্নাঘর হইতে না পলাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সিপাহী-লোক আমায় গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত।"

আমি বলিলাম, "তোমাকে আর বেশী বাক্য ব্যয় করিতে হইবে না। তুমি আমার সঙ্গে আইস, ডাল রুটী তৈয়ারী করিতে হইবে।"

পাচক ব্রাহ্মণ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল।

ছয় জনের আহার প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমরা দুই ভাই,—জহুরীমল, তাহার গোমস্তা এবং চাকর, ও স্বয়ং পাচক ব্রাহ্মণ,—মোট এই ছয় জন। পাঁচ সের আটাই বরাদ্দ করিলাম। ঘৃত দেড় সের লইতে বলিয়া, আধ সের ঘৃত কল্যকার জন্য রাখিতে বলিলাম। ডাল যাহা ছিল তাহা সমস্তই লইতে বলিলাম।

পাচক জিজ্ঞাসিল, "এত ঘি এত আটা কে খাইবে? আপনারা তো দুই জন বৈ ন'ন।"

আমি। সে ভাবনা তোমার নাই। রুটী গাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পাচকের রন্ধনে আমি ষোল আনা সাহায্য করিয়াছিলাম। আমি বাল্য-কাল হইতেই কিঞ্চিৎ রন্ধনকার্য্যে পটু। আহারের সময় শেঠজী বলিলেন, "আমার পাচক এরূপ রসুই করিল কিরূপে? এমন মিষ্ট রুটী, এমন মিষ্ট ডাল আমি ত একদিনও খাই নাই।"

আমি বলিলাম, "অন্ত আপনার শুভদিন, তাই এমন উৎকৃষ্ট আহারীয় সামগ্রী মিলিল।"

আমি যেমন রন্ধন-কার্য্যে কিঞ্চিৎ দক্ষ, আহার-কার্য্যেও সেইরূপ বা ততোধিক দক্ষ। কাহারও বিশ্বাস হইবে কি না, জানি না,—সেই দিন আমি একাসনে বসিয়া প্রায় দুই সের আটার রুটি খাইয়াছিলাম।

শেঠজীর সুপ্রশস্ত খাটে সুকোমল শয্যায় আমরা দুই ভাই শয়ন করিলাম। স্বয়ং শেঠজী একখানি ক্ষুদ্র খাটিয়ার উপর শুইয়া রহিলেন। শুইবামাত্র আমি ঘোর ঘুমে অভিভূত হইলাম।

পঁচিশ

পর দিন অতি প্রত্যূষে আমি উঠিলাম। যখন অরুণোদয় হয় না, যখন গাছ-পালায় একটু-আধটু অন্ধকার থাকে, তাহার বহু পূর্ব্বে উঠাই আমার তখনকার অভ্যাস ছিল। আমি আজও সেইরূপ উঠিলাম। দেখিলাম, ভায়া নিদ্রিত, শেঠজী নিদ্রিত, গোমস্তা পাচক চাকর সকলেই নিদ্রিত। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ঠিক দ্বারদেশে আট জন প্রহরী, তাহার মধ্যে কেহ বসিয়া নিদ্রিত, কেহ ঠেস্ দিয়া নিদ্রিত, কেহ শুইয়া নিদ্রিত। আমি মনে মনে বলিলাম,—"প্রহরিগণ। ভাল ভাল। তোমরা আচ্ছা পাহারা দিতেছ। তোমাদের মনিব দেখিলে এখনি গলায় মোহর গাঁথিয়া তোমাদের পুরস্কার দিবেন। বন্দীর বাপের সাধ্য নাই যে, তোমাদের কাছ দিয়া অন্ত এখন পলায়। তোমরা অন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণতার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছ।"

আমার কৌতূহল জন্মিল। মনে বড় হাসিও আসিল। অবশিষ্ট প্রহরিগণ কোথায় কি করিতেছে জানিবার জন্ম অন্তরে বড় সাধও জন্মিল। শেঠজীর বাঙ্গলা-ঘরটীর চারি দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। সেই প্রাচীরে কতকটা উঠিয়া, মুখ বাড়াইয়া, উঁকি মারিয়া দেখিলাম যে, প্রহরিগণ আমাদের গৃহের অদূরে দুইটী বৃহৎ নিম্বরক্ষের তলদেশে সারি বাঁধিয়া শুইয়া আছে। বন্দুক তাহাদের মাথার বালিশ হইয়াছে। চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত তরবারি পাশবালিশ হইয়াছে। কাহারও নাক ডাকিতেছে, কেহ স্বপ্ন দেখিয়া আঁ আঁ করিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ কাহারও হইতেছে না। আহা! শেষরাত্রে সুনিদ্রা,—ঘুমের গাঢ়তাই বা কি!

একটু দুষ্ট বুদ্ধি মনে আসিল। ভাবিলাম, প্রহরিদল মধ্যে একটা ঢিল মারিয়া দেখি না কেন, ইহাদের ঘুম ভাঙ্গে কি না। প্রাচীর হইতে একটী মাঝারি আড়ার মাটীর ঢিল খুঁজিয়া লইলাম। গাছের উপর বেগে ঢিল ছুড়িলাম। ঢিল শত কুচি হইয়া কতকগুলি পত্রের সহিত সৈন্যবৃন্দের গায়ে আসিয়া পড়িল; কিন্তু তথাচ বীরপুরুষগণের চেতনা নাই, জনপ্রাণীরও ঘুম ভাঙ্গিল না। লাভের মধ্যে, কেহ কেহ পাশ ফিরিয়া শুইয়া অধিকতর সুনিদ্রা সম্ভোগ করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে কহিলাম,—"সিপাহীগণ! তোমরাই ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত পাত্র বটে! যেমন তোমাদের শৃঙ্খলা, তেমনি তোমাদের সুবন্দোবস্ত! তোমাদের গুণের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়!"

আমি যদি ইচ্ছা করিতাম, তবে সেই দিন, সেই সময়, ভায়াকে ও শেঠজীকে সঙ্গে লইয়া অনায়াসেই পলাইতে পারিতাম। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার বিতর্ক করিয়া দেখিলাম, এখন পলায়ন করা উচিত নয়। পলাইয়া কোন্ স্থানে যাইব তাহা ঠিক না হইলে পলায়ন করা যুক্তি-সঙ্গত নয়। পলায়নের পর যদি ধৃত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ নষ্ট হইবে। আর যেরূপ গতি দেখিতেছি, তাহাতে যখন চেষ্টা করা যাইবে তখনই পলাইতে সক্ষম হইব।

আমি প্রাচীর হইতে নামিলাম। ঘরের বারান্দায় আসিলাম। তামাক খাইবার জন্য চক্‌মকি ঠুকিতে বসিলাম। দেখিতে দেখিতে পৃথিবীর অন্ধকার ভাব একটু একটু কমিতে লাগিল। টিকা ধরাইয়া, তামাক সাজিয়া কলিকাতে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময় অদূরে এক মহা কোলাহল-ধ্বনি উত্থিত হইল। সে শব্দে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হয়। সে বিকট চীৎকার শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। সে 'হর হর' শব্দ, সে 'আলি আলি' শব্দ, 'জয় কালী জয় কালী' শব্দ, সেই প্রমত্ত পদাতি সৈনিকগুলির পদধ্বনি, সেই বেগগামী অশ্বের খুরধ্বনি, সেই হস্তিবৃন্দের বৃংহিত ধ্বনি, সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া যেন প্রলয়কালের মহা-কল্লোল কোলাহল উপস্থিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত বন্দুকের একত্রে আওয়াজ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ভীমনাদে কামানের ভৈরব নিনাদ হইতে লাগিল।

এ দিকে ভ্রাতা কালীপ্রসাদ কাঁচা ঘুমে উঠিয়া আতঙ্কে অস্থির হইয়া, শয্যায় বসিয়াই 'দাদা দাদা' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। শেঠজী ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—"বাবু সাহেব! নেহি জান্‌তে আওর ক্যায়া ফ্যাসাদ খাড়া হুয়া। হামকো মালুম হোতা হায় কি, হাম-লোগকা জান কৈ সুরতসে নেহি বঁচ সকতা হায়!"

ন্যায় এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, এইবার অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আমাদের প্রহরিগণ এইবার জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা থতমত খাইয়া, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ছোড়ভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে ভীতিব্যঞ্জক স্বরে পরস্পর পরস্পরকে কেবল জিজ্ঞাসাই করিতেছে, "ক্যা হুয়া ভাই? ক্যা হুয়া ভাই? প্যারেড পর ক্যা হুয়া ভাই?" অনবরত এইরূপ প্রশ্নই হইতেছে, কিন্তু উত্তর কেহই দিতেছে না।

আমারও মন কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইল। তথাচ আমি তামাক ছাড়িলাম না, হুঁকা-দণ্ডে কলিকা সংযুক্ত করিয়া, তামাক টানিতে টানিতে দ্বারদেশে প্রহরি-গণের নিকট আসিলাম। দফাদারকে বলিলাম, "তুমি ঘোড়া ছুটাইয়া প্যারেড-ভূমিতে গিয়া দেখ কি হইতেছে। এখানে দাঁড়াইয়া গোলযোগ করিলে কি হইবে?"

দফাদার আমার কথা মান্য করিল। আমাকে সেলাম করিয়া আর দুই জন অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া দফাদার দৌড়িল। আমিও এক-পা এক-পা করিয়া দ্বারদেশের বহির্ভূমিতে উপনীত হইলাম। তখন পৃথিবীর রঙ একটু ফরসা হইয়া আসিতেছে। আমার বহির্গমনে কেহ বাধা দিল না।

অল্প দূর অগ্রসর হইয়া, একটু উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া এই মহা গোলযোগ কথা শ্রবণ করিতেছি, এমন সময় দরস্থ এক দল সৈন্য হল্লা করিয়া উঠিল, "ভাই! খবরদার! ভাই! খবরদার! গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" ইহার অর্থ এইরূপ,—"ইংরেজ-সৈন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, খুব সতর্ক হও।"

এইবার সকলের মুখ হইতেই শুনিতে পাওয়া গেল, "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" তখন আর কাহারও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। সকলেই বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া যেন হাত-পা-হারা হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল,—"গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দে যেন আকাশ, পাতাল, পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ কি করিবে, কোথায়

যাইবে, কিরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইবে, তাহার কিছুই স্থির-মীমাংসা দেখিলাম না। কেবল দেখিতে লাগিলাম, রণবংশীর স্বর শুনিয়া সৈন্যগণ দলে দলে প্যারেড-ভূমির দিকে দৌড়িতেছে, যুদ্ধের উপযুক্ত পরিচ্ছদ অনেক সৈন্যেরই অঙ্গে দেখিলাম না। কাহারও পায়ে জুতা আছে, কাহারও নাই; কাহারও মাল-কোঁচা-মারা কাপড় পরা, কাহারও পরণে ইজার, মাথায় একটী টুপি, কিন্তু গায়ে আঙ্গরাখা নাই। কেহ বা সম্পূর্ণরূপেই যোদ্ধ্‌বেশে সজ্জিত আছেন। ফল কথা, অধিকাংশ লোকই অৰ্দ্ধ-উলঙ্গভাবে দৌড়িতেছিল। বলিতে সরম হয়, দৌড়িতে দৌড়িতে দুই-এক জন বীরপুরুষ পূর্ণমাত্রায় উলঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

গোরা অর্থাৎ ইংরেজ-সৈন্য আসিয়াছে শুনিয়া আমার মনে অতুল আনন্দ হইল। দেড় শত বা দুই শত গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দেখিলেই স্বল্পবুদ্ধি সিপাহীগণ ভয়ে পলাইবে, ইহা আমার স্থির বিশ্বাস ছিল। ইংরেজ আগমনের শুভবার্ত্তা শুনিয়া মনে মনে কতই সুখের কথা কল্পনা জল্পনা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ খবর পাইলাম, ইংরেজ আইসে নাই,—গোরা আক্রমণ করে নাই, সিপাহীগণের উহা কাল্পনিক ভয় মাত্র। কোথায় বা গোরা, কোথায় বা আক্রমণ! কেহই কোথাও নাই। সিপাহী সৰ্দ্দারগণ সম্ভবতঃ অন্ধকারে ভূত দেখিয়াছিলেন।

গোরা আসার ঘটনা এইরূপে ঘটে,—ইংরেজদের পলায়নে, গত রাত্রে সিপাহীগণ মধ্যে খুব আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। নাচ গান রঙ্গ-তামাসা— সমস্তই চলিয়াছিল। সিদ্ধি-গাঁজা-চরস-চণ্ডু—কিছুরই অভাব ছিল না। আমোদে-প্রমোদে, আহারে-বিহারে উন্মত্ত হইয়া সেনাগণ ক-একটী ঘোড়া ও ক-একটী উট—হয় বাঁধিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, না হয়, আলগা করিয়া বাঁধিয়াছিল। সেই উট ও ঘোড়া দড়ি ছিঁড়িয়া শেষ রাত্রে গভীর গৰ্জ্জন করিয়া চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের ছুটাছুটিতে ভয়বিহ্বল সিপাহী দল মনে করিয়াছিল, গোরা আসিয়াছে। 'গোরা আসিয়াছে' শুনিয়া আর বাহ্যজ্ঞান কাহারও রহিল না। তাহার পর পূর্ব্ব-কথিতরূপ হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গেল।

অল্প অন্ধকার মধ্যে ঘুমের ঘোরে গুলি চালাইতে গিয়া, সিপাহীগণ আপনা-আপনি মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ জনকে খুন-জখম করিয়াছিল।

অৰ্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে দফাদার প্রত্যাগত হইল। সে আসিয়া বখ্‌ত খাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাইল এবং তাঁহার কতকগুলি নিন্দাবাদও করিল। বলিল, "বখ্‌ত খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি নয়। কোন সিপাহী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট

নয়। তিনি কেবল নিজ গর্ব্ব-অহঙ্কারে সদা মত্ত থাকেন। কোথাও কিছু নাই, তিনি সিপাহীগণকে গুলি চালাইতে হুকুম দিয়া, খামোকা নিজ দলস্থ কয়েক জন লোককে খুন করিলেন। গোরা আসিয়াছে, কি ঘোড়া ছুটাছুটি করিতেছে, ইহা তাঁহার অগ্রে দেখা উচিত ছিল। তিনি বড়ই অদূরদর্শী। কেবল তাঁহারই দোষে অদ্য এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।" আমি এ কথার কোন উত্তর দিলাম না। ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কলিকা ঢালিয়া পুনরায় তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রভাত হইল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব নানা রঙ্গে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইলেন। অদ্য ১৮৫৭ সালের ১লা জুন সোমবার বেরিলির সিপাহী-বিদ্রোহের এক দিবস অতীত হইল—দ্বিতীয় দিবস আসিল।

ছাব্বিশ

আমি জহুরীমল শেঠের গৃহে বন্দী হইয়া আছি। ঘরের বহির্ভাগে চারি দিকে পাহারা, ভিতরে আমরা। ৫৭ সালের ১লা জুন প্রভাত কাল অতীত হইল, বেলা এক প্রহর অতীত হইল, তথাচ মহম্মদ সফী বা তাঁহার কোন লোক আমার কোন সংবাদ লইতে আসিল না। ঘরে আহারীয় সামগ্রী কিছুই নাই। যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহা যবনস্পৃষ্ট বলিয়া শেঠজী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। খাইতে খাইতে তামাকও ক্রমশ: ফুরাইয়া আসিল। বেলা তখন ১০টা। আমি শেঠজীকে ডাকিয়া বলিলাম, "শেঠজী! গতিক বড় সুবিধার নহে। এখনও আটা ঘি আজ পাঠাইল না কেন? আমার মনে কেমন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।" কাশীপ্রসাদ কিন্তু আজ একটু নির্ভীক-চিত্তে বলিল, "সিধা পাঠায় নাই বলিয়া যে ভয়ের কিছু কারণ আছে, তাহা নহে। কাল তাহারা পাঁচ সের আটা, দুই সের ঘি প্রভৃতি পাঠাইয়াছিল, তাই তাহারা মনে করিয়াছে, ইহাতেই ইহাদের অন্তত দুই দিন কাল পর্য্যাপ্ত হইবে। কিন্তু এখানে যে এক রাত্রেই সমস্ত নি:শেষ হইয়া যাইবে, তাহা মহম্মদ সফী কি করিয়া জানিবে?"

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইল দেখিয়া, আমি আমাদের প্রহরী দফাদারের নিকট গেলাম। বলিলাম,—"দফাদার সাহেব! এ পর্য্যন্ত আমাদের আহারাদি

কিছুই হয় নাই। ঘরে আটা, ঘি, কিছুই নাই, মহম্মদ সফী এ পর্য্যন্ত কিছুই *পাঠান নাই। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি, আমাদের উপায় কি হয়?"*

দফাদার। উপায় তো আমি কিছু দেখি না।

আমি। এখানে তো অনেক প্রহরী আছে, আমরাও কিছু পলাইতেছি না। তুমি একবার নিজে মহম্মদ সফীর নিকট গিয়া আমাদের এই আবেদন জানাও না কেন?

দফাদার। পাহারা ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না। বখ্‌ত খাঁর অদ্যকার হুকুম বড় শক্ত। যদি আমি পাহারা ছাড়িয়া যাই, এবং এ কথা যদি বখ্‌ত খাঁর কানে উঠে, তাহা হইলে আমার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আমি। আজ কেন এমন শক্ত হুকুম হইল?

দফাদার। আপনারা পাছে পলাইয়া যান, ইহাই তাঁহার ভয়। আপনা-দিগকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

আমি। কবে তোমরা দিল্লী যাইবে?

দফাদার। তাহা ঠিক জানি না, বোধ হয় ২।৩ দিন পরেই দিল্লী রওনা হইতে হইবে।

আমি। সে যাহাই হউক, তোমার পাহারা বদলী হইয়া তুমি যখন প্যারেডে যাইবে, তখন তুমি আমাদের অনাহারের কথা মহম্মদ সফীকে বলিতে পারিবে তো?

দফাদার। তাহা বলিতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যা ছয়টার কম আমি এ স্থান হইতে যাইতে পারিব না।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। বুঝিলাম, বিপদ্ ক্রমশঃই গাঢ়তর হইতেছে। আমি আসিবামাত্র ভায়া কাশীপ্রসাদ জিজ্ঞাসিল,—"দাদা! ডাল রুটির কি বন্দোবস্ত করিলে?" আমি প্রকৃত কথা না কহিয়া বলিলাম,—"ডাল আটা একটু পরে আসিবে।"

বেলা তৃতীয় প্রহর হইল, তথাচ আহারীয় সামগ্রী পাইলাম না। মনে বড় চিন্তা হইল, এইরূপে ক্রমশঃ অনাহারে প্রাণত্যাগ ঘটিবে না কি?

ও দিকে দাদা কাশীপ্রসাদ বিছানায় শুইয়া আই-ঢাই ছট্‌ফট্ করিতেছে। এ দিকে শেঠজী মুদ্রিতনয়নে দেবতার ধ্যানে নিযুক্ত আছেন। রসুয়ে ব্রাহ্মণটী এক এক বার আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিতেছে, "বাবু সাহেব! ঘি আটা আর কত দূর?" চাকরটী শীঘ্রই ঘি আটা আসিবার আশায় পূর্ব্বে একবার উনান

ধরাইয়াছিল। এখন উনান নিভাইয়া ভগ্নমনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছে।”

আমি বেগতিক বুঝিয়া ভাই কাশীপ্রসাদকে হাসিয়া বলিলাম,—“ভাই! আজ একাদশী কর, গতিক বড় সুবিধা নয়।”

বেলা যখন সাড়ে-চারিটা, তখন মহম্মদ সফী অশ্বারোহণে আমার নিকট আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও দশ-বার জন অশ্বারোহী আছে। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বাবু সাহেব! আপনার আহারাদি উত্তমরূপ হইয়াছে তো?” আমি হাসিয়া বলিলাম,—“উত্তমরূপ দূরে যাউক, এ অধমের আহারাদি অধমরূপও হয় নাই।”

মহম্মদ সফী। কেন কেন? রুটী তৈয়ারীতে কোন ব্যাঘাত পড়িয়াছে না কি? পাচক ব্রাহ্মণ পলাইয়াছে নাকি?

আমি। পাচক ব্রাহ্মণ পলাইবে কেন? আর কোন্ পথ দিয়াই বা পলাইবে? কোথাও এক মুঠা আটা নাই, রুটি তৈয়ারী হইবে কিরূপে?

মহম্মদ সফী। (বিস্ময়ে) ইহা ত বড় আশ্চর্য্যের কথা! আমি আজ বেলা প্রায় দেড় প্রহরের পর, দশ সের ভাল আটা, চারি সের ঘৃত, ডাল ইত্যাদি সমস্তই লোক দ্বারা পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা কি আপনার নিকট ঐ সকল জিনিস দিয়া যায় নাই?

আমি। না।

মহম্মদ সফী। বলেন কি?

আমি। দিয়া গেলে কি আর আমি মিছা করিয়া বলিতেছি? তাহারা দিয়া যায় নাই। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনার ঐ প্রহরী দফাদারকে জিজ্ঞাসা করুন।

মহম্মদ সফী। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না, বড় বিসম গোল-যোগ উপস্থিত হইল দেখিতেছি। বাবু সাহেব! কাল রাত্রি ৯টার সময় ট্যাটু ধ্বনি হইলে অশ্বারোহী সৈন্যগণ যখন মিলিত হয়, তখন গণনা করিয়া দেখিলাম ২৫ জন সওয়ার অনুপস্থিত আছে। অদ্য প্রাতে অনুসন্ধানে জানিলাম, সেই সওয়ারগণ সহরের ৩।৪ জন ধনাঢ্য লোকের বাড়ী লুঠ করিয়া, অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া আপন-আপন দেশাভিমুখে ছুটিয়াছে। আজও সংবাদ পাইলাম, বেলা ১২টার পর সওয়ারগণ ও পদাতি সৈন্য মিলিত হইয়া সহরের অনেক মহাজনের বাড়ী লুঠপাট আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের

গ্রেপ্তারের জন্য ১০০ এক শত সওয়ার পাঠাইলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "লুণ্ঠন সত্য বটে, কিন্তু সওয়ার ও পদাতি সৈন্যগণকে দেখিলাম না। সম্ভবত তাহারা আমাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পলাইয়া থাকিবে।" যে সওয়ারগণের দ্বারা আপনার আহারীয় দ্রব্য পাঠাইয়াছিলাম, বোধ হয় তাহারা আটা, ঘি, নিজে নিজে খাইয়া কাহারও বাড়ী-ঘর লুঠ করিয়া দেশে পলাইয়াছে। বিশেষ, অন্য আটা ঘিরও কিছু টানাটানি গিয়াছে। সেনা-বাজারের মুদিগণ সম্যগ্রূপে আজ আটা জুটাইতে পারে নাই। তাহারা বলিতেছে, "সহরের দোকানপাট সমস্তই বন্ধ। লুণ্ঠিত হইবার ভয়ে গ্রামান্তর হইতেও কেহ আর সহরে আটা ঘি চালান দিতেছে না।" বাবু সাহেব! আমি বহু কষ্টে আজ আপনার জন্য দশ সের আটা ও চারি সের ঘি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

আমি। বেণিয়াগণের নিকট কি আটা ঘি আর আদৌ নাই?

মহম্মদ সফী। যাহা আছে তাহাতে এক সপ্তাহ কাল আমাদের বেশ চলিতে পারে। কিন্তু বখ্‌ত খাঁ হুকুম দিয়াছেন, ঐ ৭ দিনের রসদে ১৫ দিন কাল চালাইতে হইবে। অর্থাৎ, প্রত্যহ অৰ্দ্ধেক পরিমাণ আহারীয় সামগ্রী বেণিয়াগণ তাহাদের ভাণ্ডার হইতে দিবে, বাকী অৰ্দ্ধেক সহরের বাজার হইতে ক্রয় করিয়া পূর্ণ করিবে। এ দিকে কিন্তু সহরের বাজার বন্ধ। কাজেই সেনাগণের আহারীয় আজ হইতেই কম পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"বখ্‌ত খাঁর এ বন্দোবস্তটা অতি পাকা হইয়াছে। কাহাকেও খাইতে দিব না, অথচ ঘরে পুরিয়া মাল পচাইব। সাবাস কমাণ্ডার-ইন্-চিফ! সাবাস!"

মহম্মদ সফী বলিলেন,—"যাক ও সকল কথা। এক্ষণে আপনাদের জন্য আটা ঘি আনাইয়া দিতেছি, আপনারা রন্ধন করুন।

এক জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ প্যারেড-ভূমিতে গিয়া প্রধান বেণিয়া-মুদিকে আমার নিকট লইয়া আসিল। মহম্মদ সফী তাহাকে বলিলেন, "দেখ, এই বাবু সাহেবের জন্য প্রত্যহ রসদ যোগাইবে। দেখিও যেন কোন রকমে ত্রুটি না হয়।"

মহম্মদ সফী প্রস্থান উদ্যত হইলে আমি তাঁহার হাত ধরিলাম। বলিলাম, —"আপনি যান কোথা? আমাদিগকে এরূপভাবে আর কত দিন থাকিতে হইবে? আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। সহরে যে সকল আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন, তাঁহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি।"

মহম্মদ সফী গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "কাল এমনি সময় সম্ভবত আমি আপনার নিকট আসিব। সেই সময় যাহা কিছু বলিবার আছে বলিবেন। আজ আমাকে ছাড়িয়া দিন।" অগত্যা আমি মহম্মদ সফীর হাত ছাড়িলাম। মহম্মদ সফী আমায় সেলাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেইরূপ শব্দ হইল,—"গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" এবার পূর্ব্বের ন্যায় তত হুলস্থুল না হউক, কিন্তু 'গোরে আয়ে, গোড়ে আয়ে' শব্দে দিক্‌সমূহ পূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার আমি দৌড়িয়া বাহিরের দিকে গেলাম। আবার দেখিলাম, সিপাহীগণ ইতস্তত ধাবিত হইতেছে। কিন্তু অর্দ্ধ দণ্ড পরে ভ্রম ভাঙ্গিল, কোথায়ই বা গোরা এবং কোথায়ই বা তাহাদের শুভাগমন। আমি যে কয় দিন শেঠজীর গৃহে বন্দী ছিলাম, সেই কয়েক দিনই প্রত্যহ দিনে রাতে দুই-তিনবার করিয়া ঐরূপ 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দ সিপাহীদল মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছিল। আমার বোধ হয়, জাগিয়া জাগিয়াও সিপাহীগণ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিত। এতই তাহাদের অন্তরের আতঙ্ক। 'ঐ গোরা' বলিলে সিপাহী যেন কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুলিতে থাকিত। গৌরাঙ্গ নামের এই মহামহিমান্বিতা মোহিনী শক্তি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম।

সাতাশ

সন্ধ্যা হয় হয়। আমি শেঠজীর কাছে বসিয়া আছি। সকলেরই মুখ শুষ্ক, কেন না, এ পর্য্যন্ত কাহারও আহার হয় নাই। বেণিয়া মুদি মহম্মদ সফীর আদেশ পাইয়াও এখনও আমাদের জন্য রসদ আনে নাই। শেঠজী বলিলেন, "বেণিয়ার হাত হইতে কোন সিপাহী তো আমাদের রসদ কাড়িয়া লয় নাই?" আমি বলিলাম, "যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নয়।" এমন সময় বেণিয়া এবং তাহার এক জন ভৃত্য আমাদের সম্মুখে আসিল। ডাল রুটির পরিবর্ত্তে ছাতু, গুড় ও লুন দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কি?" মুদি উত্তর করিল, "বখ্‌ত খাঁর হুকুমে আটা ঘি সমস্তই আটক হইয়া আছে। তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কাহাকেও আটা ঘি দিবার যো নাই। আমি আপনাদের জন্য স্বয়ং বখ্‌ত খাঁর নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইলাম না। কাজেই ছাতু লঙ্কা প্রভৃতি লইয়া আসিয়াছি। সম্ভবত কল্য আটা ঘি আনিতে পারিব।”

মুদি বিদায় হইল। আমরা তিন জনে খাইতে বসিলাম; পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেশন আরম্ভ করিল। সমস্ত দিনের পর আহার, ছাতুই তখন অমৃতময় বোধ হইতে লাগিল। প্রথমত নুন লঙ্কা দিয়া ছাতু ভক্ষণ, তারপর গুড়-সংযোগে ছাতু ভক্ষণ,—উদর এক রকম পূর্ণ হইল; কালিয়া পোলওয়া খাইলে যে রকম উদর পূর্ণ হইত, ছাতুতেও সেই রকম পূর্ণ হইল, তবে মন বুঝে না বলিয়াই মন কেমন একটু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। কেন না, অগু আমাদের ছাতু খাইয়া দিনপাত করিতে হইল। আড়াই টাকা দামের বালাপোষে যেমন শীত ভাঙ্গে, পাঁচ টাকা দামের লুই গায়ে দিলেও সেই রকমই শীত ভাঙ্গে, পাঁচ হাজার টাকার শাল গায়ে দিলেও সেই রকমই শীত ভাঙ্গে। কিন্তু মন বুঝে না বলিয়াই মনে হয়,—এঃ এ-টা লুই, ইহা কি গায়ে দেওয়া যায়?

আহারাদি করিয়া, আমরা তিন জনে শয়ন-গৃহে গিয়া নিজ নিজ শয্যার উপর উপবেশন করিলাম। কোন কাজ নাই, কি করি? ইহাই তখন ভাবনা হইল, এত সন্ধ্যা বেলায় শুইযাই বা কি হইবে? শেঠজীর ঘরে সেতারও নাই যে, খানিক বাজাইয়া মন তৃপ্তি করি। শেঠজীকে জিজ্ঞাসিলাম, “আপনি কি গান গাহিতে জানেন?”

শেঠজী (হাসিয়া) না।

আমি। কিছু কিছু জানেন বৈ কি।

শেঠজী। আমি ঈশ্বরের দোহাই বলিতেছি, গান গাহিতে আমি জানি না।

আমি। বলেন কি! আমি যে বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিযাছি, আপনি গান গাহিতে জানেন।

শেঠজী। (হাসিয়া) সে যা একটু-আধটু গাহিতে জানি, তাহা আর আপনাদের সাক্ষাতে গাহিবার নয়।

আমি। আমার সাক্ষাতে গাহিতে কোন দোষ নাই। আপনার গান শিক্ষা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কারণ, আপনার গান ভাল হইলে এখানে কেহ আপনাকে পুরস্কার দিতেছে না। মন্দ হইলেও কেহ তাডাইয়া দিতেছে না। সুতরাং আমার সাক্ষাতে গান গাহিতে দোষ কি?

শেঠজী। দোষগুণের কথা বলিতেছি না। আমি যখন আদৌ ভাল গান গাহিতে জানি না, তখন কি করিয়া গান গাহিব?

আমি। (হাসিয়া) আমরা ত আর ভাল গানের কান্না কাঁদিতেছি না। আপনি যাহা জানেন তাহাই একটু গান। দিন কাটিলেই হইল।

শেঠজী। আমি একলা একলা বসিয়া নির্জ্জনে যখন গান করি, তখন আমি আপনা-আপনিই লজ্জিত হই।

আমি। তবে ভগবানের নাম করুন; একটী না হয় ভজন গান; ভগবানের নামে তো কোন দোষ নাই, সুর খারাপ হইলে ভগবান তো আর রাগ করিবেন না? ভক্তি থাকিলেই হইল।

তখন শেঠজী আমায় নাছোড়-বন্দা দেখিয়া, আমার নিকট পরিত্রাণের কোন উপায় নাই দেখিয়া, তাঁহার যথাসাধ্য সুর-লয়-সংযোগে একটী ভজন আরম্ভ করিলেন।

শঙ্কর শিব বম্ বম্ ভোলা।
কৈলাসপতি মহারাজ-ধীরাজ,
গলে রুণ্ড মাল, ওঢ়ে সিংহ খাল,
লোচন বিশাল হ্যায় লাল লাল।
অর্ধচন্দ্র ভাল সুন্দর বিরাজে॥

শেঠজী ভজন গাহিয়া, আমাকে অন্য একটী ভজন গাহিবার জন্য ধরিলেন। সে যেমন তেমন ধরা নয়, অজগর সর্প যেমন ভীমকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, সেইরূপ যেন জড়াইয়া ধরিলেন! আমি অগত্যা আমার সেই চির-অভ্যস্ত ভজনটী ধরিলাম।

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী।
রসনা রস-নাম লেত, সন্তনকো দরশ দেত,
ঈষৎ মুখচন্দ্র বিন্দু, সুন্দর সুখ-দায়ী॥
কেশরকে তিলক ভাল, মনো রবি প্রাতঃকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝিল্‌মিলাতি, রবি-পথ-ছব্-ছায়ী॥
মোতিয়ন্‌কে কণ্ঠমাল, তারাগণ অতি বিশাল,
মানো গিরি-শিখর ফোড়্ সুর-সর চলি আয়ী॥
সখা সহিত সরযূ-তীর, বিহরত রঘুবংশ-বীর,
হরখ নিরখ তুলসীদাস, চরণরজ পায়ী॥

সঙ্গীত শেষ হইলে, আমি এবং ভ্রাতা কালীপ্রসাদ শেঠজীর সেই সুপ্রশস্ত খাটে পূর্ব্বদিনের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলাম। স্বয়ং শেঠজী সেই খাটিয়াখানিতে গিয়া শুইলেন।

অদ্য রাত্রে আমার ভাল ঘুম হইল না। নানা চিন্তায় আমার হৃদয় মগ্ন হইল। কারাগারে এরূপভাবে নীরব নিস্পন্দ হইয়া কত দিন থাকিব? শেষে বখ্‌ত খাঁ বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া যদি আমাদিগকে দিল্লী লইয়া যায়, তখনই বা উপায় কি করিব? আমি দিল্লী যাইতে অস্বীকৃত হইলে, বখ্‌ত খাঁ আমাকে ফাঁসীকাঠেও ঝুলাইতে পারে। তাই ভাবিতেছি, কোথায় যাই, কি করি, কাহারই বা পরামর্শ লই? ভ্রাতা কালীপ্রসাদকে সমস্ত বিপদের কথা খুলিয়া বলিলে তো সে একেবারে ভয়ে জড়সড় হইয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিবে। শেঠজীও সাদা-সিধে লোক; ইহজন্মে কেবল তিনি সুদ লইবার কৌশল শিখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গেই বা পরামর্শ কি করিব?

সহরে শুনিতে পাই অনেক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাটীতে লুটপাট হইতেছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও চলিতেছে। আমার পরিচিত আত্মীয় হরদেব এবং হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইঁহারাই বা এ সময় কি করিতেছেন? বৃদ্ধ অহিফেনসেবী ঠাকুরদাদা রামকমল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই বা এই ঘোর দুর্দ্দিনে কিরূপে কাল কাটাইতেছেন? ডাকঘরের বাবুই বা কোথায়? ডাকে চিঠিপত্র চলাচল তো বন্ধ হইয়াছে।

শুনিতেছি খাঁ বাহাদুর খাঁ নবাব সাজিয়াছেন। পাঠক! বুঝিয়াছেন,—খাঁ বাহাদুর খাঁ কে? এই রোহিলখণ্ড প্রদেশের পূর্ব্বতন নবাব হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্র সেই খাঁ বাহাদুর খাঁ। ইনি নবাববংশীয় বলিয়া গবরমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। আমায় যিনি সেতার শিখাইতেন,—সেই নবাববংশীয় চুন্না মিঞার কথা মনে পড়িল।

মন বড়ই উচাটন হইল। কি করি? এ স্থান হইতে পলাই কিরূপে? স্থির করিলাম, কাল আর এখানে কিছুতেই থাকিব না,—যেমন করিয়া হউক পলাইব।

আটাশ

পরদিন প্রাতে মহম্মদ সফী আসিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "সহরের সংবাদ আপনি কিছু জানেন কি?" খাঁ বাহাদুর খাঁ 'নবাব' হইয়াছেন নাকি?"

মহম্মদ সফী। হাঁ।

আমি। আপনারা তাঁহাকে নবাব পদে—দেশের শাসনকর্ত্তার পদে বরণ করিলেন, না, তিনি আপনিই নবাব হইয়াছেন?

মহম্মদ সফী। আমরা, অন্তত আমি এ বিষযেব কিছুই জানি না। সম্ভবত তিনি আপনা-আপনিই নবাব হইয়াছেন। শুধু তিনি নবাব হন নাই, সহরে অন্যান্য যত ইংরেজ ছিল, তিনি সকলকে গত কল্য হত্যা করিয়াছেন। অথবা তাঁহার নাম করিয়া সহরবাসিগণ ইংবেজগণকে নিহত করিযাছে।

আমি। ওঃ! ব্যাপার কি বলিতে পারেন?

মহম্মদ সফী। ব্যাপাব আর কিছুই নহে—ঘোর অরাজকতা উপস্থিত। কেহ কাহাকেও মানে না, কেহ কাহারও কথা শুনে না, যাহার গায়ে বল বেশী, সেই এখন কর্ত্তা।

আমি। খাঁ বাহাদুর খাঁ তবে নবাব হইয়া কি করিতেছেন? তিনি কি অত্যাচার নিবারণ করিতে সক্ষম হইতেছেন না?

মহম্মদ সফী। খাঁ বাহাদুর খাঁর দ্বারা অত্যাচার নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাঁ বাহাদুর খাঁ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক। যে যা বলে, তাই তিনি করেন। তাঁহাব মনে মনে প্রজার মঙ্গল করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাস্রোতে পড়িযা কার্য্যগতিকে তিনি প্রজার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। এই দেখুন, গত কল্য তিনি খাস্ বেরিলির সেসন জজ রেক্স সাহেবকে, জজ- রবার্টসন সাহেবকে, ডেপুটী কালেক্টর ওয়াট সাহেবকে এবং ডাক্তার হে সাহেবকে খামোকা হত্যা করিযাছেন।

আমি। সে কি কথা? ইঁহারা কি নাইনিতাল পলাইতে পারেন নাই?

মহম্মদ সফী। না। পলাইবাব অবসর পান নাই। রবিবার দিন বেলা ১১টার সময যে বিদ্রোহ-অনল জ্বলিযা উঠিবে, ইহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। ইঁহারা পলাইবার জন্য আস্তাবলে ঘোড়া সজ্জিত রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায পলাইতে না পারিয়া বেরিলিস্থ দুই জন

সম্ভ্রান্ত সওদাগরের বাটীতে লুক্কায়িত হন। কিন্তু খাঁ বাহাদুর খাঁ গোয়েন্দার দ্বারা সংবাদ পান। অমনি কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ গিয়া সেই কয়েক জন ইংরেজকে গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে আশ্রয়দাতার বাটীও লুণ্ঠন করে। গ্রেপ্তারীর পর কয়েক জন ইংরেজকে তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। এই ত ব্যাপার।

আমি। এরূপ ভাবে ইংরেজ কাটিয়া যে কি লাভ হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। বরং হত্যার পরিবর্ত্তে যদি বন্দী করিয়া রাখিত, তাহা হইলে সর্ব্বাংশে উত্তম কাজই হইত। খাঁ বাহাদুব খাঁ এরূপ ভাবে ইংরেজ-গণকে হত্যা করিতেছেন, সহরের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠন করিতেছেন, ইহার কোন প্রতিবাদ আপনারা কবিতেছেন না কেন?

মহম্মদ সফী। আমাদের প্রতিবাদ কবিযা লাভ কি? আমরা এ সহরে আর কয় দিন আছি? শীঘ্রই আমরা দিল্লী যাত্রা করিতেছি। সুতরাং এরূপ স্থলে খাঁ বাহাদুব খাঁব সহিত বিবাদ করিয়া ফল কি?

আমি। আচ্ছা, হঠাৎ খাঁ বাহাদুব খাঁ নবাব উপাধি ধারণ করিলেন কিরূপে? এক্ষণে তাঁহার অপেক্ষা ক্ষমতাশীল ধনাঢ্য লোক ত অনেক বর্ত্তমান আছেন।

মহম্মদ সফী। অনেক না থাকুন, এক-আধ জন আছেন বটে। মোবারেক শা খাঁ একজন উদ্যমশীল অধিনায়ক বটেন, তাঁহার প্রচুর অর্থও আছে, লোকবলও আছে, আব, পাঠানদের উপর তাঁহার যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে। খাঁ বাহাদুর খাঁর পাঠানদেব উপর আধিপত্য আছে বটে, নবাববংশীয় বলিয়া বিশেষ সম্মানও আছে বটে, কিন্তু তিনি অধ্যবসায়শীল নহেন; আর, কি শরীরেব, কি মনের, সেরূপ তেজও তাঁহার নাই। আফিং সিদ্ধি প্রভৃতি নেশাদি লইয়াই তিনি সদাই বিব্রত। এজন্য মোবাবেক শা খাঁর মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিযাছিল যে, তিনিই বেরিলির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। গত ৩১শে মে সৈনিকাশ্রমে অগ্নিপ্রদানের সংবাদ পাইযা মোবারেক শা খাঁ প্রায় এক শত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হইলেন, প্রায পাঁচ শত অস্ত্রধারী অনুচবকে সঙ্গে লইলেন। মহাসমারোহে তিনি এইরূপে কোতোয়ালীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে মনে এরূপ কল্পনা ছিল যে, দিল্লীর সম্রাটের অধীনে তিনি বেরিলির নবাব নাজিমের পদ গ্রহণ করিবেন।

আমি। আপনি এত ব্যাপাব জানিলেন কিরূপে?

মহম্মদ সফী। (হাসিয়া) সর্ব্ব সংবাদ সংগ্রহ করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সহরের চারি দিকে দিন রাত্রি আমার চর ঘুরিতেছে, সহরের সামান্য ব্যাপারটী পর্য্যন্ত আমার নখদর্পণে। খাঁ বাহাদুর খাঁ কি দিয়া ভাত খান, তাহা পর্য্যন্তও আমি জানি। মোবারেক শা খাঁ কখন্ কোন্‌খানে কাহার সহিত কি পরামর্শ করিতেছেন, তাহারও সকল সংবাদ আমি রাখিতেছি। বিশেষ, বিদ্রোহ ঘটিবার এক মাস পূর্ব্ব হইতেই মোবারেক শা খাঁ আমাদের সেনাপতি বখ্‌ত খাঁর সহিত এ বিষয়ে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন;—এ কথা আমি সম্প্রতি বখ্‌ত খাঁর মুখেই শুনিয়াছি।

আমি। সে কথা যাক্। এখন কিরূপে খাঁ বাহাদুর খাঁ নবাব হইলেন বলুন।

মহম্মদ সফী। এ দিকে মোবারেক শা খাঁ পূর্ব্বোক্তরূপ দল বাঁধিয়া কোতোয়ালী অভিমুখে আসিতেছিলেন, ও দিকে খাঁ বাহাদুর খাঁ ঠিক ঐরূপ দল বাঁধিয়া কোতোয়ালী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কি ছোট, কি বড়, পুরাতন সহরের সমস্ত মুসলমান খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে ছিল। নও মহল্লার সৈয়দেরাও খাঁ বাহাদুর খাঁর পক্ষে ছিল। সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, উট এবং অনেক অস্ত্রধারী পুরুষও ছিল। মধ্য পথে দুই দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মোবারেক শা খাঁ নিজের চিরপোষিত আশাকে বিসর্জ্জন করত তৎক্ষণাৎ খাঁ বাহাদুর খাঁর দলে মিশিয়া গেলেন। তিনি খাঁ বাহাদুর খাঁকে বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি সদলে আপনার নিকট যাইতেছিলাম, তবে সৌভাগ্য এই, পথিমধ্যেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আপনি দিল্লীশ্বরের অধীনে নবাব নাজিমের পদ গ্রহণ করুন, দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক হউক।" বলা বাহুল্য, মোবারেক শা খাঁ অতি চতুর লোক। তিনি মনে মনে স্থির করেন, "এ সময় আমি যদি নবাব হইব বলিয়া খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হই, তাহা হইলে ঘরে ঘরে বিষম বিবাদ বাধিবে এবং রক্তপাত তাহার পরিণাম হইবে। কিন্তু আমি যদি খাঁ বাহাদুর খাঁর অধীনত্ব এক্ষণে স্বীকার করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমিই এ প্রদেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতে পারিব। কেন না, খাঁ বাহাদুর খাঁ সদাই নেশায় মগ্ন এবং স্বয়ং কার্য্য করিতে অক্ষম।"

আমি। তৎপরে খাঁ বাহাদুর খাঁ কোতোয়ালীতে গিয়া কি করিলেন? আমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলুন,—আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিতেছে।

মহম্মদ সফী। কোতোয়ালীতে পৌঁছিবার পর তৎক্ষণাৎ এক মসনদ প্রস্তুত হইল। বহুমূল্য শাল ও বিচিত্র বসন দ্বারা ঐ মসনদকে আবৃত করা হইল। তখন মাদারালী খাঁ রোহিলখণ্ড প্রদেশের সমগ্র পাঠানের সম্মতি জ্ঞাপন করত খাঁ বাহাদুর খাঁকে সেই মসনদে উপবেশন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ সুবর্ণ, হীরক এবং মুক্তাখচিত বস্ত্রে সুশোভিত হইয়া সেই মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তখন চারি দিক্ হইতে 'জয় দিল্লীশ্বরের জয়!' 'জয় নবাব খাঁ বাহাদুরের জয়!' ধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ কোতোয়ালীর সম্মুখে মহম্মদী ঝণ্ডা বা পতাকা প্রোথিত করা হইল। একটী ইষ্টকনির্ম্মিত চাতালে কয়েক ব্যক্তি ধূপ ধুনা ইত্যাদি প্রজ্বলিত করিতে লাগিল। এইরূপে খাঁ বাহাদুর খাঁ বেরিলির শাসনকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইলেন।

আমি। সম্ভবত তখন তথায় অবশ্যই বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল?

মহম্মদ সফী। হাঁ। দশ সহস্র লোকের কম নহে।

আমি। খাঁ বাহাদুর খাঁ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমে কি কাজ করিলেন?

মহম্মদ সফী। কোতোয়ালীতে ইংরেজের আমলের যে কাগজ-পত্র দলিল-দস্তাবেজ ছিল, সমস্তই তিনি পুড়াইয়া ভস্মসাৎ করিবার হুকুম দিলেন। এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে কাগজ-পত্র সমস্তই নিক্ষিপ্ত হইল। কোতোয়ালীতে ইংরেজের আমলের যে সমস্ত বরকন্দাজ ছিল, তাহাদের পরিধেয় বসন সমস্ত কাড়িয়া লওয়া হইল। এমন সময় কয়েক জন গোয়েন্দা আসিয়া খাঁ বাহাদুর খাঁকে সংবাদ দিল, কয়েক জন ইংরেজ মুন্সেফ হামিদ হোসেনের বাড়ীতে লুক্কায়িত আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরেজগণকে খুন করিবার আদেশ দিলেন। অমনি কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ 'মার মার' শব্দে হামিদ হোসেনের বাটীর দিকে ধাবিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ফজলু সেখ আমাদের যাইবার পূর্ব্বে হামিদ হোসেনের গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া ইংরেজগণকে খুন করিয়াছে এবং হামিদ হোসেনের যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়াছে।"

আমি। ফজলু কে?

মহম্মদ সফী। ফজলুকে আপনি জানেন না কি? সে এক জন সহরের গুণ্ডা। তাহার দলে প্রায় আড়াই শত গুণ্ডা আছে।

আমি। তাহার নাম ফজলু কেন হইবে? তাহার নাম যে বকাউল্লা।

মহম্মদ সফী। তাহার অনেকগুলি নাম আছে; নানা স্থানে সে নানা নামে প্রসিদ্ধ। তাহার শরীরে অসুরের ন্যায় বল। তাহার হৃদয় নির্ভয়। সে কাহাকেও দৃক্‌পাত করে না।

আমি। সে যাহা হউক, খাঁ বাহাদুর খাঁ ফজলুর কার্য্য শুনিয়া কি কহিলেন?

মহম্মদ সফী। তিনি অতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—"ইংরেজ মাত্রকেই হত্যা করিয়া ফেলিতে হইবে।" এক একটী ইংরেজের মাথার মূল্য দশ টাকা করিয়া ধার্য্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ঘোষণা প্রচারিত হইল, "যে কোন ব্যক্তি কোন ইংরেজকে আশ্রয় দিবে অথবা আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিবে, তাহাকেও বিশেষরূপ দণ্ড দেওয়া হইবে। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে সেই আশ্রয়দাতার প্রাণদণ্ড হইতে পারে, অথবা তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহার নাক কান কাটিয়া তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

আমি। গতকল্য বেলা কয়টা পর্য্যন্ত তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন?

মহম্মদ সফী। বেলা প্রায় ১১টার পর তিনি দরবার ভঙ্গ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনরায় বেলা ৩টার পর আসিয়া কোতোয়ালীর মসনদে বসিলেন। সেই সময় স্পিনেল নামক এক জন ইংরেজ, তাহার স্ত্রী এবং তাহার দুইটী শিশু-সন্তানকে কোতোয়ালীতে ধৃত করিয়া আনা হইল। খাঁ বাহাদুর খাঁ তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন। প্রথমত শিশুসন্তান দুইটীকে পিতামাতার সম্মুখে বধ করা হইল। তাহার পর, স্ত্রীকে জঘন্যভাবে তীক্ষ্ণধার বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বধ করা হইল। অবশেষে স্পিনেল সাহেবের মাথা লগুড়াঘাতে গুঁড়া করা হইল। পূর্ব্বে রেক্‌স রবার্টসন, হেবাক এবং ওর প্রভৃতি সাহেবগণ সহরবাসীদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। কয়েক জন বদমাইস গুণ্ডা ঐ সাহেবদের মৃতদেহ উলঙ্গ করত সহরের প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া টানিয়া আনিয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে খাঁ বাহাদুর খাঁর সিংহাসনের নিকটে রাখিয়া দিল। তিনি হুকুম দিলেন,—কল্য প্রাতে আবার ইহাদের মৃতদেহ সহরময় ঘুরাইতে হইবে। কিন্তু কার্য্যত তাহা ঘটে নাই। অদ্য প্রাতঃকালে মৃতদেহ হইতে বিষম দুর্গন্ধ উত্থিত হওয়ায় সহরের বাহিরে একটী পুষ্করিণীতে তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

আমি। গত কল্য বৈকালে মসনদে বসিয়া তিনি আর কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন আমাকে বলুন।

মহম্মদ সফী। বেরিলির কারাধ্যক্ষ হ্যান্‌স বেরো সাহেব কোতোয়ালীতে বেলা প্রায় ৫টার সময় আনীত হইলেন। তাঁহার হাতে হাতকড়ি, পায়ে শিকল। মুখ দিয়া রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। গত কল্য সমস্ত দিন তিনি অকুতোভয়ে অসীম সাহসে বিদ্রোহী সহরবাসীর বিরুদ্ধে কারাগারের দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন। বন্দুকের দ্বারা তিনি প্রায় ৩০ জন লোককে হত্যা করেন। কিন্তু অবশেষে অপরাহ্ণ কালে তিনি বন্দী হইয়া খাঁ বাহাদুর খাঁর সম্মুখে আনীত হইলেন। সে সময়েও তাঁহার সাহস ও বিক্রম দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। তিনি সর্ব্বজনসমক্ষে সগর্ব্বে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"আমি এক্ষণে তোমাদের বন্দী। তোমরা আমাকে খুন করিতে পার। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ কথা ভাবিও না যে, আমাকে এবং আরও কয়েক জন এই সহরের ইংরেজকে খুন করিয়াই তোমরা এ দেশে ইংরেজ-শাসনের অবসান করিতে সক্ষম হইবে। অচিরেই প্রতিফল পাইবে, আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিও।" এই কথা বলিবামাত্র খাঁ বাহাদুর খাঁ তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। কারাধ্যক্ষের দেহ প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

আমি। বড়ই বিপরীত ব্যাপার ঘটিয়াছে দেখিতেছি। তারপর কি হইল?

মহম্মদ সফী। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খাঁ বাহাদুর খাঁ আপন পারিষদবর্গ সঙ্গে লইয়া তানজামের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নকীব ফুকরাইতে লাগিল,—"হে দোকানদারগণ! তোমাদের আর কোন ভয় নাই। তোমরা আসিয়া দোকান-পাট খোল। হে সহরবাসিগণ! তোমাদের আর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে পলাইবার আবশ্যক নাই। যাহারা পলাইয়াছে, তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করুক। হে শিল্পিগণ! তোমরা শিল্পকার্য্যে মন দাও। ইংরেজ-রাজত্ব লোপ হইয়াছে। আর কস্মিন্‌কালেও ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপিত হইবে, সেরূপ আশা এককালেই আর নাই। দিল্লীর সম্রাট্‌ই এখন ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। আমি তাঁহার অধীনে নবাব নাজিমের পদে নিযুক্ত হইয়াছি। ভয় নাই! ভয় নাই! ভাই সকল! আর ভয় নাই।" নকীব এই কথা ফুকরাইবামাত্র, অমনি শত শত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"জয় নবাব বাহাদুরকী জয়! জয় দিল্লীশ্বরকী জয়!"

আমি। এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইলে দোকানদারগণ দোকান খুলিল কি ?

মহম্মদ সফী। দুই এক জন ছাড়া আর কেহই দোকান খুলিতে সাহস করিল না।

আমি। খাঁ বাহাদুর খাঁ রাত্রি কতক্ষণ পর্য্যন্ত এরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ?

মহম্মদ সফী। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্য্যন্ত তিনি নানা স্থানে নানা পল্লীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐরূপ ঘোষণা দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমি। কল্য রাত্রে সহরে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল কি ?

মহম্মদ সফী। না। কেবল ৪।৫ জন মহাজনের গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

আমি। অদ্যকার খবর কি ?

মহম্মদ সফী। অদ্য ত প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি আপনার নিকট আসিয়াছি। অন্য কোন সংবাদ কেমন করিয়া বলিব ?

আমি। এত তাড়াতাড়ি কেন ?

মহম্মদ সফী। আমাদের সেনাপতি বখ্‌ত খাঁ আমাকে আপনার নিকট এত তাড়াতাড়ি করিয়া প্রাতঃকালে পাঠাইলেন।

আমি। কেন কেন ? ব্যাপার কি ?

মহম্মদ সফী। ব্যাপার আর কিছুই নয়, কেবল আপনি আমাদের অধীনে চাকরী স্বীকার করেন, উহাই তাঁহার মন্তব্য। পাছে অন্য কাহাকেও পাঠাইলে আপনি কথা গ্রাহ্য না করেন, তাই আমাকে পাঠাইয়াছেন। বিশেষ, বখ্‌ত খাঁ আরও জানেন, আমার সহিত আপনার সদ্ভাব আছে। আমার অনুরোধ আপনি কখন এড়াইতে পারিবেন না, ইহাই বখ্‌ত খাঁর বিশ্বাস।

আমি। আমাকে লইয়া তিনি এত টানাটানি করিতেছেন কেন ? সহরে কি আর উপযুক্ত লোক নাই ? এক জন ভাল মুহুরিকে বাছিয়া গুছিয়া রাখিলেই তো হইত।

মহম্মদ সফী। আচ্ছা, আপনাকে আমি গোপনে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের অধীনে চাকরী স্বীকার করিতে আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন ? ক্ষতি কি ? চাকরী করিলে লাভ ভিন্ন তো লোকসান নাই। বিশেষ, আমরা এখন বড়ই বিব্রত হইয়াছি। নানা স্থান হইতে দিন-রাত গাড়ী করিয়া বাক্স বাক্স টাকা আসিতেছে। সে সকল টাকার হিসাবপত্রই

বা রাখে কে? লইয়া খরচ-পত্রই বা করে কে? টাকা মজুদ, রসদও মজুদ,—অথচ আবশ্যক হইলে, সময়ে টাকাও পাওয়া যায় না, রসদও পাওয়া যায় না। তাই বলি, আপনি টাকা ও রসদ বিভাগের অধ্যক্ষ হউন। ইহাতে আপনার লাভ বই লোকসান হইবে না।

আমি। আপনিও যদি বখ্ত খাঁর ন্যায় চাকরীর জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তবে আর আমার আশ্রয় কোথায়?

মহম্মদ সফী। কেন, আপনার চাকরী লইতে এত ভয় কিসে? আপনি কি মনে করেন যে, ইংরেজ এখনি আবার স্বসৈন্যে ফিরিয়া আসিবে?

আমি। ইংরেজ ফিরিয়া আসুক, আর নাই আসুক, আপনাদের অধীনে চাকরী লইলে আমার দুরবস্থার একশেষ হইবে। আপনাদের নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, প্রকরণ নাই, পদ্ধতি নাই, আছে কেবল মাঝে মাঝে 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দ। আপনাদের কাণ্ড যাচ্ছেতাই রকমের; যেন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ উপস্থিত। আমি একা কেন, আমার ন্যায় দশ জন লোক আসিলেও সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ কবিতে সক্ষম হইবে না।

মহম্মদ সফী। আপনি ঠিক কথাই বলিযাছেন। তবে আমি চলিলাম; বখ্ত খাঁকে গিযা বলিব যে, তিনি কিছুতেই চাকরী স্বীকার করিতে রাজী নহেন।

আমি। আপনি মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিবেন, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, আমি কিছুতেই চাকরী স্বীকার করিব না।

তখন আমি মনে মনে কহিলাম, "ইংরেজের নুণ খাইয়া, কিছুতেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়।" মহম্মদ সফী উঠিবার উপক্রম করিলেন, আমি তাঁহাকে হাত ধরিযা বসাইয়া বলিলাম, আমার এক বক্তব্য আছে শুনুন।

মহম্মদ সফী। কি বলুন।

আমি। আপনি বলিয়াছেন, "আমার প্রাণ থাকিতে আপনার প্রাণ কখনও নষ্ট হইবে না।" কিন্তু এক্ষণে অস্ত্রাঘাতে প্রাণে না মরি, অনাহারে বুঝি প্রাণে মরিতে হইল।

মহম্মদ সফী। কেন,কেন? বেণিয়া মুদি কি গত কল্য আপনাদের সিধা দিয়া যায় নাই?

আমি। দিযাছিল বটে, কিন্তু যাহা দিযাছিল তাহা আমাদের অভক্ষ্য। ছাতু লঙ্কা খাইয়া কয়দিন প্রাণে বাঁচিব?

মহম্মদ সফী। কল্য কি সে আটা ঘির পরিবর্ত্তে ছাতু লঙ্কা দিয়া গিয়াছিল ?

আমি। হাঁ। আপনি জানেন, ছাতু লঙ্কা খাওয়া আমার কখন অভ্যাস নাই। কল্য প্রাণের দায়ে ছাতু লঙ্কা কিছু খাইয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। (পেটের অসুখের কথাটী মিথ্যা)

মহম্মদ সফী আমার উদরাময়ের কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, আটা ঘি পাঠাইয়া দিলেও এখানে রুটী তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত লোক নাই। আর আপনি জানেন আমি স্বয়ং কখনও রন্ধন করিয়া খাই নাই। সুতরাং রন্ধনকার্য্যে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। অতএব আপনি আটা ঘি পাঠাইবারও যদি রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আমার অনাহার বা অর্দ্ধাহার হইবে। (বলা বাহুল্য, আমার এইরূপ উক্তিও মিথ্যা)

মহম্মদ সফী উত্তর দিলেন, "তবে আপনার আহারের উপায় কি হইবে বলুন দেখি ?"

আমি। সহরে হরদেব এবং হবগোবিন্দ নামক আমার দুই দাদা আছেন। সেখানে যদি প্রত্যহ আমাকে পাঠাইযা খাওয়াইযা আনিতে পারেন, তাহা হইলেও আমাদের প্রাণরক্ষা হইতে পারে।

মহম্মদ সফী। তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ?

আমি। আমাদের সঙ্গে আট জন অশ্বারোহী প্রহরী দেবেন, তাহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে এবং আহারাদি হইলে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিবে। বলা বাহুল্য, আমরা অবশ্যই পলাইব না। আর পলাইবই বা কোথায় ?

মহম্মদ সফী এ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, —"আমি একা আপনার কথার উত্তর দিতে পারিতেছি না। বথ্‌ত খাঁর আদেশ ব্যতীত আপনাকে এরূপভাবে ছাড়িয়া দিতে সক্ষম নহি। কিন্তু বথ্‌ত খাঁ যখন শুনিবেন যে, আপনি চাকরী লইতে কিছুতেই রাজি নন, তখন যে তিনি এরূপভাবে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিবেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তবে এক কৌশল করা যাক। বথ্‌ত খাঁকে গিয়া বলিব যে, দুর্গাদাস বাবুর মন অনেক নরম হইয়াছে। তিনি আপনার অধীনে চাকরী

স্বীকার করিতে বার-আনা রূপ সম্মত হইয়াছেন, তবে এই কয়েক দিন কারাগারে আহারের গোলযোগে তাঁহার উদরাময় হইয়াছে। পীড়া একটু আরাম হইলে তিনি সম্ভবত চাকরী লইবেন। এইরূপ কথা বলিলে অবশ্যই বখ্‌ত খাঁ আপনাকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া একবেলা আহারের জন্য সহরে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন।

আমি। আচ্ছা, যে উপায়ে হউক, আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই মঙ্গল।

মহম্মদ সফী আমাকে সেলাম করিয়া অশ্বারোহী দলে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

বেলা তখন প্রায় ১০টা। অদ্য ২রা জুন, মঙ্গলবার, বেরিলি-বিদ্রোহের তৃতীয় দিবস।

উনত্রিশ

মহম্মদ সফী প্রস্থান করিবার পরে বেণিয়া মুদি সিধা আনিল। অদ্যকার সিধা ডাল আটা ঘৃত লবণ এবং তামাক। আহারাদি কার্য্য যথানিয়মে যথাসময়ে সম্পন্ন হইল।

বেলা ৩টার সময় আবার 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দ উপস্থিত হইল। এবার ভয়ঙ্কর শব্দে যেন ধরাধাম টলটল কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের প্রহরিগণও অস্ত্রশস্ত্র হস্তে করিয়া সেই শব্দাভিমুখে দৌড়িল। আমি, ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ, শেঠ জহুরীমল, গোমস্তা এবং ভৃত্য এই পাঁচ জনে বাটীর বাহির হইয়া ব্যাপার দেখিতে অগ্রসর হইলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের বহির্গমনে বাধা দিবার বা নিবারণ করিবার অন্য কোন প্রহরীই নিকটে নাই। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম, মহা দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি ব্যাপার পড়িয়াছে এবং সহরের দিক্ হইতে প্রায় তিন সহস্র লোক সেনা-নিবাসের দিকে আসিতেছে। সেই তিন সহস্র লোকের ধ্বজা পতাকা লইয়া, তরবারী বন্দুক লইয়া আগমন দেখিয়া সেনা-নিবাসের যত সেনা 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দ করিয়া এক ভীষণ বিকট ধ্বনি করিতেছে। কে কাহার ঘাড়ে পড়িতেছে, কে কখন ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। দূর হইতে সেই

তিন সহস্র লোককে অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া আমার প্রথম একটু সন্দেহ হইয়াছিল, বুঝি সত্য সত্যই ইংরেজের গোর্খা পল্টন আসিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম আমার এ আশা দুরাশা মাত্র।

রহস্য এই। একটু গোড়া হইতে না বলিলে পাঠকগণ এ রহস্য বুঝিবেন না। অদ্য অর্থাৎ ২রা জুন, মঙ্গলবার, বেলা ১টার সময় নূতন নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ সহরের কোতোয়ালীতে উপস্থিত হইয়া এক বিরাট দরবার করেন। সহরের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী সে দরবারে উপস্থিত হন। পাঁচ শত জোয়ান বাছিয়া তাহাদের হস্তে বন্দুক দেওয়া হয়। কতকগুলি লোক কেবল ঢাল তরবারী প্রাপ্ত হয়। আর এক দল লোক বর্শা ও জাল-কিরিচ প্রাপ্ত হয়। অন্য এক সম্প্রদায় অশ্বে আরোহণ করিয়া অশ্বারোহী সৈন্যরূপে সজ্জিত হয়। দরবারে নূতন রাজ্য কিরূপে শাসন করিতে হইবে, কিরূপে প্রজাপুঞ্জ সুখে থাকিবে, প্রথমে ইহারই বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, সে বিষয়ের মীমাংসা কিছুই হইল না। শেষে স্থির হইল, বিদ্রোহী সৈন্যের অধিনায়ক বখ্‌ত খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা হউক। তাঁহার নিকট হইতে অস্ত্র-শস্ত্র এবং আড়াই শত সুশিক্ষিত সিপাহী রাজ্য-রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হইবে। ইহাই প্রধান মন্তব্য রহিল। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর মনে ঐরূপই গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যত এই বলিয়া যাত্রা করিলেন যে, তিনি বখ্‌ত খাঁ এবং মহম্মদ সফীকে সম্মান প্রদর্শন করণার্থেই তাঁহাদের নিকট যাইতেছেন। হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার উপর খাঁ বাহাদুর খাঁ উপবিষ্ট। সঙ্গে ইহা ব্যতীত আরও ১৬টী হস্তী ছিল। তদুপরি সহরের সম্ভ্রান্ত রেইসগণ বসিয়াছিলেন। যখন এই দল সেনা-নিবাসের ধারে কালেক্টর সাহেবের কাছারীর সন্নিকটে উপস্থিত হইল, তখন বিদ্রোহী সেনাগণ ইহাদিগকে দেখিতে পাইল,—কিন্তু ইহারা কে?—কেন আসিতেছে?—অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিবার উদ্দেশ্যই বা কি?—ইহা বিদ্রোহী সেনাগণ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। তাহারা আতঙ্কে অধীর হইয়া, শত্রু-আগমনসূচক ভয়ব্যঞ্জক বিউগল বাজাইয়া দিল। তারপর ঐরূপ 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' শব্দ পড়িয়া গেল। সেই শব্দ শুনিয়া আমাদের প্রহরিগণ প্রহরার কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দৌড়িয়া ব্যাপার দেখিতে ছুটিল। আমরাও শূন্য ঘর পাইয়া প্রহরীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদে বাহিরে আসিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, বিদ্রোহী সিপাহীগণ খাঁ বাহাদুর খাঁর দলের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। খাঁ বাহাদুর খাঁর দলস্থ কয়েক

ব্যক্তির শরীরে গুলির আঘাত লাগায় তাহারা ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। একটা হস্তী গুলি খাইয়া বিপরীত বিকট চিৎকারপূর্ব্বক দল হইতে দৌড়িয়া বাহির হইয়া সহরের দিকে ছুটিল। দেখিলাম তাহার পায়ের এবং গায়ের চাপনে পড়িয়া ৫।৭ জন ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনেকে বিষম আঘাত পাইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ এইরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বখ্‌ত খাঁ তাঁহার এই বন্ধুভাবের আগমন হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি যে বন্ধুভাবে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, এই অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইবার জন্য হাওদার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। আরও কয়েক জন রেইস হাওদার উপরে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে রুমাল ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে মহম্মদ সফী কোথা হইতে তীরবেগে অশ্বারোহণে ছুটিয়া আসিয়া, যে সকল সিপাহী গুলি চালাইতেছিল তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন এবং গুলি চালানো বন্ধ করিয়া দিলেন। বখ্‌ত খাঁ তখন প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বোধ হয় কিঞ্চিৎ লজ্জিতও হইলেন। বখ্‌ত খাঁ মহম্মদ সফীর সহিত কি পরামর্শ করিয়া নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর নিকট তৎক্ষণাৎ এক জন দূত পাঠাইলেন। খাঁ বাহাদুর খাঁ সেই দূতের কথা শুনিয়া সহরের যাবতীয় লোককে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সকলেই অমনি পশ্চাৎপদ হইয়া সহরাভিমুখে যাত্রা করিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ পাঁচ জন বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে লইয়া বখ্‌ত খাঁ ও মহম্মদ সফীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সম্মানের জন্য ১১টি তোপধ্বনি হয়। কিন্তু বখ্‌ত খাঁ প্রথমতঃ নবাব সাহেবকে বিশেষরূপ সম্ভাষণ বা আদর অভ্যর্থনা করিলেন না এবং নবাব সাহেব উপঢৌকনস্বরূপ এক সহস্র মুদ্রা বখ্‌ত খাঁকে প্রদান করিলে তাহাও তিনি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে মোবারেক শা খাঁর প্ররোচনা-বাক্যে বখ্‌ত খাঁ ঐ টাকা গ্রহণ করেন। তৎপরে বখ্‌ত খাঁর সহিত খাঁ বাহাদুর খাঁর কানাকানি পরামর্শ হইল। তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রত্যাগমন কালে প্রত্যেক সেনা-নায়ককে নবাব সাহেব কিছু কিছু টাকা দিয়া আসিলেন এবং সমগ্র সৈন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবা লোগ্‌! তোম-লোগনে বড়া আচ্ছা কাম কিয়া। খোদানে চাহাতো হাম তোমারে হাতমে সোনেকী কড়ে দেলওয়ায় দেঙ্গে।"

নবাব সাহেব ঘরে গেলেন। আমরাও আপন আপন ঘরে আসিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, প্রহরিগণ আমাদের গৃহে সঙ্গীণ ঘাড়ে করিয়া পাহারা দিতে নিযুক্ত। আমি মনে মনে বলিলাম,—"বলিহারী পাহারায়! হে দফাদার সাহেব! তুমি না বলিয়াছিলে,—এবার বখ্‌ত খাঁর শক্ত হুকুম,—এ স্থান হইতে নড়িলেই প্রাণদণ্ড হইবে।"

ত্রিশ

অদ্য চতুর্থ দিন, ৩রা জুন, বুধবার। আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া তামাক খাইতেছি এবং ভ্রাতা কালীপ্রসাদকে বকিতেছি। কি করি, কোন কাজ-কর্ম্ম নাই, কাজেই ভাইকে একহাত বকিয়া লইতেছি। ভ্রাতার অপরাধ বিশেষ কিছু ছিল না। ভ্রাতাকে আমি প্রাতঃস্নান করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু কালী একটু ইতস্তত করায় আমি বিরাশী সিক্কার ওজনে ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলাম। কালী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিয়াছে, তখনও আমার বকুনি ফুরায় নাই। শেঠজী বলিলেন,—"বাবু সাহেব। আপনি ক্ষেপিলেন না কি?" আমি বলিলাম,—"কিঞ্চিৎ বটে।"

শেঠজী। ভাইটী একে ছেলেমানুষ, তাহার উপর বন্দী, তাহার উপর এখানে সময়ে আহার মিলে না,—এ সময় কি বকা ভাল দেখায়, না উচিত হয়?

এইরূপ আমাদের কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় এক সুখের সংবাদ আসিল। অন্ধ চক্ষু পাইলে যেরূপ সুখী হয়, আমি সেইরূপ সুখী হইলাম। পাঁচ জন সওয়ার এবং এক জন দফাদার আমার নিকট উপস্থিত হইল। দফাদার এক পার্সী চিঠি এবং এক ছাড়পত্র আমার হাতে দিল। পত্র পড়িয়া ভায়াকে বলিলাম, "উঠ, আর বিলম্ব করিও না, চল, দাদার বাসায় যাই।"

পাঠক! বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিয়াছেন, এই ছাড়পত্র এবং এই অশ্বারোহিগণ মহম্মদ সফী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। আমরা দাতৃগৃহে গিয়া আহার করিবার অনুমতি পাইয়াছি। আমাদের দুই ভ্রাতার জন্য দুইটী অশ্বও আসিয়াছে। বেলা তখন আটটা বাজিলেও আমরা দুই ভাই 'মঙ্গলের উষা'

বুধে পা' করিয়া ছয় জন অশ্বারোহিপরিবৃত হইয়া অশ্বারোহণে আনন্দিত মনে সহরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। শেঠজীর মুখটী কিন্তু চূণ হইয়া রহিল দেখিয়া আমার দুঃখ হইল। আমি বলিলাম,—"শেঠজী! আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

আমাদের দুই ভ্রাতার জন্য মহম্মদ সফী ২টী সুশিক্ষিত বড় বড় এবং তেজীয়ান ঘোড়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সে ঘোড়ার জিনের উপর ক্যাবুলে অর্থাৎ জিনের দুই পার্শ্বস্থ চামড়ার থলির ভিতরে ২টী রিভলভার ছিল।

আমরা ঘোটকদ্বয়ে আরোহণ করিলাম। আমরা আগে আগে, আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহরী অশ্বারোহিগণ যাইতে লাগিল। তাহাদের কটীবন্ধে তরবারি নিবদ্ধ, বাম হস্তে ঘোড়ার লাগাম, দক্ষিণ হস্তে বর্শা।

শীঘ্র গতিতে আমরা ময়দান পার হইলাম। সহরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম পথে জনমানব নাই। সমস্ত দোকান বন্ধ, হাটে বাজারে লোক-সমাগম কিছুই নাই। বোধ হইল সকল লোক এককালে কোথাও পলাইয়াছে। স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের চিহ্ন দৃষ্ট হইল। কাহারও ঘর সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইয়াছে, কাহারও গৃহ অর্দ্ধদগ্ধ, কাহারও ঘরের কপাট জানালা ভগ্ন, কোথাও বা রাজপথে মৃতদেহ নিপতিত, সৎকার করিবার কেহই নাই, শকুনিকুল সমাগত হইয়া সেই শবোপরি বসিয়া সানন্দে পচা নরমাংস ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও দেখিলাম, পথিমধ্যে রাশিকৃত গবরমেণ্টের আফিং এর 'বাট' ছড়ান রহিয়াছে। এক স্থানে দেখিলাম, বরফি মিঠাই ও জিলাপির হাঁড়ি ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলা মিঠাই ও বরফি ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে। কোন স্থানে সুজি ও আটার উপর দিয়া ঘোড়া চালাইতে লাগিলাম। প্রকৃতই সহরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

সম্মুখে এক দল অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিলাম। তাহাদের হাতে এক একখানি তরবারি। তাহারা আমাদের সম্মুখীন হইয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসিল, "তোমরা কোথা যাইবে?" আমি উত্তর দিলাম, "আমরা বখ্‌ত খাঁর লোক। শুনিলাম সহরে দারুণ অত্যাচার হইতেছে, তাই অত্যাচারকারিগণকে ধৃত করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে এখানে পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে তোমরা কে তাহার পরিচয় দাও।" তাহারা বলিল, "আমরা নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর লোক। আমরা নগরের শান্তিরক্ষক।"

আমি। তোমরাই যদি শান্তিরক্ষক, তবে সহরের ভিতর দিন-দুপুরে এরূপ ডাকাতি, লুণ্ঠন, হত্যা হইতেছে কেন? তোমরা কি কেবল নিদ্রা যাইতেছ? লুণ্ঠনের ভয়ে এক জনও দোকানদার দোকান খুলে নাই। তোমরা কোন্ মুখে তবে শান্তিরক্ষক বলিয়া পরিচয় দাও? অথবা তোমরাই বুঝি ডাকাত দলের আশ্রয়দাতা এবং অভিভাবক? চল, তোমাদিগকেই বখ্‌ত খাঁর নিকট লইয়া যাই, আগে তোমাদেরই বিচার করা হইবে।

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, ভ্রূকুটীভঙ্গিপূর্ব্বক এই কথা বলিবামাত্র সেই অস্ত্রধারী পুরুষগণ পার্শ্ববর্ত্তী গলির মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপাতের ন্যায় দ্রুতপদসঞ্চারে কে কোথায় যে দৌড়াইয়া পলাইল তাহা আমি ঠিক করিতে পারিলাম না। বলা বাহুল্য, আমি তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম না।

এইরূপে নানা ব্যাপার অবলোকন করিয়া, শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ বন্দোপাধ্যায় (মাতামহ কুলসম্পর্কীয়) দাদামহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দাদার গৃহের দ্বার রুদ্ধ, বাহির দিকে চাবি দেওয়া। 'দাদা দাদা' করিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। ভাবিলাম, ইঁহারাও সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছেন না কি? বিপদ্ গাঢ়তর দেখিতেছি।

দরজায় ধাক্কা দিলাম, কেহই উত্তর দিল না। আর একবার খুব জোরে ধাক্কা মারিলাম, কপাটের মুখ একটু ফাঁক হইল। দেখিলাম ভিতর দিক হইতে খিল-বদ্ধ। মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল ভিতরে অবশ্যই লোক আছে। দাদা বুঝি পালান নাই। বিদ্রোহীদের ভয়ে বুঝি ভিতরে খিল, বাহিরে চাবি দিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। তখন বাঙ্গালা ভাষায় আমি ডাকিতে লাগিলাম, "দাদা, আমি দুর্গাদাস আসিয়াছি।" হরগোবিন্দ দাদা তখন ছাত হইতে উত্তর দিলেন,—"কে, দুর্গাদাস! আমরা এই তোমার কথা বলাবলি করিতেছিলাম। যা হোক প্রাণে যে বাঁচিয়া আছ, সেই ভাল।" তিনি তখন ছাতের কিনারায় আসিয়া লম্বা দড়িতে বাঁধা একটা চাবি আমার সম্মুখে ঝুলাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"সঙ্গে তোমার এ সব কি! এত বন্দুক সওয়ার কেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম,—"আগে ভিতরে যাই, তবে সব কথা বলিতেছি।

দড়ি হইতে চাবিকাটী খুলিয়া দরজার চাবি খুলিলাম। ও দিকে হর-গোবিন্দ এবং হরদেব ভ্রাতৃদ্বয় খিল খুলিয়া আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমি এবং ভ্রাতা কালীপ্রসাদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। বেঙ্ক

এবং মোড়া আনাইয়া দফাদার এবং অশ্বারোহিগণকে বৈঠকখানার চাতালে বসিতে আসন দিলাম। এক জন সওয়ার ঘোটকসমূহের তত্ত্বাবধান জন্য বাটীর বহির্ভাগে নিযুক্ত রহিল।

এই দফাদারটী আমার বিশেষ পরিচিত এবং বন্ধু; আমি ইহাকে বিনা সুদে ১০০৲ এক শত টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলাম। সেই জন্য এ ব্যক্তি আমার বিশেষ বাধ্য ছিল। দফাদার জাতিতে মুসলমান এবং এক জন উৎকৃষ্ট পালোয়ান বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অনেকবার কুস্তি খেলায় জয়লাভ করিয়া অনেকবার সে অনেক টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার নামটী এখন আর আমার মনে নাই।

প্রহরীদিগকে প্রথমত বিশেষ আপ্যায়িত করিয়া অভ্যর্থনার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বসাইলাম। তারপর হরগোবিন্দ দাদাকে সকল ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি আমার অবস্থার কথা শুনিয়া বড়ই বিস্মিত এবং কাতর হইলেন।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। দাদা বলিলেন,—"দুর্গাদাস! যা হই-বার তা হইয়াছে, এখন বাটীর ভিতরে গিয়া স্নান আহার কর, বিশ্রাম কর।" আমি বলিলাম,—"একা একা বাটীর ভিতর না গিয়া দফাদারকে আগে জিজ্ঞাসা করা ভাল; কেন না, ও ব্যক্তি যদি আমার অন্দর-গমনে আপত্তি করে, তাহা হইলে কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়।" আমি হাসিয়া দফাদারকে বলিলাম, —"দফাদার সাহেব! আমরা তো এখন বন্দী, তোমরা এক্ষণে আমাদের প্রহরীর স্বরূপ; স্নান আহার তোমার সম্মুখেই কি করিতে হইবে? যদি বল, তবে তাহাই করি।" দফাদার বলিল,—"বাবু সাহেব! তাহা করিতে হইবে না, আপনি অন্দরেই যান। আপনার প্রতি আমাদের অবিশ্বাস নাই।"

অনুমতি পাইয়া দুই ভাই বাটীর ভিতর গমন করিলাম। সেখানে গিয়া এক বিপরীত কাণ্ড দেখিলাম। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা রামকমল চক্রবর্ত্তী মহাশয় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। তিনি আর বাঁচিবেন না, ইহা স্থির হইয়াছে। আমি হরগোবিন্দ দাদাকে জিজ্ঞাসিলাম, "ব্যাপার কি?—ইঁহার ব্যারাম কি?" দাদা বলিলেন,—"আজ তিন দিন হইতে ইনি অচেতন। তুমি জান, ইঁহার অনেকটা করিয়া আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল, তিনবারে আধ ভরির অধিক আফিং সেবন করিতেন। বিদ্রোহের পরদিন হইতে ইঁহার আফিং খাওয়া বন্ধ আছে। বাজারের সমস্ত দোকান বন্ধ। আর খোলা থাকিলেই

বা পথে বাহির হইয়া কে আফিং আনিতে যাইবে? চারি দিকে ডাকাতদল ফিরিতেছে। তথাচ সাহসে ভর করিয়া গতকল্য আমি আমি আফিং খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু কোথাও পাই নাই। যখন বাহির হই, তখন ইঁহার একটু সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু ফিরিয়া আসার পর যখন তিনি শুনিলেন যে, আফিং পাওয়া যায় নাই, তখন হইতেই ইনি সংজ্ঞাহীন হইয়া আছেন।"

আমি বলিলাম "আফিংএর ভাবনা কি? কত আফিং চাই? আমি এখনই আনাইয়া দিতেছি।" আমি বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দাদা আফিংএর মূল্যস্বরূপ একটী টাকা আমার হাতে দিতে আসিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, "টাকা চাই না। টাকায় এখন আফিং মেলে না। আমি বিনা টাকায় এখনি এত আফিং আনাইয়া দিব যে, ঠাকুরদাদার ছয় মাস তাহাতে বেশ চলিবে।"

আমি অন্দর হইতে সদরে আসিয়া দফাদারকে বলিলাম, "দফাদার সাহেব! আমার ঠাকুরদাদার প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, এ সময় তুমি যদি একটু উপকার কর, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।"

দফাদার। যদি সাধ্য হয়, তবে এখনি আমি সে কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি। আমার ঠাকুরদাদা আজ তিন দিন আফিং না খাইয়া অচেতন হইয়া আছেন। সহরের দোকান সব বন্ধ,—কোথাও আফিং পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আমরা আসিবার সময় দেখিলাম, গবরমেণ্টের অনেক আফিং রাস্তায় ছড়ান রহিয়াছে। তুমি যদি একবার ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া কিছু আফিং লইয়া আইস, তাহা হইলে ঠাকুরদাদা প্রাণ প্রাপ্ত হন।

দফাদার। ইহা আর অধিক কাজ কি, ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ দফাদার উঠিয়া পড়িল। বাহিরে গিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। পনের মিনিট মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া প্রায় তিন সের আফিং আমার হস্তে অর্পণ করিল।

আমি তখন আধ ভরি আন্দাজ আফিং জলে গুলিয়া, একটু একটু করিয়া ঠাকুরদাদাকে খাওয়াইতে লাগিলাম। দেড় ঘণ্টা পরে ঠাকুরদাদা একটু চৈতন্য লাভ করিলেন। তখন আমি স্নানাহার করিলাম। বেলা তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে।

বাসায় আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত বিবেচনা করিলাম না;—কেন না, দফাদার প্রভৃতি এখন পর্য্যন্ত কিছুই খায় নাই। দাদাকে বলিলাম,—"আজ আমি আসি,—কল্য আসিয়া আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিব।" হরগোবিন্দ দাদা কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ভাই, তুমি যে এরূপভাবে বন্দী হইবে, তোমার যে এরূপ দশা ঘটিবে, ইহা কখন ভাবি নাই। তোমার যে এককালে সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইবে, তাহা কখনও মনে ছিল না। এখন তো এই অবস্থা, ভবিষ্যতে যে অদৃষ্টে কি আছে তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? বিশেষ, কাশী ছেলেমানুষ, সে তোমার সহিত এরূপ কষ্ট কেমন করিয়া সহিবে!'

আমি বলিলাম,—দাদা! আপনি ভাবিবেন না, দুর্গা দুর্গা নাম করিয়া আমরা অচিরে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইব। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আমাদিগকে বিদায় দিন।"

দাদা। টাকা-কড়ি কিছু সঙ্গে রাখিবে কি? বল ত কিছু তোমার হাতে দি।

আমি। টাকার আবশ্যক কিছুই নাই।

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা, সাতটী টাকা আমাকে এক্ষণে দিন। কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।" দাদা তৎক্ষণাৎ আমার হাতে সাতটী স্থানে আটটী টাকা দিলেন। বলিলেন,—"টাকা কিছু হাতে রাখা ভাল।" আমি আট টাকা লইয়া বাহিরে আসিলাম। পুরস্কারস্বরূপ দফাদারকে দুই টাকা ও পাঁচ জন অশ্বারোহীকে পাঁচ টাকা, মোট সাত টাকা প্রদান করিলাম। সওয়ারগণ টাকা পাইয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হইল। দফাদার প্রথমত টাকা লইতে অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু আমার জেদে টাকা গ্রহণ করিল। তারপর আমি ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রণাম করিয়া, দুর্গা দুর্গা নাম স্মরণপূর্ব্বক যাত্রা করিলাম। বেলা তখন প্রায় দেড়টা।

একত্রিশ

ছয় জন সওয়ার এবং আমরা দুই ভাই, এই আট জন অশ্বারোহণে সহরের মধ্যে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলাম। যে পথ দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সে পথ দিয়া না গিয়া অন্য পথ ধরিলাম। কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার অভিলাষ সহরের সর্ব্ব স্থান সন্দর্শন করা। লুণ্ঠনপ্রিয় বিদ্রোহী সেনাগণ এবং অত্যাচারী সহরবাসী গুণ্ডাগণ বেরিলিতে কি যে ভয়ানক রসের অভিনয় করিতেছে, তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। কাহারও মাটীর প্রাচীর ভাঙ্গা, কাহারও খোলার চাল ভাঙ্গা, কাহারও অশ্বালয়ে অশ্ব অপহৃত, গোশালায় গোগণ অপহৃত। সর্ব্বত্রই নীরব নিস্তব্ধ ভাব। পক্ষিকুলও যেন পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে আর ডাকে না। সহরের ভগ্নশ্রী দেখিয়া হৃদয়ে বড় ব্যথা জন্মিল। চকের বাজারে গিয়া উপনীত হইলাম। অদূরে গভীর আর্ত্তনাদ হইতেছিল। আমরা বেগে অশ্ব ছুটাইয়া সেই দিকে গেলাম। দেখিলাম প্রায় ২৫ জন দস্যু নর্ত্তকী পান্নার গৃহ আক্রমণ করিয়াছে।

পান্না ষোড়শী, অকলঙ্ক শশী। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলিয়া পান্না রোহিলখণ্ডে সুবিখ্যাতা। ঐ প্রদেশস্থ সর্ব্বসাধারণের ধারণা,—পান্নার ন্যায় রূপবতী এবং গুণবতী রমণী বুঝি ধরাধামে আর জন্মগ্রহণ করে নাই।

পান্না সুশীলা, চরিত্রযুক্তা, বুদ্ধিমতী। নর্ত্তকী বলিয়া সে বারবিলাসিনী নহে। বিধাতার বিধানে সে পরপুরুষগামিনী বটে, কিন্তু একের প্রতিই তার মতিগতি। যখন যার তখন তার। কর্ণেল ক্রশ্‌মান বলিতেন, "পান্নার মুখের মধুর হাসিটুকুর দামই দশ হাজার টাকা।"

পান্না রামজানি জাতীয়া। আচারনিষ্ঠা প্রকৃত হিন্দুর ন্যায়। প্রত্যূষে স্নান করিয়া পান্না এক ঘণ্টা কাল শিবদুর্গার পূজা করিত এবং সেই সময় কাগজে হিন্দী অক্ষরে এক শত আটটী করিয়া রাম নাম লিখিত; সপ্তাহান্তে প্রত্যেক রাম নাম স্বতন্ত্র করিয়া কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিত। সেই কাগজের টুক্‌রা আটার সহিত মিশাইয়া মটরের ন্যায় এক একটী বড়ি তৈয়ারী করিত। এইরূপে সপ্তাহে ৭৫৬টী রাম নামের গুলি হইত। এক জন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ সেই রাম নামের গুলিসমূহ মৎস্যকুলের আহারের জন্য রামগঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিতেন।

পান্না মাছ-মাংস খাইত না। পান্না যেখানে বসিত, সেখানে কোন মুসলমান বসিতে পাইত না। মুসলমান-স্পৃষ্ট হইলে পান্না স্নান করিত। যে বিছানায় হুঁকা থাকিত, সে বিছানা হঠাৎ কোন মুসলমান বা নীচজাতি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে পান্না তৎক্ষণাৎ হুঁকার জল পরিবর্ত্তন করাইত।

উচ্চ শ্রেণীর বামজানি জাতীয়া প্রায় সকল নর্ত্তকীই এরূপ আচারবতী। পান্না ভ্রাতৃগৃহেই থাকিত। ভ্রাতা গৃহস্থ, তাহার স্ত্রী কুলবধূ, মাতাও পর্দ্দা-নসীন। ভ্রাতৃবধূর ঘোমটা দীর্ঘ। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বলিয়া যে কথা আছে, তাহা পান্নার ভ্রাতৃজায়াতেই সার্থক হইযাছে।

বাহিরের বৈঠকখানাই পান্নার অধিকারে। পান্না সেইখানেই থাকিত। সেইখানেই ওস্তাদ আসিয়া পান্নাকে নৃত্য-গীতাদি শিক্ষা দিত। সেইখানেই পান্নার বন্ধু-বান্ধব আসিয়া পান্নার সহিত আলাপ-পরিচয করিত। অন্দরে থাকিত পান্নার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া এবং মাতা। তাহারা গৃহস্থ।

পান্নার রঙ সাদা ধপ্‌ধপে, সেই শ্বেতপদ্ম হইতে গোলাপী রঙের আভা ঈষৎ দৃষ্ট হইত। মনে হইত বুঝি স্বর্গের কোন বিদ্যাধরী ধরাধামকে আলোকিত করিতে আসিয়াছেন।

বড় বড় ইংরেজগণ বলিতেন, "ইংলণ্ডীয রমণী বলিয়া পান্নাকে ভ্রম হয, কেন না, পান্নার যেমন রঙ, সেরূপ রঙ এদেশে সম্ভবে না।

ত্রিতলের ছাদে উঠিয়া নয়নজলে ভাসিয়া পান্না কাতর কণ্ঠে সকলকে বলিতেছে,—"কে আছ, আমাকে রক্ষা কর। দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ আমার ধন-প্রাণ লইতে আসিযাছে। এদিকে পান্নার গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া কযেক জন দস্যু দ্বিতলের দ্বার ভগ্ন করিতেছে। দুপদাপ শব্দ হইতেছে। পাছে কেহ পান্নার বাটীতে প্রবেশ করে, এই জন্য দশ-বার জন বিকটাকার মনুষ্য সম্মুখদ্বার রক্ষা করিতেছে। তাহাদের প্রায প্রত্যেকেরই হাতে এক একখানি তরবারি। কাহারও বা হাতে লৌহমণ্ডিত লাঠি। সেই ভীমদর্শন পুরুষগণ 'আলি আলি' শব্দ করিয়া তরবারি এবং লাঠি ঘুরাইতেছে। কাহার এমন সাধ্য যে, সহজে তাহাদের নিকট অগ্রসর হয়? আমি নিকটস্থ সওয়ারের নিকট হইতে একটী বর্শা লইয়া উন্মত্তের ন্যায ভীষণভাবে দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দফাদার ও পাঁচ জন সওয়ার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিল, ভায়া কাশীপ্রসাদ কেবল পশ্চাতে রহিল। আমি ভ্রূকুটী করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, আরক্ত-লোচনে, বাম হস্তে অশ্বরজ্জু ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই তীক্ষ্ণধার বর্শা উদ্যত করিয়া কহিলাম,—

"কেঁও বদমাইস্ লোগ! এ ক্যা জুলুম হ্যায়? দিন দোপরমে বেগুনা আওরংকে মোকান পর ডাকা ডাল্তা হ্যায়? আভি চলা যাও, নেহি তো আভি সবকা জান লেঙ্গা।"

আমার বর্শা উত্তোলন দেখিয়া সওয়ারগণ ঠিক সেইভাবেই বর্শা উত্তোলন করিয়া রহিল।

সাধু এবং দস্যুর প্রভেদ এইখানেই বুঝা যায়। তাহারা দলে পুষ্ট হইলেও, পাশব বলে আমাদের অপেক্ষা বলীয়ান হইলেও, দস্যুগণ কেমন যেন থতমত খাইয়া উঠিল। সহসা কোন কথার উত্তর দিবার তাহাদের শক্তি রহিল না। আমি তাহাদিগকে মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বজ্রনিনাদে বলিলাম,—"জল্‌দি জবাব দেও শালে লোগ্।"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বর্শার তীক্ষ্ণধার অগ্রভাগটী সম্মুখস্থ বিকটাকার পুরুষের বক্ষঃস্থলের আরও নিকটে লইয়া গেলাম। সেই বিকটাকার ব্যক্তি তখন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "আমরা খাঁ বাহাদুর খাঁর লোক। এই বাটীতে এক জন ইংরেজের বিবি হিন্দুস্থানীর বেশ পড়িয়া হিন্দুস্থানী সাজিয়া লুকাইয়া আছে। নবাব সাহেবের হুকুমে আমরা তাহাকে ধরিতে আসিয়াছি।"

আমি পূর্ব্ববৎ তীব্রস্বরে বলিলাম, "কে বলিল, এখানে বিবি লুকাইয়া আছে? তোদের সকল কথাই মিথ্যা। বদমাইস! ডাঁকাইত!"

সেই দস্যুদল হইতে এক জন উত্তর করিল,—"কে বলিল আমাদের কথা মিথ্যা?" এই কথা তাহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র, দফাদার সাহেব তীরবেগে তাহার নিকট গিয়া তাহার টুঁটি ধরিয়া টানিয়া আনিল এবং খানিক কান-মলার ঘোড়দৌড় করাইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দফাদার এক জন পালওয়ান, কুস্তিগীর জোয়ান,—শরীর যেন লৌহময়। বিষম কর্ণমর্দ্দনে দস্যুর কান দিয়া টস্ টস্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

দ্বিতলে উঠিয়া যে সকল দস্যু দরজা ভাঙ্গিতেছিল, তাহারা নিম্নে কিছু গোলযোগ বুঝিয়া নামিয়া আসিল। অবতরণমাত্র তাহাদের হস্তস্থিত লাঠি তরবারি মুগুর প্রভৃতি দফাদার সাহেব কাড়িয়া লইতে লাগিল। তাহারা কেমন বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া 'থ' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উচ্চবাচ্য করিতে পারিল না। দুই-এক জন দস্যু পলাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সওয়ারগণ দ্রুতপদে গিয়া তাহাদের গতিরোধ করিল। আমি বলিলাম, "যে

পলাইবার চেষ্টা করিবে তাহাকে এখনি কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিব। খবরদার—তোমরা আমার সঙ্গে সেনাপতি বখ্‌ত খাঁর নিকট চল। সেখানে তোমাদের বিচার হইবে।"

বখ্‌ত খাঁর নাম শুনিয়া সকলের মুখ আরও শুষ্ক হইল। তখন সেই বিকটাকার পুরুষ আমার পায়ে ধরিয়া বসিযা পড়িল। অতি কাতর স্বরে বলিল, "এ দফা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি যাহা দণ্ড দিতে হয় দিউন, বখ্‌ত খাঁব নিকট লইয়া যাইবেন না; দোহাই আপনার।" আমি বলিলাম, "তুমি যদি সত্য কথা বল, তাহা হইলে তোমায় এ যাত্রা ছাড়িয়া দিব। বল, কাহার হুকুমে পান্নাবিবিকে এরূপভাবে ধরিতে আসিযাছ?"

বিকটাকার পুরুষ যোড়হাতে কহিল,—"হুজুর! মা-বাপ; আমাকে এর পর রক্ষা করেন তো বলি।"

আমি। তোমার কিছু ভয় নাই, তুমি বল।

বিকটাকার পুরুষ। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ পান্নাকে ধরিয়া আনিতে বলেন নাই, তিনি এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানেন না। এই সহরের এক জন রেইস যাঁহার নাম শ্রী—, ইনি খুব বড় লোক। আপনিই কোন্ না ইঁহাকে চেনেন? আজ ছয় মাস হইতে ঐ রেইসের পান্নার উপর নজর পড়ে, পান্নাকে তিনি অনেক টাকা ও মণি-মুক্তা দিবার প্রলোভন দেখান। কিন্তু পান্না কিছুতেই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। অবশেষে বিদ্রোহের পর সহরে যখন অরাজকতা উপস্থিত হইল, তখন তিনি আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "পান্নাকে ধরিয়া আনিতে পারিলে তোমাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিব।" পঞ্চাশ টাকা নগদ দিযাছেন, আর বাকী টাকা পরে দিবেন বলিয়াছেন। দোহাই হুজুর! আমি সত্য কথা কহিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দিন।

আমি। তুমি আল্লার নাম করিয়া শপথ করিযা বল, আর কখন পান্নার গৃহ আক্রমণ করিবে না।

বিকটাকার পুরুষ। আমি আল্লার নাম করিযাই বলিতেছি, আর কখন পান্নার গৃহ আক্রমণ করিব না। পান্না আমার মা। মাকে যেমন সন্তানে রক্ষা করে, আমি তেমনি পান্নাকে রক্ষা করিব।

আমি ভাবিলাম, আমি নিজে তো বন্দী, সদাই প্রহরী-বেষ্টিত। আমিই বা ২০।২৫ জন ডাকাইতকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কি করিব?

আমি তখন সেই বিকটাকার পুরুষকে বলিলাম, "তোমরা আপন আপন ঘরে যাও। দেখিও সত্য পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হইও না।"

তখন সেই পঁচিশ জন দস্যু এককালে মুক্তকণ্ঠে এইভাবে বলিযা উঠিল, "পান্না আমাদের মা, পান্নাকে আমরা সতত রক্ষা করিব।"

যে সকল লাঠি ও তরবারি কাড়িয়া লওযা হইযাছিল তাহা দস্যুগণকে প্রত্যর্পণ করা হইল।

দস্যুগণ পলায়নে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময উপরিতল হইতে পান্না সুন্দরী তাহার ভ্রাতার সহিত নিম্নতলে আমার নিকট উপনীত হইল। পান্না তখন আলুলায়িতকেশা, আলুথালুবেশা, নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। তখনও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে। তখনও বক্ষঃস্থল এক একবার স্ফীত হইযা উঠিতেছে, আবার তালে তালে নিম্নে নামিতেছে।

পান্নার সহিত পূর্ব্ব হইতেই আমার পরিচয ছিল। সেনা-নিবাসে তাহার অনেকবার নাচ হইয়াছিল। ইংরেজগণ পান্না ব্যতীত অন্য কোন নর্ত্তকী পছন্দ করিত না। কাজেই আমাকে পান্নার বায়না করিতে হইত।

বসন-ভূষণে ভূষিত—নর্ত্তকীর সাজে সজ্জিত অবস্থায় পান্নাকে যেরূপ সুন্দরী দেখাইত, আজ তাহা অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী দেখাইতে লাগিল। মরি মরি বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

পান্না অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদ স্বরে যোড়হাতে আমাকে বলিল, "বাবু সাহেব! আপনি না থাকিলে আজ আমার প্রাণ যাইত। আপনার এ ঋণ পরিশোধ হইবার নহে। এই অধমা নারী নর্ত্তকী জাতীয়া। আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, যদি কোন দোষ না থাকে, তবে আপনার পদ-ধূলি আমার শিরোপরি প্রদান করুন।"

এই বলিয়া পান্না আমার পদপ্রান্তে পতিত হইল। আমি পান্নার দক্ষিণ করকমল ধরিযা ভূমিতল হইতে উঠাইলাম। পান্নার তখন দুই চক্ষু দিযা শত-ধারা বহিতেছে। কথা কহিবার শক্তি তাহার তখন আর নাই। পান্নার ভ্রাতা জল আনিযা দিলে পান্না মুখ ধুইল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পান্না ভাবে জানাইল (স্পষ্টত বলিতে সাহস করিল না) আমি এইখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করি।

আমি বলিলাম, "আমি বন্দী। বসিবার যো নাই।"

পান্না ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় শিহরিয়া উঠিল। চক্ষুকোণে আবার অশ্রু-বিন্দু দেখা দিল। তখন দুই-চারি কথায সংক্ষেপে পান্নাকে আমার অবস্থা

বুঝাইলাম। বলিলাম, "যদি জীবিত থাকি, যদি কখন মুক্তিলাভ করিতে পারি, তবে আবার তোমার সহিত দেখা করিব। অদ্য বিদায়।"

পান্না তখন আর কোন কথা না কহিয়া আবার আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। আমিও তখন আর কোন কথা না কহিয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অশ্বারোহিগণসহ দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলাম।

বত্রিশ

বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় আমরা দুই ভাই জহুরীমল শেঠের গৃহে উপনীত হইলাম। আমাদের প্রহরী ছয় জন আমাকে সেলাম করিয়া সেনা-নিবাসে প্রস্থান করিল। দেখিলাম, জহুরীমলের মুখটী শুষ্ক। চোখের কোল বসা। তিনি যেন নিরানন্দ-নীরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। বুঝিলাম, শেঠজী চিন্তা-জ্বর ব্যাধিতে বিষম আক্রান্ত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসিলাম,—"শেঠজী। আজ আপনার মুখ এত ম্লান কেন?" শেঠজী হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"ম্লান মুখের কারণ কি বুঝিতে পারিতেছেন না? অথবা অদ্য এক্ষণে আপনার না বুঝাই সম্ভব। কারণ, আপনার এখন উদর পূর্ণ, চিত্ত প্রফুল, দেহ বলশক্ত। সম্পদকালে লোকে অন্যের কষ্ট বা কষ্টের কারণ বুঝিতে সক্ষম হয় না।"

আমি। আমার আবার এখন সম্পদকাল কি দেখিলেন?

শেঠজী। যাঁহার জঠরজ্বালা নাই, তিনিই সর্ব্বসম্পদের অধিকারী।

আমি। আপনার কি এখনও আহারাদি হয় নাই?

শেঠজী। না।

আমি। ডাল আটা কি এখনও সেনা-নিবাস হইতে আসে নাই?

শেঠজী। আসিয়াছে। আপনার আসিবার একটু পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

আমি। আজ কি কি জিনিস কত পরিমাণে আসিল?

শেঠজী। পরিমাণ খুবই কম, তবে আজকার জিনিষগুলি ভাল। ভাল ঘৃত, ভাল আটা, ভাল ডাল অদ্য আসিয়াছে। ইহার উপর বেগুন, সিম এবং আলু আছে। মসলার ভাগ কিছু প্রচুর।

আমি। আজ তা হলে জামাই-আদর বলুন।

শেঠজী। জামাই-আদর সন্দেহ নাই,—কিন্তু বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, এই যা দুঃখ।

আমি। রসদ আনিতে এত বেলা হইবার কারণ কি?

শেঠজী। রসদ যে আসিয়াছে, তাই ঢের। যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে কোন্‌দিন হয়ত অনাহারে এই ঘরে মরিয়া থাকিতে হইবে। চারি দিকে পাহারা, বাহিরে যাইবার যো নাই। যাহারা এই বাটীর প্রহরী নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে যদি রসদের কথা বলি, তাহারা উত্তর দেয়, "রসদের বিষয় আমরা কি করিয়া জানিব?" সিপাহীদের সব গোলমাল, আদৌ বন্দোবস্ত নাই।

আমি। কথা সবই সত্য, কিন্তু উপায় তো কিছু দেখি না।

শেঠজী। (হাসিয়া) আপনার কিন্তু নিতান্ত মন্দ উপায় হয় নাই। বেশ দুই ভাই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন, আর সহর হইতে আহার করিয়া আসিতেছেন। কোন্‌দিন হয়ত আসিয়া দেখিবেন, শেঠজীর রসদও আসে নাই, শেঠজী দাঁতে দাঁত দিয়া আকাশ পানে চাহিয়া পড়িয়া আছে।

শেঠজীর এই সকল কথা শুনিয়া আমার অন্তরে বড়ই কষ্ট হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া চতুর্থ প্রহর প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তথাচ শেঠজী অভুক্ত, ক্ষুধিত। আমি হাঁকিয়া পাচক-ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলাম, "মহারাজ! রুটী তৈয়ারীর আর বিলম্ব কত?" মহারাজ উত্তর দিল,—"আওর আধে ঘণ্টেকে বিচ্‌মে তৈয়ার হো যায়গা।" শেঠজী কহিলেন, "মহারাজকে আর বিরক্ত করিয়া ফল কি? এই তো উহার আটা ঘি প্রাপ্ত হইল। বিশেষ উহারা এত বেলা পর্য্যন্ত না খাইতে পাইয়া ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছে।"

বেলা যখন প্রায় চারিটা তখন মহারাজ আসিয়া সংবাদ দিল,—আহার প্রস্তুত। ক্ষুধায় কাতর শেঠজী ধীরে ধীরে উঠিয়া আহার করিতে গেলেন। আমিও শেঠজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। রন্ধনগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম,—নির্ম্মল শ্বেত প্রস্তরের উপর চারি-পাঁচখানি ফুলা ফুলা রুটী বর্ত্তমান। ছোট একটী শ্বেত প্রস্তরের বাটীতে আলুর তরকারী। ডালও আছে।

শেঠজী আহারের আশায় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ হস্ত ধৌত করিলেন। মহারাজ আরও দুখানি ফুলা ফলা রুটী তৎক্ষণাৎ সেঁকিয়া শেঠজীর পাতে নিক্ষেপ করিল।

এমন সময় আমি বলিলাম, "মহারাজ! রোটী তো খুব আচ্ছি বনতি হায়—খুব ফুলতি হায়, আওর তরকারীকি র ভি আচ্ছি হুই হায়।"

শেঠজী জিহ্বা কাটিলেন। কহিলেন,—"রাম, রাম! বাবুজী! আপনে ইয়ে ক্যা কহ দিয়া?"

শেঠজী আহারীয় সামগ্রীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ঘুরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

আমি তো অবাক্। অপ্রতিভের একশেষ। বিস্মিত হইয়া শেঠজীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"কেন কেন, শেঠজী! কি হইয়াছে? আমি এমন কি কথা বলিলাম যাহাতে আপনি ও দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন?"

শেঠজী। যাহা বলিবার নয় তাহাই আপনি বলিয়াছেন। যাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়, যাহা শুনিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, সেই কথাই আপনি উচ্চারণ করিয়াছেন।

সম্মুখে হঠাৎ শত বজ্রপাত হইলে মানুষ যেরূপ চমকিত হয়, আমিও সেইরূপ চমকিত হইলাম। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সমস্ত দিনের পর ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি অপরাহ্নে আহার করিতে বসিয়াছে, আমি সেই আহারে বাধা দিলাম,—ধিক্ আমাকে! কিন্তু কেন, কি হেতু, কিসের জন্য শেঠজী আহার করিলেন না, ইহা জানিবার জন্য মনে বড়ই বিস্ময়-বিমিশ্রিত কৌতূহল জন্মিল। আমি শেঠজীকে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলাম, "কি হেতু আপনি আহার বন্ধ করিলেন, আমায় বলুন,—শীঘ্র বলুন।"

শেঠজী। ভগবান্ আমার অদৃষ্টে আজ আহার লেখেন নাই, তাই আমি আহার প্রস্তুত থাকিলেও, আহার করিতে বসিলেও, আহারে বঞ্চিত হইলাম। বাবু সাহেব! আপনার দোষ কিছুই নাই, দোষ আমার অদৃষ্টের।

আমি। আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আপনাকে আমি যোড়-হাতে বলিতেছি, আমার কোন্ অপরাধে আপনি আহার করিলেন না, এ কথা শীঘ্র আমাকে বলিয়া আমার অস্থির প্রাণকে রক্ষা করুন।

শেঠজী হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আপনি বালকের ন্যায় এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন?"

আমি। উৎকণ্ঠিত তো হইবারই কথা। ইহাতে যে উৎকণ্ঠিত না হয়, সে মানুষ নয়। আমি এমন একটা কাজ করিয়াছি বা অপরাধ করিয়াছি, যদ্দ্বারা আপনার এই অপরাহ্নের আহার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল; অথচ আমি সেই কার্য্যটী কি, বা অপরাধটী কি, তাহা এখনও জানিতে বা বুঝিতে পারিলাম না।

শেঠজী মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"বাবু সাহেব! সে কথা আমার মুখে বলিতেও কষ্ট হয়, তাহা বড়ই বদ্ কথা। আপনার নিকট সে কথা শুনিয়া অবধি আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করিতেছে।"

আমার কৌতূহলের মাত্রা আরও বৃদ্ধি হইল। আমি বলিলাম,—"আপনার কষ্টই হউক, আর গা ঘিন্ ঘিন্ই করুক, আপনাকে সে কথা বলিতেই হইবে। অন্তত আমাকে শিক্ষা প্রদানের জন্য আমার নিকট সে কথা প্রকাশ করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য।

শেঠজী বলিলেন,—"বাবুজি! শুনিযে,—ঢোর যব মরতে হৈঁ তো ফুলতে হৈঁ, রোটী ডেহুড়তী হৈঁ। আওর মাংসকো 'তরকারী' কহতে হৈঁ,—আলু বৈঁগুন ইন্সবকো 'শাগ' কহা যাতা হৈঁ,—'তরকারী' কহনেসে হামারা হিঁয়া নেহি খাঁতে হৈঁ।"

ইহার ভাবার্থ এইরূপ,—মহিষ এবং গরু প্রভৃতি জন্তু মরিলেই ফুলিয়া উঠে। রুটীকে ফুলা বলিতে নাই, তাহা হইলে জন্তু ফুলার ভাব আমাদের মনে উদয় হয়। ফুলা রুটীকে আমরা 'ডেহুড়া' বলি। ছাগ ভেড়া প্রভৃতির মাংসকে আমরা তরকারী কহিয়া থাকি। আলু বেগুনকে আমরা তরকারী বলি না, বলি আলুর শাগ বেগুনের শাগ। আলু বা বেগুনকে তরকারী বলিলে আমরা তাহা খাই না।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। শেঠজী আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। আমি হতভম্ব হইয়া বসিয়াই রহিলাম। শেঠজী আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—"বাবুজি! আপনি ভাবিতেছেন কেন? আপনি আসুন,—আমার সঙ্গে আসুন। মনে করুন, আজ আমার 'ভীম একাদশী'। একাদশীর উপবাসে কোন কষ্ট আছে কি?"

সে দিন শেঠজীর আহারার্থ বাজার বা সেনা-নিবাস হইতে আটা, ঘি, ডাল আনাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সর্দ্দার-প্রহরীকে কত অনুনয়-বিনয় করিলাম, কিন্তু সে আমার এ কথা শুনিল না।

সে দিন আমার কথার দোষে চারি ব্যক্তির আহার হইল না—শেঠজী তাঁহার গোমস্তা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং ভৃত্য। গোমস্তা, পাচক-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পক্ষে 'রুটী ফুলিয়াছে' বা 'তরকারী' এই শব্দ উচ্চারণ করায় আহারে তাদৃশ ব্যাঘাত ঘটিত না বটে, কিন্তু প্রভু শেঠজী অনাহারে রহিলেন বলিয়া তাহারা আর ডাল রুটী মুখে দিতে পারিল না।

যত দিন বাঁচিব, তত দিন এই নিদারুণ ঘটনা আমার স্মৃতি-পথে জাগরূক থাকিবে

তেত্রিশ

অদ্য বেরিলীর সিপাহী-বিদ্রোহের পঞ্চম দিন,—১৮৫৭ সাল, ৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার।

প্রভাত হইল। রোদ উঠিল। ধরাধাম হাসিল, কিন্তু আমার মনের অন্ধকার দূর হইল না। অন্য কয়েক দিন অপেক্ষা অদ্য আমার মনের ভাব বড়ই খারাপ।

বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইল, আমি পথ পানে চাহিয়া আছি, শেঠজীর রসদ কখন আসে। আমার জন্য গতকল্য শেঠজী এবং তাঁহার অনুচরবর্গ আহার করিতে পান নাই,- ইহা কি কম ক্ষোভের কথা? বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল, তখনও শেঠজীর রসদ আসিল না। আমি আইটাই ছটফট্ করিতে লাগিলাম। সহর হইতে দাদাগৃহে আহার করাইয়া আনিবার জন্য এখনও অশ্বারোহী প্রহরীও আসিয়া পঁহুছিল না। যদি অশ্বারোহিগণও আসিত তাহা হইলে দাদার গৃহ হইতে লুকাইয়া শেঠজীর জন্য ঘি আটা আনিতাম। কিন্তু হন্ত 'কা কস্য পরিবেদনা।' হয় কি? করি কি? আর যে তিষ্ঠিতে পারি না। হয় আমাকে কেউ মারিয়া ফেলুক, না হয় আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুক। শেঠজী যে মৃত ব্যক্তির ন্যায় চাদরখানি গায়ে দিয়া, ভয়ে এবং অন্নাভাবে খাটের উপর নীরবে শুইয়া থাকিবেন, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। মহম্মদ সফীর কি এই কাজ? তাঁহার সহিত আমার এত দিনের বন্ধুত্ব, এত দিনের ভালবাসা, কিন্তু বিপদের সময় দেখিতেছি তিনিও বিমুখ হইলেন। তিনি যদি সত্য সত্যই আমাদের অনুকূলে থাকিতেন, তাহা হইলে কি এতক্ষণ রসদ আসিয়া পঁহুছিত না? অথবা আমার জন্য অশ্বারোহী প্রহরী আসিত না? অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, আর এখানে থাকিব না,—পলাইব। এখানে থাকিলে মরণ নিশ্চয়। পলাইলে বরঞ্চ প্রাণ বাঁচিতে পারে।

এত দিন কোন্ কালে আমি পলাইতাম, কিন্তু কাশীর জন্য আমি পলাইতে পারি নাই। কাশী ছেলেমানুষ, দৌড়িতে ও প্রাচীর ডিঙ্গাইতে অক্ষম;

দ্রুতপদে পথ চলিতে বা অনাহারে থাকিতে অক্ষম। কাশীর এখনও ভূতের ভয় আছে। ক্ষুধা পাইলে এখনও তাহার কাঁদিয়া ফেলা আছে। এ কাশীকে লইয়া আমি পলাই কি করিয়া ?

ভাবিতে ভাবিতে বেলা ১টা হইল। একবার স্থির করিলাম, কাশীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করি, "ভাই ! তুমি পলাইতে পারিবে কি না ?" না, পলায়নের কথা হঠাৎ কাহাকেও বলা হইবে না। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গাও যা, আর কাশীকে কোন গোপনীয় কথা বলাও তা,—কাশীর পেটে একটুও কথা থাকে না।

বেলা যখন ১।০টা, তখন দেখিলাম অদূরে রসদ আসিতেছে এবং আমার জন্য অশ্বারোহী প্রহরী আসিতেছে। অনন্ত দুঃখরাশির উপর ঈষৎ আনন্দের আবির্ভাব হইল। উহারা সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র আমি দফাদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দফাদার সাহেব ! এত বিলম্ব কেন ? খাইতে না পাইয়া আমরা যে মারা পড়িলাম।"

দফাদার হাসিয়া উত্তর দিল,—"বাবু সাহেব ! অদ্য যে আসিতে পারিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিবেন। মহম্মদ সফীর আমার প্রতি হুকুম ছিল, প্রাতে আসিয়াই আপনাকে সহরে লইয়া যাওয়া। অদ্য প্রাতে আপনাকে লইতে আসিতেছি, এমন সময় বখ্‌ত খাঁর হুকুম হইল, 'পিলিভিত যাইবার পথে পাহারা দেওয়া'। আমি বলিলাম,—'বাবু দুর্গাদাসকে আমি আনিতে যাইতেছি।' বখ্‌ত খাঁ উত্তর দিলেন,—'দুর্গাদাসকে আনিবার আমি দোসরা বন্দোবস্ত করিতেছি।' আমি হুকুমের দাস, কাজেই বখ্‌ত খাঁর হুকুমে পিলিভিতের পথে পাহারা দিতে গিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে কিছু পূর্ব্বে মহম্মদ সফীর সহিত আমার তথায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে এ কার্য্য করিতে দেখিয়াই ক্রোধান্বিত হইলেন। বলিলেন,—'তুমি দুর্গাদাস বাবুকে সহরে না লইয়া গিয়া কাহার হুকুমে এখানে পাহারা দিতে আসিয়াছ ?' আমি বখ্‌ত খাঁর নাম করিলাম। তখন মহম্মদ সফী নীরব হইলেন। অন্য কয়েক জন অশ্বারোহীকে পিলিভিতের পথে পাহারা রাখিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাই আসিতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।"

আমি বেণিয়া মুদির চাকরকে জিজ্ঞাসিলাম, "বাপু ! রসদ আনিতে তোমাদের এত দেরী হইল কেন ? দেখিতেছ না, চারি জন লোকের প্রাণ তোমার রসদ যোগাইবার উপর নির্ভর করিতেছে ?" চাকর উত্তর দিল, "আমি কি করিব বাবু ? যেমন মিলিয়াছে তেমন লইয়া আসিয়াছি। তবু

যত দিন বাঁচিব, তত দিন এই নিদারুণ ঘটনা আমার স্মৃতি-পথে জাগরূক থাকিবে।

তেত্রিশ

অদ্য দেল্লীর সিপাহী-বিদ্রোহের পঞ্চম দিন,—১৮৫৭ সাল, ৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার।

প্রভাত হইল। রোদ উঠিল। ধরাধাম হাসিল, কিন্তু আমার মনের অন্ধকার দূর হইল না। অন্য কয়েক দিন অপেক্ষা অদ্য আমার মনের ভাব বড়ই খারাপ।

বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইল, আমি পথ পানে চাহিয়া আছি, শেঠজীর রসদ কখন আসে। আমার জন্য গতকল্য শেঠজী এবং তাঁহার অনুচরবর্গ আহার করিতে পান নাই,—ইহা কি কম ক্ষোভের কথা? বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল, তথনও শেঠজীর রসদ আসিল না। আমি আইঢাই ছটফট করিতে লাগিলাম। সহর হইতে ভ্রাতৃগৃহে আহার করাইয়া আনিবার জন্য এখনও অশ্বারোহী প্রহরীও আসিয়া পঁহুছিল না। যদি অশ্বারোহিগণও আসিত তাহা হইলে দাদার গৃহ হইতে লুকাইয়া শেঠজীর জন্য ঘি আটা আনিতাম। কিন্তু অদ্য 'কা কস্য পরিবেদনা।' হয় কি? করি কি? আর যে তিষ্টিতে পারি না। হয় আমাকে কেউ মারিয়া ফেলুক, না হয় আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুক। শেঠজী যে মৃত ব্যক্তির ন্যায় চাদরখানি গায়ে দিয়া, ভয়ে এবং অন্নাভাবে খাটের উপর নীরবে শুইয়া থাকিবেন, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। মহম্মদ সফীর কি এই কাজ? তাঁহার সহিত আমার এত দিনের বন্ধুত্ব, এত দিনের ভালবাসা, কিন্তু বিপদের সময় দেখিতেছি তিনিও বিমুখ হইলেন। তিনি যদি সত্য সত্যই আমাদের অনুকূলে থাকিতেন, তাহা হইলে কি এতক্ষণ রসদ আসিয়া পঁহুছিত না? অথবা আমার জন্য অশ্বারোহী প্রহরী আসিত না? অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, আর এখানে থাকিব না,—পলাইব। এখানে থাকিলে মরণ নিশ্চয়। পলাইলে বরঞ্চ প্রাণ বাঁচিতে পারে।

এত দিন কোন কালে আমি পলাইতাম, কিন্তু কাশীর জন্য আমি পলাইতে পারি নাই। কাশী ছেলেমানুষ, দৌড়িতে ও প্রাচীর ডিঙ্গাইতে অক্ষম,

দ্রুতপদে পথ চলিতে বা অনাহারে থাকিতে অক্ষম। কাশীর এখনও ভূতের ভয় আছে। ক্ষুধা পাইলে এখনও তাহার কাঁদিয়া ফেলা আছে। এ কাশীকে লইয়া আমি পলাই কি করিয়া ?

ভাবিতে ভাবিতে বেলা ১টা হইল। একবার স্থির করিলাম, কাশীকে ডাকিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করি, "ভাই! তুমি পলাইতে পারিবে কি না ?" না, পলায়নের কথা হঠাৎ কাহাকেও বলা হইবে না। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গাও যা, আর কাশীকে কোন গোপনীয় কথা বলাও তা,—কাশীর পেটে একটুও কথা থাকে না।

বেলা যখন ১৷৷০টা, তখন দেখিলাম অদূরে রসদ আসিতেছে এবং আমার জন্য অশ্বারোহী প্রহরী আসিতেছে। অনন্ত দুঃখরাশির উপর ঈষৎ আনন্দের আবির্ভাব হইল। উহারা সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র আমি দফাদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দফাদার সাহেব! এত বিলম্ব কেন? খাইতে না পাইয়া আমরা যে মারা পড়িলাম।"

দফাদার হাসিয়া উত্তর দিল,—"বাবু সাহেব! অদ্য যে আসিতে পারিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিবেন। মহম্মদ সফীর আমার প্রতি হুকুম ছিল, প্রাতে আসিয়াই আপনাকে সহরে লইয়া যাওয়া। অদ্য প্রাতে আপনাকে লইতে আসিতেছি, এমন সময় বখ্‌ত খাঁর হুকুম হইল, 'পিলিভিত যাইবার পথে পাহারা দেওয়া'। আমি বলিলাম,—'বাবু দুর্গাদাসকে আমি আনিতে যাইতেছি।' বখ্‌ত খাঁ উত্তর দিলেন,—'দুর্গাদাসকে আনিবার আমি দোসরা বন্দোবস্ত করিতেছি।' আমি হুকুমের দাস, কাজেই বখ্‌ত খাঁর হুকুমে পিলিভিতের পথে পাহারা দিতে গিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে কিছু পূর্ব্বে মহম্মদ সফীর সহিত আমার তথায় সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে এ কার্য্য করিতে দেখিয়াই ক্রোধান্বিত হইলেন। বলিলেন,—'তুমি দুর্গাদাস বাবুকে সহরে না লইয়া গিয়া কাহার হুকুমে এখানে পাহারা দিতে আসিয়াছ?' আমি বখ্‌ত খাঁর নাম করিলাম। তখন মহম্মদ সফী নীরব হইলেন। অন্য কয়েক জন অশ্বারোহীকে পিলিভিতের পথে পাহারা রাখিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাই আসিতে এত বিলম্ব ঘটিয়াছে।"

আমি বেনিয়া মুদির চাকরকে জিজ্ঞাসিলাম, "বাপু! রসদ আনিতে তোমাদের এত দেরী হইল কেন? দেখিতেছ না, চারি জন লোকের প্রাণ তোমার রসদ যোগাইবার উপর নির্ভর করিতেছে?" চাকর উত্তর দিল, "আমি কি করিব বাবু? যেমন মিলিয়াছে তেমন লইয়া আসিয়াছি। তবে

আপনাদের এ রসদ সকালে সকালে আনিয়াছি, এখনও অনেকের রসদ যোগাইতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ কার্য্য চলিবে।”

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি শেঠজীকে ডাকিলাম। বলিলাম,—“আজ আর আমি থাকিতেছি না,—আপনার আহারেব পর আসিব। আপনি যত শীঘ্র পাবেন আহারাদি করুন।”

শেঠজী হাসিলেন। আমি এবং কাশীপ্রসাদ অশ্বারোহী দলে পরিবৃত হইযা বেগে অশ্বচালনা করিলাম। বেলা তৃতীয প্রহবে দাদার গৃহে গিয়া আহাবাদি করিলাম। বেলা চারিটাব পর প্রত্যাগমনকালে নর্ত্তকী পান্না সুন্দবীব গৃহেব নিকট দিযা আসিলাম। কিন্তু পান্নার সহিত দেখা হইল না। আমি শুদ্ধমথে শেঠজীর-নিকট ফিবিলাম।

চৌত্রিশ

৫ই জুন, শুক্রবাব। বিদোহেব ষষ্ঠ দিন। আজ সকাল সকাল বসদ আসিল, আমাব অশ্বাবোহী প্রহবীও আসিল। বেলা ৯টাব মধ্যে আমি যাত্রা করিলাম। প্রথমে পান্নার গৃহেই গেলাম। ‘পান্না পান্না’ বলিয়া ডাকিলাম, দ্বাবে ধাক্কা দিলাম, কিন্তু কেহই উত্তব দিল না। অবশেষে পান্নার ভাই আসিয়া খিল খুলিযা দিল। বলিল, “বাবু সাহেব। আপনি ডাকিতেছেন, আমি ভাল বুঝিতে পাবি নাই।”

আমি। পান্নাব সহিত আমি একবাব দেখা কবিব।

পান্নাব ভাই। আসুন, তবে উপবে আসুন।

আমি। আমাব সময খুব কম, পথে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ অশ্বারোহণে আছে এবং সওযাবগণ আছে।

ইত্যবসবে আমার স্বর সংযোগে পান্নাসুন্দবী আমাব আগমনবার্ত্তা বুঝিতে পাবিযা স্বয়ং নীচে নামিয়া আসিল। বীণা-বিনিন্দিত স্ববে বলিল,—“অধিনীর গৃহে যদি আপনি পাযেব ধূলা দিযাছেন, তবে একবাব উপরে আসিযা বসিলেই অধিনী কৃতার্থ হয়।”

আমি পান্নাকে ধীব অথচ গম্ভীব স্ববে বলিলাম,—“বড়ই বিপদ্‌কাল উপস্থিত, সত্য সত্যই উপবে যাইয়া বসিবার আমাব সময় নাই। তোমাকে

কোন বিশেষ কথা আমার বলিবার আছে, অন্যের অগোচরে গোপনে তাহা বলিব।”

পান্না যোড়হাতে কহিল,—“আপনি যা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হউক,—নিম্নের এই ছোট কুঠবীতে আসুন।”

পান্না এবং আমি নিম্নতলস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কবিলাম। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র খাটে পান্না আমাকে বসাইয়া, যুক্তকরে অবনতমস্তকে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি কহিলাম, “পান্না! বড় বিষম কথা! তোমাব প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট হইবাব কথা। কিন্তু অন্য উপায নাই বলিয়াই আমি তোমাকে এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। দেখিও কোন রকমে এ কথা যেন প্রকাশ না হয। প্রকাশ হইলেই সদা সর্ব্বনাশ ঘটিবে।”

পান্না। প্রাণেব জন্য আমি ভয় কবি না। প্রাণ থাকিতে গুপ্ত কথা কিছুতেই প্রকাশ হইবে না,—আপনি বলুন।

আমি। তবে কানে কানে শুন। কথা উচ্চাবণ কবিয়া বলিলে, কি জানি কেহ শুনিযা ফেলে, তাই কানে কানে বলিতেছি। শুন, ধীর হইয়া শুন, বিচলিত হইও না।

আমি তখন পান্নাব সুন্দর গোলাপী বঙ্গেব আভাযুক্ত কর্ণমূল-প্রদেশে আপনাব কৃষ্ণবর্ণেব মুখটী লইয়া গিযা অতি ধীবে ধীবে সন্তর্পণে সেই গূঢ় কথা বলিলাম।

কথা শ্রবণানন্তব পান্না কহিল,—“আমাব প্রাণ পর্য্যন্ত পণ জানিবেন। আমি এ কথা শুনিয়া ভীত বা বিচলিত হই নাই, ববং আনন্দিতই হইযাছি।”

যাত্রাকালে পান্না আমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, পান্নার চক্ষু হইতে মুক্তাফলনিভ অশ্রুজলবিন্দু টপ্ টপ পড়িতেছে।

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—“এ কি এ। তুমি কাঁদিতেছ কেন?” প্রত্যুৎপন্নমতি পান্না উত্তব দিল,—“আমি কাঁদি নাই, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কবিতেছি।”

আর বাক্য ব্যয় না কবিয়া অশ্বাবোহণে আমবা দাদাব গৃহে গমন করিলাম। ষোড়শোপচাবে আগাবকার্য্য সম্পন্ন হইল। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আবাব অশ্বাবোহণে শেঠজীব গৃহে উপনীত হইলাম।

পঁয়ত্রিশ

৬ই জুন তারিখে বেরিলির সিপাহী-বিদ্রোহের সপ্তম দিবস। অদ্য আমার কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ নাই। ভ্রাতার সহিত কথা কহিতে ভাল লাগিতেছে না, শেঠজীর সহিত গল্প করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না; আমি একাকী নীরবে আপন মনে বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতেছি। জড়-ভরতের ন্যায় গুম্ হইয়া স্থাণুবৎ উপবিষ্ট আছি। আজ মৃদু মন্দ প্রভাত-সমীরণ সেবনে বিরক্তি বোধ হইতেছে, তাম্রকূট-ধূমপানে বিরক্তি বোধ হইতেছে, পক্ষীকুলের কলরব-শ্রবণে বিরক্তি বোধ হইতেছে।

হৃদয়ে কেমন গুর্ গুর্ করিতেছে, শরীরে কাঁটা দিতেছে, কথন বা এক হাত অগ্রসর হইয়া দশ হাত পশ্চাৎ গমন করিতেছি। কথনও বা বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কে অস্থির হইয়া, অন্তরে 'মা মা' শব্দ উচ্চারণ করিতেছি। কথনও মনে হইতেছে, কাশীপ্রসাদ কাছে আর নাই, দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদল তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—আমি একাকী প্রান্তরে পতিত হইয়া কেবল 'হায় হায়' করিতেছি।

কথন মনে মনে বলিতেছি,—'মাভৈ মাভৈ', 'ভয় নাই, ভয় নাই',—হর্ষোদ্গমে মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। কথনও বা যেন স্বর্গরাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি, এখানে হিংসা-দ্বেষ নাই, দ্বন্দ্ব-কলহ নাই, বন্ধন হনন নাই,—যেন মূর্ত্তিমতী চির-শান্তি সদা বিরাজিত। কিন্তু এই সুখভাবের সঙ্গে সঙ্গে এককালে সহস্ররূপ দুঃখের ভাব সমুত্থিত হইতে লাগিল। এক বিন্দু অমৃতের সঙ্গে রাশি রাশি মহাবিষ পাইতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, দুর্ব্বৃত্ত দানবদল ঐ আসিতেছে, ঐ ধরিল, ঐ গ্রাস করিল!

আর ভাবিতে পারি না। অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা হইবে,—অদ্য নিশা-যোগে নিশ্চয় পলাইব। আর চিত্তকে চঞ্চল করিব না, পলায়নই স্থির। আর সুবিধা-অসুবিধা, লাভ-অলাভ, মঙ্গল-অমঙ্গল—এ সকল বিষয় কিছুই ভাবিব না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম, অদ্য অবশ্যই পলাইব।

তবু কিন্তু মন মানিল না। 'ভাবিব না' বলিলে ভাবনা কথন থামে না। মনোমধ্যে আবার পূর্ব্ববৎ ভাবনাবলীর সমাবেশ হইতে লাগিল। গত কল্য রাত্রে এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া আমার ভাল নিদ্রা হয় নাই। যথন অল্প-নিদ্রা ভাব আসিয়াছে, তৎনই অমনি স্বপ্নে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। যথন জাগিয়াছিলাম, তথন তো অবশ্যই ভাবিয়াছি।

পলাইব,—তা এত ভাবনা হইতেছে কেন, কেহ বলিতে পারেন কি? দাঙ্গা, মারামারি, লাঠালাঠি, অস্ত্র-চালন ও সম্মুখ-সমর—ইহার মধ্যে কোন কার্য্যেই তো আমার কিঞ্চিন্মাত্র ভয় হয় নাই। ভয় হওয়া দূরে যাউক, বরং এইরূপ কার্য্যে আমার অধিকতর প্রীতি, অনুরক্তি, উল্লাস, উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। বাল্যকাল হইতেই সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতেছি। প্রকৃত সেনা বা সেনা-নায়ক না হই, সেনা বা সেনা-নায়কের সকল কার্য্যই শিখিয়াছি। অশ্বা-রোহণে, বন্দুক-পরিচালনে, বর্শা-উত্তোলনে, তরবারির খেলনে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি তৎকালে সেই রেজিমেণ্টের মধ্যে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। সাহসও আমার অতুল ছিল। পর্ব্বতীয় সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অশ্বারোহণে গিরিশৃঙ্গে উঠিতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইত না। সাহেবের সঙ্গে ব্যাঘ্র-শিকারে গমন করিয়া, আমি সর্ব্বজনের অগ্রণী হইয়া সর্ব্বসমক্ষে অবস্থিতি করিতাম। ভয় কাহাকে বলে, এ ভাব তখন আমার মনেই আসিত না। কিন্তু আজ পলাইব,—এই চিন্তাতেই হৃদয়ে এত আতঙ্ক উপস্থিত হয় কেন? গা এত ঝিম্ ঝিম্ করে কেন? মাথা এরূপ ঘোরে কেন? মন এমন ধুক্ ধুক্ করে কেন? আমার মনে হইতেছে,—পলাইবার অভিপ্রায়ে দ্বারদেশে যাইলে, সিপাহীরা আমায় ধরিয়া আনিবে এবং কাহাকে কাটিয়া ফেলিবে। কখন বা মনে হইতেছে,—মধ্যপথে সিপাহীরা আমাদিগকে বেষ্টন করিবে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাকূপে নিক্ষেপ করিবে। কখন বা এমন মনে হইতে লাগিল,—যে স্থলে আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া থাকিব স্থির করিযাছি, সে স্থলে আশ্রয় পাইব না। সেই গৃহস্বামী হয়ত বলিবে, "এখানে তোমাকে স্থান দিতে আমি অক্ষম, তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি কি সবংশে নিধন হইব?" ফল কথা,—আমার খুব সাহসই থাকুক, যুদ্ধ-কৌশলে পারদর্শিতাই থাকুক, আমার মনে কিন্তু পলায়ন-ব্যাপারে বিশেষ ভীতিসঞ্চার হইল।

বেলা ৯টা বাজিল। আমার নির্দ্দিষ্ট অশ্বারোহী দল আসিল। আমরা দুই ভাই তাহাদের সঙ্গে আহারার্থ দাদার বাসায় গমন করিলাম। অন্য দিন দফাদারের সহিত যেরূপ হাসিয়া হাসিয়া গাল-গল্প করি, অদ্য তাহা আর কিছুই করিলাম না। যেন কলের কাঠের পুতুলের ন্যায় যাইতে লাগিলাম। হরগোবিন্দ দাদার সহিতও বিশেষ কোন বাক্যালাপ হইল না। তথা হইতে যাত্রাকালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"দুর্গাদাস! তোমার মুখ এত শুষ্ক কেন? কোন রকম অসুখ হইয়াছে না কি?"

আমি বলিলাম,—হাঁ।”

দাদা। কি অসুখ?

আমি। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আম্‌তা আম্‌তা স্বরে বলিলাম,—“অসুখ এমন কিছু নয়, এই গা-হাত-পা কামড়াইতেছে।”

দাদা। খুব সাবধানে থাকিও।

আমি এ কথার উত্তর না দিয়াই দ্রুতপদে আসিয়া ঘোড়ার উপর উঠিলাম। পথিমধ্যে দফাদারকে জিজ্ঞাসিলাম, “আজকাল তোমাদের আহারাদি কেমন হইতেছে? নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে ভাল আটা ঘি পাইতেছ তো?”

দফাদার হাসিল। বলিল, “বাবু সাহেব! বন্দোবস্ত কিছুরই নাই। আজকাল যে চুরি করিতে বেশী মজবুত, সে-ই ঘি আটা বেশী পাইতেছে। কেহ বা একবার স্থানে তুইবার করিয়া লইতেছে, কেহ বা একবারও পাইতেছে না। কাহারও অদৃষ্টে একবারও মিলিতেছে না। এই গত কল্য আমার অদৃষ্টে কিছুই মিলে নাই, তারপর বেণিযা মুদিকে গিয়া বলিলাম,—‘তুমি যদি ঘি আটা না দাও, তাহা হইলে তোমার পেটে এক ছুরি চালাইব।’ তখন ভয়ে ভয়ে বেণিয়া মুদি আমাকে ঘি আটা দিল।

আমি। তোমবা কবে দিল্লী যাইতেছ?

দফাদার। বা: সাহেব! সত্য বলিতে কি, সে সকল সংবাদ আমি কিছুই রাখি না।

আমি। তোমাদেব দলে রোজ রোজ লোক বৃদ্ধি পাইতেছে তো? শুনিযাছি, দশ হাজার সৈন্য পূর্ণ হইলে বথ্‌ত খাঁ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

দফাদার। এক পক্ষে লোক যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্য পক্ষে লোক তেমনি কমিতেছে। অনেক সিপাহী এবং সওয়ার কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশে চলিয়া যাইতেছে। শুনিতে পাই, পথে বা গ্রামে গিয়া তাহারা লুঠপাট করিতেছে। এ দিকে সহরের এবং নিকটস্থ পল্লীগ্রামের যত বদ্‌মাইস লোক, যত ভিখারী-জাতীয় লোক বথ্‌ত খাঁর দলে আসিয়া মিশিতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য—রসদ চুরি করা, ঘোড়া চুরি করা, তাঁবু চুরি করা। সুবিধা হইলে, তাহারা টাকাও চুরি করিয়া থাকে। সে দিন খাজনাখানায় সিঁদ হইয়াছিল; কিন্তু টাকা তো গুণা নাই, রাশি রাশি বাক্স বাক্স পর্ব্বতপ্রমাণ টাকা পড়িয়া আছে। কাজেই কত টাকা চুরি হইল তাহার ঠিক

হইল না। আসল চোর ধরা পড়ে নাই, কতকগুলি নিরপরাধ লোককে বখ্‌ত খাঁ কয়েদ করিয়াছেন এবং কতকগুলিকে বেত্রাঘাত দণ্ড দিয়াছেন। সেনা-নিবাস বড়ই ভীষণ স্থান হইয়া উঠিয়াছে। গত পরশ্ব এক জন তয়ফা-ওয়ালী নর্ত্তকীর জন্য ১০।১২ জন সিপাহী আপনা আপনি খুনাখুনি করিয়া মরিয়াছে। বাবুজি। এ পাপ স্থানে আর থাকিতে নাই।

আমি। তবে তুমিও কি দেশে চলিয়া যাইতেছ?

দফাদার। হাঁ বাবুজী। আমি অদ্য রাত্রেই দেশে যাইব। কিন্তু ইহা বড় গোপনীয় কথা। দেখিবেন, যেন কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

আমি জিহ্বা কাটিয়া বলিলাম, "তাহাও কি কখন সম্ভব?"

দফাদার। আপনি আমার অনিষ্ট করিবেন না জানি বলিয়াই আপনাকে এ কথা বলিয়াছি। এ গোপনীয় কথা পলাইবার পূর্ব্বে প্রকাশ হইলে আমার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়াই আমি নীরব হইলাম। আবার কাষ্ঠপুত্তলিকা-বৎ দফাদারের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলাম। অবিলম্বে শেঠজীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

ছত্রিশ

মনে মনে অমঙ্গলের কথা সদাই উদিত হইতেছে, তখন অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। পলায়নে নিশ্চয়ই বিঘ্ন-বাধা বিপত্তি ঘটিবে। কিন্তু পলায়নই স্থির।

আট-ঘাট বাঁধিতে আরম্ভ করিলাম। একটি পিস্তল, একখানি তরবারি এবং একটা মোটা লাঠির অনুসন্ধানে রহিলাম। পথে ৫।৭ জন সিপাহী যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে কিছুতেই ধরা দিব না। হয় লগুড়াঘাতে, না হয় তরবারির আঘাতে, অথবা পিস্তল দ্বারা,—যেরূপ সুবিধা বুঝিব, সেইরূপই আত্মরক্ষার্থ এবং শত্রুবিনাশার্থ চেষ্টা করিব। মনে মনে অহঙ্কার ছিল,—অন্তত আট জন সিপাহীকে আমি একা ভাগাইতে পারিব। সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমি ঐরূপ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইলাম। সকলেই জানেন, আমার নিকটে কোনরূপ অস্ত্র ছিল না। শেঠজীর ঘর খুঁজিয়া একটী

মোটা লাঠি পাইলাম। সে লাঠির দ্বারা মানুষ মারাও চলে, বেড়ানও চলে। তরবারি কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। দেখিলাম, দেওয়ালে একটী জাল-কিরীচ টাঙ্গানো আছে। গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শেঠজীর ভাল পিস্তল আছে, কিন্তু তাহা সিন্দুকের ভিতর চাবি-বন্ধ। কিসে সেই পিস্তল আমার হস্তগত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্ত্রশস্ত্র এরূপভাবে গ্রহণ করিতে হইবে যে, শেঠজী যেন কিছুই না জানিতে পারেন এবং ভ্রাতাও প্রথমে সে বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ থাকে। কারণ, ভায়া একটী ঢাক—ঢাকে কাঠি দিলে কাহারও অগোচর থাকে না।

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। শেঠজীর আহারাদি কার্য্য শেষ হইল। আমি শেঠজীর সহিত 'ভাব' করিবার জন্য তামাক খাইতে খাইতে, নানারূপ প্রীতিকর মুখরোচক কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। এ-কথা সে কথা, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালের কথা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কথা,—কত কথাই পাড়িলাম ; দেখিলাম শেঠজীর মন কিছুতেই ভিজিল না, কিছুতেই মনের একাগ্রতা জন্মিল না। অবশেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া সুদের কথা পাড়িলাম , সুদে সহজেই শেঠজীর মন খুশি হইল। সুদ, সুদের সুদ, তস্য সুদ, সিকি পয়সা পর্য্যন্ত সুদ ত্যাগ করিতে নাই, এক কড়া কড়ি সুদও ত্যাগ করিলে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হয় না, লক্ষ্মীশ্রী থাকে না ; এইরূপ কথা কহিতে,কহিতে শেঠজীর মন ক্রমশ আর্দ্র হইয়া আসিল। ক্রমশঃ গলিয়া দ্রব হইল। যেন অমল ধবল কাঁচা পারার ন্যায় ঢল-ঢল করিতে লাগিল।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি প্রস্তাব করিলাম,—"শেঠজী! নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া ত আর থাকা যায় না। সমস্ত দিন বসিয়া বসিয়া হাতে পায়ে যেন বাত ধরিয়া যাইতেছে। আপনার সুদের হিসাবের কাগজ-পত্র যদি বাহিরে থাকিত, তাহা হইলে দুই জনে বসিয়া সুদই কষিতাম। কিন্তু সে সকল হিসাবের কাগজ-পত্র সিপাহীগণ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া চাবি লাগাইয়া গিয়াছে। যদি আপনার পিস্তলটাও লোহার সিন্দুকের ভিতর না রাখিত, তাহা হইলে বৈকালে দুই-একটা পাখীই শিকার করিতাম।"

শেঠজী। পিস্তল তো উহারা লোহার সিন্দুকে রাখিয়া যায় নাই, পিস্তলটী আমার ঐ কাঠের সিন্দুকে আছে , তাহার চাবি আমার গোমস্তার নিকট। কিন্তু কথা হইতেছে এই, প্রহরিগণ আমাদিগকে পিস্তল ছুড়িয়া পাখী শিকার করিতে দিবে কেন? আমরা হইলাম বন্দী, বন্দীর হাতে পিস্তল দেখিলেই বথ্‌ত খাঁ কাড়িয়া লইয়া যাইবে।

আমি। সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আমি মহম্মদ সফীর অনুমতি লইয়া পাখী শিকার করিব। তাঁহার আমার উপর যথেষ্ট স্নেহ-ভক্তি আছে। নির্দ্দোষ আমোদ করিতে তিনি কখনই আমাদিগকে বাধা দিবেন না।

শেঠজী। (হাসিয়া) আপনি জানেন আমাদের শাস্ত্রানুসারে জীবহিংসা মহাপাপ। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার পিস্তল দ্বারা পক্ষিকুলের ধ্বংস সাধন করিয়া কাজ নাই।

আমি বেগতিক বুঝিয়া শেঠজীর রাযে বায দিযা বলিলাম,—আপনার কথাই ঠিক। বৃথা পাখী মারা উচিত নয়। পাখী শিকাবেব কথা বলাই আমাব ভুল হইয়াছিল। আত্মরক্ষার্থই গুলি চালান চাই।

শেঠজী। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক সম্মুখে আক্রমণোদ্যত,—ইহা দেখিলে গুলি চালাইতে হয, কিন্তু পাখী তো আর গ্রাস কবিতে আসিতেছে না যে, অনর্থক গুলি চালাইয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে ?

আমি। ঠিক কথা।

শেঠজী। আব পিস্তলটী এমন চমৎকাব যে, এক গুলিতেই বাঘ মবিতে পারে। আমাব বোধ হয, এই পিস্তলের গুলির এতটুকু আঁচ লাগিলেই পাখী মরিয়া যাইবে।

আমি। অতি চমৎকাব পিস্তল তো। কত টাকা দিযা খরিদ করিয়াছিলেন ?

শেঠজী। আডাই শত টাকা। ছয নলা পিস্তল। বিলাতেব এক জন প্রসিদ্ধ কাবিকর দ্বারা ইহা নির্ম্মিত।

আমি। কাবিকবের কি নাম ?

শেঠজী। নামটী আমাব মনে নাই,—পিস্তলেব গাযে ইংবেজিতে সে নাম লেখা আছে।

আমি। আপনাব গোমস্তাকে একবাব পিস্তলটী বাহিব কবিতে বলুন,—দেখি কার নাম লেখা। আমি অনেক রকম পিস্তল দেখিযাছি, কিন্তু এরূপ আড়াই শত টাকা মূল্যেব পিস্তল কখন দেখি নাই,—অতি চমৎকাব জিনিষ হইবে,—দর্শনীয় জিনিষ বটে।

শেঠজী আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। গোমস্তাকে পিস্তলটী আনিতে তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলেন। পিস্তল সিন্দুকেব ভিতব হইতে বাহিরে আসিল, আমার মন প্রফুল্ল হইল। পিস্তলটীকে আর সিন্দুকের ভিতর ঢুকিতে

দিব না, যে কোন গতিকে হউক বাহিবে বাখিব, অথবা আমার আয়ত্তাধীনে বাখিব,—ইহাবই উপায় উদ্ভাবন কবিতে লাগিলাম। পিস্তলটী দেখিয়া আমি তাহাব ভূয়সী প্রশংসা করিতে আবম্ভ কবিলাম। বলিলাম, এরূপ পিস্তলের পাঁচ শত টাকা মূল্য হইলেও অধিক হয় না। সুদপ্রিয় শেঠজী এ কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আমি পিস্তলটীকে খুলিলাম, মাজিলাম, ঘসিলাম। জিজ্ঞাসিলাম,—"টোটা বারুদ কোথায়?"

শেঠজী বলিলেন,—"সমস্তই ঐ সিন্দুকেব ভিতব একটী ছোট বাক্সে আছে।"

আমি। থাক থাক্,—সিন্দুকেই থাক।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া গোমস্তার নিকট হইতে সিন্দুকেব চাবি লইয়া আমি স্বয়ং পিস্তলটীকে সিন্দুকে বাখিতে গেলাম। সিন্দুকে বাখিবাব সময় টোটা-বারুদেব বাক্সটী খুলিয়া দেখিলাম, দেখিয়া আবাব তদবস্থায় তাহাকে স্থাপন কবিলাম। পিস্তলটী সিন্দুকে রক্ষিত হইল। সিন্দুকেব ডালা বন্ধ কবিলাম। বাহিবে চাবি আনিয়া শেঠজীব সাক্ষাতে গোমস্তাকে দিলাম।

বেলা তখন প্রায় ৫টা। ঠিক কবিলাম, অদ্য বাত্রি আড়াই প্রহবে বা তৃতীয় প্রহবে অথবা প্রভাত হইবাব একটু পূর্ব্বেই আমি ভ্রাতাব সহিত এ স্থান হইতে পলায়ন কবিব। ভ্রাতাকে বাত্রি ১০টাব পব এই সংবাদ দিব, এখন এ কথা বলিয়া কোন লাভ নাই।

বলা উচিত—শেঠজীব সিন্দুকস্থিত ক্ষুদ্র আগ্নেয় অস্ত্রটী পিস্তল নহে,—ইহাকে বিভলভাব কহে। পিস্তল বা বিভলভাব দুইটী স্বতন্ত্র সামগ্রী।

আবও একটী কথা বলিয়া বাখি,—যে সিন্দুকে পিস্তলটী বাখিলাম, সে সিন্দুকেব ডালাটী ফেলিলাম বটে, কিন্তু চাবি বন্ধ কবিলাম না। এমন কৌশলে এ কাজ কবিয়াছিলাম যে, শেঠজী বা গোমস্তাব মনে কিছুমাত্র আমার প্রতি সন্দেহ জন্মে নাই।

সাঁইত্রিশ

সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়। কিন্তু কোন কোন বৃক্ষের অগ্রভাগে এখনও একটু-আধটু রৌদ্র আছে। আমি অস্থির হইয়া উঠানে পায়চারি করিতেছি। যত বেলা যাইতেছে ততই আমার মন উচাটন হইতেছে।

এক মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ভাবিলাম,—আবার 'গোরে আয়ে গোরে আয়ে' শব্দ উত্থিত হইয়াছে নাকি? কান পাতিয়া শুনিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দ্বারদেশে প্রহরিবৃন্দের নিকট গেলাম। দেখিলাম, তাহারাও অনিমেষ-লোচনে এবং উৎকর্ণে সে ব্যাপার দেখিতেছে এবং শুনিতেছে। আমি তাহাদের প্রধান ব্যক্তিকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসিলাম,—"ভাই! এ কিসের গোলযোগ বলিতে পার?"

প্রহরী। না—জানি না, আবার কি ফ্যাসাদ হইয়াছে।

আমি। আপনার উচিত, এখনি এক জন সওয়ার পাঠাইয়া এ সংবাদ জানা। আমরা অবশ্যই পলাইতেছি না। আর এক জন সওয়ার এ স্থান হইতে গেলে আমরা যে পলায়নে সক্ষম হইব, তাহাও নহে।

প্রহরী। আপনাকে তো আমি জানি,—আপনি অতি ভদ্র ব্যক্তি। আপনি কখনই পলাইবেন না। আর পলাইয়াই বা যাইবেন কোথা? তবে কথা এই,—বখ্‌ত খাঁ যদি জানিতে পারেন আমাদের কেহ অন্যত্র গিয়াছে, তাহা হইলে মুস্কিল বাধাইবেন।

আমি। এ স্থান হইতে ১০ মিনিটের জন্য এক জন সওয়ার চলিয়া গেলে, বখ্‌ত খাঁর জানিবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

প্রধান প্রহরীর ইঙ্গিত মাত্র এক জন সওয়ার সেনা-নিবাসের দিকে ছুটিল।

ক্রমশঃই গোলযোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রহরিবৃন্দ ক্রমশঃই দুই-এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া ব্যাপার দেখিতে লাগিল। আমি সেই উচ্চ মাটীর ঢিপির উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম প্রায় ৩০।৪০টী হস্তী, অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিকও অসংখ্য। ভাবিলাম,—আবার নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ সসৈন্যে বখ্‌ত খাঁর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন নাকি? তাই বটে। তখন আমি প্রধান প্রহরীকে বলিলাম,—"সহর হইতে নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ আবার আসিতেছেন। সৈন্যাধ্যক্ষ বখ্‌ত খাঁর সহিত দেখা করাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য।"

প্রধান প্রহরীর হৃদয়ে সম্ভবত তখন গোরাঙ্গের বিভীষণ মূর্ত্তি জাগিতেছিল। সে কহিল,—"না, বাবু সাহেব! আমার বোধ হয়, গোরা লোগ আসিতেছে।"

দেখিতে দেখিতে সেই সওয়ার প্রত্যাগত হইয়া বলিল,—খাঁ বাহাদুর খাঁ তাঁহার রাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমভিব্যাহারে বখ্‌ত খাঁর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। শুনিলাম,—সৈন্যদল মধ্যে বিতরণের জন্য তিনি নগদ বিশ হাজার টাকা এবং এক হাজার সোনার বালা লইয়া আসিয়াছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র প্রায় দশ-বার জন প্রহরী অমনি সেনানিবাসের দিকে ছুটিল। বালা বা টাকা পাইবার লোভে তাহারা আর পশ্চাৎ পানে ফিরিয়া চাহিল না। প্রধান প্রহরী তাহাদিগকে দুই-একবার ক্ষীণকণ্ঠে 'ফেরো ফেরো' বলিয়া ডাকিল; কিন্তু কেহই তাহার কথা শুনিল না। অবশেষে প্রধান প্রহরী স্বয়ং স্বুবর্ণবলয় লাভ লালসায় অবশিষ্ট সওয়ারগণকে সঙ্গে লইয়া দৌড়িল; যাত্রাকালে আমাকে বলিল,—"বাবুজী! আপনি একবার ঘরের ভিতর যান, আমরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"

আমি ভাবিলাম,—"আর কোন্ সময়? এইবার পলাইব।" ঘরে ঢুকিয়াই দ্বারদেশে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে দেখিয়া বলিলাম,—"ভাই! ভীত হইও না, চল আমার সঙ্গে। এইবার পলাইতে হইবে। এ স্থানে থাকা হইবে না। আমি বিশেষ সংবাদ পাইয়াছি, এখানে আর দুই-এক দিন থাকিলে আমরা নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব।"

কাশী। সে কি দাদা! পলাইব কেমন করিয়া?

আমি। ভয় কিছুই নাই। এখন আমি যাহা যাহা করিতে বলি, দ্বিরুক্তি না করিয়া তুমি তাহা কর। ঐ ছোট ঘরটীর ভিতর একখানি জাল-কিরীচ টাঙ্গান আছে, সেখানি তুমি চাপকানের ভিতর গায়ের সঙ্গে লুকাইয়া বাঁধিয়া লও। শীঘ্র যাও। বিলম্ব করিও না। দেখিও, যেন ইহা শেঠজী বা অন্য কেহ দেখিতে না পায়।

কাশী আমার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম,—"আর ইতস্তত করিলে চলিবে না, তুমি শীঘ্র যাও।"

এই বলিয়া আমি কাশীর গায়ে এক ধাক্কা দিলাম। ধাক্কা খাইয়া কাশী বাটীর ভিতর গমন করিল।

আমিও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, শেঠজী ও দিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবু সাহেব! গোলযোগের কারণ কি বলিতে পারেন?"

আমি। কারণ অন্য কিছুই নয়। বোধ হয় নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ আবার সৈন্যনিবাসে আসিয়াছেন।

শেঠজী। গোল তো ভয়ঙ্কর উঠিয়াছে।

আমি। চলুন না,—দুই জনে গিয়া একবার ব্যাপার দেখিয়া আসি।

শেঠজী। প্রত্যহ মিছামিছি গিয়া কি হইবে?

আমি। আপনি যদি একান্তই না যান, তবে আমি গিয়া একবার না হয় দেখিয়া আসি।

শেঠজী। গোলমালে ভিড়ে যেন আপনাকে ধাক্কা না লাগে। সে দিন আমার পিঠে এক বিষম ধাক্কা লাগিয়াছিল, তাহাতে আমার পিঠ আজও টাটাইয়া আছে।

আমি। আমাকে ধাক্কা মারে কে? আপনার ঐ ঘরে যে মোটা লাঠিটা আছে, তাহা আমি হাতে করিয়া লইয়া যাই।

শেঠজী। তা লউন, আপত্তি কিছুতেই নাই।

আমি লাঠি লইবার ছলে শেঠজীর ঘরে ঢুকিলাম। শীঘ্র-হস্তে সিন্দুক হইতে রিভলভার বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলাম। টোটা পকেটে লইলাম। শেঠজীর একখানি থান কাপড় পাকাইয়া, কৌশলে রিভলভার ঢাকিয়া কটিদেশ দৃঢ়রূপে কষিয়া বন্ধন করিলাম। বাহিরে আসিয়া 'কাশী, কাশী' বলিয়া ডাকিলাম। দেখিলাম, কাশী সাজিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রাচীর-ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কাশী উত্তর দিল,—"আমি এখানে।"

দুই ভাই একত্র মিলিলাম। বলিলাম,—"ভাই একবার মনে মনে 'দুর্গা দুর্গা' বল। কোন চিন্তা নাই; বিপদে শ্রীমধুসূদন আছেন। চিন্তা নাই, চল, চল।"

আমি অগ্রে অগ্রে, কাশী পশ্চাৎ পশ্চাৎ—দুই জনে দ্রুত-পাদবিক্ষেপে চলিলাম। তখন সন্ধ্যা সমাগতা,—একটু ঘোর ঘোর হইয়াছে। যে দিকে সেনা-নিবাস, তাহার বিপরীত পথ ধরিয়া আমরা দুই ভাই যাত্রা করিলাম। ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র সন্তরণ দ্বারা পার হইবার চেষ্টা করিলাম। তরী নাই, কূল-কিনারা নাই, চারি দিকেই অনন্ত পাথার—চারি দিকেই অনন্ত অন্ধকার এবং অর্ণব।

আটত্রিশ

আমি মরি নাই। পলাইবার কালে পথে প্রহৃতও হই নাই। কেহ ধৃত করিবারও চেষ্টা করে নাই। অধিক কি, কেহ আমার সঙ্গে একটী কথা পর্য্যন্তও কহে নাই। বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, বিপত্তি নাই; আমি স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া লুক্কায়িত হইলাম।

কোথায় লুকাইলাম বলুন দেখি? কোন্ দেশে, কোন্ নগরে, কিরূপ গৃহে, কাহার ভবনে, কিরূপভাবে ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিলাম, তাহা বলুন দেখি? আমি মোদ্দা আপাতত সে কথা বলিতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি,—এ স্থান তাদৃশ নিরাপদ নয়, তাদৃশ প্রীতিকরও নয়। শেঠজীর গৃহে যেরূপ বন্দী ছিলাম, এখানেও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকরূপ বন্দী হইয়া রহিলাম। এখানে বাহির হইবার যো নাই, বারান্দায় বসিয়া থাকিবার যো নাই। এমন কি ছাদে উঠিলেও গৃহস্বামী টিক্-টিক্ করেন, বলেন,—"নামুন, নামুন,—এখনই সর্ব্বনাশ হইবে। কে কোন্ দিক্ হইতে দেখিয়া ফেলিবে,—আব আপনারও জান্ যাইবে, আমারও জান্ যাইবে।" কূপের ভিতর বাস কবিতে হইলে, মানুষের যেরূপ হাঁপানি সম্ভব, আমার মন সেইরূপ হাঁপাইতে লাগিল। এক একবার ভাবিতে লাগিলাম, শেঠজীর গৃহে বন্দী হইয়া বরং ছিলাম ভাল,—এ যে পলাইয়া স্বাধীনতা পাইয়া ঘটাইলাম অধিক মন্দ। অদৃষ্টের ফের এমনি!

গতকল্য সন্ধ্যার সময় আমি পলায়ন করি। সত্য সত্যই সেই সন্ধ্যাকালে খাঁ বাহাদুর খাঁ, বখ্ত খাঁর নিকট আসিয়াছিলেন। সত্য সত্যই তিনি সৈন্যদের মধ্যে কিছু টাকা ছড়াইয়াছিলেন এবং দুই-চারি জনকে সোনার বালাও দিয়াছিলেন। সৈন্যসমূহের বিশেষ প্রিয়তম পাত্র হইবার জন্যই খাঁ বাহাদুর খাঁ এরূপ দানাদি আরম্ভ করেন। সে দিন তিনি বখ্ত খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া চারিটী কামান প্রার্থনা করেন। এমন কি, চতুর্গুণ মূল্যে সেই চারিটী কামান খরিদ করিতেও চাহেন। কিন্তু বখ্ত খাঁ বড় শক্ত লোক। কিছুতেই কামান দিতে স্বীকৃত হইলেন না। শেষে খাঁ বাহাদুর খাঁ কহিলেন,—"আমি বড়ই কাতর হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। সহরের বদ্‌মাইস লোকদিগকে শাসন করিতে সেরূপ সক্ষম হইতেছি না। বদ্‌মাইসগণ কখন কখন দলবদ্ধ হইয়া আমার সিপাহীদিগকে মারিয়া ধরিয়া

তাড়াইয়া দিতেছে। সেই বদ্‌মাইস-দলনের জন্যই চারিটী কামান চাহিতেছি। আপনি যদি মূল্য লইয়া একেবারে চারিটী কামান না দেন, তাহা হইলে অন্তত দুই-তিন দিনের জন্য আমাকে কামান ধার দিউন। কার্য্য সিদ্ধ হইলে, আমি তাহা আপনাকে প্রত্যার্পণ করিব।"

বখ্‌ত খাঁ উত্তর দিলেন,—"আমি একায়েক কামান দিতে পারিব না, তবে বদ্‌মাইস দলনার্থ যাহা সাহায্য করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

এইরূপ ভগ্নমনোরথ হইয়া নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ তথা হইতে বিরস-বদনে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এ দিকে সৈন্যবৃন্দ স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিল। শেঠজীর গৃহের প্রহরিগণ অবশ্যই আবার পাহারা দিবার জন্য শেঠজীর ভবনে দ্বারদেশে সমুপস্থিত হইল। এ সময় যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহার কোন বিষয়ই আমি স্বচক্ষে সন্দর্শন করি নাই। পরে বিশ্বস্ত লোক-মুখে এবং অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছি, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

দফাদার দেখিল, দ্বার খোলা। তাহার মনে একটু সন্দেহ হইল। দ্বার দিয়া গৃহমধ্যে সে প্রবেশ করিল। গৃহের নিকটস্থ হইয়া আমার এবং শেঠজীর নাম ধরিয়া ডাকিল। শেঠজীর গোমস্তা তাহার নিকট গিয়া বলিল,—"কেন কি হইয়াছে?" দফাদার উত্তর দিল, "বাবু সাহেব কোথায়? শেঠজী কোথায়?"

গোমস্তা। বাবু সাহেব তো অনেকক্ষণ তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেনা-নিবাসে গিয়াছেন। কৈ তিনি তো এখনো ফেরেন নাই?

দফাদার। তবেই বোধ হয় সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার ভাই কাশীপ্রসাদ কোথায়?

গোমস্তা। তিনিও তাঁহার দাদার সঙ্গে গিয়াছেন।

দফাদারের মুখ শুকাইল। কয়েদী পলাইয়াছে ভাবিয়া, তাহার অন্তরাত্মা বিচলিত হইয়া উঠিল। বলিল,—"শেঠজীর সহিত আমি একবার দেখা করিব।"

পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে শেঠজী কহিলেন,—"দুর্গাদাস বাবু সেনা-নিবাসেই গিয়াছেন। যাইবার সময় এই কথা আমায় বলিয়া যান যে, আমি শীঘ্রই সেনা-নিবাস হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, আমার মোটা লাঠিটীও সঙ্গে লন।" রাত্রি ৯টা বাজিল, তথাচ ফিরিয়া আসিলাম না দেখিয়া দফাদার এ

সংবাদ সেনা-নিবাসে বখ্‌ত খাঁর নিকট প্রেরণ করে। বখ্‌ত খাঁ এ সংবাদ পাইয়া একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন। চারি দিকে 'ধর্‌ ধর্‌' সংবাদ পড়িয়া যায়। মহম্মদ সফীর সহিত এই সূত্রে বখ্‌ত খাঁর ঘোরতর বিবাদ হয়। বখ্‌ত খাঁ ইঙ্গিতে এই ভাব প্রকাশ করেন যে, মহম্মদ সফীর আদরে এবং আনুকূল্যে দুর্গাদাস পলাইয়াছে, নহিলে সাধ্য কি যে, সে পলায়? বিবাদ বিতণ্ডা, বিচার বিতর্ক, পরামর্শ মন্তব্য, এইরূপ করিতেই রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। শেষে বখ্‌ত খাঁ কহিলেন,—"দুর্গাদাস নিশ্চয়ই সহরে আছে। যাহার নিকট প্রত্যহ আহার করিতে যাইত, তাহারই সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্গাদাস তাহারই পরিচিত স্থানে লুক্কাইত আছে। সহর পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান কর। সহরবাসিগণকে বল, তাহারা দুর্গাদাসকে যদি বাহির করিয়া না দেয়, তাহা হইলে বখ্‌ত খাঁ তোপে সহর উড়াইয়া দিবে। আর কোরান স্পর্শপূর্ব্বক আমি এই ঘোষণা করিতেছি,—"যে ব্যক্তি দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে দশ সহস্র টাকা পুরস্কার দিব।"

এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়া দরবার ভঙ্গপূর্ব্বক বখ্‌ত খাঁ বিশ্রাম-তাঁবুতে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

প্রাতঃকালে সেনা-নিবাস মধ্যে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড পড়িয়া গেল। প্রত্যেক সিপাহী, প্রত্যেক সওয়ার, প্রত্যেক গোলন্দাজই দশ হাজার টাকা পুরস্কার লাভ লালসায় বলিতে লাগিল,—"আমি দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিব। আমি দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিব।" কেহ দলবদ্ধ হয় না, প্রত্যেকেই একাকী ধরিতে চায়। কেন না, দলবদ্ধ হইলে তাহার দলস্থ অন্য সহচরগণকে পুরস্কারের টাকার অংশ দিতে হইবে। টাকার অংশ দিতে যাই কেন, একাই দুর্গাদাসকে ধরিয়া আনিয়া এককালে দশ হাজার টাকা গ্রহণ করিব।

মহম্মদ সফী দেখিলেন, বেরিলি সহর এইবার বুঝি ধ্বংস হইল, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় এই দশ বার হাজার লোক যদি বেরিলি সহর এককালে আক্রমণ করে, তাহা হইলে সহর এককালে সমূলে বিনষ্ট হইবে। তাঁহার বন্দোবস্ত মতে ২৫ জন অশ্বারোহী ৫০ জন পদাতি এবং দুইটী কামান আমাকে ধৃত করিবার জন্য সহরাভিমুখে চলিল।

এই সৈন্যদল সহরে পৌঁছিয়া রাষ্ট্র করিল,—"সহরবাসিগণ মধ্যে যিনি দুর্গাদাসের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন বা দুর্গাদাসকে ধরিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পুরস্কার দিব। যদি সহরবাসিগণ দুর্গা-

দাসের অনুসন্ধান না করিয়া দেন, তাহা হইলে বখ্ত খাঁর হুকুমে তোপে আজ সহর উড়াইব।"

বাড়ী বাড়ী ঘর-ঘর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। সহরে বদ্মাইস গুণ্ডাগণ, ভদ্রলোকের খানাতল্লাসী করিবার ভয় দেখাইয়া, গৃহস্বামীর নিকট টাকা ঘুষ লইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সৈন্যদল হরগোবিন্দ দাদার গৃহে গিয়া পৌঁছিল। বলিল,—"এখনই দুর্গাদাসকে বাহিব কবিয়া দাও, নিশ্চয়ই দুর্গাদাস এইখানে লুকাইয়া আছে।" দাদা ব্যাপার দেখিয়াই ত একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। সৈন্যদল বলিল,—"যদি দুর্গাদাসকে এখনই বাহির করিয়া না দাও, তাহা হইলে পরিজনবর্গ সহিত এখনি তোপে তোমার গৃহ উড়াইয়া দিব।"

দাদা বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী রুক্ষ স্বরে ক্রোধভরে বলিল,—"কাঁদিলে চলিবে না। বল, শীঘ্র বল।"

দাদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দুর্গাদাস ভায়া যে কোথায়, আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানি না।"

এই কথা বলিবামাত্র এক জন প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী দাদাব দক্ষিণ গণ্ডে এক বিষম চপেটাঘাত কবিল। কড়া হাতেব কড়া চড় খাইয়া দাদা ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিলেন। তখন হবদেব দাদা সাহসে ভর কবিয়া জোড়হাতে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"আমাদিগকে মাবা কাটা এখন তোমাদিগেব একতার। যা ইচ্ছা তোমরা করিতে পার। কিন্তু দুর্গাদাসেব স বাদ আমরা কিছুই জানি না। এই ঘর-বাড়ী তোমাদিগকে এখন অর্পণ কবিলাম, তোমরা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া দেখ, দুর্গাদাস কোথাও লুকাইয়া আছে কিনা। কিন্তু এক মিনতি এই, এই ঘবে যে সকল স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিও।"

এইরূপ অনুনয় বিনয় কবিয়া বলায় তাহাবা হবদেব দাদাকে আর কিছু বলিল না। কেবল ঘব খানাতল্লাসী করিয়াই ক্ষান্ত হইল। বলা উচিত, খানাতল্লাসীকালে সিপাহীগণ স্ত্রীলোকের উপব কোনরূপ অত্যাচাব বা উপদ্রব করে নাই। তবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহের জিনিসপত্র কিছু কিছু চুবি করিয়াছিল।

সহরে আমাব যে সকল বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই গৃহে সিপাহীগণ আমার অনুসন্ধানার্থ গমন করেন। মিশ্র বৈজনাথ, রায় চেতরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, আলতাপ আলি খাঁ, হাকিম সাহাদৎ আলি খাঁ,

প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সম্মানার্হ সঙ্গতিপন্ন হিন্দু ও মুসলমানের ভবনে সিপাহীগণ গমন করিয়া নানারূপ উপদ্রব করিয়াছিল। কিন্তু আমি তো এ সকল স্থানে নাই, আমাকে খুঁজিয়া পাইবে কিরূপে? আমাকে না পাইয়া, হতাশ হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরের পর সিপাহীগণ সেনা-নিবাসে প্রস্থান করে।

যখন বখ্‌ত খাঁ শুনিলেন, অন্বেষণ করিয়া কেহ আমাকে প্রাপ্ত হয় নাই, তখন তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। মহা-দাবানলের ন্যায় তাঁহার ক্রোধ-বৈশ্বানর যেন আকাশস্পর্শী হইয়া ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল। "দুর্গাদাস কো আবহি লে-আনে হোগা, আবহি লে-আনে হোগা" বলিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন,—"বাঙ্গালী কৈসা বদ্‌মাইস হ্যায়, হম্ একদম্ দেখ লেঙ্গে"—এ কথাও তাঁহার মুখ দিয়া সজোরে উচ্চারিত হইতে লাগিল।

বখ্‌ত খাঁর রাগ কেন যে আমার উপর এত হইল, তাহা বলিতে পারি না। অনেক লোকেই তো পলাইতেছে, কিন্তু কৈ তাহাদিগকে ধরিবার জন্য এরূপ সৈন্যও বাহির হয় নাই, তোপও বাহির হয় নাই। আর হিসাব কিতাব রাখিবার জন্য বেরিলি সহরে যে আমা ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই, এমনও কিছু নয়; সুতরাং আমাকে ধৃত না করিলে যে বখ্‌ত খাঁর সংসার অচল হয়, তাহাও নহে; তবে তাঁহার এত ক্রোধ কেন, আমাকে লইয়া এত পীড়া-পীড়ি কেন? বোধ হয়, বখ্‌ত খাঁর আমার উপর কেমন একটা ঝোঁক পড়িয়াছিল; বিশেষ, আমি তাঁহার চোখে ধূলা দিয়া যে পলাইলাম, তাতে তাঁহার আরও রাগ হইল। তাই সদাই তিনি ধর্ ধর্ ধ্বনিতে ধরাতল কম্পিত করিতে লাগিলেন।

যে দফাদার আমার প্রহরিস্বরূপ হইয়া দাদার বাসা হইতে আমাকে প্রত্যহ খাওয়াইয়া লইয়া যাইত, সেই দফাদারকে ডাকিবার হুকুম হইল। কিছুক্ষণ পরে বখ্‌ত খাঁর নিকট সংবাদ আসিল, সে দফাদারকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবত সে পলাইয়াছে। অনেকে অনুমান করিল, আমি এবং দফাদার একত্রে একযোগে এক পরামর্শে রাত্রে কোন নিকটস্থ পল্লীগ্রামে পলাইয়া লুকাইয়া আছি। বখ্‌ত খাঁ হুকুম দিলেন,—"দফাদারের সঙ্গে যে সব সওয়ার যাইত, তাহাদিগকে হাজির কর।"

অনতিবিলম্বে পাঁচ জনের পরিবর্ত্তে তিন জন সওয়ার হাজির হইল, বাকি দুই জন পলাতক।

বথ্‌ত খাঁ বলিলেন,—"ভাই! ঠিক ঠিক কথা কহিও, যাহা সত্য জানো তাহাই বলিবে, মিথ্যার লেশ যেন তাহাতে না থাকে।"

তাহারা যোড়হাতে উত্তর দিল,—"হুজুর যাহা বলিতেছেন তাহাই হইবে।"

বথ্‌ত খাঁ। এই যখন দুর্গাদাস বাবুর সহিত তোমরা প্রত্যহ যাইতে এবং প্রত্যাগত হইতে, তখন দুর্গাদাস বাবু পথিমধ্যে কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন কি না?

সওয়ারগণ একবাক্যে বলিল,—"না। কথাবার্ত্তা যাহা কিছু হইত, তাহা আমাদেরই সঙ্গে।"

বথ্‌ত খাঁ। দুর্গাদাস পথিমধ্যে কখন কাহারও গৃহে ঢুকিয়াছিল কি না?

প্রহরিগণ উত্তর দিল,—"অন্যের গৃহে ২।৩ দিন তিনি ঢুকিয়াছিলেন।"

বথ্‌ত খাঁ। কার গৃহে?

সওয়ারগণ। নর্ত্তকী পান্নার গৃহে।

বথ্‌ত খাঁ মন্ত্রিবর্গকে জিজ্ঞাসিলেন, "পান্নার গৃহে দুর্গাদাসের অনুসন্ধান বা পান্নার গৃহ খানাতল্লাসী হইযাছিল কি না? এ কথা জানিয়া আমাকে শীঘ্র বল।"

ইহার উত্তর হইল, "না—খানা-তল্লাসী হয নাই। পান্নার গৃহে কেহ যায়ও নাই।"

বথ্‌ত খাঁ কহিলেন,—"আমার বিশ্বাস দুর্গাদাস নিশ্চযই পান্নার গৃহে লুকাইয়া আছে, এথনই তোমরা সসৈন্যে গমন কর। দুর্গাদাস মৃতই হউক, আর জীবিতই থাক, যে তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিবে তাহাকেই দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব।"

তখন আবার 'সাজ সাজ সাজ' সাড়া পড়িয়া গেল, আবার ২৫ জন সওয়ার, ৫০ জন সিপাহী, ২ খানি তোপ, আমাকে ধরিবার জন্য সহরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

উনচল্লিশ

এত যে কাণ্ড ঘটিতেছে,—সেনা-নিবাসে এবং সহরে যে এমন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে,—এ পর্য্যন্ত আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহি। আমি পলাইয়া আসিযাছি, আর লুকাইয়া আছি। খাইয়াছি, ঘুমাইয়াছি, আবার জাগিয়া বসিয়া আছি। আমার জন্য যে ত্রিসংসারে এরূপ কল্লোল কোলাহল উত্থিত হইযাছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও এ পর্য্যন্ত অবগত নহি। সেনাদল পান্নার গৃহ আক্রমণ করিবার জন্য যে ছুটিয়াছে, বলা বাহুল্য, সে সংবাদ আমি স্বপ্নেও প্রাপ্ত হই নাই।

আমি এখন কোথায়? কাহার ভবনে, কাহার গুপ্ত গৃহে আমি লুক্কায়িত? কে আমাকে সাহস করিয়া, আপনার প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন?

এইবার খুলিযাই বলিতে হইল, পান্নার গৃহই আমার আশ্রয়ভূমি, পান্নাই আমার আশ্রয়-দাত্রী, পান্নাই এখন রক্ষয়িত্রী। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, পলাইবার একদিন পূর্ব্বে আমি পান্নার নিকট আসিযা কানে কানে গুপ্ত কথা বলিয়াছিলাম,—সে গুপ্তকথা আর কিছুই নয়,—এই 'আশ্রয় স্থান ভিক্ষা'। নিতান্ত নিরুপায় হইযাই নর্ত্তকীভবনে বাস করিয়াছিলাম। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, পান্না দ্বিচারিণী, বিলাসিনী ভুবনমোহিনী। তাহার পাপ-পঙ্কিল ভবনে আমার বসবাস কিরূপে সম্ভব? সম্ভব নহে বলিযাই একান্ত অসম্ভব বলিয়াই পান্নার গৃহে আমি গমন করিযাছিলাম।

আমি যে নিশি দিবা পান্নার কুঞ্জকাননে যাপন করিব, ইহা লোকের মনে কখনই ধারণা হইতে পারে না। তাই আমি পান্নার নিকট গমন করিয়াছিলাম। যাহা লোকের বিশ্বাসের বিপরীত, ধারণার বিপরীত, এ-বিপদে সেই কার্য্যই করা আমার উচিত, তাই আমি পান্নার গৃহে গমন করিয়াছিলাম। এরূপ বেশ্যা-ভবন-বাস দূষণীয় হইলেও, প্রাণরক্ষার্থ আমি তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

আমি পলাইলে আমার জন্য যে এরূপ অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে, তাহা আমি কখন ভাবি নাই, কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি নাই। এইমাত্র স্থির করিযাছিলাম, যদি একান্তই আমার অনুসন্ধান হয় তো সহরের দুই-এক স্থানে আমার বিশেষ পরিচিত লোকের ভবনেই হইবে। কিন্তু ইহা তো তাহা

নহে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত দুর্য্যোধনের ন্যায় আমার অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। অথবা বিরাটগৃহে ছদ্মবেশে অবস্থিত পঞ্চপাণ্ডবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেন দুর্য্যোধনের দূতগণ ছুটিয়াছে।

পান্নার গৃহ দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বৈঠকখানা, দ্বিতীয় খণ্ডে অন্দর। বৈঠকখানা বাড়ী, দ্বিতল চক্-মিলান। অন্দর বাড়ীও দ্বিতল বটে, কিন্তু চক-মিলান ঠিক নহে। বৈঠকখানার বাহার বেশী, ঘর বেশী, আলোক-বায়ু গমনাগমনের পথ বেশী। বৈঠকখানা-বিভাগের দ্বিতলের ঘরগুলি উত্তমরূপ সজ্জিত। তন্মধ্যে প্রধান ঘরটী বা হলটীর শোভা-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। ঝাড়-লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, সোফা, চেয়ার, আলমারি, রেশম-পশম কার্পেটের কত রকম যে কারিকুরি,—তাহার বর্ণনা আর কি করিব? সেই বৃহৎ হলের দুই পার্শ্বে দুইটী কুঠারী আছে। সেই প্রকোষ্ঠদ্বয় আকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও সাজসজ্জায় নিতান্ত কম নহে।

বৃহৎ হলটী পান্নার বৈঠকখানার সদর খণ্ড। ঐখানে ওস্তাদজী আসিয়া পান্নাকে নাচ শিখায়, গান শিখায়, বাজনা শিখায়। পান্নার বন্ধু-বান্ধব ঐ স্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করে। ভদ্রলোকগণ পান্নার নাচ-গানের বায়না করিতে আসিয়া ঐখানেই উপবিষ্ট হন। ঐ হলের উভয় পার্শ্বস্থ দুইটী কুঠরী, পান্নার অন্দর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা ব্যতীত দ্বিতলে অন্য দিকে চারি-পাঁচটী কুঠরী আছে। তাহার মধ্যে কোনটী ভাণ্ডার গৃহ, কোনটী বেশ-বিন্যাসের গৃহ, কোনটী স্নানের গৃহ, কোনটী বা আহারের গৃহ,—ভাব এইরূপই।

অন্দর মহলের দ্বিতলে দুইটী মাত্র কুঠরী আছে। একটীতে জননী বাস করে, আর একটীতে পান্নার ভ্রাতা পত্নীর সহিত বাস করে।

পান্নার মা এবং ভ্রাতৃবধূ উভয়েই পর্দ্দানসীন। তাহারা বৈঠকখানায় আসে না, পরপুরুষের সাক্ষাতে কখন বাহির হয় না। পান্নার ভ্রাতা বৈঠক-খানা বাটীতে সাধারণত পান্নার অনুমতি ব্যতীত আসিতে পায় না। পান্নার ভ্রাতার বৈঠকখানা বাটীতে আসিবার আবশ্যক হইলে লোকদ্বারা এ বিষয় পান্নাকে জানান হয়। তখন পান্নার অবশ্যই অনুমতি হয়। এইরূপে শ্রীমতীর অনুমত্যনুসারে ভ্রাতা বৈঠকখানায় আসিতে পায়।

বলাই বাহুল্য, পান্নার উপার্জ্জনে মাতা ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির ভরণপোষণ হইয়া থাকে। সংসারের যা কিছু খরচ-পত্র, আহারীয় সামগ্রী, বস্ত্রাদি, বাটীভাড়া, ভৃত্যাদির বেতন, সমস্তই পান্না প্রদান করিয়া থাকে। পান্না যেন

এম-এ বি-এল পাস রোজকারী পুত্র। এক জন প্রথম শ্রেণীর সদরালার অপেক্ষাও পান্নার আয় অধিক।

অন্দরে দ্বিতল গৃহের নিম্নে—অর্থাৎ একতলে দুইটী কুঠরী আছে। তন্মধ্যে একটী কুঠরীর নিম্নে পাতাল প্রদেশে আর একটী কুঠরী আছে। তাহার নাম তহখানা অথবা পাতাল-ঘর। দুরন্ত গ্রীষ্মের সময় সেই পাতাল-ঘরে থাকিলে বড়ই আরাম বোধ হয়। মাটীর নীচের ঘর বড়ই ঠাণ্ডা। সেই পাতাল-ঘরটী দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নূতন চূণকাম করা। বায়ু আসিবার নিমিত্ত উপরিতলস্থ কুঠরীর দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে গর্ত্ত কাটা আছে। সে গর্ত্ত দেখিলে মনে হয় বুঝি ক্রন্দন-প্রিয় বালক ভুলাইবার জন্য এই গর্ত্ত কর্ত্তিত হইয়াছে। পাতাল-ঘরের ভিতর দাঁড়াইলে কড়ি মাথায় ঠেকে না। ঊর্দ্ধে প্রায় চারি হাত হইবে। ভিতরে অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিয়া না রাখিলে বিশেষরূপ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরিতল হইতে কাঠের সিঁড়ি দিয়া এই ঘরে নামিতে হয়। নামিয়া আসিলে কাঠের সিঁড়ি খুলিয়া রাখা যায়, এবং অবতরণের দ্বার একখানি তক্তা দিয়া বন্ধ করা হয়। সেই তক্তার উপর জিনিষ-পত্র রাখ, আলমারি রাখ, চেয়ার রাখ, যাহা ইচ্ছা তাহাই রাখিতে পার। যাঁহার পাতাল-ঘরে বসবাস করা অভ্যাস নাই, প্রথম তথায় বাস করিলে, তাঁহার কেমন এক রকম হাঁপ লাগে, বিশেষ পান্নার তহখানায় নানা দিক্ হইতে বায়ু আসিত, অথচ উপরে দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হইত ভিতরে বায়ুপ্রবেশের দ্বার অতি অল্পই আছে।

আমার ও কাশীপ্রসাদের লুকাইবার জন্য পান্না ঐ পাতাল-ঘরটী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু আমার হাঁপ লাগায় আমি তথায় থাকিতে পারি নাই, কাশীপ্রসাদের এই নিম্ন ঘরটী বেশ পছন্দ হইয়াছিল। সে বলিত, "দাদা! এ ঘরে আমরা তো বেশ আছি, উপরে যাইবার দরকার কি?" আমার উত্তর এইরূপ, "বরং বথ্ত খাঁকে আমি ধরা দিতে রাজী আছি, কিন্তু এ পাতাল-ঘরে থাকিতে আমি কিছুতেই রাজি নহি। বাপ্! এ পাতালপুরীর ভিতর অন্ধকারে কি মানুষ তিষ্ঠিতে পারে? তুমি পার থাক, আমি কিন্তু উপরে যাইব।"

বলা বাহুল্য, আমি কখন দ্বিতলে, কখন নিম্নতলে, কখন ছাদে, এইরূপ করিয়াই সেদিন কাটাইলাম। পান্না আমাকে ছাদে উঠিতে বা দ্বিতলে উঠিতে দেখিয়া বড়ই বিব্রত হইল,—তাহার প্রাণ যেন ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। আমাকে যোড়হাতে, কাতর কণ্ঠে বলিল, "বাবু সাহেব! আমার প্রতি

দয়া করিয়া আপনি নিম্নতলে লুক্কায়িত থাকুন।´ আমি পান্নার কথায় একবার নীচে আসিলাম। আবার এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া যখন দেখিলাম পান্না সম্মুখে উপস্থিত নাই, অমনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে উপরে গিয়া বসিলাম।

নীরবে বসিয়া থাকিতে আমি নারাজ, আমার স্বভাব বড়ই চঞ্চল। নিস্পন্দ হইয়া, নিষ্কর্ম্মা হইয়া, জড় পদার্থের ন্যায় বসিয়া থাকা আমার কোষ্ঠীতে কথন লেখে নাই।

বেলা তৃতীয় প্রহর। দেখিলাম পান্না ত্রিতলের গৃহে একাকিনী উপবিষ্টা, হাতে একটী দূরবীণ। আমি পাছে ছাদে যাই, সেই ভয়ে পান্না বোধ হয় ছাদের দ্বার আটক করিযা ত্রিতলের গৃহে বসিয়া আছে। আমি এই অবসর বুঝিয়া পান্নার বৈঠকখানা গৃহের দ্বিতলের হলে আসিলাম। খানিক সোফায় শুইলাম, খানিক চেয়ারে বসিলাম, খানিক খাটে গড়াগড়ি দিলাম, প্রাণ কেমন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। "কি করি, কি করি," ইহা মনোমধ্যে স্থির করিতে লাগিলাম। কাজ তো কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে পান্নার সেতারের দিকে নজর পড়িল। ভাবিলাম, যদি সেতার খুলিয়া ঝঙ্কার দি, তাহা হইলে পান্না অমনি রায়বাঘিনীর মতন গাঁক্ করিয়া আসিবে। কিন্তু মন মানিল না। সেতার-বাজনায় ভয়ঙ্কর নেশা জন্মিয়াছিল। বিদ্রোহের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি সেতার চক্ষে দেখি নাই, সেতার বাজাইতেও পারি নাই। গোলমালে, ভাবনায় চিন্তায়, সেতারের কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ সুন্দর সুসজ্জিত সেতার দেখিয়া হৃদয়-সবিৎএ যেন এক মহা-কোটালের বান ডাকিয়া উঠিল; ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন ক্ষীরময় জননী-স্তন দেখিলে আকুলি-ব্যাকুলি করে, সেতার দেখিযা আমার মন সেইরূপ করিতে লাগিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ধীরপদে উঠিয়া আস্তে আস্তে সেতারটী পাড়িলাম। অতি ধীরে ধীরে সন্তর্পণে সুর বাঁধিলাম। সেতারের তারে ঘা দিলেই যে এক মহাশব্দ উত্থিত হইবে, সে জ্ঞান তখন আমার আর নাই, অথচ সেতার বাজাইবার পূর্ব্বকার্য্যসকল ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করিতেছি। সমুদয় ঠিক হইলে, ভীমপলাশী রাগ আরম্ভ করিলাম।

দুই-চারিবার সেতারে ঝঙ্কার পড়িতে-না-পড়িতে সম্মুখে দেখিলাম, এক আলুথালু-বেশা ক্ষিপ্তপ্রায়া নারীমূর্ত্তি। রমণীর মুখ দিযা বাক্য-নিঃসর হয় না, থাকিয়া থাকিয়া সে কেবল হাঁপাইতে লাগিল। আমি চমকিত হইয়া

রমণীর মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলাম, "পান্না! তুমি এমন করিতেছ কেন, কি হইয়াছে?" পান্না তখনও স্পষ্টরূপে কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। কিন্তু পান্না যাহা বলিল তাহার ভাব এইরূপ, "আমি ছাতে উঠিয়া দূরবীণ দিয়া দেখিলাম, অশ্বারোহী এবং পদাতি সৈন্য কামান লইয়া এই দিকে আসিতেছে, বোধ হয় আপনাকে ধরিবার জন্য বিদ্রোহী সিপাহীগণ ধাবিত হইয়াছে। সেতার ছাড়ুন, শীঘ্র আপনি অন্দর-বাটীর পাতাল-ঘরে গিয়া লুক্কায়িত হউন।"

এই কথা বলিয়া পান্না আমার হাত হইতে সেতার কাড়িয়া লইল এবং আমাকে 'উঠুন উঠুন' শব্দে অভিবাদন করিতে লাগিল।

আমি উঠিলাম, কিন্তু পাতাল-ঘরে শীঘ্র যাইতে মন সরিল না। পান্নাকে কহিলাম, "সিপাহীরা যে কামান লইয়া আমাকেই ধরিতে আসিতেছে, তাহার এখন ঠিক কি? এমনও তো হইতে পাবে যে, সিপাহীগণ এই বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া অন্য কোথাও যাইতেছে।"

পান্না এইভাবে উত্তর করিল, "এ সকল কথার বিচার-বিতর্ক করিবার সময় এখন নহে। ঐ দেখুন, ঘোড়ার পায়ের খুরের শব্দ পাওয়া যাইতেছে। ঐ ঐ ঐ দেখুন, একটা মহা-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। আপনি শীঘ্র গমন করুন, আপনার ভ্রাতাকে লইয়া তহখানায় লুক্কায়িত হউন।"

পান্নার দেহ বাত্যান্দোলিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম, বিপদ্ সত্য সত্যই সম্মুখবর্ত্তী। সত্য সত্যই অশ্বের হ্রেষারব, সৈন্যসমূহের কণ্ঠরব আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

এই ঘোর বিপত্তিকালে আমার কোন্ পথ অবলম্বনীয় তাহাই মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলাম। পান্নাকে কহিলাম, "তুমি ভীত হইও না। তুমি আমাকে লুকাইয়া থাকিতে বলিতেছ, কিন্তু আমি লুকাইব না,—আমি ধরা দিব। সেনাগণ এই বাটীতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে আমি ডাকিয়া বলিব, 'এই আমি'—এই দুর্গাদাস উপস্থিত। যদি তোমরা আমাকে ধরিতে আসিয়া থাক, তবে আমি যাইতেছি, আমাকে লইয়া যাও। কিন্তু তোমাদিগকে এক অনুরোধ, এই পান্না নিরপরাধিনী, ইহার বাটী লুণ্ঠন করিও না; অথবা পান্নার সম্ভ্রম নষ্ট বা ইহাকে হনন করিও না।' পান্না! তুমিই ভাবিয়া দেখ, আমার জন্য কেন তুমি সবংশে মরিবে? আমি পাতাল-ঘরে লুক্কায়িত আছি, যদি ইহারা জানিতে পাবে, তাহা হইলে তোমাকে প্রহার করিবে, বে-ইজ্জত করিবে, অবশেষে

হয়ত প্রাণেও মারিবে। তাই বলিতেছি, কেন তুমি আমার জন্য সবংশে মজিবে? পান্না! তুমি মনে কিছু করিও না আমি ধরা দিব।"

পান্না নয়নজলে গণ্ডস্থল অভিষিক্ত করিয়া, ভূলুণ্ঠিত হইয়া ব্রততীর ন্যায় আমার পদযুগল বেষ্টনপূর্ব্বক নিতান্ত করুণ স্বরে কহিল, "প্রভু! আপনি সর্ব্বনাশ করিবেন না। আপনি লুক্কায়িত হউন, যে কোন উপায়ে হউক আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে কিছুতেই ছাড়িতেছি না; আপনি সহজে না যান, আপনার পদযুগল ধরিয়া টানিযা লইয়া যাইব।"

আমি গম্ভীর স্বরে কহিলাম, "পান্না! কর কি? কর কি? আমাব পা শীঘ্র ছাড়িয়া দাও।"

পান্না পা ছাড়িল না। কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমার গৃহে এবং আমার দ্বারা আমি ব্রহ্মহত্যা হইতে দিব না। আজ দুর্ব্বৃত্ত সিপাহীগণ আপনাকে পাইলে ফাঁসি দিবে, অথবা তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিবে। তাই বলিতেছি, আমি ব্রহ্মহত্যার কারণ হইতে পারিব না।"

সিপাহীদের কোলাহল ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পান্না কহিল, "আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র চলুন, শীঘ্র চলুন,—লুক্কায়িত হউন। আর একটা কথা ভাবিযা দেখুন, আপনার জন্য আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে প্রাণ দিতে হইবে। আপনি যখন ধরা দিবেন, তখন, অবশ্যই সিপাহীগণ কাশীপ্রসাদের সংবাদ আপনাকে জিজ্ঞাসিবে। আপনি যদি কোন কথাব উত্তর না দেন, তথাচ তাহারা কাশীপ্রসাদ এই বাটীতে আছে জানিযা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কাশীপ্রসাদকে বাহির করিয়া ফেলিবে। কাশীপ্রসাদের জন্য তাহারা এই বাটীর ইট এক একখানি করিয়া খুলিযা দেখিবে। তাই বলিতেছি,— আপনি ভ্রাতৃবধ করিবেন না, অথবা ভ্রাতৃবধের কারণ হইবেন না। সর্ব্বদিক্ ভাবিয়া দেখিলে এক পলায়নই মঙ্গলকর। আপনি যদি সৈনিকদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ কবেন, তাহা হইলে আপনারও নিধন এবং যে কারণেই হউক, আমারও নিধন ঘটিবে, ইহা স্থির বলিলাম। অবশেষে কাশীপ্রসাদেরও যে নিধন ঘটিবে, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। সুতরাং আত্মসমর্পণ করিয়া ফল কি? আমি মায়াবিনী, নানা কৌশল জানি। বলিতে কষ্ট হয়, দুঃখ হয়,— কুটিল কটাক্ষে, মধুর হাস্যে, ভ্রূভঙ্গীতে আমি ভুবন জয় কবিতে পারি, মুনি-ঋষিরও মন ভুলাইতে পারি। সুতরাং পাশব বলসম্পন্ন সৈন্যসকলকে আমি যে স্ববশে আনিতে পারিব না, ইহা আপনাকে কে বলিল?"

পান্নার মনোহর মধুর বক্তৃতামন্ত্রে আমি মোহিত হইলাম। পান্না যাহা বলিল, তখন তাহাই করিতে প্রবৃত্তি জন্মিল। পান্না লুকাইবার উপদেশ দিল, তাহাই তখন ভাল বোধ হইল।

আর বাক্য ব্যয় করিলাম না। দ্রুতপদে অন্দরাভিমুখে চলিলাম। আমি যখন যাই, তখন সৈনিক দল পান্নার গৃহের প্রায় দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে বোধ হইল।

আমি কাশীপ্রসাদের সহিত পাতাল-ঘরে লুকাইলাম। শ্রুত আছি, পাতাল-ঘরের মুখ প্রথমে একখানি তক্তা দিয়া বন্ধ করা হইল। পান্নার ভ্রাতা সেই তক্তার উপর একখানি জলচৌকি বসাইয়া রাখিল। চৌকির উপর কলসী কুজা গেলাস থাল প্রভৃতি রক্ষিত হইল। চৌকির আশে পাশে এরূপভাবে জিনিসপত্র সাজান হইল যে, বাহ্য-দৃশ্যে সহজে বুঝিবার যো রহিল না,—চৌকির নীচে পাতাল-ঘরের দ্বার আছে।

চল্লিশ

পাতাল-ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতই আমি হাঁপাইতে লাগিলাম। ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ স্বচ্ছন্দ-মনে একখানি উৎকৃষ্ট খাটে শুইয়া রহিল। ভাবনার আদি-অন্ত-মধ্য নাই ;—আমি ভাবনা-সাগরে ডুবিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সৈনিক দল সেই নিম্নতলের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুভবে বুঝিলাম খানাতল্লাসী আরম্ভ হইয়াছে। আমরা নীচে, উপরে সৈন্যদল,—তাহাদের পদভরে গৃহ টলমল করিতে লাগিল। কাশীপ্রসাদ ব্যাপার বুঝিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে আমাকে বলিল, “দাদা! এইবার কি হবে?” আমি অতি ধীর স্বরে উত্তর দিলাম, “ভাই! চুপ করিয়া থাক, কথা কহিও না।” সৈন্যসমূহের পায়ের দুপ দুপ শব্দে এক এক-বার মনে হইতে লাগিল, ছাদ বুঝি বা ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়ে! প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সমস্তই একেবারে নীরব হইল ;—আমার বোধ হইল, খানাতল্লাসী কার্য্য শেষ করিয়া এ ঘর হইতে সৈন্যদল অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে। তখন আমি ভয়ে মৃতপ্রায়, ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে বলিলাম, “ভাই! বুঝি আর ভয় নাই।”

কিয়ৎক্ষণ পরে পান্না ও তাহার ভ্রাতা আসিয়া পাতাল-ঘরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিল। আমরা উপরে উঠিলাম। পান্না কহিল, “দেখুন, বাবুজি! আপনার

প্রাণ আপাতত রক্ষা হইল ত! আপনি যদি আমার কথা না শুনিয়া সিপাহী-দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে এতক্ষণ মহা সর্ব্বনাশ ঘটিত।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—রুধিরে পান্নার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত। জিজ্ঞাসিলাম,—"এ কি? পান্না! এ কি?"

পান্না হাসিয়া উত্তর দিল,—"বাবুজি! আজ আমি রণজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ। ঘোর সংগ্রামে সম্মুখ-সমরে আহত হইযাছি মাত্র। কিন্তু এ সৈনিক জীবনে ইহাতেই আমাদের সুখ।"

পান্নার হেঁয়ালীর ছন্দে উত্তর শুনিয়া আমি কহিলাম,—"আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, যথার্থ ঘটনা কি আমায় বল।"

কিরূপে পান্নাকে বাঁধিয়াছিল, কিরূপে পান্নাকে তীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিতে গিয়াছিল, কিরূপে পান্নার পৃষ্ঠদেশে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, কিরূপে পান্নার অঙ্গে তীক্ষ্ণধার সূচিকা বিদ্ধ করিয়াছিল, কিরূপে পান্নাকে সহস্রাধিক টাকা দিবার লোভ দেখাইযাছিল, সমস্ত কথাই পান্না একে একে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। কিন্তু শত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও বুদ্ধিমতী পান্না এরূপ ধীরতার সহিত কৌশলে অথচ সুমিষ্ট ভাষায় উত্তর দিয়াছিল যে, সিপাহীদলের সমস্ত চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ হইয়া যায়। মায়াবিনী পান্নার ক্ষুরধার বুদ্ধির নিকট সিপাহীদের সমস্ত কৌশল-জাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক, পান্নার অনুগ্রহে, পান্নার বুদ্ধির জোরে, পান্নার আত্মত্যাগে, আমি সে যাত্রা পাতাল-ঘরে লুকাইয়া রক্ষা পাইয়াছিলাম।

আমরা দুই ভাই দিবসে পাতাল-ঘরে থাকিতাম, সন্ধ্যার পর পাতাল-ঘর হইতে উঠিয়া স্নান আহ্নিক করিতাম এবং স্বপাক অন্ন খাইতাম। পান্নার যত্নের ত্রুটি থাকে নাই, কিন্তু আমার কষ্টের অবধি ছিল না। দিবসে অন্তঃপুর পাতাল-ঘরে কি থাকা যায়! কবে বখ্ত খাঁ সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন, কেবল ইহারই সংবাদ লইতে লাগিলাম। ১০ই জুন শুনিলাম, বখ্ত খাঁ দিল্লী যাইবার উদ্দেশ্যে সহস্রাধিক গরুর গাড়ীতে মাল-পত্র বোঝাই করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বহু সংখ্যক উষ্ট্র হস্তীর উপর টাকা ও আসবাব বোঝাই হইয়াছে। ভাবিলাম, ১১ই জুন ইহারা নিশ্চয়ই বেরিলি সহর পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে সংবাদ পাইলাম, যাত্রার জন্য সকলেই সজ্জিত বটে, কিন্তু যাত্রা কেহ করে নাই। ভাবিলাম, আপদ্ দূর হইয়াও হয় না কেন!

এক একবার মনে হইতে লাগিল, বুঝি আমাকেই ধরিবার জন্য বখ্‌ত খাঁ অপেক্ষা করিতেছে। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তিনি বেরিলি সহরে ঘোষণা দিয়াছিলেন যে, "যে ব্যক্তি দুর্গাদাস বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া দিতে পারিবে সে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।"

১৩ই জুন প্রাতঃকালে পান্নার ভ্রাতা পাতাল-ঘরে হাসি-হাসি মুখে আমার নিকট আসিয়া বলিল, "বাবু সাহেব! শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, আমাকে কি খাওয়াইবেন বলুন?"

আমি বলিলাম—"ইংরেজ-রাজ সসৈন্যে পুনরায় আসিয়াছেন না কি?"

ভ্রাতা। না, তা নয—বখ্‌ত খাঁ সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করিয়াছে।

আমি। এ সংবাদও শুভ বটে,—কেন না, এইবার আমি কারামুক্ত হইব।

পান্নাসুন্দরীও এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারও মুখে ঐ কথা।

আমাদের গৃহে আনন্দের উচ্চ রোল উঠিল। সুখের প্রস্রবণ হৃদয়-কন্দরে উচ্ছ্বলিত হইল।

একচল্লিশ

বখ্‌ত খাঁ তো সসৈন্যে সহর ত্যাগ করিলেন, এ দিকে কিন্তু অরাজকতার এবং অশান্তির সংবাদ প্রতিনিয়ত আসিতে লাগিল। বিদ্রোহের সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, সকলেই যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বিদ্রোহীরা যে কেবল বৃটিশ-শাসনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল এমন নহে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার শাসনের উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে এই সুযোগে আপনাদের চির-শত্রুদের নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। আজ এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কল্য অপর স্থানে মার-পিট ইত্যাদি হইতে লাগিল। পূর্ণমাত্রায় দেশব্যাপী অশান্তির ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চারি দিকে বিরাজ করিতে লাগিল। কিরূপে এই সকল বিশৃঙ্খলা নিবারিত হইবে, তাহার উপায় চিন্তার জন্য খাঁ বাহাদুর খাঁ তাঁহার বিশ্বস্ত কয়েক জন অনুচর লইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক যুক্তির পর এই স্থির হইল যে, এক জন

দেওয়ান নিযুক্ত করিতে হইবে, তিনি দেশের রাজস্ব এবং পুলিশ-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিবেন। সদর আলি খাঁর অনুরোধে খাঁ বাহাদুর খাঁর অধীনে শোভারাম নামক এক ব্যক্তি এই দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইল।

শোভারাম স্থূলকায়, শ্যামবর্ণ, খঞ্জ। চলিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। তাঞ্জামের উপর আরোহণ করিয়া, অর্দ্ধ-উপবিষ্ট, অর্দ্ধ-শায়িতভাবে তিনি নগর পরিভ্রমণ করিতেন। শোভারাম বাহ্য দৃশ্যে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, কিন্তু অন্তরে দারুণ নাস্তিক। এ দিকে তিলক-ফোঁটা কাটেন,—ও দিকে কিন্তু সব ফাঁকি, তিনি তেজস্বী, দাম্ভিক, প্রবল-প্রতাপ। প্রজার উপর ভীষণ অত্যাচারী বলিয়াও তিনি প্রসিদ্ধ।

যে বদ্‌মায়েস ফজলু ইতিপূর্ব্বে হামিদ হোসেনের বাড়ীতে ইংরেজেরা লুক্কায়িত ছিল বলিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করত নিঃসহায় বৃটিশ-তনয়দের বধ করে, সে আজি সন্ধ্যার সময় খাঁ বাহাদুর খাঁর সমীপে আনীত হইল। সে ব্যক্তি ফসায়াত উল্লা খাঁ এবং আরও অনেক মুসলমানের গৃহে প্রবেশ করত যথাসর্ব্বস্ব লুঠপাট করিয়াছিল বলিয়া অভিযুক্ত। দেওয়ান শোভারাম বহু কৌশলে ইহাকে ধৃত করেন। তাহার অপরাধ প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা হইল যে, তাহার দক্ষিণ হস্ত এবং বাম পদ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এ দণ্ড পাইয়াও তাহার পরাক্রমের লাঘব হইল না। সে সাধারণ লোকের বড় প্রিয় ছিল। উক্ত কঠোর শাস্তি পাইলেও তাহাকে সকলে সমারোহের সহিত তাঞ্জামে করিয়া সহরের মধ্য দিয়া লইয়া গেল। খাঁ বাহাদুরের শাসনকাল পর্য্যন্ত সে বেরিলিতে ছিল। তাহার পর ১৮৫৮ সালে ৫ই মে, নারকাটিয়া পুলের নিকট ইংরেজ সৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নবীন দেওয়ান শোভারাম ২০শে জুন দরবারে উপস্থিত হইয়া এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। সরকারের জন্য যে সকল ব্যয় হইবে, তাহা বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার অর্দ্ধেক অংশ শোভারাম পাইবে। ইহা ব্যতীত আর কয়েকটী পদের সৃষ্টি হইল। মাদার আলি খাঁ ও নিয়াজ মহম্মদ খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহাদের বেতন মাসিক হাজার টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত হইল। মূলচাঁদ শোভারামের সহকারী নিযুক্ত হইল, তাহার মাসিক বেতন পাঁচ শত টাকা। শোভারামের পুত্র হরিলাল ১০০০৲ টাকা বেতনে পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত হইল। মাদার আলির পুত্র আলি হোসেন খাঁ ৫০০৲ টাকা বেতনে অশ্বা-

রোহী সৈন্যের অধিনায়কের পদ পাইল। সায়েফুল্লা খাঁ ৫০০৲ টাকা বেতনে জেলখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ পাইল। এইরূপে অনেকগুলি লোককে ভিন্ন ভিন্ন পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল।

যত দিন বিদ্রোহী সেনারা বেরিলিতে ছিল, তত দিন কেহই খাঁ বাহাদুরের আদেশ প্রতিপালন করিত না। যাহার যাহা ইচ্ছা হইত, সে তাহাই করিত। বখ্‌ত খাঁর বেরিলি সহরে অবস্থানকালে, ৭ই জুন আমাদের পদাতি রেজিমেণ্টের কয়েক জন সিপাহী সোহারা মহল্লা ঘেরিয়া ফেলিল। সেই মহল্লায় মিশ্র বৈজনাথ ব্যাঙ্কার এবং গবরমেণ্টের কোষাধ্যক্ষ কানজেটলাল বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকট সিপাহীরা টাকা চাহিল। প্রথমে তাঁহারা কিছুদিন লুক্কায়িত ছিলেন, শেষে তাঁহারা ধৃত হইয়া খাঁ বাহাদুরের সমীপে নীত হইলেন। সে সময়ে তিনি মহাসমারোহে দরবার-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের উপর এই আদেশ হইল, তাঁহাদের নিকট সরকারী এবং বে-সরকারী যত টাকা আছে, অবিলম্বে তাহা আনিয়া হাজির করিতে হইবে। কিন্তু উঁহারা টাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাদের দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বখ্‌ত খাঁর নিকটে প্রেরণ করা হইল। তাঁহাদের দুই জনকে সৈনিক-নিবাসে লইয়া গিযা নানা প্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হইয়াছিল। দারুণ গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে দুই দিন তাঁহাদের দুই জনকে দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলা হইবে, কিংবা তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছিল। শেষে তাঁহাদের নিকট হইতে ৫৪০০০৲ টাকা আদায় করিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাও সহজে হয় নাই। রেসালাদার মেজার মহম্মদ সফীকে ৪০০০৲ টাকা উৎকোচ দিয়া উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল। বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লী চলিয়া গেলে প্রজার উপর উৎপীড়নের যে কিছু হ্রাস হইয়াছিল তাহা নহে। অত্যাচার সমভাবে বা অধিকভাবে চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে বখ্‌ত খাঁ অত্যাচার করিত,—এখন নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর শাসনে আরও যেন অত্যাচার বৃদ্ধি পাইল। নবাবের মনের ভাব কি, তাহা জানি না,—কিন্তু কার্য্যত খুবই উৎপীড়ন আরম্ভ পাইল।

২৫শে জুন খাঁ বাহাদুর খাঁ আর একটী মন্ত্রণাসভা আহূত করিলেন। সেখানে সকলের বিবেচনায় এই স্থির হইল,—মকদ্দমা-মামলা নিষ্পত্তি করিবার জন্য একটী সভা প্রয়োজন; তদনুসারে একটী কমিটি গঠিত হইয়া

তাহার কয়েক জন সদস্যও নিযুক্ত করা হইল। পরদিন মন্ত্রণা-সভায় রাজস্বের কথা উত্থাপন হয়। ধনাগারে অর্থ নাই, একেবারে শূন্য। বিদ্রোহীরা বেরিলি পরিত্যাগ করিবার সময় যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং তৎ-প্রদেশবাসীর উপর কর ধার্য্য করাই স্থিরীকৃত হয়। কর সংগ্রহ শাস্ত্রসম্মত কি-না, তাহা দেখাইবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নিকট 'ব্যবস্থা' আর মুফ্‌তিদের নিকট 'ফাতওয়া' লওয়া হইল। পণ্ডিত এবং মুফ্‌তিরা এই ব্যবস্থা দিলেন যে, সাধারণ কার্য্যের জন্য যদি রাজার কিংবা নবাবের অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি প্রজাদের সম্পত্তি হইতে দশ ভাগের এক ভাগ অনায়াসে লইতে পারেন। এই ব্যবস্থার উপর নিভর করিয়া, কর আদায়ের জন্য আর একটী সভা সংগঠিত এবং কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ৫ জন লোক উক্ত সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইল। কানাইয়ালাল নামক এক ব্যক্তির গৃহে উক্ত সভার সভ্যগণ স্থির করিল যে, মহাজন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে চারি কিস্তিতে এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা আদায় করিতে হইবে। কাশীরাম নামক এক ব্যক্তির উপর প্রথম এই কর সংগ্রহের ভার অর্পিত হয়। তাহার পর দুই জন মুসলমানকে এই ভার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কিরূপ কঠোর এবং নৃশংসভাবে এই কার্য্য আরম্ভ করিল, নিম্নলিখিত ঘটনাই সম্পূর্ণরূপে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। সেই পাষণ্ডেরা হিন্দুদের নিকট কর আদায়ের সময় গো-হাড় তাহাদের সম্মুখে ধরিত, অন্য কেহ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে উত্তপ্ত লৌহকটাহের উপর বসাইয়া দিত। ঈদৃশ ভীষণ অত্যা-চারের দ্বারা দুরাচারেরা প্রথম দিনে প্রায় ৮২০০০৲ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিযা-ছিল। সংগৃহীত অর্থে কামান বারুদ ইত্যাদি ক্রয় করা হইল।

এইরূপ অরাজকতা, এরূপ অত্যাচার আমি আর কখন দেখি নাই। কোন কোন হিন্দু ব্রাহ্মণ যদি কর দিতে বিলম্ব করিত, অমনি এক জন মুসলমান বরকন্দাজ তাহার মুখে থুথু দিত, থুথুতে কাজ না হইলে গো-হাড় বা গো-মাংসের বন্দোবস্ত ছিল। এ দিকে মুসলমানের পক্ষে শূকর-হাড় বা শূকর-মাংসের বরাদ্দ করা ছিল। পক্ষপাত ছিল না। এরূপ অত্যাচারের দরুণ, সময়ে সময়ে নবাব-সৈন্যের সহিত অধিবাসিগণের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিত। উভয় পক্ষে দশ-বিশটা খুন-জখম হইত।

আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লী যাত্রা করিবার পর বেরিলি সহরে সোনার মোহর বা সোনা ছিল না বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। এক-একটী কুড়ি-বাইশ টাকার মোহর সিপাহীগণ পঞ্চাশ ও ষাট টাকা পর্য্যন্ত দিয়া খরিদ করিয়াছিল। ইহার কারণ এই,—প্রায় প্রত্যেক সিপাহী বা অশ্বারোহী লুঠপাট করিয়া পাঁচ-সাত শত টাকা বা দুই-এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু এত টাকা বহিয়া লইয়া যাওয়া কঠিন। তাই তাহারা টাকার পরিবর্ত্তে মোহর বা সোনার গহনাদি ক্রয় করিতে এত ইচ্ছুক হইযাছিল। কাজেই বেরিলিতে সোনার বাজার গরম হইয়া উঠে।

বিদ্রোহী সৈন্য যাত্রা করিলে আমি পান্নার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরদিন শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ দাদার বাসায় আসি। জুন জুলাই, এই দুই মাস কাল আমি বেরিলিতে থাকি। তাহার পর ঘটনাচক্রে পড়িয়া নানা স্থানে নীত হই,—নানা অদ্ভুত কর্ম্মেব কাবণ হই,—পর্ব্বতে, অরণ্যে, তোপ-তরবারির মুখে পতিত হই,—স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া কখন একাকী, কখন বা ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া, বিদ্রোহীদেব বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনাও করি।

এ পর্য্যন্ত আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা "আমাব জীবন-চরিতে"র ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা বা সূচনাতেই আমার জীবন-চরিতের প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভাগ

এক

সিপাহী-বিদ্রোহ যে কেবল বেরিলিতেই ঘটিয়াছিল তাহা নহে। ভারতের নানা স্থানে একই কালে এই বিদ্রোহানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। বঙ্গে, বিহারে, উত্তর-পশ্চিমে, অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌয়ে, পাঞ্জাবে, মধ্যভারতে, যেন সর্ব্বত্রই সমভাবে সম-সময়ে সকলেই গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ইংরেজ-রাজকে চাহি না,—ইংরেজ-রাজ্য ধ্বংস কর,—ইংরেজ দেখিলেই তাহার প্রাণ বধ কর।"

হঠাৎ কেন এমন হইল? হঠাৎ এক দিনের কল্পনা-জল্পনায়, এক মুহূর্ত্তের বিচার-বিতর্কে এ মহামারী ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। বিন্দু বিন্দু বারিকণা একত্র হইয়া এক মহাসমুদ্রের উৎপত্তি হয়। অণু-অণুপ্রমাণু প্রস্তরকণা একত্র হইয়া এই মহা-হিমালয় পর্ব্বত সুগঠিত হইয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ-বীজ একে একে ধীরে ধীরে ইংরেজের অলক্ষ্যে সংগৃহীত হইতেছিল। ক্রমে অঙ্কুর হইল,—বৃক্ষ পূর্ণাবয়ব হইল, ফুলে ফলে পরিশোভিত হইল,—তখন দেখিয়া শুনিয়া ইংরেজ ভয়-চকিত হইলেন, ইংরেজের অন্তরাত্মা শুকাইল।

অসংখ্য কারণে সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সম্পূর্ণরূপে, বিশদ এবং বিস্তৃতভাবে সে কারণাবলীর কথা কহিতে গেলে, তাহাই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া পড়ে। যথাসময়ে সংক্ষেপে সে কারণ-কাহিনী কীর্ত্তন করিব।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে বেরিলিতে সিপাহী-বিদ্রোহের আরম্ভ। ১৮ই জুন বিদ্রোহীদলের সেনাপতি বখ্‌ত খাঁ সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন। তিনি সমস্ত বন্দুক, কামান, গুলি, গোলা, তরবারি, বল্লম, বেয়নেট, টাকা-কড়ি, তাঁবু, সাজসরঞ্জাম এবং অস্ত্রশস্ত্র,—ইংরেজের যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায়ই সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হন।

বখ্‌ত খাঁর যাত্রার পর এ দিকে খাঁ বাহাদুর খাঁ প্রকৃত প্রস্তাবে বেরিলি অঞ্চলের নবাব হইলেন। যত দিন বিদ্রোহী সিপাহীদল বেরিলিতে ছিল, তত দিন খাঁ বাহাদুরের হুকুম সহজে কেহ মান্য করিত না। প্রজার উপর প্রবল উৎপীড়ন করিতে হইলে খাঁ বাহাদুর খাঁকে তখন বখ্‌ত খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত।

খাঁ বাহাদুর এক্ষণে পুরা নবাব হইয়া, দেওয়ান শোভারামের সাহায্যে স্বদেশের সুশাসন আরম্ভ করিলেন। সুশাসনের সদর্থ সু-উৎপীড়ন।

প্রথম সৈন্য-সংগ্রহ হইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ হাজার পদাতি-সেনা, দুই হাজার অশ্বারোহী এবং দশ-বার হাজার মহম্মদী ঝণ্ডা সংগৃহীত হইল।

খাঁ বাহাদুর খাঁ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী নানা দেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। প্রায় সমগ্র রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন প্রদেশ তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল। কিন্তু অন্য দেশ অধিকার আয়ত্তে আনয়নকালে তাঁহাকে অনেক ক্ষত্রিয় নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। কোথাও শত্রুপক্ষ রণে পরাজিত হয়, কোথাও বা শত্রুগণ বিনাযুদ্ধে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করে। ফল কথা, যুদ্ধে যত না হউক, কৌশলে এবং নামের প্রতাপে খাঁ বাহাদুর খাঁ দিগ্বিজয়ী হইলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গুলি, গোলা, তোপ, বন্দুক, তরবারি প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গ অনেক ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক নানা দেশের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইলেন। কোন জামাই কোন নগরের গবর্ণরী পদ পাইলেন, কোন সম্বন্ধী কোন সৈন্যদলের সেনাপতি হইলেন, কোন ভ্রাতুষ্পুত্র কোন মহকুমার দেওয়ান হইলেন। এ অঞ্চলে ইংরেজের নাম এককালে লোপ পাইল। 'জয় নবাব বাহাদুরের জয়' —এই কথা কেবল নানা স্থানে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

উৎপীড়ন, অত্যাচার, অনাহার, উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সতীর সতীত্ব রাখা দায় হইয়া উঠিল। অমুকের সহধর্ম্মিণী পরমা সুন্দরী এবং নবযৌবন-ভূষণে ভূষিতা,—এই কথা নবাব-বংশীয় কোন নবযুবকের কানে উঠিল। নবযুবক অমনি পরস্ত্রীকে পাইবার জন্য কল-বল-কৌশল আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তখন দুর্ব্বলের স্ত্রী বলবান্ কর্ত্তৃক অপহৃত হইতে লাগিল। ধনী ব্যক্তি ধন-লুণ্ঠনের আশঙ্কায় রাত্রে প্রায় নিদ্রা যাইত না। চুরি, ডাকাতি, মারামারি, দাঙ্গা, সহরে এই সকল ঘটনা নিয়তই ঘটিতে লাগিল। লোক সকল কেমন যেন উন্মত্তপ্রায় হইল; সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহাকেও

মানে না, কেহ কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না, জোর যার, মুলুক তার। দুর্ব্বল শিষ্ট-শান্ত প্রজাসমূহ বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া কেমন যেন দিশাহারা হইল।

একটী কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। সাধারণ প্রজাবৃন্দ 'ইংরেজের রাজ্য এরূপভাবে হঠাৎ লুপ্ত হউক'—এ কথা একটী দিনও বলে নাই, ইংরেজকে দূরীভূত করিবার জন্য এক দিনও ইচ্ছা প্রকাশ করে নাই। প্রজাকুল স্বচ্ছন্দে খাইতেছিল, পরিতেছিল, আপন কাজকর্ম্ম কৃষি ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছিল; —হঠাৎ একদিন শুনিল,—ইংরেজ আর নাই, ইংরেজ হত, আহত, পলায়িত, —ইংরেজ ভারতসীমার বহির্ভূত। আবার রোহিলখণ্ডে কুমায়ুন প্রদেশে নবাবী আমল উপস্থিত হইল। আবার সেই পুরাতন প্রথা, পুরাতন নীতি, পুরাতন পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল। আবার সেই অর্দ্ধচন্দ্র-অঙ্কিত ধ্বজ পতাকা উড্ডীন হইতে আরম্ভ হইল। আবার সেই মুসলমানের মস্‌জিদ, মুসলমানের মৌলুভী, মুসমানের কোরানের সম্মান আদর-গৌরব বৃদ্ধি হইল। আবার সেই মুসলমান সম্রাট্, মুসলমান রাজা, মুসলমান সেনাপতি, মুসলমান শাসনকর্ত্তা—সমস্তই মুসলমানময় হইল। সুখের আর সীমা নাই।

সুখ অসীমই হউক, বা স-সীমই হউক, সাধারণ প্রজা কিন্তু এ সুখ-সম্ভোগ করিতে সক্ষম ছিল না, সম্মতও ছিল না। প্রজা ভাবে, আমি তাঁত বুনি আর খাই, আমি লাঙ্গল চষি আর খাই, আমি দোকান-পাট করি, খাই-দাই আর থাকি। তা, ইংরেজই আমার রাজা হউক, মুসলমানই আমার রাজা হউক, আর হিন্দুই আমার রাজা হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমি দু-বেলা কাজকর্ম্ম করিয়া, খাটিয়া-খুটিয়া স্ত্রী-পুত্রের পূর্ণমাত্রায় ভরণ-পোষণ করিতে পারিলেই আমার যথেষ্ট হইল। সুতরাং সাধারণ প্রজা যে 'ইংরেজ-রাজ্য লোপ' এই কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে।

আমি স্থির দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, মুসলমান প্রজা-সাধারণ ইংরেজরাজ্য লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হয় নাই। বোধ হয়, তাহারা এই ভাবিয়াছিল যে, পাহারার পরিবর্ত্তন হইল মাত্র। কিছুকাল ইংরেজ আমাদের প্রহরী রক্ষকস্বরূপ ছিল, এক্ষণে আবার আমাদের মুসলমান প্রহরী, মুসলমান রক্ষকই আসিল। যে রক্ষক হয় হউক, ভাল রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলেই হইল।

মুসলমান প্রজার মনে ত ঐরূপ ভাব। হিন্দু প্রজার হৃদয়ে আরও বিষম ভাব। সিপাহী-বিদ্রোহ ব্যাপারে কোন হিন্দু নরপতি রোহিলখণ্ডের রাজ-

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন না,—হিন্দুর বসুন্ধরা হিন্দুরাজের করতলগতও হইল না,—ছিল বাইবেল, আসিল কোরান,—ছিল যীশু, আসিল মহম্মদ,—ছিল খৃষ্টমাস, আসিল মহরম। হিন্দুর ইহাতে আনন্দ কেন হইবে ? আঁধার রজনী আর অমানিশা—এক অর্থে এ উভয়ই সমান।

ইংরেজ-রাজ্য লুপ্ত হইল বলিয়া হিন্দু প্রজার তো উৎসবের কোন কারণ ছিলই না, বরং কষ্টেরই বিশেষ কারণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইংরেজ-রাজত্বে এরূপভাবে অত্যাচার ছিল না, লুণ্ঠন ছিল না, স্ত্রীর সতীত্ব-অপহরণ ছিল না ;—পূর্ব্বে ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ গ্রহণ করিবার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল, রীতিমত বিচার-প্রথা ছিল ;—পূর্ব্বে অপরাধী দণ্ড পাইত—দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন হইত ;—কিন্তু এক্ষণে এই নূতন নবাবী আমলের আরম্ভে—নিয়ম, শৃঙ্খলা, পদ্ধতি কিছুই ছিল না। কাজেই প্রজা-সাধারণ অস্থির, উদ্বিগ্নচিত্ত, আতঙ্কযুক্ত হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প এক রকম বন্ধ হইয়াছিল। প্রকৃতই প্রজার কষ্টের অবধি ছিল না। আবার ইংরেজের শুভাগমন হউক, ইহাই অনেকে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন আমি অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর মুখে এই কথা শুনিয়াছি, "বাবুজি ! আর সহ্য হয় না ; শীঘ্র ইংরেজ আগমন করুন,—পুনরায় শাসন-দণ্ড লউন,—ইহাই আমরা চাহি। পূর্ব্বে আমরা রাম-রাজ্যে বাস করিতেছিলাম।"

অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমানও ইংরেজের পুনরাগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। মুখ ফুটিয়া তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারিতেন না,—মুখে খাঁ বাহাদুরের জয় কীর্ত্তন করিতেন, কিন্তু অন্তরে ইংরেজের গুণ গাহিতেন। অধিক কি, খাঁ বাহাদুর খাঁর খুড়তুতো ভাই হাফিজ নিয়ামৎ খাঁ বলিতেন, "ভাই সাহেব তো পাগল হোগয়ে হ্যায়। ইংরেজ বাহাদুরনে হামারে বুজরুগোঁসে মুলুক লেলিয়া হ্যায়, লেকিন্ হাম্‌লোগোঁকো ওসিকা দেতে হ্যায়। আওর আচ্ছি আচ্ছি নোক্‌রি, তসিলদারি, মুনসেফি, সদরালা, সদরসদুর—ইয়ে সব ও হোদা দিয়া হ্যায়। আওর হামলোগোঁকা পরওরিষ কিয়া হ্যায়। হামলোগোঁকো নেহি চাহিয়ে সরকারসে দুষমণি করেঁ। আওর সরকার অব্ জল্‌দি আওএগি, ইস্‌মে কুচ শক নেই হ্যায়।"

বেরিলি সহরে আমি যে বাসায় থাকিতাম, তথা হইতে হাফিজ নিয়ামতের বাটী অতি অদূরেই অবস্থিত। আমার সহিত প্রায় তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হইত। আমি বলিতাম, "আপনি ইংরেজ-রাজের এত প্রশংসা-বাদ করেন, এ

কথা আপনার ভ্রাতা খাঁ বাহাদুর শুনিলে আপনার উপর রাগ করিতে পারেন, বিশেষ বিরক্তও হইতে পারেন।" বৃদ্ধ হাফিজ নিয়ামৎ খাঁ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিতেন, "ও পাগলকে আমি ভয় করিব? সে বিরক্ত হইয়া আমার কি অনিষ্ট সাধন করিবে?"

আমি। তাঁহার অধীনে এখন দশ হাজার ফৌজ হইয়াছে।

হাফিজ নিয়ামৎ। খাঁ বাহাদুরের এখনও এত অধিক বল হয নাই যে, সৈন্য দ্বারা আমার বাড়ী লুণ্ঠন করিতে পারে। আর, আমি ইচ্ছা করিলে এক দিনেই সেই সমস্ত সৈন্য আমার বশে আনিতে পারি।

আমি। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র চুন্না মিঞা ত খাঁ বাহাদুরের অধীনে চাকুরী লইয়া নায়েব-দেওয়ান হইয়াছে নয়?

হাফিজ নিয়ামৎ। হাঁ। চুন্না বড়ই বেকুফ। আমি নিষেধ করিলেও আমার সে কথা শুনে নাই। তাহাকে আমি আর এ বাড়ী ঢুকিতে দিই না।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই চুন্না মিঞা আমার বাসায় আসিয়া প্রত্যহ সেতার বাজাইত এবং আমি তাহাকে মাসিক সর্ব্ব-রকমে প্রায় ত্রিশ টাকা দিতাম। সেই চুন্না মিঞার এক্ষণে মাসিক ৩০০৲ টাকা মাহিনা হইয়াছে।

হাফিজ নিয়ামৎ এবং অন্যান্য সম্রান্ত মুসলমানগণ যে ইংরেজের শুভ-কামনা করেন, তাহা নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ মনে মনে জানিতেন। কিন্তু অন্তরে ইহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়াও, তিনি প্রকাশ্যে ইহার কোন প্রতিকার করিতে সক্ষম হন নাই। বিশেষ তাঁহার একমাত্র কন্যা—পরম প্রিয়তমা কন্যা—রূপবতী গুণবতী কন্যার সহিত হাফিজ নিয়ামতের কনিষ্ঠ পুত্রের শুভবিবাহ হইয়াছিল। কাজেই হাফিজ নিয়ামতের অনিষ্ট করিতে হইলে জামাতার ও কন্যার অনিষ্ট করিতে হয়। আরও এক কথা এই, তিনি সহসা যদি নিয়ামতের উপর উৎপীড়ন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে বেরিলির সমগ্র মুসলমান-সম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে, অথবা তাঁহার সৈন্যদল মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করিতে পারে। বস্তুত খাঁ বাহাদুরের উপর অধিকাংশ গণ্যমান্য মুসলমান খড়্গহস্ত ছিলেন। দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা এই খড়্গহস্ততার মূল কারণ। খাঁ বাহাদুর কোন্ গুণে নবাব হইলেন? আর আমাদের গুণগ্রামের এতই অভাব কি ছিল যে, আমরা নবাব হইতে সক্ষম হইলাম না? খাঁ বাহাদুরের দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ, আমাদেরও তাই;—

সুতরাং আমরা নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত না হইলাম কেন? অধিকন্তু আমাদের বিষয়-সম্পত্তি এবং টাকাকড়ি খাঁ বাহাদুর খাঁ হইতে বরং অধিক হইবে, তথাচ কম নহে। অতএব আমাদের স্বত্ব, অধিকার, দাবী-দাওয়া দূরে রাখিয়া আমাদিগকে নগণ্য জ্ঞানে একেবারে উপেক্ষা করিয়া, কেবল কতকগুলি তোষামোদপ্রিয় নীচকুলোদ্ভব মুসলমানের সাহায্যে খাঁ বাহাদুর খাঁ স্বয়ং নবাব হইয়া অবশ্যই ঘোর অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন।

সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানীগণ প্রত্যহ ভগবান্‌কে ডাকিতেন, বলিতেন, "হে ঈশ্বর! এদেশে ইংরেজের রাজত্ব পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত কর; জ্বালা আর সহিতে পারি না—সদাই শরীরে যেন সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে।" মিশ্র বৈজনাথ, লালা লছমীনারায়ণ, রাজা নহবৎ রায়, রায় চেৎরাম প্রভৃতি অনেক ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি গোপনে নাইনিতালস্থ পলায়িত ইংরেজগণের সহিত চিঠি-পত্র লেখালেখি করিতেন এবং মুসলমান নবাবের গতিবিধি সমস্তই তাঁহারা এইরূপে ইংরেজের কর্ণগোচর করিতেন।

যদি হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই নবাব বাহাদুরের উপর এত বিরূপ ছিল, তবে তিনি এরূপ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন কিরূপে? নানা দেশ জয় করিলেন কিরূপে? সৈন্য সংগ্রহ সহজ। দেশের যে সকল লোক খাইতে পাইত না, যাহারা গুণ্ডাগিরি করিয়া দিনপাত করিত, যাহারা কাজকর্ম্ম না জুটায় অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়াছিল, তাহারাই মাসিক ৫৲ টাকা ৬৲ টাকা বা ৭৲ টাকা মাহিনায়, নবাব সাহেবের সৈন্যদল মধ্যে প্রবেশ করিল। সকল দেশেই ভদ্র-নামধারী অনেক চোর বঞ্চক বদ্‌মাইস থাকে,—তাহারা কাপ্তেন, লেফ-টেনেণ্ট, কর্ণেল প্রভৃতি পদ গ্রহণ করিল। পেটের দায়ে, অথবা নবাবের ক্রোধানলে পড়িবার ভয়ে, অনেক ভাল মানুষ ব্যক্তিও নবাবের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

দুই

খাঁ বাহাদুর খাঁর রাজত্ব-সময়ে শোভারামের সম্মান এবং প্রভুত্ব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহার ক্ষমতা-বলে বহু হিন্দুসন্তান রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, কেন না, শোভারাম যাহা করেন তাহাই হয়। তাঁহার এ প্রকার অসীম ক্ষমতা, ঈদৃশ সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব দেখিয়া নওমহলার সইয়দেরা বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা ঈর্ষাকষায়িত নেত্রে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল এবং কি কৌশলে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। জুলাই মাসের কোন এক দিন শোভারাম রাজ-দরবারের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে কতকগুলি সইয়দ আসিয়া গুপ্তভাবে খাঁ বাহাদুরকে সংবাদ দিল যে, শোভারাম আপনার বাড়ীতে এক জন ইংরেজকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, সুতরাং তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এই সংবাদ পাইয়া খাঁ বাহাদুর সৈন্য-সামন্ত লইয়া শোভারামের বাড়ীতে তল্লাস লইতে আদেশ দিলেন। একেই শোভারামের উপর সইয়দদের ভয়ঙ্কর জাতক্রোধ ছিল, তাহাতে আবার এই আদেশ পাইবামাত্র তাহারা সৈন্য লইয়া শোভারামের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল এবং দরজা ভাঙ্গিয়া লুঠপাট করিতে আরম্ভ করিল। এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার এবং উৎপীড়নের কথা শোভারামের বন্ধু ইনায়েৎউল্লা খাঁ এবং বকসিস আলির কর্ণগোচর হইল, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে গিয়া সেই অত্যাচারাসক্ত সৈনিকদিগকে শান্ত করিলেন। এদিকে শোভারাম দরবারে বসিয়া অভিনিবেশপূর্ব্বক রাজকার্য্য করিতেছিলেন; তাঁহার প্রতি যে কিরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার এবং উৎপীড়ন হইতেছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। যাহা হউক, যখন তিনি এই সংবাদ পাইলেন তখন তাঁহার ক্রোধ এবং ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ দরবারের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত মনের ক্ষোভ মনের আক্রোশ মনেই মিটাইতে লাগিলেন। তিনি আর দরবারে উপস্থিত হইলেন না। শোভারাম খাঁ বাহাদুরের দক্ষিণ হস্ত, তিনিই তাঁহার বুদ্ধিবল; তাঁহার অনুপস্থিতকালে কাজ-কর্ম্মের বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিল। কাজেই খাঁ বাহাদুর বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন এবং তাঁহার অবিমৃষ্য-কারিতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলেন। যাহা হউক, শোভা-রামকে পুনঃ হস্তগত করিবার ইচ্ছা তাঁহার নিতান্ত বলবতী হইয়া উঠিল।

মাদার আলি খাঁ শোভারামের পরম বন্ধু ছিলেন ; খাঁ বাহাদুর তাঁহার সাহায্যে এবং স্বীয় দোষের জন্য বিধিমতে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, শোভারাম পুনরায় আপনার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে বেরিলির একটী উদ্যানস্থ কূপের মধ্যে ডেপুটী কালেক্টর ওয়াট সাহেবের মৃতদেহ পাওয়া গেল। অনেকে অনুমান করেন, শোভারাম এই ওয়াট সাহেবকে আপনার গৃহে লুকাইয়া রাখেন, এবং পাছে আবার কোন বিপৎপাত হয়, এই ভয়ে তাঁহাকে হত্যা করিয়া উক্ত কূপে নিক্ষেপ করেন। এ ঘটনাটী লোকে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই বলিয়াছিল, ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না॥

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বেরিলিতে বিদ্রোহের সূচনা হইবামাত্রই তত্রস্থ ইংরেজেরা নাইনিতালে গিয়া আশ্রয় লন। এক্ষণে খাঁ বাহাদুর খাঁ এবং তাঁহার পরামর্শদাতারা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যত দিন নাইনিতাল ইংরেজদের অধিকৃত থাকিবে, তত দিন খাঁ বাহাদুরের প্রভুত্ব রোহিলখণ্ডে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইবার আশা নাই। তাঁহারা ইহাও শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, হয়ত একদিন ইংরেজেরা কোন এক নতন রেজিমেণ্ট সংগঠিত করিয়া তাঁহাদের অনায়াসে আক্রমণ করিতে পারেন। আর ইহাও তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, বৃটিশ-সন্তানগণ শিয়রে দণ্ডায়মান থাকিলে তাঁহাদের রাজ্য-শাসন নিতান্ত শিথিলমূল হইবে এবং দেশীয় কুচক্রিগণ নানারূপ ষড়যন্ত্র দ্বারা নিয়তই তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবে। এইরূপ চিন্তা করত নাইনিতাল আক্রমণের জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সৈন্য সংগৃহীত হইল ; খাঁ বাহাদুর খাঁর পৌত্র বন্নে মীর সেনানায়কের পদে বরিত হইয়া জুলাই মাসে যুদ্ধার্থে সসৈন্যে যাত্রা করিল। কিন্তু সে বহেড়িতে গিয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে আর একটী ঘটনা ঘটে। খাঁ বাহাদুর খাঁর পরামর্শদাতার অভাব ছিল না। যিনি যাহা মতলব আটিতেন তাহা তাঁহাকে বলিলে, তদনুসারে তিনি প্রায়ই তাহা করিতেন। সুজা উদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তি এই পরামর্শ দিলেন যে, দিল্লীর সম্রাটকে নজর পাঠান বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। খাঁ বাহাদুর তাঁহার যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত উপঢৌকন পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, এই উপঢৌকনের পরিবর্ত্তে উপযুক্ত খেলাত পাইবেন। এই আশায় উৎসাহিত হইয়া একখানি সুবৃহৎ পত্রের সঙ্গে এই সকল সামগ্রী পাঠাইলেন।

১। স্বর্ণনির্ম্মিত হাওদা এবং তদুপযুক্ত শোভন আস্তরণ-সমন্বিত একটী বৃহৎ হস্তী।

২। মণিমুক্তা-খচিত পর্য্যাণ-যুক্ত একটী অশ্ব।

৩। একখানি কোরান।

৪। একটী মুকুট।

৫। ১০১ মোহর।

আমেদ সা খাঁ, আলি ইযার খাঁ, আকবর খাঁ এই তিন জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ৫০ জন অশ্বারোহী এবং দুই শত পদাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে এই উপঢৌকন লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। আমেদ সা খাঁ রামপুর পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আইসে।

জুলাই মাসে বন্নে মীর বদ্ধার্থ বেরিলি পরিত্যাগ করে, কিন্তু সে নাইনি-তালে না গিযা বহেড়িতে অবস্থিতি করিযা তত্রত্য গ্রাম লুণ্ঠন করিতে থাকে। নাচ, গান, রমণী ও বারুণী লইযা সেনাপতি বাহাদুর বহেড়িতে দিন কাটাইতে লাগিল। সেনাপতির এরূপ কার্য্য-শৈথিল্য দেখিযা এক রেজিমেণ্ট সৈন্য সঙ্গে করিয়া আলি খাঁ মেওয়াতি এবং হাফিজ কাল্লান খাঁ, বন্নে মীরের সঙ্গে যোগ দিল এবং তাহাকে যদ্ধার্থ নাইনিতালে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু বন্নে মীর তথায় একেবারে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আলি খাঁ তাহাকে বেরিলি ফিরিয়া যাইতে বলিল এবং তাহার নিকট হইতে কামান এবং সৈন্য লইয়া হালদোয়ানি এবং কাটগুদাম নামক স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় পঁহুছিয়া সে স্থান লুঠ করিযা ভস্মীভূত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের এ অত্যাচার তৎপ্রদেশবাসীদের অধিক দিন সহ্য করিতে হয় নাই। অনতিবিলম্বে হঠাৎ একদিন নাইনিতাল হইতে সৈন্য আসিয়া আলি খাঁকে সসৈন্যে পরাজিত করিল। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আলি খাঁর অনেক সৈন্য হত হয়। খাঁ বাহাদুর খাঁ নাইনিতাল আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইবার পূর্ব্বে এ সংবাদ বেরিলি হইতে নাইনিতালে ইংরেজের গুপ্তচর দ্বারা নীত হইয়াছিল। যখন এ কথা তিনি শুনিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিলিস্থ ইংরেজী-অভিজ্ঞ লোকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুই দিনের অধিক কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। কারামুক্তির সময় আদেশ দেওযা হয যে, যাঁহারা ইংরেজের সঙ্গে পত্রাদি লেখালেখি করিতেছেন বলিয়া ধৃত হইবেন, তাঁহাদের অতি কঠিন শাস্তি

দেওয়া হইবে। যে সকল বাঙ্গালী বেরিলিতে ছিলেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম হইল।

তিন

বাঙ্গালীর বেরিলি সহর পরিত্যাগের কথা একটু বিশদভাবে বলিব। ৩১শে মে বিদ্রোহ হয়। আমি জুন, জুলাই এবং আগষ্ট মাসের কয়েক দিন পর্য্যন্ত বেরিলিতে থাকি। অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষে, যখন ও দেশে বিষম বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, পথসমূহ পিচ্ছিল এবং কর্দ্দমপূর্ণ হইয়াছে, সেই সময় আমি বেরিলি সহর একাকী নীরবে গোপনে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

বেরিলিতে যে সমস্ত বাঙ্গালীর স্ত্রী-পরিবার ছিল, তাঁহারা বহু দিন হইতে বেরিলি সহর ত্যাগের চেষ্টা বিশেষরূপে করিতেছিলেন। আমাদের সাত-আট জন বাঙ্গালীর সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র ছিল না; আমরাও কিন্তু সহর ত্যাগের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ দিকে নবাব বাহাদুর একত্র একসঙ্গে সকল বাঙ্গালীকে সহর পরিত্যাগের আজ্ঞা দিতে কিছুতেই স্বীকৃত নহেন। খাঁ বাহাদুর বলিতেন, "বাঙ্গালী ইংরেজের গুরু; বাঙ্গালীকে কেহ বিশ্বাস করিও না; বাঙ্গালী ও ইংরেজ একপ্রাণ।" পাছে সমগ্র বাঙ্গালী নাইনিতালে গিয়া ইংরেজের সহিত মিশিয়া কি একটা হুলস্থূল ঘটায়, ইহাই নবাবের ভয় ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টার পর শেষে হুকুম হইল, যে সকল বাঙ্গালীর স্ত্রী-পরিবার আছে, তাহারা সহর ত্যাগ করিয়া আপন গৃহে যাইতে পারিবে। বঙ্গদেশে বাঙ্গালী যাইবে, অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না। বলা বাহুল্য, এই হুকুম বাহির করিবার জন্য রাজ-দরবারে অনেক টাকা ঘুষ দিতে হইয়াছিল। এই হুকুম পাইয়া আমার হরদেব ও হরগোবিন্দ দাদা মহাশয়গণ এবং চারি জন পরিবার-যুক্ত বাঙ্গালী বেরিলি ত্যাগ করিয়া, নবাবের মুক্তিপত্র লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বেরিলি হইতে বঙ্গদেশ বহু দূর, পথে কেবল লুণ্ঠন, ডাকাতি, খুন হইতেছে; তাই কিছু দূর গিয়া তাঁহারা অন্য এক বাঁকা পথ দিয়া আবার বেরিলির দিকে ফিরিলেন; কিন্তু ঠিক বেরিলিতে না আসিয়া, বেরিলিকে বামে রাখিয়া তাঁহারা আরও উত্তরাভিমুখে চলিলেন। শেষে কাশী-পুরের রাজা শিবরাজ সিংহের তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সিপাহী-

বিদ্রোহের সময় রাজা শিবরাজ সিংহ ইংরেজরাজের বিশেষ সাহায্য করেন—নগদ টাকা, সৈন্য ও রসদ দানে ইংরেজকে রক্ষা করেন। ইঁহারা, বিদ্রোহ-সময়ে কাশীপুরে পরম সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে খাঁ বাহাদুর শুনিলেন, বেরিলির কোন কোন অধিবাসী নাইনিতালস্থ ইংরেজগণের সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করিয়া থাকে। এ কথা শুনিয়াই অমনি তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি সহসা হুকুম দিলেন,—"বেরিলি সহরে যে ব্যক্তি ইংরেজি জানে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করিয়া কারাকূপে নিক্ষেপ কর।" এইরূপ গ্রেফতারের হুকুম পাইয়া নবাবের পুলিশ কর্ম্মচারিগণ সহরে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই ইংরেজি-অভিজ্ঞ বলিয়া ধরিতে লাগিল। যাহাদের টাকা ছিল, তাহারা পুলিশকে উৎকোচ দিয়া, পুলিশের পদপ্রান্তে প্রচুর পরিমাণ টাকা বর্ষণ করিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। তখন নানা রহস্যজনক ব্যাপারও ঘটিতে আরম্ভ হইল। যে সকল ধনবানের সন্তান এ বি সি ডি পড়ে, উৎকোচের লোভে পুলিশ তাহাদিগকেও গিয়া ধরিল। পুলিশ কাহারও হাতে হাতকড়ি দিল, কাহাকেও পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল, কাহারও পৃষ্ঠে দারুণ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। প্রজাকুল চারি দিকে গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুস্থানী এবং তাঁহাদের সন্তানগণ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই শত লোক হঠাৎ এক দিনে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। 'হায় হায়' শব্দে দিক্‌সমূহ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রথম দিন আমাদিগকে কেহ ধরিতে আসিল না। আমাদের দুই ভাইকে যে দয়া করিয়া পুলিশ প্রথম দিন ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা নহে। প্রথম দিন, দুই-তিন মহল্লার ইংরেজি অভিজ্ঞ লোক গ্রেফতার করিতে করিতেই সূর্য্যদেব অস্তমিত হন। কাজেই আমাদের পাড়ায় সে দিন আর পুলিশ আসিল না। লোকপরম্পরায় অবগত হইলাম, দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকাল হইতেই আমাদের পল্লীতে গ্রেফতার আরম্ভ হইবে। কাশীপ্রসাদের মুখটী একেবারে শুকাইয়াছে। কাশী কহিল, "দাদা! আর বুঝি রক্ষা নাই। কল্য নিশ্চয়ই আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। বেরিলি সহর মধ্যে আমরা দুই ভাই এক্ষণে যত ইংরেজি জানি তত ইংরেজি আর কেহই জানে না। কাজেই আমাদিগকে আগে ধরিবে।"

আমি। ভাই! এত বিচলিত হইও না। বিপদে ভগবান্ রক্ষা করিবেন।

কাশী। এবার তো রক্ষার উপায় দেখি না। বেরিলী হইতে এ রাত্রে

পলাইয়া যে প্রাণ রক্ষা করিব, তাহার উপায় নাই। কারণ, সহরের চারি দিকে প্রবল পাহারার ঘাটি আছে। মুক্তিপত্র ব্যতীত কাহারও সহর ত্যাগ করিয়া যাইবার যো নাই।

আমি। ভাই! ভাবিও না,—রাত্রি হইয়াছে, আহারাদি করিয়া ঘুমাও।

বলা বাহুল্য, কাশীপ্রসাদের সে রাত্রি ঘুম হয় নাই।

প্রাতঃকালে উঠিলাম,—ভাবিলাম পুলিশের বড় কর্ত্তার নিকট গিয়া উপস্থিত হই,—তিনি আমার পরিচিত ব্যক্তি—তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্যও আছে,—তাঁহাকে গিয়া আমাদের রক্ষার কথা বলি,—যদি কিছু টাকা তিনি লয়েন, তবে তাঁহাকে দিয়া আসিব। আমার তখন টাকার নিতান্ত অভাব ছিল, কারণ যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছিল। উপায়হীন হইয়া আমি তখন প্রচ্ছন্নভাবে পান্নার নিকট গিয়া ১১টী মোহর ধার করিয়া আনিলাম। মোহর লইয়া পথে আসিতে আসিতে শুনিলাম, গত কল্য যে সকল ব্যক্তি ইংরেজি-জানা অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের সকলেরই মুক্তির হুকুম হইয়াছে। হঠাৎ এ কথায় বিশ্বাস হইল না। শেষে জানিলাম, এ কথাই সত্য। ইহার কারণ এই,—সহরের প্রায় দশ-বার হাজার অধিবাসী গত কল্য রাত্রে জেলখানা ঘেরাও করিয়াছিল, 'বলপূর্ব্বক জেল ভাঙ্গিয়া কারাবাসিগণকে মুক্তি দিব' এরূপ ভয় দেখাইয়াছিল। খাঁ বাহাদুর তাহ শোভারামের পরামর্শে বার জন বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলকেই খালাসের হুকুম দেন। এইরূপ খালাসের হুকুম হইলেও বন্দোবস্তের দোষে অনেককে ২।৩ দিন কারাগারে থাকিতেই হইয়াছিল।

যাহা হউক, খাঁ বাহাদুর শেষে এই আজ্ঞা দিলেন, "যদি কোন ব্যক্তি ইংরেজকে চিঠিপত্র লেখেন, তবে তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। আর বেরিলি সহরে যে সকল বাঙ্গালী আছে, তাহারা অবিলম্বে সহর ত্যাগ করিয়া যাউক।'

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া এ সংবাদ আমি কাশীপ্রসাদকে বলিলে তাহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। আমি বলিলাম, "দেখ, বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদন আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। বিপদে ধৈর্য্য ধরিবে। উতলা হইতে নাই। তবে সাধ্যমত ধীরভাবে বিপদ্ দূরীকরণার্থ সতত চেষ্টা করিবে।"

এই উপদেশ-বাক্য কাশীর কানে গেল কি না বলিতে পারি না। কাশী কহিল,—"দাদা! আজই এখনি এ স্থান হইতে পলাইলে হয় না?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ভাই! আবার তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে।"

চার

ঠাকুরদাদা রামকমল চক্রবর্ত্তীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইনি বিদ্রোহের পর আফিঙ্ বিহনে দুই দিন কাল একরকম অচেতন ছিলেন। ইহার বয়ঃক্রম তখন ৭৫ বৎসরের কম নহে, বরং অধিক হইবে। দেখিতে ঠিক পাকা আমটীর মত। তাহার উপর আনাভি বিলম্বিত প্রকাণ্ড শ্বেতচামরবৎ দাড়ি ছিল। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। কপালে, গ্রীবায়, বক্ষে, হস্তমূলে শ্বেতচন্দনের শোভা। আজ প্রায় এক মাস হইল তিনি গৈরিক বসন পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার অঙ্গের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। নিরামিষাশী, হবিষ্যান্নভোজী,—মুখে সদাই হর-হর বম-বম ধ্বনি লাগিয়াই আছে। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিলে সেই প্রাচীন কালের পৌরাণিক মুনি-ঋষি-যোগী বলিয়া ভ্রম হইত।

হরদেব দাদার বাসায় ঠাকুরদাদা থাকিতেন। দাদা যখন সপরিবারে বেরিলি ত্যাগ করিয়া কাশীপুর রাজধানীতে গমন করেন, তখন ঠাকুরদাদা বার্দ্ধক্যবশত শারীরিক দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহাদের সহিত বিপদসঙ্কুল পথে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। সুতরাং হরদেব দাদার বেরিলির বাসায় আমরা দুই ভাই এবং ঠাকুরদাদা—এই তিন জনে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

সকল বাঙ্গালীর বেরিলি সহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম হইল,—কিন্তু ঠাকুরদাদা অবাধে বেরিলিতে বাস করিবার আদেশ পাইলেন। ঠাকুরদাদা সহর-কোতোয়ালকে বলেন, "আমি সন্ন্যাসী,—আমার অন্তিম-দশা উপস্থিত, আমার দেহ শিথিল হইয়া আসিতেছে, চলিবার শক্তি নাই, আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইলে পথেই আমি মারা যাইব। আর আমার দ্বারা নবাব বাহাদুরের কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ঠাকুরদাদা এই কথাগুলি বেশ গুছাইয়া বলায় কোতোয়ালের কেমন দয়া হইল। সে অনিমেষ-লোচনে ঠাকুরদাদার সেই প্রশান্ত সুন্দর গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আপনি ফকির, আপনি এখানে থাকুন।"

শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগ, বর্ষাকাল। গগনপটে মেঘমালার শোভা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। বোঁ বোঁ শব্দে বায়ু বহিতেছে। পথ পিচ্ছিল,—এক হাঁটু কাদা।

নগরত্যাগের ত হুকুম হইল,—কিন্তু এখন এই দুর্দ্দিনে যাই কোথা? অর্থ নাই, বস্ত্র নাই, তৈজস-পত্র নাই,—এই ভিখারীর বেশে যাই কোথা? যে পথে

যাইব, শুনিতে পাই সেই পথেই দলে দলে দস্যু-তস্কর তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে লইয়া ঘুরিতেছে। শুনিতে পাই, পথে বাঙ্গালী দেখিলেই বিদ্রোহিগণ ধরিতেছে, মারিতেছে, কয়েদ করিতেছে, কাটিয়া ফেলিতেছে। আমি নিঃসম্বল, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন,—ইহার উপর সঙ্গে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ আছেন। কিন্তু পথে বিপদ্ বলিলে ছাড়ে কে? বেরিলিতে থাকিলে হয় কয়েদ, না হয় ফাঁসি। ইহা অপেক্ষা সহর ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত। পথে যাহা হয় হউক।

নাইনিতালে ইংরেজের সহিত মিলিত হইবার কি কোন উপায় নাই? পলায়িত ইংরেজগণের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা আমার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ইংরেজ আজ মহাভ্রমে পতিত; যদি আমি এক শত সুশিক্ষিত গোরা সৈন্য পাই, তাহা হইলে এক দিনেই বেরিলি-বিজয় সংসাধিত হয়। ইংরেজের ভ্রম দূর করিব,—প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিব,—ইংরেজকে উৎসাহিত করিব, বলিব,—"ভয় নাই,—খাঁ বাহাদুরের উপর কেহই সন্তুষ্ট নহে, —নবাবের যে দশ-বার হাজার ফৌজ আছে, তাহারা কাপুরুষ, অকর্ম্মণ্য— একটী তোপের গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওযাজ হইতে থাকিলে, তাহারা নিশ্চয়ই রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলাইবে।"

তবে নাইনিতাল যাওয়াই শ্রেয়স্কর। কিন্তু কোন্ পথ দিয়া যাই? আগে কাশীপুরের রাজা শিবপ্রসাদের কাছে গমন করিব; তথা হইতে নাইনিতাল যাইব। এ পথ দিযা গেলে, যদিও কিছু ঘোর হইবে বটে, কিন্তু হরগোবিন্দ দাদার সহিত সাক্ষাৎ হবে, তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সকল বাঙ্গালীই তথা হইতে একত্র নাইনিতাল যাইব।

খাঁ বাহাদুর খাঁর সহিত যদিও পূর্ব্বে আমার কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয় ছিল, কিন্তু বিদ্রোহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহাব সহিত দেখা করি নাই। পাছে খাঁ বাহাদুর আদর করিয়া বলেন, "বাবুজী! আমার অধীনে একটী চাকরী গ্রহণ করুন,"—ইহাই আমার ভয়।

বখ্‌ত খাঁ দিল্লী চলিয়া গেলেও আমি বেরিলি সহরে এক রকমই লুক্কায়িতই থাকিতাম, দিবসে বড় একটা বাহির হইতাম না। সন্ধ্যার পর পরিবর্ত্তিত বেশে,—এক রকম ছদ্মবেশেই বন্ধু-বান্ধবের বাটী গমন করিতাম।

কল্য পলায়নই ঠিক হইল, কিন্তু রাজদরবারে দরখাস্ত করিয়া মুক্তিপত্র লইতে গেলে পাছে ধরা পড়ি, তখন ইহাই ভয় হইতে লাগিল। আবেদন-পত্রে আমার নাম-স্বাক্ষর দেখিয়া, আমাকে চিনিতে পারিয়া, নবাব সাহেব

যদি বলেন, "দুর্গাদাসকে সহর ত্যাগ করিতে দেওয়া হইবে না। দুর্গাদাসকে দরবারে হাজির কর। দুর্গাদাস আমার অধীনে এক চাকুরী লইয়া এখানে থাকুক।" তাহা হইলেও আমি গিয়াছি! বরং বখ্‌ত খাঁকে পার ছিল, কিন্তু খাঁ বাহাদুরের হাত হইতে পরিত্রাণের কোনও উপায় নাই। বিশেষ দেওয়ান শোভারাম যেমন দুর্দ্ধষ, তেমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ইঁহাদের জালে একবার পড়িলে আর উঠিবার বা অব্যাহতি পাইবার উপায় থাকিবে না। যদি 'চাকুরী করিব না' বলি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে কয়েদ বা ফাঁসি হইতে পারে। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বে, বাধ্য হইয়া প্রাণভয়ে যদি চাকুরীই করিতে থাকি, আর এ কথা যদি ইংরেজরাজের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে ইংরেজ ভাবিবে—"দুর্গাদাস বাবু কি বেইমান! এত দিন আমাদের নুণ খাইয়া এক্ষণে মুসলমানের অধীনে চাকুরী লইয়া মুসলমানেরই গুণ গাহিতে আরম্ভ করিল।" আরও এক কথা, দুই দিন হউক, দশ দিন হউক, এক বৎসর হউক, দুই বৎসর হউক—অনতি-বিলম্বে ইংরেজ সসৈন্যে আসিয়া নিশ্চয়ই এই বিদ্রোহ দমন করিবেন, আর খাঁ বাহাদুরের রাজত্ব লোপ হইবে। তখন আমার দশা কি হইবে? আমি যে বাধ্য হইয়া ইচ্ছার বিপরীতে, কেবল প্রাণের দায়ে মুসলমানের এ চাকুরী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা তখন কে শুনিবে? কেই বা তখন আমার কথা বিশ্বাস করিবে? আমাকে 'নিমকহারাম' বলিয়া সম্ভবত ই রেজরাজ অগ্রে ফাঁসি দিবেন।

মুক্তিপত্র না লইয়া ছদ্মবেশে সহর হইতে পলায়ন করিব। ইহা ভিন্ন আর গতি নাই। কিন্তু পথে যদি ধরা পড়ি, তবে উপায়?

সে দিন এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। মনে করিলাম, যদিই ধরা পড়ি, তখন ঘাটির প্রধান প্রহরীকে কিছু টাকা দিয়া শান্ত করিব। বলা বাহুল্য,—এ সময় খাঁ বাহাদুরের সকল কর্ম্মচারীই, কি ছোট কি বড, বিষম ঘুষখোর হইয়া উঠিয়াছিল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, ঘুষে নিশ্চই প্রহরীকে বশ করিতে পারিব।

কিন্তু ঘুষের টাকা কোথায়? আমি ত কপর্দ্দকবিহীন। অদ্য প্রাতে পান্নার নিকট হইতে যে এগারটী মোহর আনিয়াছিলাম, তাহা আর তাহাকে ফেরত দিব না। সেই টাকা লইয়াই যাত্রা করিব।

কিরূপ বেশ ধারণ করিব,—তখন এই চিন্তাই মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী সাজিব? না, ভিক্ষুক, ফকির হইব? অথবা আমি ত এখন বেশ সেতার বাজাইতে শিখিয়াছি, আমি পেশাদার সেতারবাদক

এইরূপ ভাণ করি না কেন? ঘাটির প্রহরীকে এক গৎ সেতার শুনাইয়া খুশি করিয়া বলিব, "আমার পেশাই এই—যদি অনুমতি করেন, নিকটস্থ গ্রামে অমুক জমিদারের বাটী গিয়া একবার সেতার বাজাইয়া আসি। এইরূপে দু'পয়সা রোজগার না হইলে আর উদর পূর্ণ হয় না।" প্রহরী যদি যাইতে নিষেধ করে, কিছুতেই পথ ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে ঘরে ফিরিয়া আসিব। যদি গ্রামান্তরে যাইবার অনুমতি পাই, তখন ঐ পথে চম্পট দিয়া রামপুর অভিমুখে যাইব। ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে সেতার-বাহক ও ডুগিদার করিব স্থির করিয়াছিলাম।

এইরূপ মন্ত্রণা স্থির করিয়া, কাশীপ্রসাদকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম। কাশীকে সেতারের সহিত ডুগি বাজাইতে হইবে শুনিয়া কাশী হাসিয়াই আকুল। আমি বলিলাম,—"হাসিলে চলিবে না,—তোমাকে ভৃত্যের ন্যায় এ কাজ করিতেই হইবে। তুমি ঠিক যেন আমার চাকর সাজিয়া থাকিবে। আর এদেশীয় লোকের ন্যায় আমার সহিত হিন্দি ভাষা উচ্চারণ করিয়া কথা কহিতে হইবে। খবরদার! আমাকে যেন সে সময় তুমি দাদা বলিয়া ফেলিও না।" কাশীপ্রসাদ আমার কথা শুনে, আর কেবল হাসে। তাহার মুখে আর হাসি ধরে না। আমার ভয় হইল,—ভায়া প্রহরীর নিকট ডুগি বাজাইতে বাজাইতে যদি হাসিয়া ফেলে, বা অন্য কোনরূপ বেযাদবি করে,—তাহা হইলে মহা মুস্কিল বাধিয়া যাইবে। কাশীকে আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভায়া! বিপদ্‌কালে হাস্য করা উচিত নহে। তুমি এ কাজ করিতে পারিবে কি না বল?" কাশীপ্রসাদ আমার কথার উত্তর দিতে পারিল না,—কেবল হাসিয়া ফেলিল। এ যে বড়ই বিপদ্ হইল দেখিতেছি! কাশী ছেলেমানুষ। উহাকে বলিই বা কি? বুঝাই বা কিরূপে? এখন উহার হাসির ঝোঁক ধরিয়াছে,—কিছুতেই ত ওর হাসি থামিবে না। ঘাটিতে প্রহরীর কাছে যদি উহার এইরূপ হাসির ঝোঁক ধরে, তাহা হইলে মহা অনর্থপাত হইবে। মন বড়ই খারাপ হইল।

এমন সময় ঠাকুরদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"কাশী এত হাসিতেছে কেন?" বলা উচিত, ইত্যবসরে কাশী বাহিরে গিয়া প্রাণ খুলিয়া হো হো শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি সকল কথা ঠাকুর-দাদাকে খুলিয়া বলিলাম। ঠাকুরদাদা ধীরভাবে বিচার করিয়া বলিলেন,—"তোমার এ যুক্তি ভাল হয় নাই। প্রহরীর নিকট সেতার বাজাইতে গেলেই

কাশী না হাসিলেও তুমি ধরা পড়িবে। তুমি বেরিলি সহরে কি ছোট, কি বড়, কি সিপাহী, কি কনেষ্টবল,—অনেকের নিকট পরিচিত। তুমি তাহা-দিগকে চেন, আর না চেন, তাহারা কিন্তু তোমাকে চেনে। তুমি যখন সেতার বাজাইবে, তখন কেহ না কেহ তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে,—হয়ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিবে, 'আপ্‌কা নাম দুর্গাদাস বাবু হ্যায় না? আপ্‌ বেসালেকা বাবু থে না?' তাই বলি,—সেতার বাজাইবার এ মন্ত্রণা ভাল মন্ত্রণা নহে।"

আমি। ঠাকুরদাদা! পলাইবার কি উপায় করি বলুন দেখি?

ঠাকুরদাদা। এক কর্ম্ম কর, দুই জন টাটুওয়ালাকে ডাকাও। তাহাদের সহিত পরামর্শ কর। তাহাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে স্বীকার কর তাহারা মনে করিলে তোমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইতে পারে।

একটী কথা বুঝা দরকার। ছোট ছোট দেশী ঘোড়ার উপর ঘি, আটা, ডাল বোঝাই দিয়া টাটুওয়ালাগণ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া বেচা-কেনা করিয়া থাকে। তাহারা এইরূপে গ্রামের জিনিষ সহরে আনে, সহরের জিনিষ গ্রামে লইয়া যায়। বিদ্রোহের পর লুঠপাটের ভয়ে এইরূপ ব্যবসা বন্ধ হইয়াছিল। তারপর ক্রমশঃ ধীরে ধীরে এ ব্যবসা আবার আরম্ভ হয়। কিন্তু খাঁ বাহাদুর যখন "মুক্তিপত্র না লইয়া কেহ সহর ছাড়িতে পারিবে না" এরূপ আদেশ দিলেন, তখন আবার ঐ ব্যবসা বন্ধ হইল। কেন না, মুক্তিপত্র লওয়া সহজ ছিল না। ঘুষ না দিলে সুবিধামত মুক্তিপত্র পাওয়া যাইত না। টাটুওয়ালারা ধর্ম্মঘট করিল। ভিন্ন গ্রাম হইতে সহরে জিনিষ আনা তাহারা একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। সহরে জিনিষ-পত্র দারুণ দুর্ম্মূল্য হইল। এমন কি, এক দিন এরূপ ঘটিল যে, খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রায় চারি-পাঁচ হাজার সৈন্যকে সহরে আটা অভাবে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। দেওয়ান শোভারামের এ কথা কর্ণগোচর হইল। তিনি মূল তত্ত্ব বুঝিয়া আদেশ দিলেন, কেবল টাটুওয়ালারা বেচা-কেনা অভিপ্রায়ে গমন করিলে বিনা মুক্তিপত্রে সহর ত্যাগ করিতে পারিবে।

আমি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ঠাকুরদাদাকে বলিলাম, "টাটুওয়ালার সঙ্গে ত আমরা যাইব। আমাদের কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসিলে আমরা তাহার কি উত্তর দিব?"

ঠাকুরদাদা। তোমরা বেপারি সাজিবে। তোমরাই খরিদ বিক্রয়কারী,—আর, টাটুওয়ালার কাজ কেবল ঘোড়া তাড়াইয়া আনা। আমি বলিতেছি,

তোমাদের কোন চিন্তা নাই, টাটুওয়ালার সহিত তোমরা পলাও। আমি তোমাদের জন্য দুই জন টাটুওয়ালার সন্ধানে যাইতেছি।

ঠাকুরদাদা দুই জন টাটুওয়ালা আনিলেন। কাশীপুরের ভাড়া সাত টাকা হিসাবে ১৪৲ টাকা ধার্য্য হইল। আর আমাদের দুই ভাইকে নির্ব্বিঘ্নে তথায় পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে, আরও পাঁচ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। টাটুওয়ালারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। বলিল, "বাবু সাহেব! পথে আপনার কোন ভয় নাই, আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না।" প্রত্যেক টাটু-ওয়ালাকে ১৲ টাকা হিসাবে বায়না দেওয়া হইল। তাহারা প্রত্যুষে আসিবে বলিয়া চলিয়া গেল।

বেলা আড়াই প্রহর। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। ছাতা ছিল না, আমি ভিজিয়া ভিজিয়া পান্নার গৃহে গমন করিলাম। পলায়নের কথা সমস্ত বলিলাম। প্রাতঃকালে যে ১১টী মোহর আনিয়াছিলাম তাহা ফেরত দিলাম। পান্না কহিল, "আপনি দূর পথ দুরত্তর নগরে যাইতেছেন, পথের আপনার সম্বল কি?"

আমি। তুমি আমাকে একটী মোহর দাও এবং কুড়িটী টাকা দাও।

পান্না। আপনি এগারটী মোহরই এক্ষণে লউন। পথে নানা কারণে অর্থের আবশ্যক হইতে পারে। আর এক কথা এই, আমার গৃহে ডাকাইতির সদাই ভয় হয়। আগে দুই জন দ্বারবান রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথায় চারি জন দ্বারবান নিযুক্ত করিয়াছি। কিন্তু দ্বারবানদিগকেও আমার বিশ্বাস হয় না। তাহাদের কোন কাজ-কর্ম্ম নাই, সদাই কেবল ফুস্-ফাস্ করিয়া কি যেন ষড়যন্ত্র করে। প্রত্যহ রাত্রে সহরে নানা স্থানে ডাকাইতি লুণ্ঠন হয়। আপনি ত এ দেশ ত্যাগ করিযা চলিলেন। এখন আমার গহনা, মোহর, টাকা রাখি কোথায়? নিরাপদ্ স্থান কোথায়?

বহু তর্ক-বিতর্কের পর, আমাদের বাসায় জামতলায় পান্নার গহনাদি পুতিয়া রাখা স্থির হইল। পান্না আমাকে দুইটী বাক্স দিল। একটী বাক্স পিতলের, একটী রূপার। রূপার বাক্সটীতে মোহর পূর্ণ; মোহর গণিযা লইবার আবশ্যক হইল না। বোধ হয়, এক হাজার মোহরের কম নহে। পিতলের বাক্সটীতে মণি-মুক্তা-হীরক-জড়িত গহনা, মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। নগদ রূপার টাকা ও কোম্পানীর নোট লইলাম না।

সেই দুই বাক্স কাপড়ে বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে বাসায় আসিলাম। এবার আর পথে ভিজিতে হয় নাই। কারণ পান্না ছাতা দিয়াছিল। কিন্তু

পথে বড় পিছল হওযায় আমি পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে বিষম আঘাত পাইলাম। হাঁটু কন্‌কন্‌ করিতে লাগিল।

হাঁটু কন্‌কন্‌ করুক, কিন্তু বাসায় আসিয়া স্বয়ং কোদালি ধরিয়া জামতলার কাছে গর্ত্ত খনন করিতে লাগিলাম। ঠিক আমার মাথা সমান গর্ত্ত হইল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোল গর্ত্ত হইল। গর্ত্তের শেষ সীমায় দুই পাশ খানিক খুঁড়িয়া আবার গর্ত্তের গায়েই দুইটী গর্ত্ত কাটিলাম। একটী গর্ত্তে রৌপ্য বাক্স, অপরটীতে পিতলের বাক্সটী রক্ষিত হইল। তৎপরে উপরে উঠিয়া গর্ত্তে মাটী ঢাকা দিলাম, গর্ত্তের মুখে একটী বৃহৎ পাথর চাপা দিলাম। সেই পাথরের উপর বসিয়া ঠাকুরদাদা প্রত্যহ হাত-মুখ ধুইতেন।

গায়ে কাদা লাগিয়াছিল। স্নান করিলাম। ধৌত বসন পরিয়া কাশীর নিকট গেলাম। দেখিলাম, কাশী শুইয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে আঃ উঃ করিতেছে। জিজ্ঞাসিলাম,—"কাশী! তুমি অমন করিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?

কাশী। বিশেষ কিছু হয় নাই, তবে—

আমি। ভাল করিয়া খুলিয়াই বল না—কি হইয়াছে?

কাশী। আমার পশ্চাতে একটী ফোড়া হইয়া বড়ই কন্‌কন্‌ করিতেছে।

আমি। বল কি কাশী! ফোড়া কখন হইল?

কাশী। আজ তিন দিন হইল হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে নাই। আর তখন ফোড়ার বিষয় আমি গ্রাহ্যও করি নাই। আজ আহারের পর যেমন শুইয়াছি, অমনি হঠাৎ কেমন কন্‌কন করিতে আরম্ভ হইল। ক্রমশঃই কন্‌কনানির বৃদ্ধি—

আমি। তুমি যে মহা অনর্থপাত করিলে দেখিতেছি,—কল্য প্রাতে এ স্থান পরিত্যাগের জন্য সব প্রস্তুত, টাটুওয়ালাকে ২৲ টাকা বায়না পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে,—এখন তুমি বলিলে, আমার ফোড়া। ইহাতে বোধ হইতেছে, ভগবান্‌ আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। দেখি, ফোড়া কিরূপ?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাশীপ্রসাদ পশ্চাদভাগের কাপড় খুলিয়া আমাকে ফোড়া দেখাইল। দেখিলাম,—এক ভয়ঙ্কর ফোড়া, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তাহার বর্ণ, লাল টক্‌ টক্‌ করিতেছে। ফোড়া দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির। বলিলাম, "ভায়া! এ যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিতেছি। কাল সকালে তুমি কেমন করিয়া আমার সঙ্গে যাইবে বল?" কাশী আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তা, তা

—বোধ হয় পারিব।” কাশী মুখে বলিল বটে, ‘পারিব’; কিন্তু অন্তরে যেন কহিল,—“একান্তই অক্ষম হইব।” আমি প্রমাদ গণিলাম। কি করিব, তাহার উপায় কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। “আমি যদি যাই, তবে ভায়া একা থাকে;—আমি যদি বেরিলি সহরেই অবস্থিতি করি, তাহা হইলে দুই-এক দিন মধ্যে নিশ্চয়ই আমরা কারারুদ্ধ হইব।

ঠাকুরদাদা পরামর্শ দিলেন,—“কাশী এখানে আমার নিকট থাকুক; উহার জন্য চিন্তা নাই, উহাকে আমি নিরাপদ্ স্থানে লুকাইয়া রাখিব। বিশেষ তুমি যেমন বেরিলি সহরে সর্ব্বপরিচিত লোক, কাশী সেরূপ নহে।

আমি। তাও কি কখনও হয়? আমি কাশীকে এখানে একা রাখিয়া যাইব কেমন করিয়া?

ঠাকুরদাদা। যখন কয়েদ করিবার জন্য ধরিতে আসিবে, তখন তুমি কাশীর নিকট বসিয়া থাকিয়াই বা কি করিবে? উভয়কেই বাঁধিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। আমার কথা শুন। তুমি কাশীপুর হইয়া, রাজা শিবপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করিয়া নাইনিতালে যাও। সেখানে সাহেবদিগকে এখানকার অবস্থা বুঝাইয়া বল। সাহেবদিগকে সাহস দাও,—উৎসাহান্বিত কর এবং শীঘ্র বেরিলি বিজয় করিতে বল। এক শত শিক্ষিত গোরা এবং দুইটী কামান হইলে এক দিনেই এ দেশ জয় হইতে পারে। কালবিলম্বে অনর্থ ঘটিতে পারে। কেন না, খাঁ বাহাদুর উপযুক্ত লোক দ্বারা সেনাসমূহকে সুশিক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক গোলা, গুলি, কামান, বন্দুক খরিদ করিয়া নানা স্থানে গড়বন্দীর সূত্রপাত করিয়াছে।

আমি। এ সব কথা জানি এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমার বেরিলি ত্যাগ করা। কিন্তু ভাইকে এ বিপদ্সঙ্কুল স্থানে একা রাখিয়াই যাই কেমন করিয়া?

ঠাকুরদাদা। সঙ্গে লইয়া গেলেই বা বিপদ্ কোন্ কম? প্রথমত তুমি ‘পাস’ না লইয়া লুকাইয়া পলাইয়া যাইতেছ, প্রথম ঘাটিতেই তোমরা দুই জন ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইতে পার। দ্বিতীয় কথা, যদি কোনগতিকে ঘাটি পার হইতে পার, তাহা হইলে আপাতত কতক মঙ্গল বটে, কিন্তু আজিকালি পথে—দিনে-রেতে ডাকাইতদল ঘুরিতেছে, রামপুরের পথে মাঝামাঝি যাইতে-না-যাইতে, তোমাকে ডাকাইতে ধরিয়া তোমার সর্ব্বস্ব লইতে পারে, অথবা প্রাণ পর্য্যন্ত বধ করিতে পারে। তাই বলি, কোন্ স্থান বিপদ্সঙ্কুল নয়? বরং এখানে থাকিলে কাশী থাকিবে ভাল। এই ত বর্ষাকাল উপস্থিত। পথে

ভয়ঙ্কর কাদা। কাশীর কস্মিন্‌কালে পথ হাঁটাও অভ্যাস নাই। আর, তোমার ন্যায় কাশীর গায়ে অসুরের মত জোরও নাই যে, কাশী প্রত্যহ আট-দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে সক্ষম হইবে। দুই দিন পথ হাঁটিলে কাশীর পা ফুলিয়া উঠিবে,—আর পথ চলিতে পারিবে না, শেষে কাশীকে লইয়াই পথে তোমার বিষম বিপদ্ ঘটিবে।

ঠাকুরদাদার এই কথা শুনিয়া কাশী আপনা-আপনিই বলিল,—"দাদা! আমি তোমার সহিত যাইব না। এখানে আমি ঠাকুরদাদার বাসাতেই লুকাইয়া থাকি।"

ঠাকুরদাদা। এই কথাই ভাল। যদিই তোমাকে গ্রেফ্‌তারের হুকুম হয়, তবে সাধ্যপক্ষে তোমাকে ধরিতে দিব না। এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ তোমাকে সহজে খুঁজিয়া পাইবে না।

ঠাকুরদাদার কথায় কাশীর বেরিলিতে একা থাকিতে মন হইল এবং আমাকে বারংবার নাইনিতালে যাইয়া সাহেবদের সহিত মিলিত হইবার জন্য কাশী অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তখন অগত্যা একা যাওয়াই স্থির করিলাম। রাত্রি আসিল। কাশীর ফোড়ার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। যন্ত্রণা দেখিয়া আমার আর যাইতে মন সরে না, কিন্তু কাশীর ইচ্ছা যে, আমি যাই। কাশী পুনরায় বলিল, "দাদা! তুমি যাও, আমার জন্য ভাবিও না। আমি এখানে বেশ থাকিব।" সে রাত্রি আমার ভাল নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রিই গুড় গুড় মেঘ ডাকিয়াছে, বিদ্যুৎ চমকিয়াছে এবং জল হইয়াছে।

পথের সম্বল, আমি একটী রিভলভার এবং একটী মোটা লাঠি লইলাম। রিভলভারটী কাপড়ে বাঁধিয়া চটে জড়াইলাম। লাঠিটী হাতে লইলাম। ঠাকুর-দাদা একটা কাপড়ে বাঁধিয়া কিছু আটা দাল ও নুণ দিলেন। বলিলেন,—"পথে যদি কোন দিন কিছু না পাওয়া যায়, তবে এই আটায় তখন কাজ আসিবে।" ইহা ব্যতীত সঙ্গে লইলাম একখানি ছোট শতরঞ্জ, একখানি ছোট বিছানার চাদর, আর একটী বড় ঘটী। আর লইলাম, সর্ব্বলোকের অজ্ঞাতভাবে, পান্নাপ্রদত্ত সেই এগারটী মোহর।

অতি প্রত্যূষে দুই জন টাটুওয়ালা দুইটী টাটু সঙ্গে করিয়া আমার বাসায় আসিল। এ দিকে আমি প্রস্তুতই ছিলাম। আসবাব সমস্ত টাটুর উপরে উঠাইয়া দিলাম। হাতে রহিল কেবল সেই মোটা লাঠিটি,—আর কোঁচার খুঁটে বাঁধা পেটকাপড়ে আবদ্ধ রহিল সেই এগারটী মোহর।

ভায়ার জন্য যে টাটুওয়ালা আসিয়াছিল, তাহাকে একটী টাকা দিয়া বিদায় দিলাম। ভায়াব সহিত সজল নয়নে দেখা করিয়া ঠাকুরদাদার চরণ-ধূলা মাথায় লইয়া খুব ভোর বেলা একটু ঘোর ঘোর থাকিতে আমি যাত্রা করিলাম।

যাত্রা করিলাম বটে, কিন্তু মন প্রফুল্ল হইল না। কেমন যেন ভয়ের উদয় হইল,—কেমন যেন গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল,—পশ্চাৎ দিক্ হইতে কে যেন আমাব কাপড় ধবিয়া টানিতে লাগিল, কে যেন বলিল, "যাইও না,—পথে বড় বিপদ্!" আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দুর্গানাম স্মবণ করিতে করিতে দ্রুতপদে টাটওযালাব সঙ্গে চলিলাম।

পাঁচ

নিরাপদে প্রথম ঘাটি, দ্বিতীয ঘাটি, তৃতীয ঘাটি পাব হইলাম। টাটুওয়ালা প্রথম ঘাটিব সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র কেবল এই একটী উপদেশ দিয়াছিল, "আপনি ও-দিকে চাহিবেন না,—ঘোডাব গাযে হাত দিয়া ঘোডাব পানে চাহিযা চলুন।" বলা বাহুল্য, আমি এ উপদেশ পালন করি।

ঘাটি-ঘবগুলিকে যে আমি দেখি নাই এমন নহে। কৌতূহলপ্রযুক্ত ঘোড়ার দিকে চক্ষু বাখিযাও, আড-নয়নে ঘাটি-ঘবেব সমস্তই দেখিযা লই। প্রত্যেক ঘাটিতে লম্বা লম্বা আট-দশখানি চালাঘব,—উহাবই মধ্যে একখানি ঘর ভাল,—তাহা সাহেবদেব 'বাঙ্গলাব' ধবণে নিৰ্ম্মিত। টাটুওয়ালাকে জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিলাম, প্রত্যেক ঘাটিতে দুইটী কবিযা তোপ, পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী এবং এক শত জন পদাতি সিপাহী আছে।

যখন তৃতীয ঘাটি পাব হইলাম, বেলা তখন প্রায আটটা। বেরিলি সহর হইতে তখন আমবা প্রায পাঁচ ক্রোশ দূবে আসিযাছি। এ পথটুকু খুব দ্রুতই আসিযাছিলাম।

আকাশে আর মেঘ নাই,—গগনে সূর্য্যদেব সমুদিত। আমরা আরও দেড ক্রোশ পথ অতি দ্রুতপাদবিক্ষেপে আসিলাম। এক গণ্ডগ্রামের নিকট পৌছিলাম। সে গ্রামে বাজপথের ধারেই এক বৃহৎ হাট। সেদিন হাটবার। টাটুওয়ালা বলিল, "এই হাটে অনেকগুলি ঘর ছিল, প্রত্যহ বাজার বসিত,

এবং হাটবার দিন হাট হইত। কিন্তু বিদ্রোহের পর হইতে বাজার আর বসে না, দোকানদারগণ কে কোথায় পলাইয়াছে। তবে আজ এক মাস হইতে হাট বসিতেছে; কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় অধিক লোক আসে না।"

আমি। কেন?

টাটুওয়ালা। সিপাহী-বিদ্রোহের তিন-চারি দিন পরে বখ্‌ত খাঁর দুই-তিন শত সিপাহী আসিয়া এই বাজার লুঠ করে এবং ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। শেষে গ্রামে গিয়া লোকের উপর অশেষ উৎপীড়ন করে।

ক্রমশঃ রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল। মেঘমুক্ত রবির তেজ তিন গুণ বলিয়া বোধ হইল। দ্রুতপদে আগমন হেতু দেহ কিঞ্চিৎ যেন অবসন্ন হইযাছে। আমি টাটুওয়ালাকে বলিলাম, "এ বেলা এই স্থানেই আহারাদি করা যাউক।" সে বলিল, "হাঁ বাবু! এইখানে বই আর নিকটে চটি নাই, এই স্থানেই অদ্য আহার করিতে হইবে। আর সাত ক্রোশ দূরে ভাল চটি আছে। আমাদিগকে শীঘ্র আহার করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই সেই দূরস্থ চটিতে পৌছিতে হইবে। কেন না, সে পথে ডাকাইতের ভয় আছে।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাপন করিলাম। আহারের পর বিশ্রাম। একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল। এক ঘণ্টার অধিক হইল, তথাচ নিদ্রা ভাঙ্গিল না। টাটুওয়ালা তখন আমার গা ঠেলিয়া উঠাইল। বলিল, বাবু! এখানে এত ঘুমাইলে চলিবে কেন? এখনও সাত ক্রোশ পথ যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, "এ বেলা যে আমি আট ক্রোশ পথ হাটিতে পারি তাহা ত বোধ হয় না। বাপু! হাটা ত আমার অভ্যাস ছিল না, এই পাচ ক্রোশ পথ চলিয়াই পায়ে ব্যথা হইয়াছে।"

টাটুওয়ালা বলিল, "আপনি এই ঘোড়াব উপর চড়ুন। আমি আপনার আসবাব সমস্ত মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছি।"

ঘোড়ার উপর চড়িতে হইবে শুনিযা আমার মনে বড হাসি আসিল। ঘোড়াটী দেশী, বেতো, ক্ষীণাঙ্গ, ক্ষুদ্রকায়। সেই পক্ষিরাজের বংশসম্ভূত, সেই সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত উচ্চৈশ্রবায আরোহণ করিলে নিশ্চয় তাহার শিরদাঁড়াটী ভগ্ন হইবে, ইহাই আমার ভয় হইল। একটু দুঃখও হইল, কোথায় আমার সেই ব্রহ্মদেশজাত পঞ্চ সহস্র টাকার অশ্ব, আর কোথায় আজ এই বিকৃতদেহ বেতো ঘোড়া! আমি ইতিপূর্ব্বে খুব বড় বড় দুর্দ্দান্ত ঘোড়া ভিন্ন চড়িতাম না। গবরমেণ্টের অশ্বশালার মধ্যে যে অশ্বটী অধিকতর তেজী এবং দুষ্ট, সচরাচর সেইরূপ

অশ্বেই আমি আরোহণ করিতাম। কিন্তু উপায় নাই। অগত্যা আজ সেই খর্ব্বকায় ক্ষীণকণ্ঠ বৃদ্ধ টাটুটীর উপর চড়িয়া বসিলাম। টাটুর পিঠ যেন মড় মড় করিতে লাগিল। টাটুর জীন নাই, রেকাব নাই, লাগাম নাই। পালান একখানি ছেঁড়া চট্, লাগাম দড়ির, রেকাব আদৌ নাই। টাটুওয়ালা আমার আসবাব সমস্ত মাথায় করিল, আর আমার মোটা লাঠিগাছটী হাতে লইল। আমি টাটুর উপর বসিয়া আমার সেই ছয়-ঘরা রিভলভারটীতে গুলি-বারুদ ভরিয়া ঠিক করিয়া রাখিলাম। টাটু ঠুক্ ঠুক্ করিয়া ধীর-কদমে চলিতে লাগিল। বেশ স্বচ্ছন্দে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোড়াটীর যন্ত্রণাভাবব্যঞ্জক চলন দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল।

দেখিতে দেখিতে বেলা অবসানপ্রায় হইল। পূর্ব্বদিন অতিবৃষ্টি হওয়ায় বৈকালিক বায়ু শীতল বোধ হইতে লাগিল। বেশ আরাম বোধ হইল। আর রৌদ্র নাই, সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন, পশ্চিম দিক্ কেবল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। আমরা এক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে পতিত। রাজপথ সেই মাঠ ভেদ করিয়া চলিয়াছে। মাঠের নিকটে কোন গ্রাম নাই। টাটুওয়ালা কহিল,—"এই মাঠ বড় ভয়ঙ্কর। এইখানেই চোর ডাকাইতের ভয়। এই আড়াই ক্রোশ মাঠ পার হইলে তবে অন্য চটি পাওয়া যাইবে। আধ ক্রোশ মাত্র মাঠের পথ আমরা আসিয়াছি, এখনও দুই ক্রোশ বাকি। আপনি যত দূর সম্ভব টাটু ছুটাইয়া দিন। আমি টাটুর সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছি।"

টাটুওয়ালার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম,—"তুমি নিতান্ত ভীত হইও না। দস্যু দেখিলে হঠাৎ পলাইও না। কারণ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করা অসম্ভব। আর পলাইবেই বা কোথায়? যদি এ পথে দস্যুগণ আক্রমণ করে, তাহা হইলে নির্ভয়চিত্তে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ সঙ্কটস্থলে প্রাণের ভয় করিতে নাই। আর তুমি ত দিব্য জোয়ান, তোমার শরীরে বেশ সামর্থ্য আছে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। তুমি কাপুরুষের ন্যায় পলাইবেই বা কেন?"

টাটুওয়ালা কহিল,—"হুজুর! আমার সে সব কিছু ভয় নাই। ভয় যা কিছু, তা আপনাকে লইয়া।"

আমি কহিলাম,—"আমার নিকট যে রিভলভার আছে তাহাতে এক-কালে ছয় জন লোককে ধরাশায়ী করিতে পারিব। আর আমি যদি লাঠি ধরি, তাহা হইলে দশ জন লাঠিয়ালও আমার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবে না।"

আমরা সেই দুর্গম প্রান্তরের দেড় ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিতে না করিতে সূর্য্য ডুবুডুবু হইলেন। পথে জন-মানব নাই, কেবল কঙ্করময় মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। পথটী পাকা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝুপি জঙ্গল আছে। আমি টাটুওয়ালাকে জিজ্ঞাসিলাম, "এখানে বাঘ-ভালুকের ভয় আছে কি না?" টাটুওয়ালা বলিল,—"না। ভয় যা, তা কেবল ডাকাতেরই।"

সন্ধ্যা সমাগত হইল। আমি ঘোটক হইতে নামিলাম। উত্তমরূপ কোমর বাঁধিলাম। রিভলভারটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। টাটুওয়ালা সমস্ত আসবাব ঘোড়ার উপর চাপাইয়া, আমার সেই লাঠি লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। অদূরে দেখিলাম, এক বৃহৎ ইঁদারা। একটী লোক ইঁদারার উপর বসিয়া আছে। আমি টাটুওয়ালাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"এই সন্ধ্যাকালে এই জনশূন্য প্রান্তরে ঐ একটী লোক ইঁদারার উপর কি মতলবে বসিয়া আছে বলিতে পার?"

টাটুওয়ালা কহিল,—"বাবু সাহেব! উহার মতলব মন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ ব্যক্তি একাকী নহে। সম্ভবত উহার দলের আরও কয়েক জন লোক ইঁদারার আশে-পাশে লুকাইয়া আছে। এই ইঁদারা অত্যন্ত গভীর। সাবেক নবাবী আমলে ইহা কাটা হইয়াছিল। ইঁদারার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ঘরও আছে। রাহি লোক ক্লান্ত হইলে ইঁদারার ঐ ঘরে বিশ্রাম করে এবং ইঁদারার জল খায়। কিন্তু শুনিতে পাই, ডাকাইতেরা সন্ধ্যার সময় আসিয়া ঐ ইঁদারার ঘরে আশ্রয় লয় এবং রাহি লোককে মারিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। ঐ ইঁদারা হইতে আমাদের চটি এক ক্রোশ দূর হইবে। ইঁদারা পার হইলে আর কোন ভয় নাই। কিন্তু যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, অদ্য ডাকাইতদল নিশ্চয় ঐ ইঁদারার ঘরে অবস্থিতি করিতেছে। আপনি সাবধান হউন।"

আমি বলিলাম,—"কিছু ভয় নাই। সাহস করিয়া চল, আনন্দ মনে চল। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে বলিয়া মনকে উৎসাহিত কর। আর এক কথা, তুমি কোনরূপ উহাদের সহিত বাক্য ব্যয় করিও না। যা কিছু বলিতে কহিতে হইবে, তাহা আমিই কহিব। আর, আমার কথামত ঐ সময় তুমি কাজ করিবে।

ক্রমে সেই বৃহৎ ইঁদারা নিকটবর্ত্তী হইল। সেই লোকটী আমাদের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়াই আছে। খুব নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র আমিও তাহার দিকে

তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলাম। সেই লোকটী অমনি গম্ভীর বিকট আওয়াজে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কোথা যাইবে ?"

বজ্র-নিনাদে চীৎকার করা আমার অভ্যাস ছিল। আমি অধিকতর বিকট-স্বরে ভ্রূভঙ্গিপূর্ব্বক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এক নিনাদ করিলাম। সেই মহা-হাঁকে যেন স্থাবর জঙ্গম কাঁপিয়া উঠিল। সেই ভীষণ নির্ঘোষের মর্ম্ম এইরূপ— "বদ্‌মাইস! ডাকাইত! তুই এখানে সন্ধ্যার সময় বসিয়া কি করিতেছিস? তোদিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্যই আমরা আজ বাহির হইয়াছি। যদি ভাল চাস্, তবে আমার সঙ্গে আয়, নহিলে এক লগুড়াঘাতে তোর মাথা গুঁড়া করিয়া দিব।"

সে ব্যক্তি কেমন একটু থতমত খাইল। বলিল,—"আমি ডাকাইত নহি, আমি পথিক।" আমি কহিলাম,—"তুই যদি পথিক হস্, তবে তোর কোন ভয় নাই, কিন্তু আমার সঙ্গে তুই এখন থানায় চল।" তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, একগাছি লম্বা লাঠি পড়িয়া রহিয়াছে, সেই লাঠির শীর্ষদেশ লৌহ-মণ্ডিত। আমি সেই লাঠি কুড়াইয়া লইয়া বলিলাম,—"এই কি পথিকের লাঠি? এ তো মানুষ-মারা যন্ত্র।"

আমি লাঠি বগলে করিয়া বাম হস্তে রিভলভার ধরিয়া সেই লোকটার গালে বিরাশী সিক্কার ওজনে সজোরে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা এক ভীষণ চপেটাঘাত করিলাম। সে চড় বড় সহজ চড় নয়, সে লোকটা যদি বলবান্ না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় সেই এক চড়েই পঞ্চত্ব পাইত। তথাচ তাহার মাথা ঘুরিল, দেহ টলিল; সে ইঁদারা হইতে ভূতলে চিৎপাত হইয়া পড়িল। এমন সময় আমার টাটুওয়ালা বলিয়া উঠিল, "হুজুর! এই বেটাই ডাকাইতের সর্দ্দার; এ অনেক লোক খুন করিয়াছে।" এই কথা বলিয়াই সে লাঠি ওচাইয়া সে লোকটাকে মারিতে উদ্যত হইল।

আমি তাহাকে কহিলাম, "সবুর! সবুর! মারিও না, মারিও না। তুমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক, আমি যখন যাহা বলিব তখন তাহা করিবে।"

টাটুওয়ালা লাঠি মারিতে আসিতেছে দেখিয়া সে লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ওরে আমায় মেরে ফেললে রে, তোরা কে আছিস্ এই বেলা আয়।"

দলপতির ইঙ্গিত মাত্রেই অমনি ষোল জন কৃষ্ণবর্ণ মুস্কি জোয়ান লম্বা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে মার্ মার্ কাট্ কাট্ শব্দে আমাদের দিকে হঠাৎ অগ্রসর

হইতে লাগিল। ষোল জন লোকের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমিও ঈষৎ চমকিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া টাটুওয়ালাকে কহিলাম,—"ভয় নাই। উহারা আমার আরও কতকটা নিকটে আসিলে আমি রিভলবার চালাইব। সেই সময় আমার মাথার উপর লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ লাঠি মারিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তুমি সেই লাঠিকে তোমার লাঠির দ্বারা নিবারণ করিও, ইহাই তোমার উপর ভার রহিল। আক্রমণকারীদিগকে তোমার আক্রমণ করিবার আবশ্যক নাই।"

সেই ষোল জন লোক একত্র মিশামিশি হইয়া যেন একখণ্ড নব মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া ক্রমশ:ই আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমি দ্রুত-পদে ঈষৎ পশ্চাৎপদ হইলাম এবং একটু উচ্চ স্থানে দাঁড়াইলাম। আমার দক্ষিণ দিকে টাটুওয়ালা লাঠি হাতে করিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন অনুমানে বুঝিলাম দস্যুদল আর আট-নয় হাত মাত্র দূরে আছে, তখন রিভলভারের ঘোড়া টিপিলাম।

গুড়ুম করিয়া আওয়াজ হইল। আল্লা আল্লা বলিয়া এক জন দস্যু ভূতলে পতিত হইল। তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রিভলভারের গুলি চলিয়া গেল। নিমিষ মধ্যে এই দস্যুদল-ঝাঁকে আর পাঁচটা আওয়াজ করিলাম। পাঁচটী আওয়াজে চারি জন দস্যু ধরায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অবশিষ্ট এক জনের হাতের কব্জায় গুলি লাগিয়াছিল। সে লাঠি ফেলিয়া মাঠের দিকে দৌড়িয়া পলাইল। কিন্তু এ দিকে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া দুই জন দস্যু কর্ত্তৃক দুই বিষম লাঠি পরিচালিত হইল। তন্মধ্যে একটী লাঠি আমার কাঁধে আসিয়া পড়ে। অপর লাঠিটী উত্তোলিত হইবামাত্র টাটুওয়ালা এমন জোরে তাহার হাতের কব্জায় এক লাঠি মারে যে, তাহাতেই তাহার কব্জার হাড় গুঁড়া হইয়া যায় এবং দস্যুর হস্তস্থিত সেই লাঠিটী দূরে যাইয়া ছিটকাইয়া পড়ে।

স্কন্ধে লাঠি পড়ায় আমি জখম হই নাই বটে, তবে কিঞ্চিৎ কাতর হইলাম। কিন্তু দস্যুদিগকে পলায়ন-উদ্যত দেখিয়া মনে বড়ই উৎসাহ জন্মিল। তাহারা ঠিক এখন পলায় নাই, কেবল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। তখন ছয় জন দস্যু ধরাশায়ী হইয়াছে, তিন জন পলাইয়াছে, সাত জন মাত্র রণস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। তখন আমি রিভলভারটী ভূতলে ফেলিয়া এক লাঠি কুড়াইয়া লইয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিলাম। এক লাঠিতে এক জনের মাথা গুঁড়া হইয়া গেল। টাটু-ওয়ালা এক জনের কোমরে এরূপ আঘাত করিল যে, সে ধড়াস্ করিয়া ভূমে

পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। অবশিষ্ট পাঁচ জন দস্যু ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। আমরা দুই জন দুই রশি পথ পর্য্যন্ত ধর্ ধর্ শব্দে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। কিন্তু তাহাদিগকে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা শীঘ্রই রণস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যাহারা গুলির আঘাত খাইয়াছিল, দেখিলাম তাহাদের প্রাণ-সংশয়। দেহ হইতে কেবল অবিরল অবিশ্রান্ত রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে, তাহারা অচেতনবৎ পড়িয়া আছে। টাটুওয়ালা কহিল,—"হুজুর! এখানে আর থাকিয়া কাজ নাই, আমরা শীঘ্র পলাই চলুন, কি জানি যদি আবার শতাধিক ডাকাইত আসিয়া আক্রমণ করে; কারণ, এখানে পাঁচ-সাত শত দস্যু আছে শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"ভয় নাই, আজ আর দস্যুদল কখনই আসিবে না। তাহারা উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়াছে।"

টাটুটি একস্থানেই দাঁড়াইয়া আছে। এত যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বহিয়া গেল, তথাচ ঘোড়াটী ভয়-বিহ্বল হইয়া স্বস্থান পরিত্যাগ করে নাই। টাটুটীর উপর আসবাব সমস্ত রাখিয়া আমরা পদব্রজে চলিলাম। আমি আগে, আমার পশ্চাতে টাটু, টাটুর পশ্চাতে টাটুওয়ালা। রিভলভারটী কিন্তু রণস্থলে খুঁজিয়া পাই নাই। দস্যুদলের যে ব্যক্তি দলপতি বলিয়া অনুমিত, অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে আমি প্রথমে এক চপেটাঘাতে ধরাশায়ী করিয়াছিলাম, সে ব্যক্তিকেও আর দেখিলাম না। আমরা যখন ধর্ ধর্ রবে কয়েক জন দস্যুর প্রতি ধাবিত হই, বোধ হয় সেই সময় দস্যুদলপতি উঠিয়া পিস্তলটী কুড়াইয়া লইয়া অন্য দিকে পলাইয়া থাকিবে। রিভলভার অভাবে মন বড় খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। রণজয়ের আনন্দ-উচ্ছ্বাস রিভলভার বিহনে কতক পরিমাণে হ্রাস হইল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমরা নির্দ্দিষ্ট চটিতে পৌঁছিলাম। বলা উচিত, আমাদের কাপড়ে, গায়ে, হাতে, মুখে যে নররক্তের দাগ লাগিয়াছিল, আমরা পথে সেই রক্তরঞ্জিত বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধৌত বস্ত্র পরিধান করি, এবং এক কূপের নিকট আসিয়া উত্তমরূপে স্নান করিয়া গায়ের রক্ত-চিহ্ন-সকল পরিষ্কার করিয়া ফেলি। চটিতে দিব্য ভাল মানুষটীর ন্যায় উপস্থিত হইয়া একটী ঘর ভাড়া লইয়া রাত্রি যাপন করিলাম। মেজাজ কেমন গরম হইয়াছিল। সে রাত্রে আহার করিতে প্রবৃত্তি হইল না এবং নিদ্রাও হইল না।

ছয়

পাঠক! মানচিত্র দেখুন,—মানচিত্রখানি না দেখিলে, আমি কোন্ পথে, কিরূপ পথে বেরিলি হইতে নাইনিতাল পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করি, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন না। আর মানচিত্রে লিখিত নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি—নগর উপনগরসমূহ, পাঠক স্মরণ করিয়া রাখিবেন।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া টাটুওয়ালা ও আমি কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রায় ছয় ক্রোশ পথের পর এক দ্বিপথগামী রাস্তার সন্ধিস্থানে আসিয়া পড়িলাম। তন্মধ্যে একটী রাস্তা কাঁচা, অপরটী পাকা রাস্তা ছিল। টাটুওয়ালা তখন পাকা রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কাঁচা রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে পাকা পথ পরিত্যাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলাম। টাটুওয়ালা কহিল,—পাকা রাস্তাটী নাইনিতাল যাইবার পথ। আর যে কাচা পথটী দিয়া আমরা যাইতেছি, এটী কাশীপুর যাইবার সড়ক।" এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আমরা প্রায় অর্দ্ধপোয়া পথ অতিক্রম করিয়াছি। আমি টাটুওয়ালাকে কহিলাম,—"দাঁড়াও, আমি আগেই নাইনিতাল যাইব মনে করিতেছি। কাশীপুরে এখন যাইবার আমি তত আবশ্যক বোধ করি না। নাইনিতালে সাহেবদের সহিত সর্ব্বাগ্রে মিলিত হওয়াই এখন যুক্তি।"

এই কথা শুনিয়া টাটুওয়ালা কিছু খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। বলিল,—"বাবু সাহেব। কাশীপুর যাইবারই ভাড়া অগ্রে হইয়াছে, এখন নাইনিতাল যাইতে বলিতেছেন কেন? বিশেষ নাইনিতালের পথ বড়ই দুর্গম এবং সে স্থান এখান হইতে বহু দূরবর্ত্তী।"

টাটুওয়ালাকে অনেক বুঝাইলাম এবং শেষে একটি অতিরিক্ত টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়ায় সে নাইনিতাল যাইতে সম্মত হইল। সে দিন অনাহারে প্রখর সূর্য্যরশ্মি ভোগ করিয়া একদমে ১২ ঘণ্টা কাল পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে সাফাখানায় গিয়া পৌছিলাম। মানচিত্রে সাফাখানার অবস্থান দেখুন।

সাফাখানা অর্থে ঔষধালয়, গবরমেণ্টের দাওয়াইখানা। এই স্থান হইতেই নিবিড় জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। অরণ্যবাসিগণ এইখানে আসিয়া চিকিৎসিত হয়। সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা খুব কম। সাফাখানার নিকট দুইখানি চালাঘর। তাহাতে দুই জন বেণিয়া

মুদী জিনিষপত্র বেচা-কেনা করে। দোকানে ভদ্রলোকের আহারোপযোগী কোন জিনিষপত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এক প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী আরণ্য বৃক্ষমূলে আমি উপবেশন করিলাম। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, তাহার উপর পথ-ক্লেশ। ক্ষুধায় এবং পিপাসায় বড়ই কাতর হইয়াছি। এমন সময় এক জন বিংশতিবর্ষীয় সুন্দরমূর্ত্তি হিন্দুস্থানী পুরুষকে দেখিলাম। পাতলা একহারা চেহারা, কিন্তু চালাকচূড়ামণি, যেন নাকে-মুখে কথা কয়। তাহাকে দেখিয়াই আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কে, কখন্ আসিলে, এবং তোমার নামই বা কি?"

হিন্দুস্থানী যুবকটী কিঞ্চিৎ যেন অপ্রতিভ হইল। আম্‌তা আমতা স্বরে উত্তর করিল, "আমি অদ্য বৈকালে এথানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। নাইনিতালে আমার ভাই আছে, তাই আমি তাহাকে দেখিতে যাইতেছি।"

এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি আমার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বলিল,—"আপনার নাম দুর্গাদাস বাবু নহে কি? আপনিই ত রেসালার বড় বাবু ছিলেন?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—'হাঁ', আর জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি আমার নাম কেমন করিয়া জানিলে?"

নবীন যুবক উত্তর দিল,—"আমি আপনাকে বেরিলিতে দেখিয়াছি। আপনি মিশ্র বৈজনাথের গৃহে অনেকবার আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত আপনার বিশেষ সদ্ভাবও ছিল। আমি বৈজনাথের সামান্য চাকর, আপনি আমাকে না চিনুন, কিন্তু আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি।"

এইরূপে সংক্ষেপে আলাপ-পরিচয় হইল, ক্রমশঃ খোলাখুলি কথাও হইল। বুঝিলাম, নবীন হিন্দুস্থানী যুবকটী বৈজনাথ-প্রেরিত গুপ্তচর; কোন গোপনীয় সংবাদ লইয়া ইংরেজের নিকট নাইনিতালে যাইতেছে। যুবকের নিকট মিশ্র বৈজনাথের স্বহস্তের লিখিত একখানি পত্রও আছে। পাছে পথিমধ্যে যুবক গুপ্তচর বলিয়া ধৃত হয়, এই জন্য সেই পত্রখানি দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। দেহ উলঙ্গ করিয়া কাপড় ঝাড়া হইলেও সে পত্র বাহির হইত না। পত্র অবশ্যই মুখের ভিতর ছিল না। পত্রখানিকে 'মমজমায়' মুড়িয়া মলত্যাগের দ্বারের ভিতর সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে যুবক পত্রখানি খুলিয়া লইত এবং শৌচাদির পর পুনরায় তৎস্থানে রাখিয়া দিত। রস বীভৎস বটে, কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বীর-বীভৎস রসেরই বিশেষ বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

পথে সহচর পাইয়া একই পথের পথিক পাইয়া মনে আমার বড়ই আনন্দ জন্মিল্। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, মুখ শুকাইয়াছে, অধর-ওষ্ঠ শুকাইয়াছে, তথাচ আমাদের উভয়ের মধ্যে গল্প চলিতে লাগিল। শেষে যুবক কহিল,—"বাবুজি! আহারের উদ্‌যোগ করুন, কেন না সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই দোকান-দার দোকান বন্ধ করিয়া এ স্থান হইতে চলিয়া যাইবে। রাত্রে এখানে কেহ থাকে না।

সাকাথানায় একখানি মাত্র মুদির দোকান। সেখানে আটা ও লবণ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া গেল না। সেই আটার লিটি (গুলি) পাকাইয়া, সেঁকিয়া, তাহাই গলাধঃকরণ করিলাম। কিন্তু সে দিন তাহাই বড় উপাদেয় বোধ হইল।

আমার সঙ্গে টাটুর পৃষ্ঠে যে আটা ঘৃত লবণ প্রভৃতি ছিল, সংগ্রামকালে তাহা কথঞ্চিৎ রুধিরাপ্লুত হওয়ায়, আমি তৎসমুদয়ই পথিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সুতরাং সে রাত্রি অনন্যোপায় হইয়া লিটিতেই রসনার তৃপ্তিসাধন করিতে হইল।

বৃক্ষমূলে টাটু বাঁধিলাম। আমরা তিন জনে,—আমি, মিশ্র বৈজনাথের প্রেরিত চর এবং সেই টাটুওয়ালা—এক মহাবৃক্ষের নিম্নদেশে রাত্রিযাপনের জন্য শুইয়া রহিলাম। ঘাসযুক্ত জমি শয্যা হইল। গাছের শিকড় আমাদের মাথার বালিশ হইল। পূর্ব্বে কয়েক দিন বৃষ্টি হওয়ায় ধরাধাম কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছিল; সুতরাং আমার সে সময়ের শয়নের সুখ অনুভবের সামগ্রী। শুনিলাম, রাত্রে বাঘের ভয় আছে, বন্য হস্তীর ভয়ও আছে। মাঝে মাঝে চোর-ডাকাইতেরাও উপদ্রব করিয়া থাকে। কিন্তু উপায় তো কিছুই নাই। ঠিক হইল, প্রথম প্রহরে আমি জাগিয়া থাকিব, দ্বিতীয় প্রহরে টাটুওয়ালা জাগিবে, তৃতীয় প্রহরে হিন্দুস্থানী যুবক জাগিবে। আর চতুর্থে আমরা সকলে উঠিয়া, একটু ফরসা হব-হব হইলেই গন্তব্য পথে যাত্রা করিব। বন্দোবস্ত এরূপ হইল বটে, কিন্তু প্রথম প্রহরেই আমি ঘোর ঘুমে অভিভূত হইলাম। জাগিবার ইচ্ছা থাকিলেও মন জাগিল না, চক্ষু জাগিল না, নিদ্রারূপ সর্পের দষ্ট হইয়া দেহ জর্জ্জরিত হইল। ক্রমেই চোখ বুজিয়া আসিল, দেহ ঢলিয়া পড়িয়া গেল। নিশার সংবাদ আমি আর কিছুই জানি না, এক ঘুমে রাত্রি পোহাইল। দেখিলাম পূর্ব্ব দিক্ প্রফুল্ল হইয়া আসিতেছে। আমাদিগকে নিশাকালে বাঘে খায় নাই দেখিয়া আমার মনও কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল। দেখিলাম যে, হিন্দুস্থানী যুবক উপবিষ্ট হইয়া জাগিয়া আছে। তাহাকে

তদবস্থায় অবলোকন করিয়া আমার একটু লজ্জা হইল; ভাবিলাম, আমার বেশ কর্ত্তব্যজ্ঞান বটে! আমি ঘুমাইলাম, আর ঐ ব্যক্তি জাগিয়া রহিল!

হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—"বাবুজি! আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া আছি। আপনি শয়নের প্রায় কুড়ি মিনিট পরেই ঘুমাইযা পড়েন, টাটুওয়ালা এক ঘণ্টা পরে নিদ্রিত হয।"

প্রভাত হইল, সেই নিবিড় অরণ্যমধ্য হইতে পক্ষিকুল ডাকিয়া উঠিল, আমরা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। বড়ই ভয়ঙ্কর পথ। দুই ধারে ঘনসন্নিবিষ্ট অসূর্য্যম্পশ্য মেঘমালাবৎ তমোময় মহারণ্যের মধ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুনিচয় সদাই ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে, এইরূপই যেন বোধ হয। টাটুওযালা বলিল, "বাবু সাহেব! এই বনে বাঘ আছে, সাবধান।" আমি কহিলাম, "সাবধান হইয়া কি করিব? আমি এখন নিরস্ত্র, লাঠি মাত্র ভরসা, পিস্তলটীও হারাইয়াছে। ভয করিও না, ভগবান রক্ষা করিবেন।"

আমরা দ্রুতপদে চলিতেছি, বেলা যখন প্রায দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তখন সাফাখানা হইতে আমরা প্রায ১০।১২ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিযাছি। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। তৃষ্ণা হইলে জলপানের উপায় নাই, ক্ষুধা হইলে আহারের উপায় নাই। সেই জনশূন্য জল-শূন্য আহারীয় সামগ্রী-শূন্য অরণ্যের মধ্য দিযা আমরা অবিশ্রান্ত চলিতেছি। অন্তরে এক একবার দুর্গানাম স্মরণ করিয়া মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে চলিতেছি। অরণ্যে কিঞ্চিন্মাত্র শব্দ হইলেও অথবা শব্দ না হইলেও হিন্দুস্থানী যুবক আমার গা টিপিযা বলে, "বাবু সাহেব! ঐ বুঝি বাঘ।" আমি কখন দক্ষিণে কখন বামে নেত্র নিহিত করিতেছি, কখন পশ্চাদ্ভাগে মুখ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, কখন সম্মুখভাগে সুদূর স্থান পর্য্যন্ত অনিমেষ-লোচনে লক্ষ্য করিতেছি, এইরূপে বেলা প্রায আড়াই প্রহর অতীত হইল। আমাদের তিন জনেরই ক্ষুধা তৃষ্ণা যুগপৎ সমুপস্থিত হইয়াছে। ক্লান্তির ত কথাই নাই। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল, "বাবু সাহেব! এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করুন। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিতেছে, এ স্থানে জল আছে কি না, একবার অন্বেষণ করিযা দেখুন, আমার পা আর চলে না।" টাটুওযালা কহিল, "এখানে বিশ্রাম করিলে চলিবে না। দিবাভাগে এই অরণ্য পার হইতে হইবে। আর এখানে জল নাই, কালাডুঙ্গি না পৌছিলে আহারীয় সামগ্রী বা জল কিছুই মিলিবে না। অতএব চলুন, শীঘ্র চলুন, কালাডুঙ্গি আর

অধিক দূর নহে।" হিন্দুস্থানী কি করে,. ধীরে ধীরে আমাদের সহিত চলিতে লাগিল। তাহার সেই সজীবতা নেই, স্ফূর্তি আর নাই, ঠিক যেন কলে কাঠের পুতুল চলিতেছে। অদূরে দেখিলাম, প্রায় ২০।২৫ জন হিন্দুস্থানী স্ত্রী-পুরুষ আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহারা ইতরজাতীয়, সকলেই কাঁদিতেছিল, সেই ক্রন্দন-ধ্বনিতে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে এক একটী ছেলে, কোন কোন বৃদ্ধার পার্শ্বে যুবতী রমণী অবস্থিতি করিতেছিল। অদূরে এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া আমি ভাবিলাম, এ আবার কি। ছদ্মবেশী ডাকাইত নয় ত? দেখিতে দেখিতে আমরা পরস্পর পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। আমি তাহাদের মধ্যে যাহাকে বয়োবৃদ্ধ ও দলপতির ন্যায় দেখিলাম, তাহাকে তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসিলাম, "তোমরা কে কোথায় যাইতেছ?" বয়োবৃদ্ধ কহিল,— আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বুঝি আমরা স্ত্রী-পুত্র কন্যা লইয়া মারা পড়িলাম। এই বলিয়া সকলেই সমস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম, 'তোমাদের কি হইয়াছে বল, ক্রন্দনের কারণ কি?" বয়োবৃদ্ধ কহিল,—'আমরা নাইনিতালে যাইতেছিলাম, আমাদের মধ্যে কাহার পুত্র, কাহার ভ্রাতা, কাহার স্বামী, কাহার স্ত্রী বিদ্রোহের পূর্ব্বে নাইনিতালে গিয়াছিল। সেখানে ইংরেজের চাকরী করিত। বিদ্রোহের পর তাহারা জীবিত, কি মৃত,' কি বন্দী, তাহা আমরা কিছুই জানি না, তাই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমরা যাইতে-ছিলাম। কিন্তু নাইনিতাল পাহাড়ের মূলদেশে যে ইংরেজ প্রহরিগণ অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা আমাদিগকে যাইতে দেয় নাই। মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া হতাশ মনে আমরা ফিরিয়া আসিতেছি। কালাড়ুঙ্গিতেও থাকিবার স্থান পাইলাম না, বিদ্রোহী সেনা সে স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" আমি কহিলাম, "সে যাহা হউক, তোমরা এক্ষণে জঙ্গল পার হইয়া সাফাখানায় কিরূপে পৌঁছিবে, তাই ভাবিতেছি। কারণ, পাঁচ-সাত ক্রোশ যাইতে না যাইতেই রাত্রি আসিবে, আর এরূপ বৃদ্ধ, স্ত্রী এবং শিশুসন্তান লইয়া তোমরা আর কতক্ষণই বা দৌড়িবে?' বয়োবৃদ্ধ কপালে করাঘাত করিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ক্রন্দনের কোলাহলে দিক্ সমস্ত পূর্ণ হইল। শিশু কাঁদিল, বালক কাঁদিল, স্ত্রী কাঁদিল, পিতা কাঁদিল, মাতা কাঁদিল। আমি কহিলাম, "আর তোমরা এখানে কালবিলম্ব করিও না, ভগবানের নাম করিতে করিতে তোমরা দ্রুতপদে চলিয়া যাও।"

তাহারা প্রস্থান করিলে আমার এক বিষম ভাবনা হইল, এত কষ্ট করিয়া নাইনিতালে ইংরেজগণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছি, যদি ইংরেজ প্রহরিগণ আমাকে বিদ্রোহীদের গুপ্তচর মনে করিয়া যাইতে না দেয় তখন উপায় কি হইবে? অথবা তাহারা যদি বন্দী করে, কিংবা প্রাণে মারিয়া ফেলে, তাহারই বা উপায় কি আছে? যদি ছাড়িয়াই দেয়, তাহা হইলেই বা যাই কোথায়? এই বিজন প্রান্তরে, এই অরণ্য-পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশে, এই হিংস্রক জন্তুপূর্ণ বিজন বনে থাকিই বা কোথায়? কি খাইয়াই বা প্রাণ ধারণ করি? ভাবনার আদিও নাই, অন্তও নাই, আমি ভাবনার সাগরে ডুবিলাম।

ভাবিতে ভাবিতে মনে একটু আশারও সঞ্চার হইল। আমি ছদ্মবেশী হইলেও ভদ্রলোক। কথাবার্ত্তা গুছাইয়া কহিতে পারিলে হয়ত আমাকে পথ ছাড়িয়া দিবে। আমি তাহাদের নিকট আত্মপরিচয় দিব। আমার ৮ নম্বর অশ্বারোহিদলস্থ সাহেবগণের নাম করিব। বিশেষ আমার সঙ্গে মিশ্র বৈজনাথের লোক আছে, তাহার নিকট গুপ্ত চিঠি থাকার কথাও বলিব। আমাকে বিশ্বাস করিয়া পথ ছাড়িয়া না দিবে কেন?

এইরূপ আশায় বুক বাঁধিয়া চলিতে লাগিলাম। এখানকার রাস্তাটী পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। বড় বড় বৃক্ষ যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, সেই বৃক্ষসমূহ বিবিধ লতা-পাতায় বেষ্টিত। প্রবলবেগে তখন বায়ু বহিতেছিল। শোঁ শোঁ সাঁই সাঁই—এক বিকট শব্দ সেই অরণ্যমধ্য হইতে উঠিতেছে। প্রকৃতই আমার গা এবার রোমাঞ্চিত হইল। মনে হইতে লাগিল, ভীষণ বন-দানব দারুণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। এ সময়ের অবস্থা বর্ণনাতীত। সকলেরই মুখ শুষ্ক। টাটুটী সমস্ত দিন ঘাস জল পায় নাই, সে আর চলিতে পারে না। টাটুওয়ালারও সেই দশা। সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুস্থানী যুবাটীর দশা অধিকতর শোচনীয়। সে যেন বিকারগ্রস্থ রোগীর ন্যায় টলিয়া টলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পথ চলিয়াছে। আমার দেহে অতুল শক্তি থাকিলেও তখন তাহা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কোমর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; মুখে সকলকে বলিতেছি বটে কোন ভয় নাই, পরওয়া নাই,—কিন্তু অন্তর ধুক্ ধুক্ করিতেছে। এ দিকে অপরাহ্ণ উপস্থিত। শীঘ্র জঙ্গল পার হইতে হইবে, নচেৎ এ জঙ্গলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে বড়ই বিপদ্। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় দেখি, দুই জন বলবান্ ব্যক্তি দীর্ঘ লাঠি হস্তে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে।

হিন্দুস্থানী যুবক বলিল,—"বাবু সাহেব! সাবধান হউন, ঐ দেখুন, সত্য সত্যই এবার দুই জন দস্যু আসিতেছে।" আমি তাহার কথা শুনিয়া আর অগ্রসর না হইয়া পথিপার্শ্বে আমার সেই লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। হিন্দুস্থানী যুবককে কহিলাম, "ভয় নাই, দুই জন দস্যুতে আমাদের কিছু করিতে পারিবে না, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না।" যখন সেই দীর্ঘ পুরুষদ্বয় অর্দ্ধ রশি অন্তরে আছে, আমি তাহাদিগকে হাঁকিয়া বলিলাম,—"তোম্ লোগ্ কোন্ হো, কাঁহাসে আতে হো, ঠ্যহরো, পহিলে লাঠিযোকো ফেক্ দো, তব আগে বঢ়ো।" তাহারা কহিল,—"আমরা ডাকাত বা দস্যু নহি, একটা ভয়ানক বন্য হস্তী আমাদিগকে তাড়া করিয়াছিল, আমাদের এখন কণ্ঠাগত প্রাণ। আমাদিগকে রক্ষা করুন।" বন্য হস্তীর কথা শুনিয়া হিন্দুস্থানী যুবকটীর শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হইল। ইহারা ডাকাইত হইলে তাহার তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বন্য হস্তীর সংবাদে তাহার যেন একেবারে প্রাণ উড়িয়া গেল। যে দিকে বন্য হস্তী ধাবিত, আমরা সেই দিকেই যাইতেছি। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—"নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে বন্য হস্তীর হাতে প্রাণ দিতে হইবে।"

সেই বলবান্ পুরুষ দুই জন সেইরূপ উর্দ্ধশ্বাসে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া দৌড়িল। আমরা অনন্যগতি, নিরুপায, কি করি, কোন্ দিকে যাই, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অগ্রসর হইলে বন্য হস্তী প্রাণে মারিবে। পশ্চাৎপদ হইয়াই বা যাই কোথায়? কারণ সাফাখানা আঠার ক্রোশ দূরে। হিন্দুস্থানী যুবক কহিল,—"এইখানেই থাকুন।" আমার রাগ হইল, আমি কহিলাম,—"তুমি থাকিবে থাক, আমি অগ্রসর হইব। হাতী ক্ষেপিয়া তাড়া করিয়া যদি ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিত, তাহা হইলে এতক্ষণ হাতী অবশ্যই দেখিতাম। কোথায বা হাতী, আর কোথায় বা কি! যদি হাতীই ক্ষেপিয়া থাকে, তবে সে এতক্ষণ জঙ্গলের কোন দিকে কোথায চলিয়া গিয়া থাকিবে। এ বিপদের সময বালকত্ব প্রকাশ করিও না। চল, এস আমার সঙ্গে।" যুবক দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। আমি মনে মনে ইষ্টনাম জপিতে জপিতে হাতে পৈতা জড়াইয়া অগ্রসর হইলাম। এই সময় আমি মল্লবেশ ধারণ করিলাম। কসিয়া কাপড় পড়িলাম, জানুদ্বয় আবরণ-শূন্য হইল। টাটুওয়ালা কহিল, "বাবু সাহেব! আপকি সুরৎ পহলওয়ান কীসী ব্যন্ গয়ী।" আমি কহিলাম, "হাতী আসিলে এখনি পহলওয়ান-গিরি বাহির হইয়া যাইবে। তুমি যদি ভাল চাও, তবে রাম নাম জপ কর।"

সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে হাতী দেখি নাই। কোনরূপ বন্য জন্তু দেখি নাই। এমন কি শশক কি শৃগালটী পর্য্যন্তও দেখি নাই।

ক্রমশঃ মেঘবর্ণ পর্ব্বতসমূহ স্পষ্টত নয়নগোচর হইল। টাটুওয়ালা কহিল,— "বাবু সাহেব! আর ভয় নাই,—ঐ দেখুন, কালাডুঙ্গি, ঐ দেখুন, নাইনিতাল"।

সাত

মানচিত্রখানি এইবার একবার স্মরণ করুন। স্মরণ না থাকে, খুলিয়া দেখুন। দেখিবেন, বেরিলি হইতে নাইনিতাল যাইবার দুইটী পথ আছে। একটী পথ বামে, একটি পথ ডাহিনে। বামের পথ দিয়া গমন করিলে রামপুর রাজ্য হইয়া, সাফাখানা হইয়া, কালাডুঙ্গি পৌঁছিতে হয়। কালাডুঙ্গি নাইনিতাল পর্ব্বতের মূলদেশে অবস্থিত। কালাডুঙ্গি হইয়া নাইনিতাল পর্ব্বতে উঠিতে হয়। বেরিলি হইতে ডাহিনের রাস্তা ধরিয়া নাইনিতালে যাইতে হইলে বহেড়ি, চাবপুবা, হলদোযানী প্রভৃতি গ্রাম নগব অতিক্রম করিয়া নাইনিতালে যাইতে হয়। কিন্তু ডাহিনেব এই পথ বিদ্রোহী সৈন্যের দ্বারা পরিপূর্ণ। খাঁ বাহাদুর খাঁ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া রাখিবার জন্য দলে দলে সৈন্য পাঠাইতেছেন। হলদোযানিতে নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রধান সেনা-নিবাস সংস্থাপিত হইযাছে। এখানে অশ্বারোহী পদাতিতে প্রায় ৪৷৫ হাজার সৈন্য আছে। বিভীষণমূর্ত্তি উদ্ধতস্বভাব মৌলবী ফজল হক এই সমগ্র সেনার কমাণ্ডার ইন চিফ। তিনি নবাব কর্ত্তৃক নাইনিতাল আক্রমণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। নাইনিতালস্থ সমস্ত ইংরেজ নবনারীগণকে কাটিয়া কুচিকুচি করিবার জন্য তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হইযাছেন। মৌলবী ফজল হক প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য কেবল সুযোগ সুবিধা খুঁজিতেছিলেন। ইংরেজগণকে হাতে না মারিযা ভাতে মাবিবাব চেষ্টায় ছিলেন। নাইনিতাল অভিমুখে ইংরেজদিগের জন্য যে সকল আহারীয় সামগ্রী রওযানা হইত, সেই সকল লুঠপাট করাই হলদোযানিস্থ সৈন্যদিগের তখন একপ্রকার কাজ ছিল। এই সকল ধর-পাকড় কার্য্যে তাহারা বিশেষ বীরত্ব দেখাইত। হলদোযানি হইতে কখন কখন শতাধিক অশ্বারোহী সৈন্য কালাডুঙ্গির দিকে ধাবিত হইত এবং কালাডুঙ্গিতে সম্মুখে যাহাকে পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত ও রসদাদি লুঠ করিয়া লইয়া যাইত।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, তখন আমরা কালাডুঙ্গি পৌঁছিলাম। এখানে এখন কিছুই নাই, কেবল জঙ্গল। এখানে পৌঁছিয়া পর্ব্বতীয় নির্ঝর হইতে আমরা নির্ম্মল জল পান করিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া আবার যাত্রা করিলাম। ক্রমে পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইলাম। দুইটী পথ দিয়া নাইনিতাল পর্ব্বতীয় পথে উপস্থিত হইতে হয়। একটী পথ সোজা, একটী পথ বাঁকা। সোজা পথ দিয়া গেলে কিছু কষ্ট এবং বিপদ্ও আছে। বাঁকা পথ দিয়া যাওয়া সহজ এবং সে রাস্তাটী ভাল। পাহাড়ের নিম্নতল দিয়া একটী ক্ষীণ-শরীরা খরস্রোতা নদী প্রবাহিতা। সে নদীতে অধিক জল নাই, কোথাও এক কোমর, কোথাও এক বুক, কোথাও বা এক হাটু। কিন্তু স্রোত অত্যন্ত। সেই স্রোত-জলের ভিতর বড় বড় পাথর আছে। নদী পার হইবার সময় পাথরে পা ঠেকিয়া পিছলিয়া একবার পড়িয়া গেলে আর রক্ষা নাই। স্রোতে অমনি গড়াইতে গড়াইতে নিম্নদিকে লইয়া যাইবে। কিন্তু সে দেশীয় পাহাড়ী লোক অনায়াসে নদী পার হইয়া অপর পারে যায়। এইটী হইল সোজা পথ। হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গেলে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাইনিতাল পর্ব্বতীয় পথে উঠা যায়। দ্বিতীয় পথটী এক মাইলের অধিক ঘুরিয়া গিয়াছে। এই পথটী সৈন্যদিগের গমনাগমনের জন্য ই রেজরাজ কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত। ইহা দিয়া গেলে হাটিয়া নদী পার হইতে হয় না। নদীর উপর এক মজবুত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া গো-যান অশ্ব-শকট পর্য্যন্তও যাইতে পারে।

সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া টাটুওয়ালা কহিল,—'বাবু সাহেব। কোন্ পথে যাইবেন ?" টাটুওয়ালার নিকট উভয় পথের যথার্থ বিবরণ পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রবণ করিয়া আমি কহিলাম,—'এক মাইল পথ ঘুরিয়া বাঁকা পথে সেতুর উপর দিয়া যাওয়াই ভাল। কেন না, সোজা পথ দিয়া যাইতে হইলে হাটিয়া নদী পার হইতে হইবে। নদীতে কত জল জানি না এবং ইতিপূর্ব্বে এরূপ নদী কখনও পার হই নাই এবং কোন পথ-প্রদর্শকও নাই।

আমরা বাঁকা পথ ধরিয়া সেতুর উপর দিয়া চলিলাম। নদী পার হইয়া ক্রমশঃ নাইনিতালের পর্ব্বতীয় পথ ধরিলাম। পর্ব্বতীয় পথ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ বড়ই প্রফুল্ল হইল। যাহার জন্য আজ কয়েক দিন কাল প্রাণ উৎসর্গ করিতে-ছিলাম, আজ তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা হইল। স্ফূর্ত্তির সহিত যথাসাধ্য বেগে পর্ব্বত-পথে উঠিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চতর ভূমিতে উঠা সে কি

কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন না। আমার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, হাঁপাইতে লাগিলাম, কোমর কন্ কন্ করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী যুবক যেন এলাইয়া পড়িয়াছে। মাছ অর্দ্ধমৃত হইয়া জলে যেমন ভাসে, যুবকটীর অবস্থা ঠিক সেইরূপ। বেগতিক বুঝিয়া আমি তখন তাহাকে টাটুর উপর চাপাইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি, ঝরণার জল খাই, আর পর্ব্বতে আরোহণ করি।

এইরূপে প্রায় এক ক্রোশের কিছু কম পথ অতিক্রম করিলাম। এমন সময় টাটুওয়ালা কহিল,—"বাবু সাহেব! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পাস আনা হয় নাই। কালাডুঙ্গিতে ইংরেজের এক থানাদার আছে। ঐ থানাদারের নিকট হইতে পাস না পাইলে, পাহাড়ের উপর ইংরেজের যে প্রহরিগণ আছে, তাহারা কিছুতেই যাইতে দিবে না। আর একটা বাঁক ঘুরিলেই আপনি ইংরেজের ঘাটি দেখিতে পাইবেন। সেই ঘাটিতে প্রাগ পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী গোরা আছে এবং তিনটী তোপ আছে।"

টাটুওয়ালার এই কথা শুনিযা আমি বড়ই বিরক্ত হইলাম। মন বড়ই খারাপ হইল। এত কষ্ট করিয়া এত দূব আসিলাম, আবার নামিতে হইবে। অদৃষ্টে যে কতই যন্ত্রণা বিধাতা লিখিযাছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তাহার প্রতিবিধান মনুষ্যের সাধ্যাতীত। নিতান্ত নিরুপায় হইযা আমাদিগকে পুনরায় কালাডুঙ্গিতে প্রত্যাগত হইতে হইল। সন্ধ্যান্ত হইতে এখনও বুঝি আধ ঘণ্টার অধিক বিলম্ব আছে। আমরা পাস লইবার জন্য থানাদারের ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তথায় জনপ্রাণী নাই, গৃহদ্বাব রুদ্ধ। এ দিক্ ও দিক্ চাহিতেছি,—এমন সময় হলদোযানির দিক্ হইতে বহুতর অশ্বের খুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে দেখিলাম, প্রায় ৫০।৬০ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিষ্কোষিত অসি হস্তে আমাদের দিকে বিদ্যুৎবেগে প্রধাবিত হইয়া আসিতেছে। এই বিরাট-বিভীষণ ব্যাপাব হঠাৎ দেখিয়া আমাদের চক্ষু স্থির হইল। এ কি! এ কি! এ আবাব কি?

আট

আমি ভাবিতে লাগিলাম, "সহসা সশস্ত্র সৈন্যদল কোথা হইতে আসিল? আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, না, জাগরিত আছি? ইহারা পৃথিবী কি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল? না বিমানচ্যুত হইয়া ধরাধামে পতিত হইল?

আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল,—"হে প্রভো! হে দয়াময়! বলিয়া দাও, আবার এ কি নূতন মায়াজাল পাতিলে! হে দানবদলনি জননি! কোন্ দৈত্যদল-বিনাশার্থ এ সৈন্যসমূহ সৃষ্টি করিলে? আমি পথশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ,—দারুণ দৈববিপাকে পড়িয়া একান্ত অবসন্ন হইয়াছি, বিধাতার বিধানে অস্ত্রহীনও হইয়াছি। তবে আমার জন্য এত আয়োজন কেন মা!"

সেই অপরাহ্ণের অন্তিম কালে নাইনিতাল পর্ব্বতের তটদেশে দাঁড়াইয়া শীতল সমীরণ দ্বারা সেবিত হইয়া, চারি দিকে গিরি-অরণ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আমি আরও ভাবিতে লাগিলাম,—"এই অশ্বারোহী সৈন্যগণ বিদ্রোহী-দলভুক্ত না হইতে পারে। আমাদের রেজিমেণ্টের যে কয় জন অশ্বারোহী সৈন্য বিদ্রোহের সময় বেরিলি হইতে ইংরেজদের সঙ্গে নাইনিতালে পলাইয়াছিল, হয়ত তাহারাই আসিতেছে;—আমায় এইরূপ জনশূন্য স্থানে একাকী দেখিয়া ইহারা আমার রক্ষার্থ আমার দিকে ধাবিত হইতেছে।"

আর অধিক ক্ষণ ভাবিতে হইল না, আর অধিক বিচার-বিতর্ক করিতে হইল না; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অশ্বারোহিগণ আমার ঘাড়ে যেন লাফাইয়া পড়িল। এক জন আমার বক্ষের দিকে বল্লম লক্ষ্য করিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক বজ্রনির্ঘোষে কহিল,—"তুঁ কৌন্ হ্যায়, কাঁহাসে আতা হ্যায়, আওর কাঁহা যায়েগা?"

বিষম বিপদ্ সম্মুখে দেখিয়া আমি বিনীত স্বরে কহিলাম, "আমি এক জন চাপরাশী, বেরিলির কাছারিতে কর্ম্ম করিতাম। আমার ভ্রাতা নাইনিতালে চাকরী করেন, তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া আমার মাতা বড় কাতর হইয়াছেন, সেই জন্য ভ্রাতার সন্ধানে নাইনিতালে যাইতেছি।"

বিদ্রোহী দল আমার এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া ভ্রূকুটী-ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"সাচ হাল বতাও, নেহি তো অভি দো টুকরা কর্ ডালুঙ্গা। হামকো মালুম্ হোতা হ্যায় কি, তুঁ 'কাফির্‌বোঁ' কো নবাব রামপুরকে তরফসে রসদ পৌঁছাতা হ্যায়।"

আমার পশ্চাতে হিন্দুস্থানী যুবকটী দাঁড়াইয়া ছিল। এক জন অশ্বারোহী তাহাকে জিজ্ঞাসিল,—"তুঁ কোন্ হ্যায় ?"

যুবক আমার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল,—"আমি ইঁহার চাকর।"

তাহার মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র অমনি অশ্বারোহী দল মধ্যে একটা হাসির কোলাহল পড়িয়া গেল। "ভাই মজার কথা শুন! চাপ-রাশীর আবার চাকর কি? নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি ইংরেজদিগকে রসদ যোগাইবার দলপতি।" তখন শূন্যমার্গে তীক্ষ্ণধার তরবারি সমস্ত ঘুরিতে লাগিল। সেনাগণ এক হুঙ্কার রব করিয়া উঠিল। কেহ দন্তে দন্ত সংঘর্ষণপূর্ব্বক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল,—"এই পাপিষ্ঠ দলপতিকে এই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেল।" কেহ কহিল,—"ইহাকে দগ্ধ করিয়া বিষম যন্ত্রণা দিয়া হত্যা কর?" কেহ কহিল,—"ইহার দক্ষিণ হস্ত এবং দক্ষিণ পদ কাটিয়া দাও।" তখন তথায় এক বিষম পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইতে লাগিল। অনেকে আমায় অশ্লীল অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। আমি নীরব নিস্পন্দ।

অশ্বারোহিগণ পরস্পর বিচার করিয়া স্থির করিল,—"ইহাকে এ স্থানে প্রাণে মারা হইবে না, আমরা ইহাকে হলদোয়ানিতে ধরিয়া বাঁধিয়া সেনাপতি ফজল হকের নিকটে লইয়া যাই চল। তিনি ইহাকে মারিতে হয় মারুন, রাখিতে হয় রাখুন। অদ্য আমরা পুরস্কার নিশ্চয়ই পাইব।"

এইরূপ বলিয়া তাহারা আনন্দে উৎফুল্ললোচন হইল।

ইতিমধ্যে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রায় ৪০।৫০টী টাটু পৃষ্ঠে রসদ-বোঝাই লইয়া ঠিক সেই সময় নাইনিতাল অভিমুখে যাইতেছিল। টাটু-ওয়ালারা বিশেষ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়া টাটুর পৃষ্ঠ হইতে রসদ নামাইয়া নদীকূলে রাখিয়া, তটিনী-তটবর্ত্তী ক্ষুদ্র বনে লুক্কায়িতভাবে রন্ধন আহারাদি কার্য্য সমাপন করিতেছিল। এ বিষয়ের আমি বিন্দু-বিসর্গও জানি না;—তাহারা কে কোথা হইতে আসিতেছে, কোথা যাইবে—তাহার কিছুই অবগত ছিলাম না। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যগণ রসদপূর্ণ টাটু এবং আমাকে দেখিয়া স্থির নিশ্চয় করিল,—আমি দলপতি এবং টাটুওয়ালাগণ আমার অধীনস্থ। আমি এইরূপে সর্ব্বদা নাইনিতালে ইংরেজগণকে রসদ যোগাইয়া থাকি।

আট জন অশ্বারোহী আমায় ঘিরিয়া রহিল। বাকি অশ্বারোহিগণ টাটু-ওয়ালাদের গ্রেপ্তার করিতে চলিল। প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া কতকগুলা টাটুওয়ালা জঙ্গলের ভিতর পলাইয়া গেল। ৩০।৩২ জন টাটুওয়ালাকে অশ্বা-

বোহিগণ ধরিল। ধরিবার সময় অস্ত্রাঘাতে ২ জন টাটুওয়ালা প্রাণ ত্যাগ করে, ৫ জন বিষম আঘাত প্রাপ্ত হয। যে সকল বসদ মাটিতে নামান হইযাছিল, টাটুওয়ালাদের দ্বারা তাহা আবাব টাটুপৃষ্ঠে চাপান হইল।

যে আট জন অশ্বাবোহী আমাকে বেষ্টন কবিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনকে আমি ধীরভাবে জিজ্ঞাসিলাম,—"আপনাবা কে এবং আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন?" উত্তর এইভাবে পাইলাম,—"আমবা গোযেন্দাব মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, বামপুবেব নবাব এইরূপে নাইনিতালে রসদ পাঠাইয়া থাকে। এই কথা আমবা বহুবাব শুনিয়াছি। অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চারিবার হলদোযানি হইতে কালাড়ুঙ্গি পর্য্যন্ত তাহাদেব উদ্দেশে ধাওয়া করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কোথাও বসদওয়ালা দেখিতে পাই নাই। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে পাইয়াছি। দলশুদ্ধ তোমাকে গ্রেপ্তাব কবিযা লইয়া গেলে অবশ্যই সেনাপতির কাছে পুবস্কাব পাইব।"

আমাব কাছে টাকা-কড়ি বা কোন জিনিষপত্র আছে কি না দেখিবার জন্য আমাব কাপড় ঝাড়া হইল। প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব কাপড উঠাইয়া বিদ্রোহিগণ আমাব দেহ অন্বেষণ কবিল। আমাব সঙ্গে পাথেয়স্বরূপ পান্না-সুন্দবী-প্রদত্ত এগাবটী মোহব ছিল, তাহা একখণ্ড কাপডে বাঁধিয়া টেঁকে বাখিযাছিলাম। আব আমাব জামাব পকেটে কয়েকটী টাকা ছিল। এই দারুণ দুঃসময়ে আমি ভয়ে অভিভূত হই নাই বা জ্ঞানহাবা হই নাই।

যখন আমাকে অশ্বাবোহী জিজ্ঞাসিল, "তেবে পাস ক্যা হ্যায, সাচ সাচ বাৎলাও।"

আমি কহিলাম,—"ম্যায গবীব আদ্‌মি হুঁ, মেবে পাস ক্যা হ্যায, সেবেফ দো-তিন বোপেয়া বাঃ খবচকা মেবে পাস্ মৌজুদ হ্যায।"

এই কথা বলিতে না বলিতে অশ্বারোহী পকেটে হাত দিযা টাকা কয়েকটী উঠাইয়া লইল।

আমি বালক কাল হইতে একটু-আধটু ভোজবাজি ভেল্কি অভ্যাস কবিয়াছিলাম। হাতেব এক বকম কসবত জন্মিযাছিল যে, টাকা লইয়া গপ্ কবিয়া গিলিয়া ফেলিলাম,—হাত দেখুন, মুখ দেখুন, কাপড-ঝাড়া লউন,—টাকা কোথাও পাইবেন না। সেই ভোজবিদ্যাব প্রভাবে মোহব কয়টি সুকৌশলে এরূপ স্থানে লুকাইয়া বাখিলাম যে, বিদ্রোহিগণ কাপড়-ঝাড়া অঙ্গ-ঝাড়া লইয়াও মোহব কয়টি কোথায় স্থির কবিতে পাবিল না।

তাহার পর তাহারা বাগড়ো দিয়া আমার দক্ষিণবাহু ভীষণ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। এক জন অশ্বারোহী সেই লম্বা দড়ির অগ্রভাগ ধরিল। আমাকে কহিল,—"চল্, বদ্‌মাস ;—আমারে আগে আগে চল্।" আরও পাঁচ-ছয় জন অশ্বারোহী আমাকে বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অশ্বের উপর —আমি পদব্রজে বন্ধন-দশায়। তাহারা দ্রুত যাইতেছে, আমাকে তাহাদের সঙ্গে দৌড়িতে হইতেছে। যখন আমি দৌড়িতে একটু অক্ষম হইতেছি,— অপেক্ষাকৃত একটু ধীরে ধীরে যাইতেছি,—অমনি এক জন অশ্বারোহী পশ্চাৎ দিকে আসিয়া আমার পিঠে সপাসপ্ চাবুক কষিতেছে। ক্রমশঃ আমার পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। ভাবিলাম,—"এইবার বুঝি প্রাণ যায়।" আমি যোড়হাতে বিদ্রোহিগণকে বলিলাম,—"হয় আমাকে একেবারে মারিয়া ফেল, না হয় আমাকে তোমাদের সহিত আস্তে আস্তে যাইতে দাও। আমি দৌড়িতে আর পারিতেছি না। আমার মাথা ঘুরিতেছে। তোমাদের চাবুকের ভয়ে আর খানিক দৌড়িতে হইলে, বোধ হয় আমি ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইব,—সম্ভবত প্রাণে মরিব।"

এ সময় আমার যে কিরূপ যন্ত্রণা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, প্রায় ১৮ ক্রোশ জঙ্গল-পথ দৌড়িয়া অতিক্রম করিয়াছি,— আমার দেহ ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে,—চোখে ভাল কিছু দেখিতে পাইতেছি না, মাথাটা যেন খালি হইয়া ভোঁ ভোঁ করিতেছে।

সে সময় টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। পথ পিচ্ছিল, উচু-নীচু এবং কঙ্করময়। আমি একবার হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় আমার হাঁটুর ছাল উঠিয়া গিয়াছিল। যে সময় আমি হোঁচট খাইয়া পড়ি, সে সময় প্রায় তিন-চারি জন অশ্বারোহী একত্র হইয়া আমায় প্রহার আরম্ভ করে; কেন না, তাহারা ভাবিয়াছিল,—আমি পলাইবার উপক্রম করিতেছি, হোঁচট খাওয়া ভাণ মাত্র।

এই ত আমার অবস্থা! এ অবস্থা বর্ণনাতীত নয় কি ?

যখন আমি অশ্বারোহিগণকে কাতর স্বরে বলিলাম, "আমি দৌড়িয়া যাইতে অক্ষম", তখন তাহারা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। কেহ কহিল,—"উহার মাথাটা এখনি কাটিয়া লওয়া হউক, এই মাথা সেনাপতির নিকট ডালি দিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যাইবে।" কেহ কহিল, "তাহা উচিত নহে, এ ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় মৌলবীর নিকট লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এই গুপ্ত-

চর দ্বারা ভবিষ্যতে ইংরেজদের গতি বিষয়ে অনেক সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।" কেহ আমাকে তামাসা করিয়া কহিল,—"এখনি তঞ্জাম ও ৮টা বেহারা আসিতেছে, তুমি তাহাতে চড়িয়া হলদোয়ানি সহর প্রবেশ করিবে।" কোন অশ্বারোহী আমার কান মলিয়া দিয়া কহিল,—"তুমি বড় চালাক,—তুমি ইংরেজের জন্য রসদ যোগাইতে পার,—আর একটু দ্রুতপদে চলিতে পার না, নয় ?"

আমি তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম,—অদ্য আর নিস্তার নাই, মৃত্যু অতি সন্নিকট,—এই নর-ঘাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের হস্তে নিশ্চয়ই এখনি জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। এ দুর্গম অরণ্য মধ্যে আমার এমন কেহই আত্মীয়-বন্ধু নাই, যিনি আজ আমাকে এই ঘোর সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারেন। আমি তখন সেই অনন্তশক্তি সর্ব্বসাক্ষী দয়াময় বিপদ্‌ভঞ্জন শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলাম। মনে মনে কহিলাম,—"হে দীনবন্ধু! হে জগৎপতি! রক্ষা কর, রক্ষা কর! প্রভু! কি দোষে, কোন্ অপরাধে এই তুষানলের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটিতেছে! একান্ত অনাথ বলিয়া, প্রভু! দয়া কর।"

নয়

প্রায় তিন পোয়া পথ গিয়া অশ্বারোহিগণ একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। আমিও দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইতে পাইয়া মনে মনে কহিলাম,—"আঃ বাঁচিলাম।" তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে। যে অশ্বারোহী আমার বন্ধন-দড়ি ধরিয়া আছে, সাহসে ভর করিয়া তাহাকে বলিলাম,—"তুমি যদি এ সময় আমাকে একটু জল দিয়া বাঁচাও, তাহা হইলে ভগবান্ তোমার ভাল করিবেন।" তাহার কেমন হঠাৎ দয়া হইল। সে আমাকে জল পান করিতে অনুমতি দিয়া লম্বা বন্ধন-দড়িটী কতক ছাড়িয়া দিল। জল নিকটেই ছিল। বর্ষাকাল। পথের প্রায় দুই ধারেই পর্ব্বতীয় ঝরণা আছে। আমি দড়ি আলগা পাইয়া ধীরে ধীরে প্রায় ষোল পদ অতিক্রম করিয়া এক ঝরণার নিকট বসিলাম, মুখ ধুইলাম, হাত-পা ধুইলাম, প্রাণ ভরিয়া জলপান করিলাম। খানিক জল লইয়া মাথায়ও দিলাম। শরীর যেন একটু সবল হইল, মনে স্ফূর্ত্তি হইল। নাড়ী একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছিল, এখন 'ধাত' আসিল।

আমার তৃপ্তিপূর্ব্বক জলপান দেখিয়া অশ্বারোহিগণও জল খাইতে আরম্ভ করিল। এই সুযোগে আমি বিশ্রাম করিয়া লইবার অবসর পাইলাম। এইরূপ জলপানে প্রায পঁচিশ মিনিট অতিবাহিত হইল। তথাচ অশ্বারোহিগণ সে স্থান হইতে নড়ে না। আমি আমাব অশ্বাবোহীকে জিজ্ঞাসিলাম,—"এখানে এতক্ষণ অপেক্ষা কবিবাব কারণ কি?" সে কহিল,—"পশ্চাতে আমাদের প্রায পঞ্চাশ জন অশ্বাবোহী আছে, টাটুওযালাদিগকে তাহারা সঙ্গে কবিয়া আনিতেছে। তাহাদেব সহিত একত্র মিলিত হইযা যাত্রা করিব। কাবণ, সন্ধ্যা উপস্থিত হইযাছে, এখনও প্রায় তিন-চাবি ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। বাত্রিকালে সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাওয়াই ভাল।"

দেখিতে দেখিতে টাটুওয়ালাগণ আপন আপন টাটুতে বসদ বোঝাই কবিয়া অশ্বাবোহী দল কর্ত্তৃক সুবক্ষিত হইযা আমাদেব নিকট আসিয়া পৌছিল। সেই মিশ্র বৈজনাথেব লোক—সেই হিন্দুস্থানী যুবককে দেখিলাম,—সে কেবল কাঁদিতেছে, গণ্ডস্থল প্রবাহিত হইযা অশ্রুজল পড়িতেছে। আব আমাব সেই টাটুওযালাকে দেখিলাম,—সে ব্যক্তি বিষম প্রহাবিত হইযাছে। নাক, মুখ, ঠোঁট দিযা তাহাব বক্ত পড়িতেছে। তাহাকে এরূপভাবে কেন মাবিল তাহাব কাবণ তখন কিছুই বুঝি নাই।

যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন অশ্বারোহিগণ মধ্যে এক আনন্দ-কোলাহল উপস্থিত হইল। প্রথমত,—নাইনিতালে সাহেবদেব জন্য যে সকল রসদ যাইতেছিল তাহা হস্তগত হইযাছে। দ্বিতীযত,—বসদ লইয়া যাইবাব কর্ত্তাকেও তাহাবা আজ ধৃত কবিযাছে। সুতবাং অশ্বাবোহীদেব অন্তবে এবং বাহিবে আনন্দ-লক্ষণ দেখা না দিবে কেন? তাহাবা মনেব উৎসাহে গান গাহিতে গাহিতে, নাচিয়া নাচিযা, ঢলিযা ঢলিয়া চলিতে লাগিল। আর আমি ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুব অবসন্ন দেহ,—তাহাতে আবাব জল্লাদেব কুঠারে প্রাণ দিবাব জন্য বন্দী হইযা যাইতেছি। অহো। অতি বড শত্রুরও যেন এরূপ অবস্থা কখন না ঘটে।

টাটুগুলিব পৃষ্ঠদেশে নানারূপ আহাবীয সামগ্রী ছিল। আটা, ডাল, ঘৃত, মূলা, আলু, ধোন্দুল ইত্যাদি। কোন কোন অশ্বাবোহী ডাল ঘৃত প্রভৃতি চুবি কবিয়া নিজে বাখিতে লাগিল। কেহ একটা বোতল বাহিব কবিয়া তাহাতেই খানিকটা ঘি পুবিয়া লইল। কেহ কতকগুলা মূলা বেগুন কাপড়ে বাঁধিয়া ঘোড়াব উপব বাখিল।

ক্রমশঃ আকাশ ঘোর তমোময় হইয়া উঠিল। ক্ষণপ্রভা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতে আরম্ভ করিল। ঘন ঘন মেঘ ডাকিতে লাগিল। এক পসলা বেশ বৃষ্টি হইয়া গেল। আমরা সকলে ভিজিয়া ভিজিয়া যাইতে লাগিলাম। সঙ্গে একটীও আলোক নাই। কেবল বিদ্যুতালোকে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আর কোথাও কিছু নাই—মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, বজ্রাঘাত নাই,—আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঈষৎ চাদের আলোক-ও দেখা দিল।

নিয়ম ছিল,—আমি সর্ব্বাগ্রে যাইব, রক্ষকস্বরূপ ছয় জন তুরুক-সওয়ার আমার আগে-পিছু থাকিবে। তৎপশ্চাতে টাটুওয়ালাগণ রসদসহ টাটু লইয়া আসিবে, তাহাদিগকে একরূপ ঘেরাও করিয়া অবশিষ্ট অশ্বারোহী দল চলিবে। নিয়ম এইরূপ ছিল বটে, কিন্তু পথের সঙ্কীর্ণতা হেতু, অন্ধকার ও বৃষ্টিনিবন্ধন শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি দূর হইয়াছিল। কখনও আমি আগে থাকি, কখন পশ্চাতে যাই, কখনও বা মধ্যস্থলে আসি। এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিলেও অশ্বারোহিগণ তাহাতে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করে নাই।

আমার জঠরানল জ্বলিয়া উঠিযাছে, আর রক্ষা নাই। ক্ষুধাতেই বুঝি প্রাণ যায়। সম্মুখে দেখিলাম, এক মোটা এবং লম্বা সপত্র কাঁচা মূলা পথে পড়িয়া রহিয়া আছে। টাটুর পৃষ্ঠে ঝুড়িতে অনেক মূলা বোঝাই ছিল, সেই মূলাই পড়িয়া গিয়া থাকিবে। সেই মূলা দেখিয়া মন মজিল, লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; আমি যাইতে যাইতে অতর্কিতভাবে পায়ে করিয়া সেই মূলা তুলিয়া হাতে লইলাম। অন্ধের চক্ষু-প্রাপ্তির ন্যায, বন্ধ্যার পুত্র-প্রাপ্তির ন্যায়, দরিদ্রের কোহিনুর-প্রাপ্তির ন্যায় আমার এই মহা-মূলা-প্রাপ্তি ঘটিল। সাত রাজার ধন একটী মাণিক,—আর আমার এই মূলা! নগদ লক্ষ কোটী রামচন্দ্রী মোহর সম্মুখে গণিয়া দিলেও আমি এই মূলা এখন বিক্রয় করি কি না সন্দেহ। হে মূলে! বিধাতা কি চাদ নিঙ্গড়িয়া রসে ফেলিয়া তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? তাই আজ তোমাকে এত অনির্ব্বচনীয় সুস্বাদু ও সুমিষ্ট বোধ হইতেছে!

মূলায় কামড় মারিয়া চিবাইয়া কতকাংশ গলাধঃকরণ করিলাম। আর অমনি হাতের মূলা হাতে রহিল,—কেবল নয়নজলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। বাপ্! বাপ্!—গেলাম! গেলাম! শব্দ করিয়া উঠিলাম। সেই নিদারুণ ঝাল মূলা খাইয়া ঠোঁট জ্বলিল, মুখ জ্বলিল, বুক জ্বলিল, পেট পর্য্যন্ত জ্বলিয়া

উঠিল। যন্ত্রণায় আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। টান্ মারিয়া সুদূরে সেই মূলা নিক্ষেপ করিলাম। যে সকল অশ্বারোহী আমার এই মূলা-ভক্ষণ ব্যাপার দেখিয়াছিল, তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এ দিকে জ্বালায় আমার প্রাণ যায় যায় হইল। আমার অশ্বারোহীকে বলিলাম,—"ভাই! পানি পিয়েঙ্গে।" সে অমনি হাসিয়া বাঁধন-দড়িটা লম্বা করিয়া দিল। আমি এক ঝরণার কাছে গিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিতে লাগিলাম।

জলপানে জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল। ভাবিলাম,—এ বিষাক্ত মূলায় আজ বুঝি সত্য সত্যই আমার মহাপ্রাণ উড়িল।

পাহাড়ের নিম্নপ্রদেশে স্থানে স্থানে কলার বাগান আছে। অশ্বারোহিগণ পথের নিকটস্থিত একটী বাগান হইতে অনেকগুলি কলার কান্দি কাটিল। অনেকেই দুই-এক কান্দি করিয়া কলা লইল। কেহ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে কলার কান্দি কৌশলে রাখিল, কেহ বা তাহা সহিসের কাঁধে দিল। এক জন বিভীষণ-মূর্ত্তি মুসলমান অশ্বারোহী এক বৃহৎ কাঁচা কলার কান্দি কাটিয়া আনিয়া আমার কাঁধে দিয়া বলিল,—"চল্ শালা, চল্!" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি আমার গলায় এক ধাক্কা দিল। আমি ত অবাক্! আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাঁধে কলা লইয়া যাইতে লাগিলাম। দুর্ব্বল দেহে কলা-কান্দির ভার পতিত হওয়ায় আর সেরূপ দ্রুতপদে যাইতে পারিলাম না। তদৃষ্টে এক জন নিষ্ঠুর অশ্বারোহী আবার আমাকে পশ্চাৎ হইতে প্রহার আরম্ভ করিল। আর সে মধুর স্বরে খাঁটি শ্লীল ভাষায় গালি দিতে লাগিল। আমার মন মোহিত হইল।

সর্ব্বশরীর মূলা-আগুনে পুড়িতেছে, তাহার উপর এই ব্যবস্থা। আমি ভাবিতে লাগিলাম,—"হলদোয়ানি আর কত দূর! পথে আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। সেখানে গিয়া ফাঁসি হউক, শূলী হউক, তাহাতে রাজি আছি, কিন্তু এ দারুণ যন্ত্রণা সহিতে একান্ত অক্ষম।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি, সম্মুখ দিক্ হইতে হঠাৎ এক তোপ-ধ্বনি হইল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকে গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইল। গুলির আঘাতে তিন জন টাটুওয়ালা ধরাশায়ী হইল; একটা অশ্ব আরোহিসহ ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সকলে ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িল। অনেকে পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম,—"এ আবার কি? ইংরেজ-সেনা আসিয়া ইহাদের গতি প্রতিরোধ করিতেছে না কি?"

গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইবামাত্রই আমাদের অশ্বারোহী দলের যিনি কর্ত্তা তিনি এক বংশীধ্বনি করিলেন। শূন্যপথে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক নিশান উড়াইয়া দিলেন। অমনি গুলিবর্ষণ থামিল।

ব্যাপার কেহ বুঝিলেন কি? আমরা হলদোয়ানি নগরপ্রান্তে পৌঁছিয়াছি। হলদোয়ানি বিদ্রোহী সেনার প্রধান আড্ডা। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ এই স্থানে নাইনিতাল আক্রমণার্থ তাঁহার প্রধান সেনাপতিকে পাঠাইয়াছেন। অদ্য এই স্থান হইতে ষাট জন অশ্বারোহী বহির্গত হইয়া, কালাডুঙ্গি গিয়া আমাদিগকে ধরিয়া আনিতেছে। এখন রাত্রি প্রায় নয়টা। নগরপ্রান্তে রাত্রি নয়টার সময় পৌঁছিয়া, আমাদের অশ্বরোহিদল-কর্ত্তার উচিত ছিল বাঁশী বাজাইয়া জানানো, —"ওগো আমরা আসিয়াছি। আমরা শত্রু নহি, মিত্র।" কিন্তু রসদসহ আমাকে গ্রেপ্তার করার আনন্দ-উল্লাসে তিনি নগর নিকটে পৌঁছিয়াও বাঁশরী-সঙ্কেত দ্বারা মিত্রপক্ষের আগমনবার্ত্তা বুঝাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ও দিকে অস্ত্রধারী অশ্বারোহী দেখিয়া, শত্রুপক্ষ ভাবিয়া নগরের সৈন্যগণ গুলিবর্ষণ করে। এইরূপ উভয় পক্ষের ভ্রম হওয়ায় কয়েক জন হত ও আহত হয়। গুলিবর্ষণ থামিলেও আমরা প্রায় এক দণ্ড কাল সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাদের দল হইতে কেবল দুই জন অশ্বারোহী নগরের দিকে ছুটিল। আমার কাঁধে যে কলার কান্দি ছিল, তখন তাহা আমার কাঁধ হইতে লইয়া এক জন সহিসের কাঁধে দিল।

পাঠক জানেন, আমার নিকট এগারটী মোহর আছে। নগরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মনে লইল,—"এই এগারটী মোহর লইয়া এখন কি করি? যদি এখান হইতে ইহার কিছু গতি না করি, তাহা হইলে হলদোয়ানি পৌঁছিলে নিশ্চয় ইহা হস্তান্তর হইবে।" আমার এ কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত হাসিবেন। যে ব্যক্তির এখনি প্রাণদণ্ড হইবে,—তাহার আবার মোহরের জন্য এত মায়া কেন? কথা সত্য। কিন্তু অকারণে এগারটী মোহর বিদ্রোহী মুসলমানদের হস্তে দিব কেন? বিশেষ আমার হাতে যদি মোহর দেখিতে পায়, তাহা হইলে বিদ্রোহিগণ ভাবিবে—"এ ব্যাটা মোহরের গাছ। ইহাকে নাড়া দিলেই তলায় মোহর পড়িবে। অতএব এ ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত লক্ষ মোহর না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাকে যন্ত্রণা দাও।" প্রাণদণ্ড—ফাঁসি, শূলী, এ সকল অনায়াসে সহ্য হয়; কিন্তু প্রত্যহ অষ্ট প্রহর যন্ত্রণা-দান কিছুতেই সহ্য হইবার নহে। আরও এক কথা। আশা বড় মায়াবিনী। প্রাণদণ্ড নিশ্চয় জানিয়াও

তখন এক একবার আমার মনে হইতে লাগিল,—"যদি আমি প্রাণে না মরি, যদি বাঁচিয়া থাকি, শেষে যদি খালাস পাই, তাহা হইলে ঐ এগারটী মোহর পাথেয়স্বরূপ হইবে,—পথ-খরচ করিয়া বাটী যাইতে কষ্ট হইবে না।" মনে মনে এ চিন্তা করিয়াও আমি কেমন লজ্জিত হইতে লাগিলাম। আমার এ কথা লোকে শুনিলে পাগল বলিবে যে। যথার্থ ক্ষুরধার অসি উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তথাচ আমি প্রাণের আশা করিতেছি! ছি!—কিন্তু আশা বড় কুহকিনী।

এই সকল কারণে, এই কয়েকটী মোহর যাহাতে শত্রুহস্তে না পড়ে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইল;—"নিকটস্থ গাছের তলায় মোহর পুঁতিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?" আমাদের পথের উভয় পার্শ্ব—অশ্বত্থ বট আম্র প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষে পরি-শোভিত, ঐ বৃক্ষাবলী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করত এক দিন নিদাঘ-সন্তাপিত পরিশ্রান্ত পথিককুলের শ্রান্তি দূর করিত। কিন্তু এক্ষণে সে শাখা-প্রশাখা নাই, বিদ্রোহী সৈন্যদের হস্তীর আহারের জন্য তাহা কর্ত্তিত হইয়াছে। অধি-কাংশ বৃক্ষই এক্ষণে যেন বজ্রদগ্ধ হইযা, ভ্রষ্টশ্রী হইয়া দণ্ডায়মান আছে। আমি এইরূপ একটী বটবৃক্ষের তলদেশে যাইবার জন্য অশ্বারোহীর নিকট প্রস্রাবের ভাণ করিলাম। অশ্বারোহী আমার বন্ধন-রজ্জু শিথিল করিয়া দিল। আমি তখন অনায়াসে একটী বটবৃক্ষের তলে গিয়া বসিলাম। দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ মাটি খনন করিয়া, তাহার ভিতর মোহর কয়টী ধীরে ধীরে রাখিয়া আবার মাটী চাপা দিলাম। আমার উক্ত কার্য্য অশ্বারোহী দেখিতে পাইল না বা তাহার মনে কোন সন্দেহও হইল না। আমি পূর্ব্ববৎ তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে দীর্ঘরজ্জু গুটাইয়া লইল।

ইহার অল্পক্ষণ পরে, হলদোয়ানি হইতে এককালে আট জন অশ্বারোহী আসিয়া আমাদের পথপ্রদর্শকস্বরূপ হইয়া, আমাদিগকে লইয়া চলিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে আমরা হলদোয়ানি উপস্থিত হইলাম। আমাকে তাহাদের সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত করিল। প্রথমে তাহারা আপনাদের অনেক বীরত্ব, অনেক বাহাদুরীর কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া শেষে আমার কথা উত্থাপিত করিল। সর্দ্দার তাহাদের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন,—"আজ তোমরা বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে চল আমরা এই সকল দ্রব্য-সম্ভার এবং এই লোকটীকে লইয়া মৌলবী ফজল হকের সমীপে উপস্থিত হই। তিনি

যেরূপ হুকুম দেন তাহাই করা যাইবে।” এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা লুণ্ঠিত রসদ, অশ্ব, অশ্বারোহী এবং আমাকে লইয়া ফজল হকের বাঙ্গলায় দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইল। অন্যান্য সিপাহীরা নীচে থাকিল। পূর্ব্বোক্ত সর্দ্দারের আর দুই জন সওয়ার আমাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফজল হকের সম্মুখে সমানীত করিয়া সকল বৃত্তান্ত একে একে বিবৃত করিল। তিনি কোন কথার উত্তর করিলেন না। কেন না, তখন তিনি জানু পাতিয়া মালা হস্তে ‘ওজিফ’ পড়িতেছিলেন। তাহারা আমাকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৌলবী ‘ওজিফা’ সমাপ্ত করত দুইটী হস্ত একবার আপনার মুখে দিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে আরক্ত লোচন, সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল। কিন্তু ব্যাকুলতা বা অধীরতা প্রকাশ করিলাম না। মৌলবী অতি পরুষ এবং জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—“তু কোন্ হ্যায ?” আমি ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহী সৈন্যদের নিকট যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই বলিলাম। কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, “তু আপনে তঁই চাপরাশী বনাতা হ্যায়,—সব ঝুঁটা বাত হায়, চাপরাশীকা গুপ্তগু এইসী সলিব নেহি হোতী হ্যায়। তু কাফেরোঁকো খবর পৌছতা হ্যায। লে, অব উসকা মজা চখ্।” এই কথা বলিয়া সর্দ্দারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—“ইসকো কল ফজর তোপমে উড়া দেও।”

মিশ্র বৈজনাথের লোক, টাটুওয়ালা প্রভৃতি সকলেই নীচে ছিল,—আমি কেবল একা উপরে গিয়াছিলাম। কেবল আমার প্রতিই তোপে উড়াইবার হুকুম হইল, অন্যের প্রতি নহে। আমাকে কল্য তোপে উড়ানো হইবে, এই হুকুম শুনিবামাত্র সেই যম-কিঙ্করেরা আমাকে নীচে লইয়া গেল। বাঙ্গলা-গৃহের দ্বারের সম্মুখে দুইটী বৃক্ষ, তাহার মূলে দুইখানি তক্তাপোষ পাশাপাশি পাতা, তাহার উপর প্রহরীরা সসজ্জ হইয়া পাহারা দিতেছিল। তাহাদের নিকট আমাকে সমর্পণ করত তাহারা চলিয়া গেল। উক্ত প্রহরীরা আমার হস্ত-পদ শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক আমাকে সেই দুই তক্তাপোষের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল, সেখানে শুইতে বলিল এবং ইহাও আদেশ করিল যে, “যখন তুমি পাশ ফিরিবে, তখন আমাদের অনুমতি লইয়া পাশ ফিরিবে। যদি বিনা অনুমতিতে পাশ ফের বা নড়-চড় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব। আমার হাতে শিকল, পায়ে শিকল, কোমরে শিকল, আটেকাঠে বদ্ধ। সেই শিকলসমূহ তক্তাপোষের পায়ার সহিত সংলগ্ন।

আমি ভূমিতলে ভিজা-মাটীতে চিৎপাত হইয়া শুইয়া রহিলাম। ঝাল-মূলার জ্বালা তখনও যায় নাই, তৃষ্ণা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আমি এ অন্তিমে কেবল সেই বিপদ্‌ভঞ্জন মধুস্থদনকে ভাবিতে লাগিলাম। জানি না, কেন, আমার চক্ষুকোণে জল আসিল। জানি না, কেন হঠাৎ গণ্ডস্থল বাহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

দশ

মরণ নিশ্চয়। প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই। চারি দিক্‌ শূন্যাকার। মনে হইতে লাগিল, আমি মহাসাগরের অনন্ত সলিলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, ডুবিতেছি। কূল-কিনারা নাই, তরী নাই,—নিকটে একগাছি তৃণও নাই যে, তাহা একবার ধরিবার আশা করি। ঘোর নিবিড় জলদজালে যেন বেষ্টিত হইলাম। চক্ষু অন্ধ হইল। কর্ণ বধির হইল। দেহ শিথিল হইল। প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে কি এইরূপ ঘটনাই ঘটে ?

মায়ের মুখ মনে পড়িল। জননীর সেই স্নেহমাখা সকরুণ বদনমণ্ডল সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। মাকে বলিলাম, "মা। বিদায় দাও,—চলিলাম। বিপাকে বন্দী হইয়া তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অকালে নিহত হইতে চলিল।" এই কথা বলিতে বলিতে আমি তখন স্পষ্টই যেন দেখিতে পাইলাম,—মায়ের দুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতেছে। আমি বলিলাম, "মা! দুঃখ করিও না, তোমার মধ্যম পুত্র কাশীপ্রসাদ রহিল, কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল রহিল,—ইহারা বড় হইয়া তোমার সেবা করিবে। আমার এইরূপ মৃত্যুই বিধিলিপি ছিল,—সুতরাং শোক বৃথা।" মা তখন করুণ আর্ত্তনাদে চোখের জলে সমস্ত অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন। মায়ের কান্না দেখিয়া আমারও নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু-বিমোচন হইতে লাগিল।

যখন কান্দিয়া উঠিলাম, তখন আমার জ্ঞান হইল,—মা তো নিকটে নাই, তবে আমি কাঁদি কেন ? প্রকৃতই সে রাত্রে এইরূপ নানারূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। সে রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, মাঝে মাঝে যে তন্দ্রা হইয়াছিল, সেই তন্দ্রায় কেবল অলীক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।

আজ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যে যেখানে ছিলেন, সকলেই যেন একে একে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। সহধর্ম্মিণীকে যেন বিধবার ন্যায় বিকৃত-বেশা দেখিলাম,—আলু-থালু কেশ,—মলিন বসন পরিধান, রুক্ষ গাত্র, কম্বলাসনে উপবিষ্ট,—আর, নয়ন-জলে ভাসমান হইয়া মুখে কেবল হরি হরি ধ্বনি। আমি কহিলাম, "ক্রন্দন বৃথা। যাহা হইবার তাহাই হইবে, কেহই আটক করিতে পারিবে না। তুমি লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইযাও এই হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়া হতভাগিনী হইলে। তোমার ভবিষ্যৎ ভরণপোষণের জন্য আমি এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। বিদ্রোহিগণ আমার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। তোমাকে আমার অন্তিমে এই উপদেশ, তুমি হিন্দু রমণী, তুমি স্বধর্ম্ম রক্ষা করিও। আর তোমার অন্নের চিন্তা কখনই হইবে না,—ভাই কাশীপ্রসাদ রহিল, সে তোমাকে প্রতিপালন করিবে।"

সহধর্ম্মিণী ভূমে গড়াগড়ি দিযা কেবল কাঁদিতে লাগিল। আমারও স্বপ্ন ভাঙ্গিল।

এইরূপে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ, গোপাল, ঠাকুরদাদা, আত্মীয-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকেই মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে হইল সেই পান্নার মুখারবিন্দ। সেই পরোপকারিণী, আমার নিমিত্ত সর্ব্বস্বত্যাগিনী, সেই অত্যন্ত অসময়ে রক্ষাকারিণী পান্নাকে যেন দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, "তুমি আমাকে এগারটী মোহর দিযাছিলে। কিন্তু এখন আমিই বা কোথায়, আর সেই মোহরই বা কোথা? তুমি এক দিন আমাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিযা বখ্‌ত খাঁর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলে। কিন্তু আজ আমাকে মৌলবী ফজল হক্ তোপে উড়াইবার হুকুম দিযাছে। রক্ষার আর কোনও উপায় নাই। আমি চলিলাম, অনন্তধামে চলিলাম। মনে এক ক্ষোভ রহিল,—তোমার কোন উপকার করিয়া যাইতে পারিলাম না।"

কখন দেখিতে লাগিলাম,—এক ভীষণ তোপ আমার সম্মুখে দাগা হইতেছে। অদূরে বহুসংখ্যক লোক দাঁড়াইযা আমার এই প্রাণবধ কার্য্য অবলোকনার্থ অনিমেষ-লোচনে চাহিয়া আছে।

এক একবার মনে হইতে লাগিল, আমাকে যে তোপে উড়াইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যখন সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরল সীবলড সাহেব প্রভৃতিকে গুলি করিয়া হত্যা করিল এবং পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে রাস্তায় রাস্তায় টানিয়া লইয়া বেড়াইল, তখন আমি ত কোন্ ছার? তোপে উড়ান এক প্রকার ভাল;

—কেন না, দেহটাকে আর পথে পথে টানিয়া লইয়া বেড়াইতে পারিবে না। সমস্ত রাত্রি আই ঢাই, ছট-ফট্, বিচার-বিতর্ক করিতে করিতে—অর্দ্ধজাগ্রৎ অবস্থায় নানারূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ প্রত্যূষ দেখা দিল। পূর্ব্ব দিক্ প্রসন্ন হইল। আমি মৃত্যুর নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মৃত্যু নিকট জানিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলাম, "হে দীনবন্ধু! হে কৃপাসিন্ধু! হে দয়াময় প্রভু! জানি না কোন্ পাপে বন্দী হইয়া আমার মৃত্যু ঘটিতেছে! হে মধুসূদন! আমার রক্ষার কি কোন উপায় নাই?

এগার

প্রভাত হইল। পক্ষিকুল কলকণ্ঠে গান ধরিল। তখনও আমাকে কেহ কোন কথা বলে না, উঠিতে বসিতে বা বধ্য-ভূমিতে যাইতে কেহ বলে না। বুঝিলাম, এখনও কাহারও ঘুম ভাঙ্গে নাই। নবাবী ধরণ, আমীরী চাল-চলন, কাজেই বিশেস বেলা ব্যতীত নয়ন হইতে নিদ্রা দূব হইবার নহে।

বেলা যখন প্রায় সাড়ে সাতটা, তখন কয়েক জন মুসলমান সর্দ্দার উত্তম বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া, আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থিত কয়েকখানি চৌকির উপর উপবেশন করিয়া, কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। উচ্চহাস্য, কৌতুক, গর্ব্বময় বীরত্বব্যঞ্জক কথা এবং গল্প চলিতে লাগিল। সে কথার মর্ম্ম এইরূপ—"এ দেশে ইংরেজরাজ্য একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ ইংরেজ নিহত হইয়াছে। কেবল কতকগুলি ইংরেজ প্রাণভয়ে পলাইয়া নাইনিতালে আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র নাইনিতাল আক্রমণ করিয়া এই কয়েক জন ইংরেজকে বধ করিতে পারিলেই আমরা নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারি।" এক জন সর্দ্দার উত্তর করিল, "নাইনিতাল আক্রমণের আবশ্যকতা নাই। আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, নাইনিতালে রসদ ফুরাইয়াছে। আমরা যদি এক মাসকাল চুপ করিয়া এইখানে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে দেখিবে নাইনিতালস্থ সমস্ত ইংরেজ অনাহারে মরিয়া আছে। আর, যাহাতে এ প্রদেশ হইতে কোনরূপে রসদ নাইনিতালে পৌছিতে না পারে, তাহার তদ্বির কর। আজ যেমন সমুদায় রসদ, সমস্ত টাটু ও তাহাদের দলপতি ধৃত হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যহ এক এক জন দলপতিকে ধরিয়া আনিবার চেষ্টা কর। এই যুক্তিই সার।"

সেই সর্দ্দার আরও কহিল,—"উপস্থিত দলপতিকে তোপে উড়ান উচিত নহে। তোপে উড়ান হইল ত মানুষ ফুরাইল। ইহাকে জীবিত রাখিতে হইবে। ইহার নাক কান কাটিয়া এবং ইহার ডান হাত ও ডান পা ভাঙ্গিয়া, ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। যে প্রদেশ হইতে নাইনিতালে রসদ যায়, ইহাকে সেই প্রদেশে লইয়া যাওয়া হউক।" অন্য এক জন সর্দ্দার উত্তর করিল,—"তাহা কখন হইতে পারে না। এ লোকটাকে কখন জীবিত রাখা উচিত নহে। বরং ইহার মৃত্যুর পর ইহার মৃত্যু-বিকৃত মূর্ত্তি পটে চিত্রিত করিয়া, গাছে বা প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখা হউক,—এবং সেই পটের নিম্নে এই কথা লেখা হইবে যে, এই ব্যক্তি ইংরেজকে রসদ যোগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া ইহার এই দশা হইয়াছে। যে কেহ এইরূপ কার্য্য করিবে, তাহার এইরূপ দণ্ড হইবে।

সর্দ্দারগণ মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় মৌলবী ফজল হক্ প্রধান সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সর্দ্দারগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। ফজল হক্ চৌকিতে উপবিষ্ট হইলে তাহারা স্ব স্ব আসনে বসিল। আমার নাক-কান কাটার পক্ষপাতী সর্দ্দার প্রথমেই এইভাবে ফজল হক্‌কে কহিলেন,—"হুজুর! ইস্‌কো তোপমে না উড়াইয়ে, ইস্‌কা নাক আউর কান কাট দিজিয়ে। আউর বামপুরকে ঐলাকেমে ছোড় দিজিয়ে। যো কোই ইস্‌কা হাল্ দেখেগা, সো ডর যায়গা। আউর কোই এইসা কাম নেহি করেগা। আউর কাফিরোঁকো রসদ নেহি পৌঁছায়েগা। হামলোগোঁনে কই দফা রসদ ভেজনেওয়াল্যোঁকো মার ডালা, লেকিন, লোগ ঝুট সমঝতে হ্যাঁয়।" এই কথা শুনিয়া মৌলবী গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। শেষে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "না, তাহা হইতে পারে না। তোপে উড়াইবার হুকুম যখন একবার হইয়াছে, তখন সে হুকুম রদ করা আমার সাধ্য নয়। তবে নবাব সাহেব আসুন, তিনি আসিলে যাহা যুক্তি হয় করা যাইবে। তিনিই এ দেশের কর্ত্তা,—আমি বিচারক, দণ্ডদাতা মাত্র। বিশেষ তাঁহার সমক্ষেই অপরাধীকে তোপে উড়াইতে হইবে, ইহাই নিয়ম। তিনি এখনি আসিবেন।"

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন,—এ দেশটা এক্ষণে নবাব খাঁ বাহাদুরের অধিকার-ভুক্ত, এখানকার সৈন্যাধ্যক্ষ মৌলবী ফজল হক্ এবং দেশ শাসনের জন্য এখানে এক জন গবর্ণর আছেন। ফজল হক্ বলিতেছেন, "সেই শাসনকর্ত্তা গবর্ণরের সম্মুখে আমাকে তোপে উড়ান হইবে।"

আমার প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছে ;—কখন নবাব সাহেব আসেন, কি কথা বলেন, কখন আমাকে তোপে উড়াইয়া দিবেন,—এই চিন্তাই তখন মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল।

এমন সময় এক জন অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়া মৌলবী সাহেবের হস্তে একখানি পত্র দিল। মৌলবী সাহেব সর্দ্দারগণকে কহিলেন—"অদ্য নবাব সাহেব উপস্থিত হইতে পারিবেন না, কেন না, তাঁহার শরীর-অসুখ। তিনি কল্য আসিবেন লিখিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র ফজল হকের আদেশ-ক্রমে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি তদ্ভাবে বন্দী অবস্থায় পড়িয়াই রহিলাম।

আমার চিন্তা দ্বিগুণ চতুর্গুণ হইল। এখনি তোপে উড়াইলে নিশ্চিন্ত হইতাম,—সকল জ্বালা দূর হইত। কিন্তু অদৃষ্টে সে শান্তি লেখা নাই, এখনও কল্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, এই চব্বিশ ঘণ্টা কাল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, অনাহারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা তুষানল ভাল ছিল। এ একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ মৃত্যু ঘোরতর যন্ত্রণাদায়ক।

আর যে ভাবিতে পারি না। ভাবিয়া ভাবিয়া দেহের রক্ত জল হইয়া গিয়াছে। বুঝি বা এইরূপ অনাহারে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে ভাবিতেই মৃত্যু ঘটে!

দুর্ব্বৃত্ত সর্দ্দারগণ বলে কি? আমার নাক কান কাটিয়া, আমাকে খোঁড়া করিয়া ছাড়িয়া দিবে! তবে কি আমি নাক-কাটা কাণ-কাটা খঞ্জ হইয়া বাঁচিয়া থাকিব? এরূপ জীবনধারণে ফল কি? ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।

বেলা যখন তৃতীয় প্রহর, তখন আমার জন্য ছোলা, ছাতু ও জল আসিল। দেখিলাম, এক জন মুসলমান কর্ত্তৃক এই সকল আহারীয় সামগ্রী আনীত হইয়াছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তখন আমার আর নাই, তখন আমি সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি। শরীর তখন কেমন ঝিম্ঝিম্ করিতেছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় আমি কেবল তখন পড়িয়া আছি।

মুসলমান-স্পৃষ্ট জল দেখিয়া আমি ধীরভাবে কাতরকণ্ঠে কহিলাম,—"ভাই! আমি ত মরিতে বসিয়াছি। এ সময়ে আমি স্বধর্ম্ম নষ্ট করিব না। কোন হিন্দু দ্বারা যদি জল ও আহারীয় সামগ্রী আনীত হয়, তাহা হইলে আমি খাইব, নচেৎ নহে।"

সেই মুসলমান আমাকে বিদ্রূপ করিয়া হাসিল। কি বিদ্রূপ করিয়াছিল এখন ঠিক মনে নাই। বোধ হয় সে এই কথা বলিয়াছিল যে, "তুমি মরিতে যাইতেছ, তোমার আবার এখন ধর্ম্মের প্রতি এত মন কেন?"

সে যাহাই বলুক, অবশেষে মিষ্ট কথায় তাহাকে বশ করিলাম। সে ফিরিয়া গিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে প্রত্যাবৃত হইল। এবার দেখিলাম, দুই জন হিন্দু তাহার সঙ্গে আসিয়াছে। এক জনের হস্তে জল ও দুগ্ধ, অপরের হস্তে ছাতু, ছোলা, গুড়। দ্বিগুণ আয়োজন দেখিয়া বুঝিলাম, সত্য সত্যই মুসলমানের আমার উপর দয়া হইয়াছে।

প্রহরিগণ হাত, পা এবং কোমরের শিকল আল্‌গা করিয়া দিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। মুখ ধুইলাম। সংক্ষেপে সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া আহারের যোগাড় করিলাম বটে, কিন্তু দুই-এক গ্রাস মুখে দিয়া কিছুই আহার করিতে পারিলাম না। অবসন্নতা হেতু দেহ কেমন কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব নাকি? মাথায় একটু জল দিয়া মুখ-হাত ধুইয়া শুইয়া পড়িলাম।

বার

সে রাত্রেও ভাল ঘুম হয় নাই, কেবল তন্দ্রা আর স্বপ্ন। আবার প্রভাত হইল, আবার পক্ষিকুল কলরব করিয়া উঠিল। আবার মৌলবী সাহেব এবং সর্দ্দারগণ যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। আবার সকলে নবাব সাহেবের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

আমি এ অন্তিমে অন্তরে কেবল দুর্গানাম জপিতেছি। দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! মা রক্ষা কর! রক্ষা কর! অবোধ সন্তানকে মা চরণে স্থান দাও। হে মহিষমর্দ্দিনি! রক্তবীজবিনাশিনি! দুষ্ট-দানব-দল-সংহারিণী! তোর ছেলেকে একবার কোলে কর্ মা!

ঠিক এইভাবে বিভোর হইয়া তখন আমি মা দুর্গাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে বেলা এক প্রহর অতীত হইল, তথাপি নবাব সাহেব আসিলেন না। বেলা দশটা হইল, ১১টা বাজিল,—তখনও নবাব সাহেবের দেখা নাই। বেলা যখন প্রায় দুই প্রহর, তখন অদূরে অশ্বখুরধ্বনি শ্রুত হইল। আমি বুঝিলাম, এইবার নবাব সাহেব—আমার যম আসিতেছেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্মুখে যাহা দেখিলাম তাহা অপূর্ব্ব অলৌকিক। দেখিলাম, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য ধীর পদে অগ্রসর হইতেছে। সুসজ্জিত, বেগশালী, দৃঢ়কায় আরবদেশীয় অশ্বের উপর যোদ্ধৃগণ উপবিষ্ট। প্রত্যেক যোদ্ধার হস্তে এক একটী লম্বা বর্শা। বর্শার অগ্রভাগ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার লাল ধ্বজা উড়িতেছে। কটিতটে তরবারি দোদুল্যমান; উষ্ণীষ বহুমূল্য মুক্তা-খচিত—ঝালরের ন্যায় ঝলঝল করিতেছে।

ইহাদের মধ্যস্থলে অবস্থিত এক জন অপূর্ব্ব রূপবান্ পুরুষ—যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিকেয়। বয়ঃক্রম বাইশ বৎসরের অধিক হইবে কি? কচি কচি ঈষৎ গোঁফ উঠিয়াছে,—মুখ-কমলে যেন ভ্রমরপংক্তির সমাবেশ। তিনিও একটী ভীমকায় অশ্বে আরোহণ করিয়া আছেন। যেমন তাঁহার মুখশ্রী, অঙ্গে তাঁহার বসন-ভূষণও তদুপযুক্ত। লাল রঙের রেশমী বস্ত্রের উপর স্বর্ণ-মুক্তা-হীরক খচিত। সূর্য্যের আভা পতিত হওয়ায় তাহা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মনে হইতে লাগিল, স্বর্গ হইতে যেন স্বয়ং ইন্দ্র ভূতলে অবতরণ করিয়াছেন।

এই দলকে দেখিয়া মৌলবী সাহেব প্রভৃতি সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই সুপুরুষকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইলেন। এই সুপুরুষ আর কেহই নহেন,—ইনিই সেই শাসনকর্ত্তা গবর্ণর। ইনিই সেই নবাব সাহেব নামে কথিত, এবং আমার পক্ষে দণ্ডধারী কালস্বরূপ স্বয়মাগত।

আমি যে স্থলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলাম, সেই স্থলে নবাব সাহেব দুই জন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন। তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে উত্তম রূপ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এক জন প্রহরী আমার বন্ধন-শিক্‌লসমূহ শিথিল করিয়া দিয়া ভীমরবে কহিল—"খাড়া হো যাও।" আমার ওষ্ঠাগত-প্রাণ, উত্থানশক্তি এক রকম রহিত। কিন্তু কি করি, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম, এই বুঝি তোপে উড়াইবার বা নাসা-কর্ণচ্ছেদের হুকুম হইল। দুর্গতিনাশিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর নাম কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই নবাব—সেই গবর্ণর—দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আমাকে মধুর রবে তখন জিজ্ঞাসিলেন, "বাবু সাহেব! আপ্ কিয়া ক্যায়সে আয়ে?"

মৃত্যুকালে পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন শুনিয়া প্রকৃতই আমার চক্ষু স্থির হইল। মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িবার উপক্রম

হইলাম। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলাম, ইনি কে? কণ্ঠের স্বর যেন চিনি চিনি করিতেছি! হৃদয়ে আরও ভয়ের সঞ্চার হইল। সন্দিগ্ধ-চিত্তে আশঙ্কাই অগ্রগামী হইয়া থাকে। মনে হইল, এই নবাব সাহেব যখন আমাকে 'বাবু সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তখন তো ইনি আমার সকল বিষয়ই অবগত আছেন। আমি যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী নহি, ইহা আমার কথাবার্ত্তায় বা বেশভূষায় কেহ জানিতে সক্ষম হইবে না,—পূর্ব্ব-পরিচয় ভিন্ন আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার কাহারও শক্তি নাই। তবে এই নবাব সাহেব আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া কেমন করিয়া জানিলেন? ইঁহার সহিত কোথায় কোন্ সূত্রে পরিচয়? সে যাহা হউক, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি—ইনি আমার সকল বিষয়ই অবগত আছেন। তবে ত নিশ্চয়ই আমি ইঁহার নিকট ধরা পড়িয়াছি! নিতান্তই নিস্তার আর নাই।

এখনও জ্ঞানহারা হই নাই,—বিপদে অধীর হওয়া মূঢ়ের কাজ, এখনও এ বোধটুকু আছে। সাহসে ভর করিয়া নবাব সাহেবকে কহিলাম,—"আপনি কৃপা করিয়া যদি আর একটু নিকটে আসেন, তাহা হইলে দুই-একটী কথা আপনাকে বলি।" নবাব সাহেব তৎক্ষণাৎ আমার নিকটে আসিলেন এবং অন্যান্য সহচরবর্গকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। নবাব নিকটবর্ত্তী হইলে আমি অনিমেষ-লোচনে তাঁহার মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলাম। তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষুকোণে জল আসিল। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। ক্রমশঃ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সৌম্যমূর্ত্তি নবাব সাহেব ধীরে ধীরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, "বাবু সাহেব! কাঁদিবেন না, বড়ই সঙ্কটকাল। চোখের জল শীঘ্র মুছিয়া ফেলুন। কি হইয়াছে, কি ঘটিয়াছে, আমাকে সংক্ষেপে শীঘ্র বলুন।" আমি মৌলবী ফজল হকের নিকট 'চাপরাশী' বলিয়া যেরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলাম, সেই কথা বলিলাম এবং পথের অন্যান্য সকল সংবাদ তাঁহাকে কহিলাম। শেষে অতি বিনীতভাবে জানাইলাম, আমাকে এ যাত্রা আপনি রক্ষা করুন।

নবাব সাহেব আমাকে সাহস দিয়া বলিলেন, "বাবু সাহেব! পহিলে মেরা গরদান কোই কাটেগা, পিছে আপ্‌কা। আপ্ কুছ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।" অন্য কেহ শুনিতে না পায়, এরূপ অনুচ্চস্বরে তিনি আমাকে এই কথাগুলি বলিলেন।

পাঠক! এই নবাব সাহেব কে? তাহা চিনিতে পারিলেন কি? এই নবাব সাহেব আমার পূর্ব্বপরিচিত পরম বন্ধু। ইঁহার নিবাস বেরিলি। ইনি নবাব-বংশীয়। বিদ্রোহের পূর্ব্বে যখন বেরিলিতে আমি অশ্বারোহী দলের 'বড়বাবু' ছিলাম, তখন ইনি আমার বাসায় সর্ব্বদাই থাকিতেন। ইনি সেতার বাজাইতে সুনিপুণ ছিলেন—বড়ই হাত মিষ্ট ছিল; ইঁহার নাম চুন্না মিঞা—যিনি গবরমেণ্ট-প্রদত্ত সামান্য মাসহারা পাইয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন, যিনি আমাকে সেতারে পরিতুষ্ট করিয়া আমার নিকট হইতে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য পাইতেন,—মাসে মাসে যাঁহাকে আমি উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদান করিতাম,—যিনি নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি হাফিজ নিয়ামৎ খাঁর পুত্র,—সেই চুন্না মিঞা এক্ষণে এ প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা—এ প্রদেশের নবাবস্বরূপে অধিষ্ঠিত।

সেই চুন্না মিঞা আমার নিকট হইতে অতি দ্রুতপদে মৌলবী ফজল হকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ঐ বাদীকে চিনি, ঐ ব্যক্তি ভাল মানুষ, বেরিলিতে চাপরাশীর কাজ করিত এবং সঙ্গতিপন্ন ছিল। উহার ভ্রাতা নাইনিতালে আছে, ইহা আমি জানি। তাই ও ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে যাইতেছিল। রসদ পৌঁছিবার সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। এ ব্যক্তি বিশ্বাসী এবং মুসলমান রাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।" এইরূপ নানা কথা চুন্না মিঞা ফজল হককে বুঝাইয়া বলিলে, ফজল হক কহিলেন, "হুজুর! আপ মালিক হ্যায়, যো আপ জানতেহেঁ তো ছোড় দিজিয়ে।"

সৈন্যাধ্যক্ষ ফজল হক এই কথা বলিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সর্দ্দারগণও প্রস্থান করিলেন। বোধ হয় ক্ষুব্ধ মনে ঘরে পৌঁছিয়া ইঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, "কোথায় তোপে আমার ধ্বংস হইবে, না, কোথায় আমি স্বচ্ছন্দে মুক্তিলাভ করিয়া বিজয়-শব্দে নবাব সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলাম।" এদিকে চুন্না মিঞা স্বহস্তে আমার শিকল খুলিয়া এক সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিতে বলিলেন। মুক্তিলাভের স্ফূর্ত্তিতে আমার দেহে যেন দ্বিগুণ বল সঞ্চয় হইল। আমি তখন লম্ফ দিয়া ঘোড়ার উপর উঠিলাম, উভয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে এক ঘণ্টা মধ্যে চুন্না মিঞার আলয়ে উপস্থিত হইলাম।

তের

চুন্না মিঞার আবাস-ভবনে, দিব্য এক প্রকোষ্ঠে স্প্রীঙের গদী-আঁটা এক শোফায় আমি উপবেশন করিলাম। এক জন ভৃত্য আসিয়া এক বৃহৎ পাখা হস্তে লইয়া আমাকে বাতাস করিতে লাগিল। মৃদু-মন্দ বায়ু সেবনে আমার দেহ-প্রাণ শীতল হইল। আলস্য বোধ হওয়ায় শুইয়া পড়িলাম। গদী আমার দেহকে যেন গিলিয়া রহিল। গৃহটী বেশ সুসজ্জিত। মেঝের উপর সর্ব্বনিম্নে কি পাতা আছে জানি না, বোধ হয় দম্মার মত কোন দৃঢ় জিনিষ হইবে। তাহার উপর মাদুর পাতা। তদুপরি সতরঞ্চ। সর্ব্বশেষে লাল টকটকে বনাত বিছানো। অদূরে একটী টেবিল এবং তাহার চারি ধারে চারিখানা চৌকি। দুই-চারিখানি ছবিও টাঙানো আছে। এইটী চুন্না মিঞার অর্থাৎ গবর্ণর সাহেবের প্রাইভেট্ বৈঠক-গৃহ।

এই বৈঠকখানা কিসের বলিতে পারেন? ইটের, মাটীর, না কাঠের? কিছুরই নয়, ইহা কাপড়ের তাঁবু।

হলদোয়ানি—পর্ব্বতময় জঙ্গলপূর্ণ দেশ; নাইনিতাল পাহাড়ের নিম্নতলে অবস্থিত। এখানে লোকের বসবাস নাই, থাকিবার মধ্যে আছে এক বাজার। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে তথায় উপস্থিত হইয়া বেচা-কেনা করে। বাজারের নিকট এক ডাক-বাঙ্গলা পূর্ব্বে ইংরেজের অধিকৃত ছিল, এখন মুসলমানের হাতে আসিয়াছে। বাজারের সম্মুখে অদূরেই ইংরেজ আমলের তহশীলদারের কার্য্য-গৃহ। এক্ষণে মৌলবী ফজল হক্ তথায় বাস করিতেছেন। বাজারের কতকগুলি খোলার ঘর, ডাক-বাঙ্গলা, তহশীলগৃহ। ইহা ছাড়া হলদোয়ানিতে আর বাসোপযোগী গৃহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে ঝোপে ঝাপে এ দিকে ও দিকে দুই-এক জনের গৃহ দৃষ্ট হইত এই মাত্র। অধিকাংশ সৈন্যই তাঁবুর ভিতর বাস করিত। যাহাদের তাঁবু জোটে নাই, তাহারা বৃক্ষতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। চুন্না মিঞা বাজারের কিছু দূরবর্ত্তী স্থানে পরিষ্কৃত উচ্চভূমি নির্ব্বাচিত করিয়া, তথায় তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জন্য প্রায় ১৫।১৬টি ছোট-বড় তাঁবু পড়িয়াছিল। একটী তাঁবুতে তাঁহার শয়ন-ঘর, অপরটিতে রসুই-ঘর, আর একটীতে স্নানাগার। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাঁবুটীতে দরবার হইত। যে তাঁবুটীতে আমি আছি, ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং এটী তাঁহার খাস বৈঠকখানা। চুন্না মিঞার

শরীররক্ষক সিপাহী-শান্ত্রী এবং দাস-দাসী প্রভৃতির সংখ্যা আজ কে গণনা করিবে? প্রত্যহ সন্ধ্যার পর চুন্না মিঞার চিত্ত-বিনোদার্থ এই বৈঠকখানায় সুন্দরী নর্ত্তকীবৃন্দ নৃত্যও করিয়া থাকে।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, কালের কি বিচিত্র গতি! মরুভূমে হঠাৎ জলাশয় দেখা দিল! হঠাৎ তাহাতে আবার পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইল! অমানিশা জ্যোৎস্নাময়ী হইল! যে চুন্না মিঞা ইতিপূর্ব্বে টো-টো কোম্পানীর ডিরেক্টর ছিল, দরিদ্রের পূর্ণ লক্ষণ যাহার মুখে অঙ্কিত হইয়াছিল, একটী টাকা পাইলে যে একটী মোহর বলিয়া বিবেচনা করিত, সেই চুন্না মিঞা আজ কেন হঠাৎ এরূপ ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত হইল? কেন এত হয়-হস্তি-জনগণের এবং বিষম বিভবের অধিকারী হইল? ভোগ-বিলাসিতা মূর্ত্তিমতী হইয়া আজ কেন তাহার চরণ-যুগল আজ্ঞাকারিণী ক্রীতদাসীর ন্যায় সতত সেবা করিতে অনুরক্ত হইতেছে? কিসে কি হয় তাহা বুঝি না,—কাহার অদৃষ্টে কখন কি ঘটে, তাহাও জানি না। মহামায়ার এই অপরূপ মায়াজাল ভেদ করিতে কে সমর্থ?

প্রকৃতই বিধাতার বিচিত্র বিধান বুঝা ভার। বন্দী হইয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া, আমি একটীবারও অন্তরের সহিত ভাবিতে সক্ষম হই নাই যে, আজ আমি রক্ষা পাইব। তোপের রক্তবর্ণ বৃহৎ গোলাকার গোলা আসিয়া আমার বক্ষ ভেদ করিয়া ফেলিবে, আমার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণিত হইবে, ইহাই আমার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্র-বলে আমি রক্ষা পাইলাম। তাই বলিতে হয়, মহামায়ার মায়া-রহস্য বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই।

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় চুন্না মিঞা সেই বৈঠক-গৃহে আসিয়া বলিলেন, "সমস্ত প্রস্তুত, আসুন। উপস্থিত একটু সরবৎ এবং ফলমূল মিষ্টান্ন খাইয়া জলযোগ করুন।" আমি ঈষৎ চকিত হইয়া বলিলাম,—"জলখাবার কে আনিল? কে তৈয়ারী করিল এবং কোথাই বা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল?" চুন্না মিঞা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"সে সব কিছু ভয় নাই। আমার এই সৈন্যদল মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণও আছে। সেই ব্রাহ্মণ দ্বারাই আপনার আহারীয় সামগ্রীর সংযোগ হইয়াছে। চলুন, ঐ নিকটবর্ত্তী তাঁবুতে সমস্ত প্রস্তুত।"

আমি তথায় গিয়া জলযোগক্রিয়া সমাধা করিলাম। তৃষ্ণা দূর হইল। দেহে আরও একটু বল পাইলাম। মন তখন 'আরও কিছু খাই, আরও কিছু

খাই' করিতে লাগিল। চুন্না মিঞা জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবু সাহেব! এইবার অন্ন পাক করিবেন কি?" আমি বলিলাম,—"হাঁ, দুই দিবস অতীত হইল, আমি অন্নাহার করি নাই। কিছু ঘৃত, চাল এবং ডাল পাইলে খিচুড়ী রন্ধন করি।" চুন্না মিঞা বলিলেন,—"তাহার ভাবনা কি? সমস্ত সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছি, এই তাঁবুর পার্শ্বে রন্ধন করুন।" আমি দেখিলাম এখানে সকলই মুসলমানী ব্যাপার—মুরগী হাঁস চরিতেছে। প্রকাশ্যে কহিলাম,—"এখানে রসুই করিবার আমার সুবিধা হইবে না, অদূরে ঐ বৃক্ষতলে নিভৃত স্থানে আমি রন্ধন করিব।" চুন্না মিঞা কহিলেন,—"তবে তাহাই করুন।" যেখানে বিদ্রোহী সেনাগণ শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল, তাহার প্রান্তভাগে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় আহারের আয়োজন করিতে বলিলাম। সেইস্থানের নিকট দিয়া পর্ব্বতীয় ঝরণা ঝর ঝর করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই ঝরণার নিম্ন-প্রদেশ ইংরেজ বহু পূর্ব্বে প্রস্তর দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। বন্ধনের স্থান হইতে ঝরণাটি ক্ষুদ্র নদীর ন্যায় দুইটি মুখে দুই দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সেই নিভৃত মনোরম স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমত স্নান করিলাম। আমার পরিচর্য্যা ও সেবার জন্য চুন্না মিঞা চারি জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা বাজার হইতে নববস্ত্র আনিয়া দিল। আমি স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলাম। দেখিতে দেখিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, চাউল, ডাল, আলু, আটা ও অন্যান্য মসলাসমূহ আনীত হইল। মাটীর উনান তৈয়ারি হইল।

বলা বাহুল্য, আমার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রার্থনানুসারে টাটুওয়ালা ও সেই নবীন হিন্দুস্থানী যুবকেরও মুক্তিলাভ হয়। তাহারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। তাহারাও সেই পর্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীতে স্নান করিয়া সেই স্থানে রন্ধনের উদ্‌যোগ করিল। আমি টাটুওয়ালাকে কহিলাম,—"তোর আর স্বতন্ত্র রাঁধিবার আবশ্যক কি? তুই আমার প্রসাদ পাইবি।" সে জোড়হাতে উত্তর দিল,—"যে আজ্ঞে হুজুর।" আমি বিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক ভুনী-খিচুড়ী রন্ধন করিলাম। নিজের রন্ধন-সামগ্রীর প্রশংসা করিতে নাই, তথাচ বলিয়া রাখি, খিচুড়ী অতি চমৎকার হইয়াছিল। তোফা সুগন্ধযুক্ত ঘৃত, মসুরির ডালগুলি বড়ই পরিষ্কার ও মনোহর এবং স্বয়ং আমি পাচক। বুঝুন না কেন, ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল। এরূপ খিচুড়ীর কাছে পোলাও কোথা লাগে? ক্ষুধাও কিঞ্চিৎ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখ এই—এরূপ উৎকৃষ্টতর রন্ধন হইলেও, খিচুড়ী অধিক খাইতে পারিলাম না। দুই-চারি গ্রাস মুখে দিতেই মুখ কেমন

মরিয়া আসিল। শেষে স্রোতস্বিনীর সুস্বাদু জল এক ঘটি খাইয়া ফেলিলাম। পেট দমসম হইল। তার পর আরও দুই-চারি গ্রাস খিচুড়ী খাইলাম, কিন্তু আর ভাল লাগিল না। তখন অতি কষ্টে আরও দুই-এক গ্রাস খিচুড়ী উদরস্থ করিলাম। শেষে আসন হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া পান ও মসলা চিবাইতে লাগিলাম।

আমার পাতে প্রায় বার আনা খিচুড়ী মজুদ। টাটুওয়ালার জন্য হাঁড়িতেও যথেষ্ট খিচুড়ী ছিল। হাঁড়ির খিচুড়ীও টাটুওয়ালা আমার পাতে ঢালিল। দ্বিগুণ খিচুড়ীতে পাত উথলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। টাটুওয়ালা ইহজন্মে কস্মিন্‌কালে এরূপ শিক্ষিত পাচক দ্বারা প্রস্তুত, এরূপ সদ্‌গন্ধযুক্ত ঘৃত-সমন্বিত ভুনী-খিচুড়ী ভক্ষণ করে নাই। প্রায় ৪৮ ঘণ্টার পর ক্ষুধার্ত্ত টাটুওয়ালা এরূপ অপূর্ব্ব আহার পাইয়া শীঘ্র-হস্তে শুভকার্য্য সুসম্পাদন করিতে আরম্ভ করিল। আমি অনিমেষ-লোচনে একাগ্রচিত্তে যেন চিত্রিত ছবির ন্যায় টাটুওয়ালার সেই বীর-আহার সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় আড়াই প্রহর। যে চারি জন ব্রাহ্মণ আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে কহিলাম,— "তোমরা এখন স্বস্থানে যাও। রসুই করিয়া খাও। আমার আবশ্যক হইলে তোমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইব।" পিতলের বাসন, ঘটী, বাটী, থাল, সমস্তই তাহারা যোগাইয়াছিল। আমি বলিলাম, "ও বেলা আসিয়া এগুলি তোমরা লইয়া যাইও।"

তাহারা 'তথাস্তু' বলিয়া প্রস্থান করিল।

চোদ্দ

আমি বসিয়া বসিয়া এক দিকে টাটুওয়ালার আহার-কার্য্য সন্দর্শন করিতেছি, অন্য দিকে পর্ব্বতীয় ঝরণার শোভা নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় এক জন 'পাহাড়ী' পর্ব্বতবাসী ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার দক্ষিণ পদে লোহার বেড়ী সংলগ্ন। বাম পদের বেড়ীটী তাহার দক্ষিণ হস্তে অবস্থিত। সে নাইনিতাল পাহাড় হইতে এই মাত্র নামিয়া আসিয়াছে। আমি তাহার ভাবভঙ্গী মূর্ত্তি দেখিয়া, প্রথমত তাহার সহিত কোন কথা না কহিয়া তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সে ক্রমশঃ আরও আমার কাছে ঘেঁসিয়া

আসিল। ধীর স্বরে কহিল, "আপকা নাম তো দুর্গাদাস বাবু। আপ্‌কা সব হাল নাইনিতালকা সাহেবলোগো কোঁ মালুম হুয়া কি আপ্‌ পাকড় গয়ে। লেকেন জলদী কহিকো চলে যাইয়ে, কেঁও কি, আজ-কাল্‌মে সাহেবলোগ ধাওয়া করেঙ্গে।" এই কথা বলিতে বলিতে সে ব্যক্তি তীরের ন্যায় আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং যেখানে বিদ্রোহী সৈন্যদল অবস্থিতি করিতেছিল, তদভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়াই অনেক সৈন্য আগে-ভাগে তাহার নিকট দৌড়িয়া আসিল। আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া কেহ তাহাকে কাঁধে করিল, দুই বাহু দ্বারা কেহ তাহার অঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিল। ফল কথা সেই 'পাহাড়ীর' আদর অভ্যর্থনার কোনরূপ ত্রুটি রহিল না। আমি তো ব্যাপার দেখিয়াই অবাক্। এ ব্যক্তি কে? ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহা জানিবার জন্য তদভিমুখে এক-আধ পা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অবশেষে এক জন বয়োবৃদ্ধ তাহার বর্ত্তমান অবস্থার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, বলিল,—"ভাই! তোমার হাতে পায়ে বেড়ী কেন? তোমার এরূপ দৈন্যদশা কেন? এবং তুমি এত দিন এখানে আস নাই বা কেন?"

একটু পূর্ব্ব-ইতিহাস বলিয়া রাখি। এই আগন্তুক পর্ব্বতবাসী, বিদ্রোহী সিপাহীদের গুপ্তচর ছিল। নাইনিতাল পর্ব্বতস্থ ইংরেজগণের গতিবিধি বল-বিক্রম সমস্তই গুপ্তভাবে জানিয়া আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে বলিয়া দিত।

'পাহাড়ী' বয়োবৃদ্ধ সিপাহীর কথার এইরূপ উত্তর দান করিল,—"আমি তোমাদের যে গুপ্তচর এব আমি তোমাদের সদাই যে সহায়তা করিয়া থাকি, হঠাৎ এক দিন ইংরেজ এ বিষয় জানিতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে বন্দী করিয়া ভীষণ কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু হলদোয়ানিতে নবাব সাহেবের পাঁচ হাজার ফৌজ আসিয়াছে শুনিয়া, ইংরেজগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া নাইনিতাল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সুযোগে বন্দীরাও জেলখানা ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বন্দীরা এখন স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়াছে। তোমরা এখন নিরাপদে নাইনিতালে যাও। সম্ভবত সেখানে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া বিদ্রোহী সেনাগণ চতুর্গুণ আহ্লাদিত হইল। কোন্ দল নাইনিতাল অভিমুখে অগ্রসর হইবে, তাহারই পরামর্শ হইতে লাগিল। কিন্তু মজা এইটুকু, কোন দলই অগ্রগামী হইতে সাহস করিল না। অশ্বারোহী সৈন্যেরা পদাতি সৈন্যদলকে এইভাবে একবাক্যে কহিতে লাগিল,—"ভাই!

তোমরা অগ্রবর্ত্তী হও।" পদাতি সৈন্যেরা এ কথার এই উত্তর দিল,—"তোমরাই অগ্রবর্ত্তী হও না কেন?" ফল কথা, এই বিষয় লইয়া উভয় দল মধ্যে বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল,—হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, চীৎকার, চপেটাঘাত পর্য্যন্ত আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, সে স্থানে উচ্চদরের কোন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন না।

আমার হৃদয় বিস্ময়, কৌতূহল ও ঔৎসুক্যে পূর্ণ হইল। এই লোকটা কে? আমার নাম জানিল কিরূপে? আমাকে চিনিলই বা কিরূপে? আমাকে আমার মনোমত মঙ্গলময় কথা বলিয়া আসিল; আবার বিদ্রোহীদের নিকট গিয়া উহাদের হৃদয়রোচক সুখময় কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না, এ সকল সত্য সত্যই সত্য ঘটনা?

দেখিতে দেখিতে সেই 'পাহাড়ী' সেনাদল মধ্যে মিশিয়া গেল। আমিও ভাবিতে ভাবিতে সেই নির্ঝরিণীতটে এক বৃহৎ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলাম। হৃদয় সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তখন রহস্য ভেদ করিতে কিছুতেই সমর্থ হইলাম না।

পাঠকগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। এই ছদ্মবেশী বহুরূপিবৎ পর্ব্বত-বাসী কে? পরে যাহা আমি জানিয়াছিলাম, তাহা আপনারা এখনই সংক্ষেপে শুনুন। প্রকৃতই 'পাহাড়ী' ইতিপূর্ব্বে বিদ্রোহীদিগের গুপ্তচর ছিল; পাহাড়ে যাইবার রাস্তাঘাট এবং সেখানে কি হইতেছে, কি না হইতেছে, ইংরেজেরা কিরূপ উদ্‌যোগ করিতেছে, কিরূপে রসদ সংগ্রহ করিতেছে, এ ব্যক্তি সে সকল সংবাদ যথানিয়মে বিদ্রোহিগণকে আনিয়া দিত। এ কথা ক্রমশঃ নাইনিতালস্থ ইংরেজদের কর্ণগোচর হয়। ঐ পাহাড়ী গুপ্তচরের স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতিও পাহাড়েই থাকিত। এক দিন সে পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ইংরেজ-সেনা কর্ত্তৃক ধৃত হয় এবং সপরিবারে বন্দী হইয়া ইংরেজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। শেষে ইংরেজের সহিত ঐ পাহাড়ীর এই সর্ত্ত হইয়াছিল যে, যদি সে ব্যক্তি বিদ্রোহীদের কত সৈন্য, কত কামান, কত গোলা-গুলি, কত অস্ত্র আছে, তাহা জানিয়া আসিয়া বলে এবং প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক বিদ্রোহিগণকে নাইনিতালের রাস্তায় আনিতে পারে, তাহা হইলে সে সপরিবারে মুক্তিলাভ করিবে, নতুবা নহে। বিদ্রোহিগণকে ছলনা দ্বারা ভুলাইবার জন্য সে এক-গাছি বেড়ী পায়ে দিয়া এবং একগাছি বেড়ী হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সে যেন বেড়ী ভাঙ্গিয়া কারাগার হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আমি

যে ইংরেজের লোক এবং বিদ্রোহীদের হাতে পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি, তাহা সে পূর্ব্বেই জানিত এবং ইংরেজের মুখে আমার আকার-প্রকার মূর্ত্তির বিষয় সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। ঐ পাহাড়ী বড়ই ধূর্ত্ত এবং বুদ্ধিমান বলিয়া আমাকে চিনিয়া পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনার নাম তো দুর্গাদাস বাবু!" এক্ষণে অদ্য সে ইংরেজের পক্ষ হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবেই বিদ্রোহীদিগকে ঠকাইতে আসিয়াছে।

পনর

সকলেরই আহার শেষ হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী যুবক, টাটুওয়ালা এবং আমি, তিন জনেই খরবেগে চুন্না মিঞার বৈঠক অভিমুখে চলিলাম। টাটুওয়ালা আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিয়া চলিতে একান্তই অক্ষম। পেট যদি ফুটি-জাতীয় হইত, তাহা হইলে টাটুওয়ালার পেট অদ্যই ফাটিয়া যাইত। আমি হাসিয়া বলিলাম,—"পরের সামগ্রী বলিয়াই কি এত খাইতে হয়?"

তাঁবুর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভৃত্য-দ্বারা আমার আগমনবার্ত্তা চুন্না মিঞাকে জানাইলাম। আমি ভিতরে গেলাম। হিন্দুস্থানী এবং টাটুওয়ালা তাঁবুর বাহিরে রহিল। প্রবেশ মাত্র আমাকে চুন্না মিঞা বিশেষ অভ্যর্থনাপূর্ব্বক এক চৌকির উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পেট ভরিয়াছে ত? এ জঙ্গল-দেশ, এখানে খাবার জিনিষ ভাল মিলে না।" আমি আপ্যায়িতভাবে বলিলাম,— "পেট খুব ভরিয়াছে, জিনিষের অভাব কি? ঘৃত অতি চমৎকার। এরূপ সুগন্ধময় ঘৃত বেরিলিতেও সহসা মিলে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" চুন্না মিঞা কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কেবল আপনার সৌজন্য। সে যাহা হউক, আপনার জন্য অদ্য হৃষ্ট-পুষ্ট নবীন নধর দুইটী ছাগল যোগাড় করিয়াছি এবং আপনার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে দুইটা তাঁবুও ফেলাইয়াছি, আর, রন্ধনের জন্য এক জন পাচক ব্রাহ্মণও নিযুক্ত করিয়াছি। আপনি পথে বহু কষ্ট পাইয়াছেন। পাঁচ-সাত দিন এখানে থাকুন, বিশ্রাম করুন এবং এখানে সুস্থির হউন।" আমি বলিলাম, "এ সকলই আপনার অনুগ্রহ। আপনি অদ্য আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আমার নিকট

পরম পূজনীয় দেবতাস্বরূপ। আপনার আজ্ঞা সর্ব্বসময়েই শিরোধার্য্য। কিন্তু আমার বক্তব্য এই, অদ্যই আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব, তাই আপনার অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি।"

চুন্না মিঞা হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"তাও কি কখন হয়! এখনও আপনার পায়ের ব্যথা মরে নাই, পৃষ্ঠদেশের বেত্রাঘাত-ক্ষতও শুষ্ক হয় নাই। বিশেষ অদ্য আপনার জন্য আমি তয়ফা-নাচের বন্দোবস্ত করিয়াছি। এই পর্ব্বতীয় প্রদেশের রমণীগণ পরমা সুন্দরী। তাহাদের একবার হাবভাবযুক্ত নর্ত্তন দেখিলে, তাহা আর ইহজন্মে ভুলিতে পারিবেন না। নর্ত্তকীর নৃত্য ব্যতীত দিল্লী হইতে এক জন সঙ্গীত-অভিজ্ঞ ওস্তাদ আসিয়াছেন। তিনি সেতারে সিদ্ধহস্ত। নাচ শেষ হইলে তাঁহার সেতার বাজনা আরম্ভ হইবে। এরূপ নৃত্য-গীত ছাড়িয়া, এরূপ ঐশ্বর্য্য-সমারোহ ছাড়িয়া, আপনি একাকী পদব্রজে এই বর্ষাকালে বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ দিয়া কোথা যাইবেন বলুন দেখি? আর এ দিকে সন্ধ্যা সমাগত হইবার অধিক দেরি নাই। আকাশে মেঘও রহিয়াছে। দিব্য স্বচ্ছন্দে কিছু দিন এখানে কালাতিপাত করুন,—কোথা যাইবেন?"

আমি দেখিলাম,—ঘোর বিপদ্। ও দিকে ইংরেজের গুপ্তচর পাহাড়ী আজ আমাদিগকে এ স্থান ত্যাগ করিতে কহিয়াছে। এ দিকে চুন্না মিঞা আমাকে এখানে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। কি করি, কোন্ দিক্ রাখি? ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম, এখানে কিছুতেই থাকা হইবে না। বিশেষ কাতরতা দেখাইয়া চুন্না মিঞাকে কহিলাম, "আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাকে গমনের অনুমতি দিন। আমার মন চঞ্চল হইয়াছে। আমি কিছুতেই এ স্থানে তিষ্ঠিতে পারিব না। ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। আমি জোড়হাতে বলিতেছি,—আপনি আমাদের অদ্যই বিদায় দিন।" চুন্না মিঞা কহিলেন, "বাবু সাহেব! আপনি এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন? যদি এ স্থান ত্যাগ করাই আপনার একান্ত অভিমত হইয়া থাকে, তবে আজিকার রাত্রিটা থাকিয়া কল্য প্রাতে যাইবেন।"

আমি। যদি শুভ অনুমতিই হইল, তবে আর এখানে কালবিলম্ব করিতে বলিবেন না।

চুন্না মিঞা। আপনি যাউন, তাহাতে কোন আপত্তি করি না, কিন্তু আশঙ্কা এই,—পথে কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে। নিয়তি আপনাকে টানিতেছে, নচেৎ আমার অনুরোধ আপনি উপেক্ষা করিবেন কেন? এই

দুর্গম পথে বাঘ, ভালুক এবং বন্য হস্তীর ভয় তো আছেই, ইহা ব্যতীত দুরন্ত দস্যুদল অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সদাই ঘুরিতেছে। বিশেষ এই বর্ষাকালে বন-জঙ্গলে পথ-ঘাট সমস্তই পূর্ণ হইয়াছে, তথাচ আপনি এই অবেলায় সন্ধ্যার প্রাক্কালেই যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। তাই বলি, নিতান্তই নিয়তি আপনাকে টানিতেছে।

আমি। (হাসিয়া) বিপদে আর বড় ভয় করি না। আজ যখন আমি তোপের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তখন আমি যে সহসা মরিব, এ বিশ্বাস আমার হয় না।

চুন্না মিঞা। আপনি এখন কোন্ দিকে যাইবার অভিলাষ করিয়াছেন? যে দিকে যাউন, আমার নিকট হইতে 'রাহাদারী-পরওয়ানা' লইয়া যাইবেন, নচেৎ আমাদের লোক দ্বারাই পথে পুনরায় উৎপীড়িত হইতে পাবেন।

আমি। নাইনিতালের পথে যাইব।

চুন্না মিঞা। (সবিস্ময়ে) না! না! না! তাহা হইতে পারে না। নাইনিতাল পথে যাইবার জন্য পাস আমি কখনও দিতে পারি না। অন্য অন্য সেনাপতিগণ ইহাতে সন্দেহ করিবেন। এক্ষণে আপনি হয় বেরিলি ফিরিয়া যাউন, অথবা কাশীতে,—যেখানে আপনার মাতা স্ত্রী প্রভৃতি আছেন, সেখানে চলিয়া যাউন।

চুন্না মিঞা এক জন মুন্সীকে ডাকাইলেন, তাহাকে রাহাদারী-পরওয়ানা লিখিতে বলিলেন। শেষে সেই পরওয়ানায় স্বয়ং দস্তখত করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"আপনি বহেড়ী হইয়া পুনরায় বেরিলিতে গমন করুন, ইহাই আমার সৎপরামর্শ।"

আমি অগত্যা তাঁহার এই কথাই স্বীকার করিলাম।

গত পরশ্ব বন্দী হইয়া আসিবার সময় পথে যে এগারটী মোহর আমি বৃক্ষ-মূলের নিকট পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম, এক্ষণে সে কথা স্মরণ হইল। বহেড়ীর রাস্তা দিয়া বেরিলি যাইতে হইলে, আর আমাকে সেই পূর্ব্বপথে যাইতে হইবে না। সুতরাং মোহর কয়েকটী কেমন করিয়া সংগ্রহ করি, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। চুন্না মিঞার নিকট বহির্দেশে যাইবার ভাণ করত লোটা-হস্তে মোহরের অনুসন্ধানে গেলাম। কিন্তু পূর্ব্বপরিচিত বটবৃক্ষটী এক্ষণে চিনিয়া লওয়া আমার পক্ষে ভার হইল। সে দিন রাত্রে বন্দী হইয়া যাইবার সময় কেবল কয়েকটী মাত্র ডাল-পালাবিহীন বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম। এক্ষণে

দেখি, প্রায় সকলগুলারই এক দশা—শাখা-পল্লববিহীন ভ্রষ্টশোভা হইয়া রহিয়াছে। আমি পূর্ব্ব বৃক্ষটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রায় এক মাইল পথ চলিয়া গেলাম। তথাপি গাছটা চিনিতে পারিলাম না। কেমন আমার ভ্রম জন্মিল। শেষে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হঠাৎ সেই বৃক্ষটী চিনিতে পারিয়া তাহার মূল দেশ খননান্তর কাপড়ে বাঁধা মোহর কয়টী সংগ্রহ করত পূর্ব্বের ন্যায় মুষ্টির মধ্যে রাখিলাম। পুনরায় চুন্না মিঞার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করত বহেড়ীর রাস্তায় চলিলাম।

আমরা অৰ্দ্ধ মাইল পথও অতিক্রম করি নাই, এমন সময় পথিমধ্যে দেখিলাম, নবাবের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন মুসলমান সিপাহী আসিতেছে। আমাদের তিন ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন কড়া সুরে বলিল,—"তোমরা কোথায় যাইতেছ?" আমি রাহাদারী পরওযানা দেখাইযা বলিলাম,—"আমরা বেরিলি যাইতেছি, নবাব সাহেবের ইহাই হুকুম।"

যে মুসলমান সিপাহীর হস্তে আমি পরওযানাটী দিলাম, সে লেখা-পড়া জানে না। সে হাস্য করিয়া বলিল,—"ইহা জাল পরওয়ানা। তোমরা মিথ্যাবাদী এবং চোর। তোমরা এই টাটু চুরি করিযা লইয়া পলাইতেছ।" আমি বলিলাম,—"এ টাটু আমি বেরিলি হইতে ভাড়া করিযা আনিয়াছি।" টাটুওয়ালার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "ইহা এই ব্যক্তির টাটু।" মুসলমান সিপাহী বলিল,—"তুই বেটা চোর, বদ্‌মাইস, হলদোয়ানিতে লইযা গিয়া তোকে তোপে উড়াইব, চল্ আমার সঙ্গে।"

তখন কয়েক জন সিপাহী আমায় পুনরায বাঁধিল। উত্তম-মধ্যম দুই-চারি ঘা প্রহারও করিল। আমি নীরব। সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। টাটুওযালা এবং হিন্দুস্থানী যুবক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাহারা আমাকে লইযা চুন্না মিঞার নিকট উপস্থিত হইল। আমাকে পুনরায় বন্ধন-দশায় দেখিয়াই চুন্না মিঞার চক্ষু স্থির। ক্রোধ-ভরে ভ্রূভঙ্গী করিযা দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিযা তিনি মুসলমান সিপাহীগণকে বিস্তর গালি দিলেন। তাহার শরীর-রক্ষক সৈন্য আসিয়া আমার বন্ধন খুলিয়া দিল। তৎপরে চুন্না মিঞা আমার নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আরও রুষ্ট হইলেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত রাহাদারী পরওয়ানা অমান্য করার জন্য প্রত্যেক সিপাহীর প্রতি পঁচিশ পঁচিশ বেতের হুকুম হইল। সিপাহীগণ পলায়মান টাটুচোর ধরিয়া আনিযাছে, নিশ্চযই নবাব সাহেবের নিকট পুরস্কৃত

হইবে, এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া তাহারা প্রফুল্লমনে আমাকে চুন্না মিঞার নিকট হাজির করিয়াছিল, কিন্তু পুরস্কার তাহারা যা পাইল তাহা অন্যরূপ।

ষোল

নবাব সাহেবের নিকট আবার আমি বিদায় চাহিলাম। নবাব সাহেব ক্ষুণ্ণমনে বিদায় দিয়া কহিলেন, "খোদা আপনাকে রক্ষা করুন।" আমি ভাবিতে লাগিলাম, চুন্না মিঞার বোধ হয় কিছু রাগ হইয়া থাকিবে, নচেৎ এবার আমাকে এখানে থাকিতে বলিল না কেন? বলা বাহুল্য, থাকিতে বলিলেও কিছুতেই আমি থাকিতাম না। সেই পাহাড়ী গুপ্তচরের কথাই এক একবার মনে পড়ে, আর পলাইবার জন্য মন ব্যাকুল হয়।

দুর্গা দুর্গা স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। তখন দিবা অবসানপ্রায়। সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করত অস্তাচল-শিখরে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিলেন। সেই মহাবনের দীর্ঘ দীর্ঘ তরুশিরে অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের স্বর্ণপ্রভা ছড়াইয়া পড়িয়া কতই রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। হু হু শব্দে বায়ু চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অঙ্গের বসন অঙ্গে রাখা ভার হইয়াছে। আমি আঁটিয়া সাঁটিয়া মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া বীরবেশ ধারণ করিলাম। হলদোয়ানি হইতে বহেড়ী দিয়া বেরিলি যাইবার রাস্তা কাঁচা। এ পথ দিয়া সর্ব্বদা লোক যাতায়াত করে না বলিয়া পথটি এত ঘাস ও কণ্টকময় এবং লতা-গুল্মে এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, রাস্তা চলা বড় কঠিন। তাহার উপর দুই পার্শ্বে নিবিড় অরণ্য। বৃক্ষশাখায় পথ এরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, রাত্রের কথা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও রাস্তা ভাল দেখিতে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ সূর্য্যের আলো ছিল, ততক্ষণ পথ চিনিয়া চিনিয়া এক প্রকার কষ্টে-শ্রেষ্টে আমরা যাইতে-ছিলাম। কখনও কাঁটাবন ডিঙ্গাইয়া, কখনও ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া, কখনও বা হোঁচট খাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে ঘোর গভীর অন্ধকার আসিয়া দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। এক্ষণে রাস্তা চলা প্রকৃতই কঠিন হইয়া উঠিল। পথ তো নয়নগোচর হইল না, কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আন্দাজে অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় পথ চলিতে লাগিলাম। আকাশে চন্দ্র নাই, মেঘ-মালার উদয়ে আকাশে তারকা-মালাও নাই। আর

অবনীতে আমার নিকটও কোনরূপ আলোক নাই। ঘন-সন্নিবিষ্ট সূচীভেদ্য নীরন্ধ্র চাপ চাপ অন্ধকার ভূতের ন্যায় বিভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে যেন গিলিতে আসিতে লাগিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি যে, হিন্দুস্থানী যুবকটী আর নাই। তার নাম ধরিয়া তখন কত ডাকিলাম, তথাচ কোন উত্তর পাইলাম না। বাঘে লইয়া গেল না কি? বাঘে লইলে শব্দ হইত, বাঘের গর্জ্জন এবং হিন্দুস্থানী যবকের আর্ত্তনাদ উভয়ে একত্রে মিশিত। অবশ্যই আমি জানিতে পারিতাম। আমাদের গতিক দেখিয়া আরও ভাবী বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া হিন্দুস্থানী যবক নিশ্চয়ই পলাইয়াছে, ইহাই স্থির করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে আমি অগ্রগামী ছিলাম, টাটুওয়ালা টাটুর বল্গা ধরিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। পাছে টাটুওয়ালাও পলায়, এই ভয়ে টাটু-ওয়ালাকে অগ্রগামী করিয়া আমি পশ্চাদ্ভাগে আসিলাম। এইবার এক ঘোর বিপদে পতিত হইলাম। টাটুওযালার একরূপ চলচ্ছক্তি রহিত হইল। পাঠকগণ জানেন, অদ্য আমি যে খিচুড়ী পাক করিয়াছিলাম, তাহা আমি অধিক আহার করিতে পারি নাই, অধিকাংশই সেই টাটুওয়ালার উদরস্থ হইয়াছিল। সে ইতর লোক, এ প্রকার মসলা-সংযুক্ত ঘৃতপক্কের জিনিষ ইহ-জন্মে কথনও খায় নাই। লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত খিচুড়ী খাইয়াছিল। সুতরাং পথে তাহার পেটের পীড়া উপস্থিত হইল। প্রায় প্রতি দশ মিনিট অন্তর তাহার দাস্ত হইতে আরম্ভ হইল। আমি প্রমাদ গণিলাম। আকাশ পানে চাহিয়া ভগবানকে ডাকিলাম,—"প্রভু দয়াময়! বিপদের উপর আবার এ কি বিপদ্ ঘটাইয়া দিলে? এ পীড়িত টাটুওয়ালাকে লইয়া পথ চলিব কেমন করিয়া? এইরূপে খানিক খানিক যাই, আর টাটু-ওযালার জন্য খানিক খানিক দাঁড়াইয়া থাকি।

হলদোয়ানি হইতে প্রায় পাঁচ মাইল আমরা অতিক্রম করিয়াছি। রাত্রি বোধ হয় আট ঘটিকা হইয়া থাকিবে। এমন সময় নিবিড় জঙ্গল মধ্যে শুষ্ক পত্রের খশ্ খশ্ শব্দ হইতে লাগিল। আমার বোধ হইল বুঝি কোন বন্য জন্তু আসিতেছে। বুঝি বাঘ বা ভালুক মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া আহারার্থ অগ্রসর হইতেছে। বড় বাঘ হইলে নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব, ইহাই স্থির করিলাম; কারণ আমার নিকট কোনরূপ আগ্নেয় অস্ত্র নাই। আমার নিকট যে রিভলভারটি ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। কেবল এক সরু লাঠি দ্বারা বাঘের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু বিনা যুদ্ধে কথনই প্রাণ দেওয়া হইবে

না, ইহা ভাবিয়া ব্যাঘ্রের আগমন প্রতীক্ষাপূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। অতি অল্পক্ষণ পরেই আমার সেই ব্যাঘ্র-ভ্রম দূর হইল। সবিস্ময়ে সম্মুখে দেখিলাম,—কৌপীন মাত্র পরিহিত, অতি ভীষণ আকার, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছয় জন দস্যু সুদীর্ঘ লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান। তাহাদের মধ্যে এক জন আমাকে জিজ্ঞাসিল,—"তুম্ লোগ্ কোন্ হো ? কাঁহা যাতে হো ?"

আমি। নবাব সাহেবের হুকুমে আমি বহেড়ী যাইতেছি।

দস্যু। তেরে পাস্ কেয়া হ্যায় ?

আমি। কিছুই নাই ; তবে এই টাটুর উপর আমার জিনিসপত্র আছে, কিন্তু টাটুটী আমার নহে।

এই বলিয়া আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি টাটুটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু টাটুওয়ালা কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে তাহার আর স্থিরতা নাই। আমি তাহার নাম ধরিয়া দুই-চারিবার ডাকিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইলাম না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ধুম্ করিয়া বজ্রোপম এক লাঠি আমার পিঠে পড়িল। দারুণ আঘাতে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি তখন কুস্তি করিতাম, দেহের বাঁধুনি খুব দৃঢ় ছিল, সেইজন্য তৎকালে সেই বিষম লাঠি খাইয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমি মধুর রবে জোড়হাতে দস্যুগণকে কহিলাম, "ভাই ! তোমরা আমাকে মার কেন ? মারিয়া কোন লাভ আছে কি ? যদি কোন পথিক তাহার নিকট যাহা আছে তৎসমস্তই দিতে চাহে, তবে তাহাকে মারিতে নাই, এরূপভাবে মারিলে তোমাদের ধর্ম্মহানি হয়। আমার কাছে যাহা আছে সর্ব্বস্বই তোমাদিগকে দিতেছি, গ্রহণ কর। কিন্তু কোন্ ধর্ম্মানুসারে আমাকে প্রহার করিতে চাও বল।"

এই সকল কথা বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে বলিতে দস্যুদিগের মন যেন একটু নরম হইল। বিশেষ, ধর্ম্মের কথায় পাষাণও গলিয়া যায়। দস্যুগণ আর আমাকে প্রহার করিল না। তাহারা প্রথমে টাটুর পৃষ্ঠস্থিত জিনিষপত্র সমস্ত গ্রহণ করিল। চাদর, লোটা, কম্বল, কয়েকখানি কাপড়, চলদোয়ানি হইতে আনীত চুন্না মিঞার প্রদত্ত ঐ সকল জিনিষ লইয়া তাহারা পরিতুষ্ট হইল না। তাহারা ভাবিল,—আমি যখন টাটু ভাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছি, তখন আমি এক জন অবশ্যই মহাজন বা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি হইব। তাহারা 'দেহ তল্লাসী' লইবার জন্য আমার নিকটবর্ত্তী হইল, বলিল—"তোমার নিকট যে টাকাকড়ি আছে, দাও।" আমি বলিলাম,—"আমি সত্যই

বলিতেছি, আমার নিকট কিছুই নাই।” তাহারা বলিল,—“তুমি কাপড় খুলিয়া দেখাও, অবশ্যই তোমার নিকট টাকা আছে।”

আমার গায়ে এক হিন্দুস্থানী আঙ্গরাখা ছিল, মাথায় হিন্দুস্থানী পাগড়ী, পরিধানে হিন্দুস্থানী ধরণের কাপড়; তবে সে কাপড় আমি কুস্তিগীর জোয়ানের ন্যায় আঁটিয়া পরিয়াছিলাম। কোমরে থানের এক চাদর জড়ান ছিল। হল-দোয়ানি হইতে যাত্রাকালে পান্নাপ্রদত্ত নেকড়ায় বাঁধা সেই এগারটি মোহর পকেটে রাখিয়াছিলাম। বনমধ্যে দস্যুদলকে দূর হইতে দেখিয়াই আমি সেই মোহর কয়টী হাতে লইয়াছিলাম। এক জন দস্যু আমার মাথার পাগড়ী উঠাইয়া লইল। এক জন দস্যু আসিয়া আমার আঙ্গরাখা খুলিবার উপক্রম করিল।. আমি দেখিলাম, এইবার বুঝি ধরা পড়িতে হয়। এইবার বুঝি মোহর কয়টি মেঘ-মুক্ত মিহিরের ন্যায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমার অঙ্গ হইতে আঙ্গরাখা খুলিবার সময় একটু গোলযোগ হয়; এই সুবিধা বুঝিয়া আমি কাপড়ে বাঁধা মোহর ক'টি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া, দক্ষিণ পদ দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিলাম। অন্ধকার ছিল বলিয়া দস্যুগণ তত লক্ষ্য করিতে পারিল না। আমি বলিলাম,—“ভাই! তোমরা আঙ্গরাখা লইয়া এত টানাটানি করিতেছ কেন? টানাটানিতে উহা ছিঁড়িয়া যাইবে, সুতরাং তোমাদের কোন কাজে আসিবে না। ক্ষান্ত হও, আমি খুলিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া আঙ্গরাখা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দস্যুর হস্তে অর্পণ করিলাম। একে একে অঙ্গের সমস্ত বসনই দূর হইল,—রহিল কেবল পরিধানের একমাত্র কাপড়। দস্যুগণের সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য বস্ত্রগ্রন্থি শিথিল করিয়া, কাপড় ঝাড়া দিয়া দেখাইয়া বলিলাম,—“দেখ ভাই! আমার কাছে কিছুই নাই। আমি গরীব লোক, আমার কাছে থাকাও সম্ভব নহে।” আমি যেমন পুনরায় কাপড় পরিতে যাইব, অমনি হঠাৎ দুই জন দস্যু সে কাপড়খানি আমার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইল। আমি তখন দিগম্বর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম এ এক নূতন রকমের বিপদ্। এরূপ পূর্ণ উলঙ্গভাবে কেমন করিয়া আমি বহেড়ীতে যাইব। আমি দস্যুগণকে বলিলাম,—“তোমাদেরও ত স্ত্রী, কন্যা, মাতা আছে; বল দেখি, আমি কেমন করিয়া এ অবস্থায় লোক-সমাজে মুখ দেখাইব? উলঙ্গ করা দস্যুর রীতি নহে।” আমার এই কথা শুনিয়া অন্য দুই জন দস্যু আমার পক্ষ সমর্থন-পূর্ব্বক কহিল,—“নঙ্গা মৎ করো, জানে দেও।” কাপড়খানি আমার গায়ে ফেলিয়া দিয়া তাহারা দৌড়িয়া নিবিড় জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমি সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। দস্যুদলের প্রতিও লক্ষ্য রাখিলাম। আমার বোধ হইল, তাহারা দূর জঙ্গলে যায় নাই, নিকটেই লুকাইয়া আছে। টাটুওয়ালা ফিরিয়া আসিবে মনে করিয়া, আমি সেখানে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিলাম। দস্যুগণ আমাকে অনেকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বন হইতে বাহির হইয়া কহিল,--"তোম্ কেঁও খাড়া হ্যায়, চলা যাও।" আমি তাহাদের ভয় দেখাইবার জন্য এই ভাবে বলিলাম,—"হলদোয়ানি হইতে ২৫ জন সওয়ার আমার পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া এবার তাহারা যেন উধাও হইয়া উড়িয়া গেল, আর দেখা দিল না।

টাটুওয়ালা আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার সঙ্গে ইহজীবনে এ পর্য্যন্ত আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। এখন উপায় কি করি? মোহর কয়েকটী কুড়াইয়া আবার চলিতে লাগিলাম, কিন্তু অদৃষ্ট যখন মন্দ হয় তখন পদে পদে বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। আমি পথ চিনিতে না পারিয়া মনোভ্রমে সেই জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কিছু দূর গিয়া শুষ্ক পত্র মধ্যে পা ডুবিয়া যাইতে লাগিল। মনে করিলাম, এখানকার পথই বুঝি এই রকম। ক্রমশঃ প্রতি পাদবিক্ষেপেই কখন বা বৃক্ষ দ্বারা, কখনও বা লতা-গুল্ম দ্বারা আমার গতিরোধ হইতে লাগিল। তখনও মনে হইতে লাগিল, এখানকার পথই বুঝি এই রকম। অবশেষে এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলাম যে, তাহা আর অতিক্রম করিয়া যাইবার যো নাই। ভয়ানক ঘন-সন্নিবিষ্ট কণ্টকময় বন সম্মুখে প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হইল। আর পথ নাই, যেমন একটু অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি, গায়ে অমনি কাঁটা ফোটে। তখন আমার চমক ভাঙ্গিল। নিশ্চয় বুঝিলাম আমি জঙ্গলে আসিয়া পড়িয়াছি। চারি দিক চাহিয়া দেখিলাম, কেবল বড় বড় বৃক্ষ আকাশ-পথ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, আর তাহার নিম্নপ্রদেশ কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক বৃক্ষতলে গভীর অন্ধকার যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। এখন আমি যে দিকে যাই, সেই দিকেই কাঁটার বন আর জঙ্গল,— কোন দিকেই পথ পাই না। এক দিকে লক্ষ্য করিয়া একটু অগ্রসর হই, আর দেখি, কণ্টকবৃক্ষ দ্বারা আমার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আবার সে দিক্ ছাড়িয়া অন্য দিকে যাই, আবার সম্মুখে দেখি সেইরূপ কাঁটাবন। আমি দিশাহারা হইলাম। পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞানশূন্য হইলাম। প্রকৃতই আমি অরণ্য

মধ্যে হারাইয়া গেলাম। হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আতঙ্ক উপস্থিত হইল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। প্রতি শুষ্ক পত্রের খড় খড় শব্দে হিংস্রক বন্য জন্তুর আগমন অনুভব করিতে লাগিলাম। অদ্য রাত্রে আমার প্রাণ-বায়ু নিশ্চয় বহির্গত হইবে, ইহা স্থির করিয়া অন্তিমে সেই অনন্ত অরণ্যে হাতে পৈতা জড়াইয়া সেই পতিত-পাবনী ত্রিলোক-তারিণী দয়াময়ী মাকে ডাকিতে লাগিলাম।

সতের

আমি পথভ্রান্ত পথিক। বিপদে পড়িয়া আমি হারাইয়া গিয়াছি। হারাইয়া গেলে চিত্ত যে কিরূপ চঞ্চল হয়, প্রাণ যে কিরূপ হাঁকু-পাকু করে, তাহা ভুক্ত-ভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে সক্ষম নয়। যেদিকে যাই, সেই দিকেই দেখি, কাঁটার বন। দেখিয়া আমার কেমন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। যেন মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বোধ হইল, মরণ ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল ছিল। আজ দিবসে তোপে উড়াইলে এ নিদারুণ মর্ম্মযাতনা সহ্য করিতে হইত না। এই দগ্ধ অদৃষ্টকে কতই ধিক্কার দিলাম। আমার কান্না আসিতে লাগিল। চক্ষু ফাটিয়া ক্রমশঃ অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।—"হে জগজ্জননি মহামায়ে! এই অবোধ সন্তানের জন্য এত মায়াজাল কেন পাতিলে, মা! যদি তোমার এইরূপই অভিলাষ ছিল, তবে আজ তোপের মুখ হইতে কেন অব্যাহতি দিলে মা! এই অনন্ত অরণ্যে—এই অনন্ত ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া প্রাণ যে বাহির হয় মা!"

বিজন বনমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। ক্রমশঃ চক্ষের জল আপনা আপনি নিবৃত্ত হইল। ভাবিলাম কাঁদিয়া কি হইবে? রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম,—মেঘ তখনও সম্পূর্ণরূপ কাটে নাই। সে দিন কি তিথি, তাহা স্মরণ ছিল না। তবে মনে মনে এই আশা হইতেছিল, চন্দ্রদেব হয়ত এখনই উদিত হইবেন। জ্যোৎস্নালোকে তখন হয়ত পথ দেখিতে পাইব। এখন অন্ধকারে ঘুরিয়া কোন লাভ নাই। নিশানাথের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু দুরদৃষ্ট এমনই, গগনগর্ভে চাঁদের দেখা পাইলাম না। মেঘ

দূর হইল, আকাশ তারার মালা পরিলেন, কিন্তু বোধ হয় আমার জন্যই সেদিন কেবল চাঁদকে বক্ষে ধারণ করিলেন না।

এই মহা অরণ্যে পর্ব্বতীয় ভূমির উপর আমি অবস্থিত। জমি সমতল নহে। জমি কোথাও বা উচ্চভাবে খানিক উঠিয়াছে, কোথাও বা নিম্নে নামিয়াছে—ঠিক যেন সাগরের ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে চলিয়াছে।

এই পর্ব্বতময় প্রদেশ পাথর এবং মৃত্তিকা-মিশ্রিত। কে যেন মাটি দিয়া পাথর গাঁথিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতারণ্যে ক্ষুদ্র প্রস্রবণ আছে, ঝরণা আছে, এবং গিরিনদীও আছে।

বর্ষাকাল। অদ্য সম্ভবত এ স্থলে বহুবার বৃষ্টি হইয়া থাকিবে। অরণ্য-প্রদেশ কর্দ্দমময়। কয়েকবার পা পিছলিয়া টক্কর খাওয়াতে দক্ষিণ পদের পাদুকা ছিন্নপ্রায় হইয়াছে, তবে নিতান্ত অচল হয় নাই। আমি একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। জুতার ভিতর শুষ্ক পত্রখণ্ড, জল ও অল্প কাদা ঢুকিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। জুতা খুলিয়া নিম্নে এক শিলাখণ্ড ছিল তাহার উপর বসিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম,—এখন কি করি? কোন উপায়ে এ রাত্রে রক্ষা পাই? এখানে বসিয়া থাকিলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তু অথবা বিষাক্ত পর্ব্বতীয় সর্প দ্বারা নষ্টপ্রাণ হইতে পারি। গাছে উঠিয়া রাত্রিবাস করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। কিন্তু বৃক্ষশাখায় অবস্থিতি করিলেও নিতান্ত যে বিপদশূন্য হইব, তাহাও নহে। ভল্লুক বৃক্ষারোহণে বিলক্ষণ সমর্থ। শুনিয়াছি,—কোন এক জাতীয় বাঘও গাছে উঠিতে পারে, সুতরাং আরণ্য বৃক্ষে আরোহণ করিলেই বা সুস্থির হইতে পারি কৈ? আরও বিশেষ কথা এই,—আমি গাছে উঠিতে ভাল জানি না, সে অভ্যাস বাল্যকাল হইতে তেমন ছিল না। সেই লম্বা লম্বা গাছ যেন তাল নারিকেল আদি বৃক্ষের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই আকাশ পথে উঠিয়াছে। সে গাছে আমি কেমন করিয়া উঠিব? এ সকল পর্ব্বতীয় বৃক্ষ, অশ্বত্থ বা বটের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট নহে। গুঁড়িটী দশ-বার হাত লম্বা। তাহার পর ছোট ছোট ডাল আরম্ভ হইয়াছে। অদ্য বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত গাছই কেমন এক রকম জলে ভিজিয়া পিছল হইয়া আছে। বলুন! আমি কেমন করিয়া গাছে উঠি?

আরও এক কথা এই, গাছে উঠিলে পড়িয়া যাইতে পারি। কোন্ ডাল শক্ত, কোন্ ডাল পক্কা, তাহার বিচারই বা কেমন করিয়া করিব? বিশেষ যদি

আমার নিদ্রাকর্ষণ হয় তাহা হইলে তো একেবারেই গিয়াছি। নিদ্রাকর্ষণ না হইলেও বা গাছের উপর বসিয়া বসিয়া মনোভ্রমেও তো পড়িয়া যাওয়া সম্ভব। তবে করি কি? যুক্তি কি?

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যে দিকে কাঁটার বন কম দেখিলাম, সে দিক্ পানেই অগ্রসর হইলাম। মনে মনে আশা,—যদি সুপথ পাই। কিন্তু কোথায় বা পথ, আর কোথায় বা নিরাপদ স্থান! কাঁটার বন কিঞ্চিৎ কমিল বটে, কিন্তু বনবৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইল। এখানকার গাছগুলি অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী এবং বৃহৎ শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট। বৃক্ষগণ যেন দশ বাহু প্রসারণপূর্ব্বক পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। সেই ঘোর অন্ধকারে উচু নীচু পিছল পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ এক ডালে মাথা ঠুকিয়া আমি পড়িয়া গেলাম। আঘাত অধিক লাগে নাই, কিন্তু দেহ কাদামাখা হইল। আমি মনে মনে কহিলাম,—আর সুপথ অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। আর অগ্রসর হইব না। অদৃষ্টে যা থাকে, এইখানেই রাত্রি যাপন করিব। বিশেষত এ স্থানের বৃক্ষসমূহ আরোহণ এবং অবস্থিতির পক্ষে কিঞ্চিৎ অধিক উপযোগী।

এইরূপ কল্পনা করিতেছি, এমন সময় অদূরে ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের ন্যায় বিকট শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমি ভাবিলাম,—এইবার কৃতান্ত আসিতেছে। যে দিকে শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, সেই দিকে কান পাতিয়া রহিলাম। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসমূহ কম্পিত হইয়া উঠিল। এই বৃক্ষসমুদ্রের কম্পন ঢেউ আমার গায়ে লাগে নাই বটে, কিন্তু আমার সম্মুখবর্ত্তী দশ হাত ব্যবহিত বৃক্ষসমূহ যেন কাঁপিয়া উঠিল। আমার দৃঢ় ধারণা হইল,—নিশ্চয়ই বাঘ এ দিকে আসিতেছে। আমি এক বৃক্ষের ডাল ধরিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এ স্থলের বৃক্ষসমূহ বহুতর ডালপালাবিশিষ্ট এবং গুঁড়ির নিকটেই ডাল ছিল। গাছে উঠিয়া বাঘের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু বাঘ আসিল না। তখন আমি স্থির করিলাম, কোন এক বৃহৎ ব্যাঘ্র কোন এক জন্তুকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া থাকিবে, তাই গাছ সকল নড়িয়া উঠিয়াছিল।

অতি কষ্টে সেই বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলাম। এইখানেই নিশা যাপন করিতে হইবে মনে করিয়া একটা কঠিন অথচ মোটা ডালে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। পশ্চাতে ঠেস দিবার জন্য একটা ডাল ছিল। পাছে নিদ্রা আসিলে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে পরিধানের সেই একমাত্র বসন লইয়া সেই ঠেস দিবার ডালটীর সঙ্গে আপনাকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিলাম।

রজনী ঘোর তমোময়ী। নীল আকাশে অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হইয়া প্রাণপণে এই ঘোর কাল নিশায় তিমির বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। অগণন দাস-দাসী দ্বারা সেবিতা হইলেও স্বামি-বিরহে যেমন রমণীর হৃদয়-আকাশের অন্ধকার দূর হয় না, সেইরূপ কোটি কোটী পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ তারার ফুল ফুটিয়া উঠিলেও এক চন্দ্র ব্যতীত আকাশ বা পৃথিবীর অন্ধকার দূর করিতে কেহই সক্ষম নহে। কথিত আছে, রামচন্দ্রের সমুদ্র-বন্ধনকালে ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-বিড়ালকুল সেতু নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিল। বোধ-হয় সেই ক্ষুদ্র জীবের অনুকরণ করিয়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র খদ্যোতকুলও সেই ঘোর অন্ধকার বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ একত্র মিলিত হইয়া এক একটা বনস্পতিকে ফিরিয়া ফিরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া আছে। যেন তাহারা আপনা আপনি হীরকের হাররূপে গ্রথিত হইয়া, বনস্পতির গলদেশে বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ফুৎকারে যেরূপ হিমগিরি উড্ডীন হয় না, সেইরূপ জোনাকীর শত চেষ্টাতেও অন্ধকার।

রজনী যতই গভীর হইতে লাগিল, ততই বন্য জন্তুদের ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে লাগিলাম। তাহারা অন্ধকারে আপনাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লুক্কায়িত করত আহার অন্বেষণের নিমিত্ত ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল। সেই নিদাঘ-নিশীথে পর্ব্বত-নিঃসৃত অসংখ্য নির্ঝরিণীর কল কল শব্দে চারি দিক নিনাদিত হইয়া উঠিল। ঝিল্লীকুল উভরায়ে চীৎকার করিয়া কান ঝালাপালা করিয়া তুলিল। মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া বোঁ বোঁ শব্দে বায়ু বহিতে লাগিল,--সঙ্গে সঙ্গে আমিও বৃক্ষের সহিত দুলিতে লাগিলাম। তখন মনে হইতে লাগিল, —বুঝি এইবার ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এবং আমিও ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া পঞ্চত্ব পাইব।

কিন্তু নিদ্রা দূরতিক্রমা। মহীরুহের শীর্ষদেশে অবস্থিতি করিয়াও মাঝে মাঝে বায়ুবলে দোদুল্যমান হইয়াও, মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কা অনবরত হৃদয়ে জাগরূক থাকিলেও,—নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে অতর্কিতভাবে আসিয়া ক্ষণে ক্ষণে আমার চেতনা অপহরণ করিতে লাগিলেন। ইহা প্রকৃত নিদ্রা না হউক, ইহাকে গভীর তন্দ্রা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাত্রি যত শেষ হইতে লাগিল, ততই আমি ঢুলিয়া ঢুলিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলাম। জাগিয়া উঠিয়া মনে করি,—আর ঘুমাইব না, আর চক্ষু মুদ্রিত করিব না, আর বৃক্ষ-

শাখায় ঠেস দিব না, এইবার ঠিক সোজা স্ফীত-বক্ষে বসিয়া রহিলাম; দেখি, কেমন করিয়া নিদ্রা আইসে। কিন্তু নিদ্রা—অনন্ত অসীম শক্তিশালিনী। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই মহাশক্তির নিকট পরাভূত; আমি কোন্ ছার! কোন্ কীটাণু কীট! অচিরেই আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। অচিরেই আমি নিদ্রা-বিষে অভিভূত হইলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। এবার একটু গতিক খারাপ দেখিলাম। আমি দক্ষিণ পার্শ্বে ঢুলিতে ঢুলিতে এরূপ হেলিয়া পড়িয়াছিলাম যে, আর একটু হেলিলেই ভূতলে পড়িয়া যাইতাম। দেবানুগ্রহেই কেবল বাঁচিয়াছি বলিয়া মনে হইল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম,—বৃক্ষের শীর্ষদেশে আর এরূপভাবে থাকা উচিত নয়। নীচে নামিয়া দাঁড়াইয়া থাকি, অথবা একটু বেড়াই, তাহা হইলে আর ঘুম আসিবে না। এরূপ অন্ধকার রাত্রিতে হঠাৎ নিম্নে অবতরণ করা উচিত কি না তাহাও ভাবিতে লাগিলাম।

রাত্রি আর কত আছে? অনেকক্ষণ হইতেই ত মনে করিতেছি, শেষ রাত্রি হইয়াছে। অথচ এখনও প্রভাত হইল না। আমার হিসাব ধরিলে এতক্ষণে বেলা ৯টা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এ কাল-রাত্রি পোহায় কৈ? বিপদের রাত্রি বড়ই দীর্ঘ হইয়া থাকে।

নিদ্রার বেগ হ্রাস করিবার নিমিত্ত আমি সেই বৃক্ষের শীর্ষদেশ হইতে মধ্যদেশে বহু কষ্টে বাঁধন খুলিয়া অবতরণ করিলাম। ভাবিলাম, এরূপ গমন, নড়ন-চড়ন এবং উদ্যমে নিদ্রা দূর হইবে। মধ্যদেশে আসিয়া আবার সেইরূপ একটী ডাল বাছিয়া লইয়া, আপনাকে ডালের সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিলাম। উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে কেবল প্রভাত কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ঐ অরুণ উদয় হইল, ঐ উষাদেবী উঁকি মারিল, ঐ বুঝি পাখীকুল কলরব করিয়া উঠিল, কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল। কখন মনে হয়, এই যে বেশ ফরসা হইয়া আসিতেছে, সত্য সত্যই এইবার তারাদল স্বগৃহে গমন করিবে। আবার এ দিক্ ও দিক চাহিয়া মনে হয়, কৈ ফরসা ত হইল না, বরং অন্ধকারের অধিক মাত্রা চড়িয়া উঠিল দেখিতেছি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুম আসিল, আবার ঢুলিতে লাগিলাম, আবার পড়ি পড়ি হইলাম। অবশেষে সে স্থান হইতে উঠিয়া সর্ব্বনিম্নের ডালে আসিলাম। মনে হইল এ স্থান হইতে পড়িলে নিশ্চয়ই প্রাণ-বিয়োগ হইবে না। এখানে কথঞ্চিৎ স্বচ্ছন্দচিত্তে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—"আমার কষ্টের এইখানেই

কি শেষ, না ইহাই আরম্ভ ? যদি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। আচ্ছা, আমি কেন এত কষ্ট পাইতেছি; আমি দাস-দাসী-পরিবৃত হইয়া দিব্য সুখ-স্বচ্ছন্দে ছিলাম, ধন এবং অন্নের অভাব ছিল না; আমার গাড়ী ছিল, ঘোড়া ছিল, নর-যান ছিল; সহস্রাধিক অশ্বারোহী আমাকে দেবতার ন্যায় মান্য করিত, ভক্তি করিত; ওস্তাদ-গায়ক, বাদকবৃন্দ এবং সুন্দরী নর্ত্তকী-কুল আমার পরিতোষের নিমিত্ত সদাই প্রাণপণে যত্ন করিত; অধিক কি, নবাবপুত্র পর্য্যন্ত আমার সেবায় নিযুক্ত ছিল; বেরিলি নগরে আমি দ্বিতীয় রাজা ছিলাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু জানি না, কেন সেই আমি আজ এরূপ বিপন্ন হইলাম ? জানি না, কোন্ পাপে, কার অভিশাপে আজ আমি ভিখারীর অধম হইলাম ? আমার সঙ্গী সহচর কেহই আর নাই; আমার পরিধানে একখানি মাত্র বসন,—তাহাও দুইখণ্ডে বিভক্ত। ক্ষুধায় আহার নাই, তৃষ্ণায় জল নাই, নিদ্রায় শয্যা নাই। অহো! শয্যা চাই না, নিদ্রায় শুইবারও যে যো নাই; এই বৃক্ষশাখায় বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইতেছে।”

ইহার উপর আরও কতরূপ দুভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইতেছে। শুনিয়াছি নাইনিতালের এই মহারণ্য প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ বিস্তৃত। আমি এখন দিক্-বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য। কোন্ মুখে গমন করিলে এ অরণ্য পার হইব তাহা জানি না। ঘুরিতে ঘুরিতে যে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিব না, তাহাই বা কে বলিল ? কত দিন অথবা কতকাল এই অরণ্যে বাস করিতে হইবে, তাহা ত বুঝিতেছি না। কি খাইয়াই বা প্রাণ ধারণ করিব ? অথবা হঠাৎ একদিন ব্যাঘ্র, ভল্লুক বা হস্তীর সম্মুখে পড়িলে নিশ্চয়ই প্রাণ-বিয়োগ হইতে পারে। প্রাণ-বিয়োগ হউক ক্ষতি নাই, কিন্তু চিরদিনই যে এই অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইব আর মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইব না, আমি ইহজন্মের মত অরণ্যের মধ্যে হারাইয়া রহিলাম, এই ভাব হৃদয়ের মধ্যে উদিত হইলে প্রাণ আর দেহে থাকে না। বুক যেন ফাটিয়া উঠে, শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রাণ আইঢাই ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। হাঁপানি-কাসযুক্ত রোগী যেমন হাঁপায়, তেমনি হাঁপাইতে লাগিলাম। যেন মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। মরিবার পূর্ব্বে কি এইরূপই যাতনা হয় ? আমি অধীর হইলাম, নিকটবর্ত্তী আর একটী ডাল বাহু-দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে বক্ষ রাখিলাম। আমার গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। আমি ক্ষণেক যেন চেতনাশূন্য হইয়া রহিলাম।

আমার এ বর্ণনাকে কেহ যেন অতিরঞ্জিত মনে না করেন। মহারণ্য মাঝে আমি হারাইয়া গিয়াছি, এ সময় মনের ভাব যে কি হয়, তাহা বর্ণনাতীত। আমি শতাংশের একাংশও বর্ণন করিতে সক্ষম হইয়াছি কি না সন্দেহ। ঠিক ঐ অবস্থায় পতিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই যে এ রহস্য বুঝিতে পারিবেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

আঠার

ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া। দুঃখের পর সুখ। অমানিশার পর পূর্ণিমা। নৈরাশ্যের পর আশা।

আমার আশা হইতে লাগিল,—রাত্রি প্রভাত হইলে অবশ্যই পথ দেখিতে পাইব। এখন অন্ধকারে অমাবস্যায় দিশাহারা। তখন দিবসে সূর্য্যালোকে দিক্-নির্ণয়-ক্ষমতা অবশ্যই জন্মিবে। শুনিয়াছি, কাঠুরিয়াগণ মাঝে মাঝে এই নিবিড় অরণ্যে কাঠ কাটিতে আইসে, তাহাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইতে পারে।

ভয় কি? আমি বড় জোর জঙ্গলে জঙ্গলে দুই কোশ পথ আসিয়াছি। সমস্ত দিন মধ্যে,—বার ঘণ্টার মধ্যে আমি কি এই দুই ক্রোশ পথ ঘুরিয়া বাহির হইতে পারিব না? চিহ্ন, লক্ষণ, পক্ষিগণের গমনাগমন, সূর্য্যের অবস্থান, বায়ুর গতি, এ সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া-বুঝিয়া অবশ্যই পথের কিনারা করিয়া লইব। কোন ভয় নাই।

এ দিকে আশার আলোক অন্তরে যতই উদিত হইতে লাগিল, ও দিকে অন্তরীক্ষে আকাশমণ্ডলে ততই সূর্য্যদেবের লাল আলোক প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ হইল। যে দিক্ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সেই দিক্ পূর্ব্ব দিক্ ঠিক করিলাম। অন্তরে আর আনন্দ ধরে না। দেহ-মন পুলকে পূর্ণ হইল। শরীর প্রকৃতই কণ্টকিত হইল। হৃদয়-পদ্ম বিকশিত হইল। আমি সূর্য্যদেবের উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিলাম। মনে মনে কহিলাম,—"হে দেব! আলোক দানে তুমি ত্রিভুবন রক্ষা করিতেছ, অদ্য পথ দেখাইয়া দিয়া আমায় রক্ষা কর। আমি আহ্লাদে উল্লসিত হইয়া তখন বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলাম। বৃক্ষমূলেই ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। কেন না, তখনও ঘোর ঘোর কাটে নাই। এমন সময় দুই-একটী পাখী ডাকিতে লাগিল। আমার আহ্লাদ চতুর্গুণ বৃদ্ধি

হইল। সেই পাখীর রব কর্ণে যেন মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। কেন না, ইহার ধ্বনি সূর্য্যদেবের শীঘ্র উদয় সূচনা করিতেছে। প্রথম দুই-একটী, তার পর তিন-চারিটী, তার পর দশ-বিশটী পক্ষীর মনোহর ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। লোকে আহ্লাদে আটখানা হয়, আমি আহ্লাদে আট-আষ্টে চৌষট্টিখানা হইবার উপক্রম হইলাম। তখন পূর্ব্বাকাশের লাল লাল ভাব কতক কাটিয়া সাদা সাদা ভাব হইয়া আসিতেছে। আর রক্ষা রহিল না। চারি দিক্ হইতে কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল এককালে ডাকিয়া উঠিল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ পক্ষী সমস্বরে উৎফুল্ল-চিত্তে যেন গান আরম্ভ করিয়া দিল। পাখীগণ প্রভাত-কালে যেন ঈশ্বরের স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। এই স্তব-গীতিতে সত্য সত্যই যেন ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী মূর্ত্তিমান্। নানা জাতীয় পক্ষীর রব নানা প্রকার হইলেও, আমার কর্ণপটাহে তাহা যেন এক অনির্ব্বচনীয় একই সুর হইয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভবরঙ্গভূমিতে যেন ঐকতান কন্সার্ট্ বাজনা বাজিতে লাগিল। পাখীর মধুর রবে আমার মন মোহিত হইল।

কোথা হইতে এত পাখী আসিল? লক্ষ বলিলেও হয়, কোটী বলিলেও হয়, লক্ষ কোটি বা কোটি কোটি বলিলেও হয়। মানুষের পক্ষে কলিকাতা যেমন মহানগরী, পক্ষীর পক্ষে এই মহারণ্য তেমনি মহানগর। নানা জাতীয় পক্ষীর রব নানা প্রকার। কেহ কিচ্ মিচ্ করিতেছে, কেহ কচ্ মচ্ করিতেছে, কেহ কু দিতেছে, কেহ কু কু করিতেছে, কেহ ঘু ঘু করিতেছে, কাহারও ডাক ট্যা টা। কেহ মধুর রবে কী-কা করিতেছে, কেহ শিস দিতেছে, কেহ গান গাহিতেছে, কেহ বা নাচিতেছে। সে অদ্ভুত ব্যাপারের বর্ণন করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কখন দেখি, এক দিক দিয়া অসংখ্য বন্ টিয়া আকাশ-পথ আচ্ছন্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আকাশের নক্ষত্র বরঞ্চ গণনা করিতে পারি, কিন্তু সেই বনের বুলবুলির সংখ্যা গণনা করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি। ছাতারে পাখী ও ঘুঘুর পালও বিস্তর। ইহা ব্যতীত আর যে সকল বিচিত্র বঙ্গের মধুর-স্বরবিশিষ্ট পক্ষী দেখিলাম, তাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে কখনও নয়ন-গোচর করি নাই। সুতরাং তাহাদের নামও জ্ঞাত নহি। এই অজ্ঞাতকুলশীল, এই অজ্ঞাতনামা পক্ষিকুল দেখিতে বড়ই সুন্দর। কেহ লাল, কেহ নীল, কেহ শ্বেত, কেহ পীত, কেহ বা এই রঙ্গ চতুষ্টয়ের সম্মিশ্রণে চিত্রিত। কেহ ধূসরবর্ণ, কেহ তাম্রবর্ণ, কেহ রক্তবর্ণ, কেহ বা নবদূর্ব্বাদল-শ্যামবর্ণ, আবার সেই বর্ণের উপর কত বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন পক্ষীর পৃষ্ঠদেশে

এবং লেজে ভগবান্ যেন তাজমহলের অনুকরণে কারুকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই মহাবনে বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। শেষে ভাবিতে লাগিলাম,—এ কি এ! আমি কোথায় আসিয়াছি? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? অথবা এ সমস্ত সত্য সত্যই বাস্তব ঘটনা?

সেই মহাদেবী মহামায়ার অনন্ত লীলার অনন্ত রহস্য ভেদ করিতে কে সমর্থ?

উনিশ

প্রভাত কাল। শীত বিলক্ষণ অনুভব করিতে হইল। এক বস্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; একখানি পরিধান করিয়া আছি, শীত-নিবারণার্থ অন্যখানি গায়ে দিলাম। কিন্তু তাহাতে শীত কমিল না। পর্ব্বতীয় কন্‌কনে শীত কখন কি সূতার কাপড়ে দূর হয়?

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পূর্ণাঙ্গে আকাশ-পটে সমুদিত হইলেন। নভোমণ্ডল হাসিল, ধরাধাম হাসিল, অরণ্যপ্রদেশও হাসিয়া উঠিল। আমি তখন সেই বৃক্ষমূল পরিত্যাগ করিয়া পথান্বেষণে যাইবার সূচনা করিলাম। যাত্রার পূর্ব্বে সূচের ন্যায় অগ্রভাগবিশিষ্ট ধারাল এক পাথর-কুচি লইয়া সেই বৃক্ষগাত্রে আপন নাম ও তারিখ লিখিলাম। লেখা স্পষ্ট হইয়া ফুটিল না। তখন চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি পাথর জড় করিয়া বৃক্ষমূলে রাখিয়া দিলাম এবং লাঠি করিবার নিমিত্ত গাছের সরল ডাল একটী ভাঙ্গিয়া লইলাম। গাত্রবস্ত্র খুলিয়া কোমরে দৃঢ়রূপে বাঁধিলাম। জুতা-জোড়াটী সেই বৃক্ষের নিকট পরিত্যাগ করিলাম। এইরূপ সাজে সুসজ্জিত বা অসজ্জিত হইয়া, শ্রীদুর্গার নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। যে দিকে গমন করিলে লোকালয় পাইব, এই অরণ্য পার হইতে পারিব এইরূপ মনে ধারণা হইল, সেই দিকেরই পথ অনুসরণ করিলাম। এইরূপে প্রায় এক ক্রোশ পর্ব্বতীয় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া কেমন যেন মনে হইল, না, এ দিকে ত কৈ পথ দেখিতেছি না। এ দিকে যে জঙ্গলের ঘন সন্নিবেশ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে! আবার সে দিক ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিলাম। এবার বৃক্ষের আর সেরূপ ঘন সন্নিবেশ দেখিলাম না। ক্রমশঃই

ফাঁক ফাঁক বোধ হইতে লাগিল। কোন স্থানে বৃক্ষাদি আদৌ নাই, প্রায় দুই-তিন বিঘা জমি মরুভূমির ন্যায় পতিত হইয়া আছে। আমি হৃষ্ট-চিত্তে ধাবিত হইলাম। ভাবিলাম, এইবার নিশ্চয় জঙ্গল পার হইব। প্রায় এক ঘণ্টা কাল দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া দেখি, আমার পথিমধ্যে একটী বেগবতী পর্ব্বতীয় ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। নদী এরূপ খরস্রোতা যে, কুটা পড়িলে দুখানা হইয়া যায়। সম্মুখে নদী দেখিয়াই চক্ষু স্থির। ইহা কি মায়া নদী? মহামায়া কি আমার জন্য আবার এখানেও মায়াজাল পাতিলেন? আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল সেই নদীর তীরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নদীর ও পারে দেখিলাম, উঁচু উঁচু পাহাড় এবং ঘন জঙ্গল।

ভাবিয়া ভাবিয়া এক সূক্ষ্ম বিচার করিলাম। এ নদী অবশ্যই লোকালয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি এই নদীর তীর ধরিয়া যে দিকে নদীর জল প্রবাহিত হইতেছে, তদভিমুখে গমন করিলে অবশ্যই লোকালয় পাইব, এইরূপ ভাবিয়া তাহাই করিলাম, নদীর ধারে ধারে যাইতে লাগিলাম।

বাল্যকাল হইতেই জুতা পায়ে দেওয়া অভ্যাস। শূন্য পদে পর্ব্বতময় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পদদ্বয়ে বিষম ব্যথা জন্মিল। বিশেষ পাথরের কুচি লাগিয়া, দক্ষিণ পদের মধ্যস্থলটা ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। নদী-জলে পা ধুইয়া একটু বসিলাম। রক্ত বন্ধ হইল, আবার চলিতে লাগিলাম। এইরূপ নদীতীরে যাইতে যাইতে বেলা প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইল। সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িল। নদীর গতি দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম,—এ নদী ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, বিষম বাঁকা, আমি নদীর সহিত কত ঘুরিব? সোজা পথে গেলে যাহাতে এক দিন লাগে, নদীর সহিত যাইলে তাহাতে সাত দিন লাগিতে পারে। বিশেষ পায়ে যেরূপ ব্যথা জন্মিয়াছে। তাহাতে ত চলৎশক্তি ক্রমে ক্রমে রহিত হইয়া উঠিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি। তাহার পর সম্মুখে দেখিলাম, বিষম কাঁটার বন এবং উঁচু উঁচু পাহাড়। এতক্ষণ নদীর ও পারে জঙ্গল এবং পাহাড় ছিল, এইবার সেইরূপ জঙ্গল এবং পাহাড় নদীর উভয় পারেই দেখা দিল। আমার গতিরোধ হইল। ভাবিলাম, এ এক রকম ভালই হইয়াছে। পাগলের ন্যায় নদীর সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ কোথায় যাইতেছিলাম? যেখানে জঙ্গলের আরম্ভ, সেইখানে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম লইলাম। কিন্তু অধিকক্ষণ এক স্থানে থাকা উচিত নয় বলিয়া প্রায় পনর মিনিট পরেই সে স্থান হইতে উঠিলাম। যে দিকে গেলে পথ পাইব

বলিয়া অনুমান হইল, আবার সেই দিকে চলিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম,—এক প্রকাণ্ড প্রান্তর। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ তাহার পরিধি হইবে। সে স্থানে জঙ্গল নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লহ লহ নবীন নবীন ঘাস গজাইয়াছে। এই প্রান্তরের মাঝে মাঝে কেবল দুই-চারিটী বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উত্থিত হইয়া শাখা-পল্লব দ্বারা প্রান্তরকে ছায়া দানে সুস্নিগ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রান্তরটী দেখিয়া আমার কেমন মনে হইল, এইখানে মনুষ্যের বাস আছে। বোধ হয় কোন পর্ব্বতীয় বন্য জাতি এই স্থলে নিরাপদে বসবাস করিতেছে। অথবা এখানে কোন ঋষি-তপস্বীর তপোবন থাকা সম্ভব। এমন ভুবমমোহন শ্যামল ক্ষেত্র আমি ত কখনও দেখি নাই! সেই প্রান্তরের দিকে আমি বেগে ধাবিত হইলাম। কিছু দূর গিয়া দেখি, দলে দলে হরিণসমূহ সেই প্রান্তরের এক প্রান্তে বিচরণ করিতেছে। নির্ভয়-হৃদয়ে আমি তাহাদের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমাকে দেখিয়া হরিণ-দল ভ্রূক্ষেপও করিল না। আপন মনে পূর্ব্ববৎ চরিতেই লাগিল। কোন হরিণ আমার পানে একবার চায়, আর নিতান্ত অগ্রাহ্যতার সহিত উপেক্ষা করিয়া আপন কার্য্যে মন দেয়। বৃহৎ বৃহৎ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট হরিণ দেখিলাম, ছোট ছোট হরিণ-শাবক জননীর স্তন্য পান করিতেছে দেখিলাম, যুবক হরিণকে যুবতী হরিণীর সহিত প্রেমালাপ করিতে দেখিলাম, কোন হরিণ-শিশু লাফাইয়া লাফাইয়া একবার ও দিকে যাইতেছে, একবার এ দিকে আসিতেছে; কেহ বা কুন্দন করিয়া নিকটবর্ত্তী ঝরণার নিকট যাইতেছে, আর অল্প জল পান করিয়া তীরের ন্যায় গতিতে আপন দলে ফিরিয়া আসিতেছে। আমি অনিমেষ-লোচনে নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়া সেই হরিণদলের ভব-রঙ্গলীলা অবলোকন করিতে লাগিলাম। মনকে বলিলাম, —"এইবার দেখিয়া লও; কাব্যে যাহা পড়িয়াছ, এইবার সেই হরিণ-চক্ষু প্রত্যক্ষ নয়নগোচর কর। সেই নীল পদ্মাভ, সেই আকর্ণ-বিস্তৃত ভাবযুক্ত ঢল ঢল নয়ন, সেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ সেই মধুর উজ্জ্বল চঞ্চল নয়ন, সেই সুখ-শান্তি-দায়ক সেই কবিকুলের অবলম্বনীয় হরিণ-নয়ন দেখিয়া একবার তোমার নয়ন সার্থক কর।"

এইরূপ প্রায় বিশ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া হরিণ-নয়ন এবং হরিণকুলের বিচরণ দেখিতে লাগিলাম। আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব? কেন না, দিবাভাগের মধ্যে আজ আমাকে পথ খুঁজিয়া লইতেই হইবে। পথ না পাইলে, আজ অন্ততঃ উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলতায় প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা।

মানব জাতির বসবাসের চিহ্ন এখানে ত কিছুই দেখিতেছি না। মনুষ্য থাকিলে এ স্থলে অবশ্যই চাষ-আবাদ করিত। পদচিহ্নও দৃষ্ট হইত। এখানে মনুষ্য নাই, এ কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার বুক কেমন দমিয়া গেল।

কি করি? কোন্ দিকে যাই? কোন্ পথ ধরি? মাঠের অপর পারে ঝুপি ঝুপি বন দেখিতেছি। সম্ভবত ঐ স্থলে মনুষ্যের বাস আছে। থাকুক আর না থাকুক, ওখানে একবার গিয়া কি আছে, কি না আছে, দেখা কর্ত্তব্য; কিন্তু ওখানে যাইতে হইলে, হরিণদলকে অতিক্রম করিয়া হরিণ-দলের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু যেরূপ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট হরিণ দেখিতেছি, তাহাতে উহারা যদি একবার আমাকে তাড়া করে, একবার যদি উহাদের শৃঙ্গ আমার দেহের সহিত সংলগ্ন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাকে এককালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণবিয়োগ হইবে।

আমি চিরদিনই একটু গোঁয়ার। স্থির করিলাম,—হরিণদলের মধ্যে দিয়াই যাইব, মরি মরিব। তখন কেবল এই বিচার-বিতর্ক করিতে লাগিলাম,—ধীর পদে নীরবে উহাদিগকে অতিক্রম করিব, না, ভীষণ চীৎকারপূর্ব্বক লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাদের দিকে ধাবিত হইব? ভয়ে যদি ইহারা পলায় তাহা হইলে আমি ত নিশ্চিন্তে এবং নির্ভয়ে চলিয়া যাইব। আর যদিও ইহারা না পলায়, তাহা হইলে আমার বিষম বিক্রম দেখিয়া ইহারা আমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। সম্ভবত এই স্থানের হরিণদল কখনও মনুষ্য দেখে নাই। ব্যাধ অবশ্যই এখানে কখনও আসে নাই। কোন শিকার-প্রিয় ইংরেজ বা ক্ষত্রিয়ও এ মহারণ্যে কখনও পদার্পণ করেন নাই। বোধ হয় এখানকার হরিণদল মানুষকে চেনে না। অথবা এমনও হইতে পারে, এখানে কেবল তপস্বীরই বাস, তাঁহারা হরিণের প্রতি কখনও হিংসা করেন না। কাজেই এদেশীয় হরিণগণ মানুষ দেখিলে পলায় না, ভয় পায় না। তাই উহারা মানুষের অত ঘা-ঘেঁষা। সে যাহা হউক, এখন যুক্তি কি? হো হো মার মার শব্দে গমন করিব, না, নীরবে ধীরপদে প্রচ্ছন্নভাবে যাইব?

কোন্ যুক্তি অনুসারে জানি না, আমি কিন্তু সেই লাঠি লইয়া হো হো মার মার রবে এক বিরাট চীৎকার করিয়া হরিণদলের প্রতি ধাবিত হইলাম। দৌড়িবার সময় বাঘের অনুকরণে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিণদল একবার সচকিত নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া,

ঊর্দ্ধশ্বাসে দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ দিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। সে দৌড়নের বাহার দেখে কে! শিশু-সন্তানটীর পর্য্যন্ত লম্ফের মাধুরী দেখিয়া বিমোহিত হইয়া আকাশ পানে চাহিয়া বিশ্বকর্ত্তাকে বলিলাম,—"তুমিই ধন্য।" হরিণের এক একটী লাফ আট হাত বা দশ হাতের কম নয়। নিমেষ মধ্যে তাহারা যে কোথায় উধাও হইয়া উড়িয়া গেল, তাহা আর ঠিক করিতে পারিলাম না। যেন যাদুমন্ত্রে সকলে অন্তর্হিত হইল।

আমি যেখানে ঋষি-তপস্বীর আশ্রম আছে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, ক্রমে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম; কিন্তু কোথায় বা ঋষি-তপস্বী, আর কোথায় বা তাঁহাদের আশ্রম। কিছুই নাই, কেবল সব শূন্যাকার। সেই পূর্ব্ববৎ ফাঁক ফাঁক জঙ্গল। বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। যেন মরমে মরিয়া গেলাম। অদূরে এক গিরিনদী প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া তাহার তীরে গিয়া বসিলাম। তখন ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছে। পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে। পথ-শ্রান্তিতে দেহ অবসন্ন হইতেছে। সূর্য্যদেব মাথার উপর উঠিয়া ঢলিয়া পড়িয়াছেন। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে।

এই মহারণ্য মাঝে কি খাইয়া প্রাণ ধারণ করি? এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া দেখিলাম, কোন বৃক্ষে কোনরূপ ফল আছে কি না। নদীর ধারে এক রকম লতাবন রহিয়াছে। যখন টাটুওয়ালার সঙ্গে সাফাখানা পার হইয়া জঙ্গল-পথ দিয়া নাইনিতাল অভিমুখে গমন করি, তখন সেই টাটুওয়ালা এইরূপ লতাবন দেখাইয়া বলে, এই লতাগাছের গোড়া খুঁড়িলে শাঁক-আলু বা মূলার মত একরূপ আহারীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। ইহা খাইলে পেট ভরে এবং তৃষ্ণা দূর হয়। তখন তাহার সে কথায় কোন আস্থা প্রদান করি নাই। এখন বিপাকে পড়িয়া সেই লতাগাছ উপড়াইয়া দেখি, টাটুওয়ালার কথাই সত্য। আমি চারি-পাঁচটা লতার মূল উপড়াইয়া জড় করিলাম। ইহাতেই তখন আনন্দ কত হইল তাহা বলিতে পারি না। অতঃপর নদীজলে স্নান করিলাম। স্নান করিতে করিতেই কয়েক অঞ্জলি জল পান করিয়া কথঞ্চিৎ পিপাসা দূর করিলাম। তীরে উঠিয়া সিক্ত বস্ত্রখানি শিলাখণ্ডের উপর শুকাইতে দিয়া অপরখানি পরিধান করিলাম। তারপর পরম তৃপ্তি-সহকারে সেই লতামূল ভক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাহা শাঁক-আলু অপেক্ষাও অধিক সরস ও সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তিনটীর অধিক আর খাইতে পারিলাম না, তিনটী-তেই উদর পূর্ণ হইল। নদীতে গিয়া আবার জল পান করিয়া আসিলাম।

একটি বৃক্ষের নিম্নে দেখিলাম একখানি মসৃণ প্রস্তর পড়িয়া আছে। দৈর্ঘ্যে তাহা চারি-পাঁচ হাত হইবে, প্রস্থে তিন হাতের কম নহে। রং ঠিক আবলুস কাঠের মতন। সেই শিলার উপরে বৃক্ষের ছায়া পতিত হইয়াছে। তথায় আমি উপবেশন করিলাম। সেই শিলা মার্বেল পাথরের ন্যায়। আমি বিশ্রাম-মানসে তাহার উপর চিৎপাত হইয়া শুইলাম। যাই শয়ন, অমনি নিদ্রার আকর্ষণ। গতকল্য সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর কতই যে পরিশ্রম, তাহার ত ইয়ত্তা নাই। সুতরাং নিদ্রাদেবী ভীমবেগে আমার প্রতি আক্রমণ করিলেন। আমি নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। সম্পূর্ণরূপে বাহ্য চৈতন্য লুপ্ত হইল। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখি সন্ধ্যা-কাল সমুপস্থিত। আকাশে দুই-চারিটী তারকা উদিত হইয়াছে। আমি ত অবাক্! আবার এ কি হইল! আবার যে রাত্রি আসিল! সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, তথাচ পথ পাইলাম না। হা দুরদৃষ্ট! আমি তখন কেবল হায় হায় করিতে লাগিলাম। জগদম্বার নামে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া, বৃক্ষে উঠিয়া রাত্রিযাপন করিবার নিমিত্ত আবার এক শাখাপ্রশাখা শ্লিষ্ট বৃহৎ মহীরুহ খুঁজিতে লাগিলাম।

কুড়ি

আজ মনোমত বৃক্ষ সহজে খুঁজিয়া পাইলাম না। যে বৃক্ষটীর নিকট যাই, সেইটিই ছোট বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল। আমার প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। গাছে উঠিয়া রাত্রি কাটাইব, কিন্তু দুরদৃষ্টবশত উপযুক্ত গাছও মিলিতেছে না। এক্ষণে যে যে গাছ নির্ব্বাচন করিতেছি, তাহা পূর্ব্বনির্ব্বাচিত বৃক্ষ অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম,—কাজ ভাল হয় নাই, প্রথম নির্ব্বাচিত বৃক্ষটীতে উঠিলে ভাল হইত। কিন্তু এখন আর চিন্তার সময় নাই, যুক্তিরও সময় নাই। কেন না, বেগবতী নদীর ন্যায় আঁধার-তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া মহারণ্যকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। এ দিকে আমি পথভ্রান্ত। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম—এ সকল কিছুই জ্ঞান নাই। কেমন করিয়া আমি এক্ষণে সেই পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত বৃহৎ বৃক্ষটীর নিকট যাইব? কোথা হইতে

আসিতেছি, কোথায় যাইতেছি, কোথায় যাইব,—এ সকলেরও কিছুই ঠিক নাই। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ দেখিলাম, তাহাতেই উঠিলাম। বৃক্ষটী দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও ডালপালাবিশিষ্ট। ডাল খুব শক্ত, পুরাতন বৃক্ষ বলিয়া বোধ হইল। সেই গাছের মধ্যভাগে উঠিবামাত্র একটী বৃহদাকার সর্প সন্ সন্ শব্দে দ্রুতবেগে গাছ হইতে ডাল বহিয়া, গুড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া গেল। সাপ দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির। ভাবিলাম,—এ আবার কি? নূতন বিভীষিকা দেখিতেছি! বুঝি মহামায়ার এই এক নূতন লীলা! অন্ধকারে বোধ হইল, সাপের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নাতি স্থূল, নাতি ক্ষীণ, তেজস্বী। এ সাপ বিষাক্ত কি না, তাহা কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু তৎকালে আমার বিষাক্ত বলিয়াই কতকটা ধারণা জন্মিল।

সাপ দেখিয়াই হৃদয়ে কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সাপ পলাইলেও সে আতঙ্ক দূর হইল না। বুক তবু ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল,—গাছে বুঝি আরও সাপ আছে। আমি নীরব হইয়া বসিলে, অথবা তন্দ্রাভাব আসিলে, সাপ আসিয়া যদি দংশন করে অথবা জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে ত গিয়াছি।" একবার মনে করিলাম,—"অদূরবর্ত্তী ঐ বৃক্ষটীতে যাই। আবার ভাবিলাম,—উহাতেও যদি সাপ থাকে, তখন উপায়?" এখন ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয় দূর হইয়া আমার সর্পভয় উপস্থিত হইল। গাছের পাতা নড়ে, আর আমার মনে হয়, ঐ সাপ আসিতেছে। বায়ুভরে গা একটু দোলে, মনে হয়—ঐ সাপ। আমি চারি দিকেই যেন সাপ দেখিতে লাগিলাম। এক প্রকার অনাহারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হৃদয়ের বলও কেমন কম হইয়া আসিয়াছিল। গাছে আরও সাপ আছে কি না জানিবার জন্য আমি দাঁড়াইয়া একটী বড় ডাল ধরিয়া গাছ নাড়া দিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে যে একগাছি লাঠি ছিল, কখন বা তাহা লইয়া গাছ ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলাম।

আবার মনে হইল,—এইরূপ গাছ নাড়া-নাড়িতে সাপ আমার গায়ে আসিয়া পড়িতে পারে। তৎক্ষণাৎ অমনি গাছ নাড়া বা গাছ ঠেঙ্গান বন্ধ করিলাম। আমার কেমন মতিভ্রম জন্মিয়াছিল। কি করিব, কি উপায় অবলম্বন করিলে রক্ষা পাইব, ইহার কিছুই স্থির ছিল না। মন কেমন হু হু করিতেছিল। দেহ অবসন্ন হইয়াছিল। সেদিনকার কথা আজও মনে করিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

কি করি। নীরবে গাছেই বসিলাম। মনকে বুঝাইলাম,—এ বিপদে এত ব্যাকুল হইলে চলিবে না; ধৈর্য্য ধর। উপায় ত কিছুই নাই, এই স্থানেই রাত কাটাইতে হইবে। সর্পেই দংশন করুক বা ব্যাঘ্রেই ভক্ষণ করুক, এই বৃক্ষে বসিয়াই নিশা যাপন করিতে হইবে,—কেন না, আমি আজ নিরুপায়।

অথবা ভয় কি? ভগবান রক্ষা করিলে মারে কে? লোহার বাসর-ঘরে থাকিয়াও লখিন্দর রক্ষা পায় নাই। জতুগৃহে বাস করিয়াও পঞ্চ-পাণ্ডব রক্ষা পাইয়াছিল। আদ্যাশক্তি মহামায়া ভগবতী যাঁহার জননী, দেবাদিদেব মহা-যোগেশ্বর মহাদেব যাঁহার জনক,—সেই স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণপতির গজমুণ্ড কেন হইল? কপালং কপালং কপালং মূলং দৈব দুরতিক্রম্য। তা আমি কোন্ ছার? —আমি কোন্ কীটাধম?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে কেমন বল সঞ্চয় হইল। কেমন অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। আমার ললাট-লিপিতে জীবিত থাকা যদি লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এ সংসারে এমন কে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আছে যে, আমাকে হনন করিতে সমর্থ? অন্য যদি মরণই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলেই বা রক্ষা করিবে কে? জীবন-মৃত্যু বিষয়ে ভাবনা ভাল নয়, উচিতও নয়। যাহা এই আছে, এই নাই,—যাহা জলবুদ্বুদের সঙ্গে তুলনীয়, যাহা পদ্মপত্রে শিশিরের সঙ্গে তুলনীয়, যাহা বালুকা-ভূমিতে পদ-চিহ্নের সহিত তুলনীয়,—অবোধ ব্যক্তিই তাহার জন্য ভাবনা করিয়া থাকে। মৃত্যুতে কিছুই আশ্চর্য্যভাব নাই—বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্য্য। আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম। পূর্ব্ব-রাত্রির ন্যায় বৃক্ষ-শাখায় আপনাকে বন্ধন করিয়া বসিলাম। নিদ্রা আসিল না। আকাশ পানে চাহিয়া স্বর-সংযোগে সেই ত্রিলোকতারিণী, পতিতপাবনী মায়ের নাম করিতে লাগিলাম। মায়ের মধুর নামের গুণে শোক-তাপ-ভয়-ক্লেশ সমস্তই যেন বিদূরিত হইল। শুধু তাহাই নহে, হৃদয়ে কেমন আহ্লাদ এবং উল্লাস ভাবের উদয় হইল। রাত্রি এক প্রহরের অধিক কাল পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত করিলাম। ক্রমে শীতানুভব হইতে লাগিল। এই জঙ্গল নাইনিতালের উপত্যকা-প্রদেশে অবস্থিত। কাজেই শীতে ক্রমশঃ জড়সড় হইয়া উঠিলাম। অঙ্গে বস্ত্র নাই। একমাত্র বস্ত্রকে দ্বিগুণ করিয়া তাহারই অর্দ্ধখণ্ড পরিয়া আছি;—বাকি অর্দ্ধখণ্ডে আপনাকে গাছের সহিত দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছি। কোমর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেহটা এককালে উলঙ্গ। আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া উলঙ্গ হইলাম—পরিধানের বস্ত্রটুকু লইয়া গায়ে

ক্লান্তি বোধ হইল। জঠরানলও জ্বলিয়া উঠিয়াছে; পিপাসাও পাইয়াছে। কিন্তু অদ্য সেই সুমিষ্ট লতামূলও নাই, পর্ব্বতীয় স্রোতস্বিনীও নাই, শয়নার্থ সেই কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ প্রস্তরখণ্ডও নাই।

জলের ভাবনা ছিল না। কারণ এ পর্ব্বতীয় জঙ্গলে ঝরণা অসংখ্য। একটু অন্বেষণ করিলেই ঝরণা পাওয়া যাইবে। কিন্তু ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় কি? বৃক্ষপানে চাহিয়া দেখিলাম, কোন রকম ফল আছে কি না। কোন কোন গাছ ফলে বিভূষিত দেখিলাম, কিন্তু তাহা খাদ্য কি অখাদ্য, সুস্বাদু কি কটু-কষায়, বিষাক্ত কি মধুময়,—তাহা কেমন করিয়া ঠিক করিব? কোন কোন ফল আম্র ফলের ন্যায়, পাকিয়া লাল হইয়া রহিযাছে, দেখিলেই খাইবার জন্য লোভ জন্মে। কিন্তু কোন পক্ষীতেই সে ফল খাইতেছে না দেখিয়া আমাব মনে সন্দেহ জন্মিল, বুঝি উহা বিষ-ফল। কোনও বৃক্ষে গোছা গোছা সুপারির ন্যায় ফল ধরিয়া আছে, কিন্তু তাহা সবুজ বর্ণ,—কাঁচা বলিয়া বোধ হইল। কোন ফলের আকৃতি খর্জ্জুরের ন্যায়। কোন ফল আমড়ার মত। কোন ফল চাল্‌তার সহিত তুলনীয়। ফলও অনেক, ফুলও অনেক। কিন্তু একটী ফলও ভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। যখন বিদ্রোহী অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইযা হলদোয়ানি যাই, মধ্যপথে প্রাপ্ত সেদিনকার সেই ঝাল মূলার কথা আমার এখনও মনে আছে। তাই ভাবিলাম,—এ ফল খাইযা প্রাণে যদিও একান্তই না মরি,—যদি সেই ঝাল মূলার দশা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও মরণের অধিক হইবে। অতএব কিছুতেই এ ফল খাওযা হইবে না।

আর বিলম্ব না করিযা তথা হইতে উঠিলাম। জল এবং আহারীয় সামগ্রী অন্বেষণে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর গিযাই ঝরণা মিলিল। শূন্য উদরে প্রাণ ভরিয়া সর্ব্বাগ্রে জল পান কবিলাম। তারপর চাহিয়া দেখি, ঝরণার পাশে কুল গাছের বন। পাকা পাকা বড বড় গোল গোল কুল বৃক্ষসমূহকে সাজাইয়া রাখিযাছে। বন্য পক্ষিকুলও সেই কুল ঠুকরাইযা ঠুকরাইয়া খাইতেছে। তলায়ও অনেক কুল পড়িয়া আছে। হৃদয়ে বড়ই আনন্দ জন্মিল। ঝরণাব জলে স্নান করিলাম। কুলতলায় গেলাম। তলার কুল কুডাইলাম না। অগ্রে বৃক্ষ হইতে একটী কুল পাড়িলাম। কুল হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ আরণ্য কুল যদি তিক্ত হয, তখন উপায়? পক্ষিগণের নিকট তিক্ত ফলও সুস্বাদু হইয়া থাকে। যাহা হউক, অগ্রে কুলের আঘ্রাণ লইলাম। আঘ্রাণে কুল সুমিষ্ট হইবে বলিয়াই বোধ হইল। তখন 'জয় দুর্গা' বলিয়া

কুল মুখে দিলাম। বলিব কি, সে কুল তখন অমৃত অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বোধ হইল। ঈষৎ অম্ল-রসও আছে, অথচ ঘোর মিষ্ট। দুইটী, চারিটী, দশটী, ক্রমশঃ বিংশতিটী কুল উদরস্থ হইল। দেহ জুড়াইল। ঝরণায় গিয়া জল পান করিয়া আসিলাম। পথের সম্বলস্বরূপ কতকগুলি অর্দ্ধ-পক্ক ও কতকগুলি সুপক্ক কুল কাপড়ে বাঁধিয়া লইলাম।

কুল খাইয়া কুলতলায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় খানিক বিশ্রাম লইলাম, কিন্তু পাছে ঘোর ঘুমে অভিভূত হই, এই ভয়ে অদ্য আর পূর্ণমাত্রায় শয়ন করিলাম না। বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, তখন উঠিয়া, যে দিকে দু-চোখ যায়, আবার সেই দিকে যাত্রা করিলাম।

কিছু দূর গিয়া সমতল ভূমিতে পড়িলাম। ভূমি কিন্তু প্রস্তরময়। দেখিলাম বড় বড় নীল গাভী বিচরণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেহ; স্বচ্ছন্দ-হৃদয়ে প্রচুর তৃণ শস্য খাইয়া গাভীগণ ঐরাবতজাতীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া বেগে এক দিকে দৌড়িয়া পলাইল।

আর এক স্থানে দেখিলাম ময়ূরের পাল। পাঁচ শত ময়ূরের কম হইবে না। এক একটী বৃক্ষে দশ-পনরটী ময়ূর বসিয়া আছে। ভূমিতলেও বহু ময়ূর ভ্রমণ করিতেছে। এরূপ বৃহদাকার ময়ূর আমি আর কখনও দেখি নাই। কোন ময়ূর পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়া আছে। মনে হইতে লাগিল, যেন শারদীয়া প্রতিমার মেড়। কোন কোন ময়ূরের দেহে এংই বল, মনে হইল যে ঠোঁটে করিয়া সে অনায়াসে মানুষ উড়াইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম। এই ময়ূরগণ যদি আমাকে ঠুকরাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে এইখানেই প্রাণে মরিব। মনে করিলাম, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না,—ময়ূরেই মারিয়া ফেলুক, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত নিমেষ মধ্যে ময়ূরের দল আমাকে দেখিয়া এক দিকে চলিয়া গেল। বোধ হয় মানুষ তাহারা এই প্রথম দেখিল।

আমি এক মনে চলিয়াছি,—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। বৃক্ষের ঘন-সন্নিবেশ আর এখানে নাই, বৃক্ষাবলী দূরে দূরে অবস্থিত। আমার মনে আশার সঞ্চার হইল, এইবার বুঝি জঙ্গল ছাড়াইলাম। ক্রমে আরও ফাঁক ফাঁক ঠেকিতে লাগিল। পঁচিশ-ত্রিশ হাত অন্তর এক একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ। আমি এই স্থানটী দ্রুতপদে, এক রকম দৌড়িয়াই অতিক্রম করিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ বেগে গমন করিয়া দেখি সম্মুখে আর রাস্তা নাই। সেই মহারণ্য মধ্যে এক বহু-বিস্তৃত বিপরীত গর্ত্ত। সেই গর্ত্ত দ্বারা সেই অরণ্য

দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সেই গর্ত্ত প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলেরও কম হইবে ; কিন্তু লম্বা যে কত, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? এ-ধার ও-ধার নজর হয় না। ইহাকে পর্ব্বতীয় 'খাদ' বলে। এই গর্ত্ত এত গভীর যে, নীচে নজর হয় না। পাঁচ সাত হাজার ফীট গভীর হইতে পারে। সেই খাতের ধারে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন টানিয়া লইয়া নীচে ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। সেই অতল-স্পর্শ খাদে একবার পড়িলে আর 'মা' বলিতে হয় না।

খাদ দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির। আমি যেন স্পন্দনহীন জড়-পদার্থের ন্যায় হইলাম। মুখে আর কথা নাই, কেবল নয়নজলে বুক ভাসিতে লাগিল। হে মহামায়ে! ইহা কি সত্য সত্যই পর্ব্বতীয় খাদ, না, তোমার মায়া ? মা! আর বেলা নাই, শীঘ্রই সন্ধ্যাদেবী সমাগতা হইবেন। আমাকে পথ দেখাইয়া দিয়া রক্ষা কর মা!

এই স্থানে বসিয়া আমি বালকের ন্যায় অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। শেষে কেমন ক্ষিপ্তবৎ হইলাম। চারি দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কখন বা এক বৃহৎ বৃক্ষকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম,—"হে বৃক্ষ! তুমি অতি প্রাচীন এবং বিজ্ঞ, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে লোকালয়ে পৌছিবার পথ দেখাইয়া দাও।" কখন বা এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম,—"তুমি অজর অমর,—তুমি সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এইখানেই বাস করিতেছ ; তুমি সর্ব্বজ্ঞ, কিছুই তোমার অগোচর নাই ; এই আশ্রয়হীন, অনাথ অধমের প্রতি দয়া করিয়া মনুষ্য-সমাজে গমন করিবার পথ বলিয়া দাও।" ক্রমে সন্ধ্যা হইবার যতই সময় হইতে লাগিল, আমার প্রাণ ততই আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাণটা তখন যে কিরূপ আই-ঢাই ছট্-ফট্ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার যো নাই। "হে বনদেবতা! হে বনদেবতা! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর", —বলিয়া কতবার যে তখন ডাকিলাম, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিলেন না, কেহই উত্তর দিলেন না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল উপস্থিত হইল। আমি নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"হে আকাশ! আর একটু অপেক্ষা কর,—আঁধার-সাগরে এ অরণ্য এত শীঘ্র ডুবাইও না। হে করুণাময় আকাশ! আর কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কর, আমি আর একবার পথ খুঁজিয়া লই। যদি পথ না পাই, তবে লম্ফ দিয়া এই খাদে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।"

আকাশ আমার কথা শুনিল না। রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া অরণ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। আমি খাদের অদূরে বসিয়া পড়িলাম ; পথান্বেষণের আর কোন চেষ্টা বা উদ্যম করিলাম না।

আর না,—আর সহ্য হয় না,—এই সন্ধ্যাকালে, মায়ের নাম করিয়া খাদে পড়িয়াই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। বৃক্ষে বসিয়া শীতে কাতর হইয়া, অনিদ্রিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতে আর সক্ষম নহি। আর পারি না,—দেহ আর বয় না, মন আর সরে না। এ সময় মৃত্যুই মঙ্গলজনক। সর্ব্ব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করিবার মৃত্যুই এখন একমাত্র উপায়। মৃত্যুই এখন সুহৃদ্ ; মৃত্যুই এখন মা-বাপ ; মৃত্যুই এখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু। তবে মরি।

উঠিলাম। খাদের ধারে গেলাম। সেই গভীর গর্ত্তের দিকে নয়ন নিবিষ্ট করিলাম। তবে পড়ি! শুভ-কর্ম্মে আর বিলম্ব কি? এই পড়িলাম।

এই মুহূর্ত্তে কে যেন আমাকে কানে কানে বলিয়া দিল,—"আজ থাক্,—আরও দুই-এক দিন অপেক্ষা কর। শুধু শুধু এ তরুণ বয়সে জননী-সহধর্ম্মিণী-ভ্রাতা থাকিতে তুমি হঠাৎ মরিতে যাইবে কেন? ভাবনা কি? ভয় কি? পথ অবশ্যই পাইবে। বিশেষ আত্মহত্যা মহাপাপ।"

আমার চমক ভাঙ্গিল। এইবার আমার ক্ষিপ্তভাব দূর হইল। আমি খাদের ধার হইতে দৌড়িয়া আসিলাম। ভাবিলাম,—ছি! ছি! করিতেছিলাম কি? আমার বাহ্যজ্ঞান কি একেবারেই লোপ পাইয়াছিল? কাপুরুষেই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। আজ পথ নাই বা পাইলাম ; কাল বিশেষ স্থির-বুদ্ধিতে তন্ন তন্ন করিয়া পথ অন্বেষণ করিলে অবশ্যই সুপথ পাইব। ভয় কি?

মনকে দৃঢ় করিলাম। রাত্রি যাপনের জন্য একটী বৃক্ষ খুঁজিয়া লইলাম। সর্পভীতি দূর করিবার জন্য গাছের ডাল ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিলাম। শেষে লাঠি দ্বারা গাছ ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু অদ্য আর সাপ বাহির হইল না। আমি গাছে উঠিয়া স্বচ্ছন্দ-মনে বসিলাম। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আমার দেহকে শাখার সহিত বাঁধিলাম। শেষে গান আরম্ভ করিলাম। কাপড়ে কুল বাঁধা ছিল ; ক্ষুধা বোধ হওয়ায় সেই ডাঁসা কুলগুলি আগে খাইতে লাগিলাম। সুপক্ক কুল অপেক্ষা এই অর্দ্ধপক্ক কুল আরও সুমধুর বোধ হইতে লাগিল। গান গাই, আর কুল খাই, আর মাঝে মাঝে গাছের ডাল চাপড়াইয়া তাল রাখি। বড়ই আনন্দ-উৎসবে নিশা অতিবাহিত হইতে লাগিল।

তিন দিন কাল গাছে ঘুমাইতেছি। ক্রমে একটু অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শেষ রাত্রে গাছের ডালে বসিয়া বেশ এক ঘুম হইয়া গেল। পাখীর কলরবে ও শীতের আবেগে ঘুম ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি, প্রভাত হইয়াছে। সূর্য্যদেব ঈষৎ উদিত হইয়া পৃথিবীকে হাস্যময় করিয়াছেন। আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া পথান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

একুশ

অরণ্যে অদ্য আমার চতুর্থ দিন। অদ্য কেমন একটু উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে, সাহসও অধিক হইযাছে। সূর্য্যের উদয় দেখিযা আমি মনে মনে একরকম দিক্ নির্ণয় করিয়া লইলাম। খাদের ধার ছাড়িয়া আপন নির্ণীত দিকে চলিতে লাগিলাম। এক ঘণ্টা কাল এইরূপে গমন করিয়া দূরে এক ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত দেখিলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া মনে হইল, কাপড়ের পাগড়ী বাঁধা কয়েক জন মানুষ নদীর ধারে বসিযা আছে। মানুষ দেখিয়া আহ্লাদে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল,—ইহারা যদি ডাকাত হয়, তবে ত আমার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। ডাকাইত অথবা আর যেই হউক, ইহারা মানুষ ত বটে। আজ মানুষের মুখ দেখিলেই আমার স্বর্গ। দস্যু হইলেই বা হঠাৎ আমাকে প্রাণে মারিবে কেন? আমার কাছে আছে কি যে ইহারা লইবে!

আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, মহোল্লাসে মানুষের দিকে দৌড়িলাম। কিন্তু কাছে গিযা যাহা দেখিলাম, তাহা আর বলিবার নহে। আট দশটা বড় বড় শকুনি কেবল নদীর ধারে বসিয়া আছে। দেখিযাই আমি গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। হরি হরি! এ কি! শেষে শকুনি হইল! একটা জানোয়ার মরিযা পচিযা আছে; শকুনিগুলা তাহার মাংস খাইতেছে, আর মনের সুখে পা-পা বেড়াইতেছে। আমি আর কথাটী না কহিয়া তথা হইতে উঠিলাম। কিন্তু মানুষের পরিবর্তে শকুনি দেখিয়া এবার মন তত দমিল না, বরং হাসি আসিল। ক্রমশঃ মন কেমন কঠিন হইয়া আসিযাছিল।

বেলা এখনও এক প্রহর হয় নাই। শীত-শীত ভাব এখনও অল্প আছে। তথাচ নদীতে অবগাহন করিতে ইচ্ছা হইল। নদীতে নামিলাম। কিন্তু নদীর জল বড় ঠাণ্ডা বলিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া নদী হইতে উঠিয়া পড়িলাম।

আবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে একটা অতি বিস্তৃত প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। প্রান্তরের এ ধার ও ধার নজর হয় না। এ মাঠে গাছ আছে বটে, কিন্তু খুব কম। ভূমি প্রস্তরময় নহে। বেশ চাষ-বাস হইবার উপযুক্ত। মাঠ দেখিয়া মনে কিছু আশার উদয় হইল। স্থির করিলাম আশা আর করিব না; যতবার আশা করিয়াছি, ততবারই ঠকিয়াছি। এই প্রান্তর দিয়া যাই—দেখি, পরিণাম ফল কি হয়। যাইতে যাইতে আভাসে বোধ হইল, দূরে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা। নানারূপ শস্যে প্রান্তর পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। আশা দ্বিগুণ বাড়িল। এক একবার মনে হইতে লাগিল, এ কি মায়া-মরীচিকা? আমার চোখের দোষ জন্মিয়া থাকিবে। যাহা হউক, দ্রুতপদে সেই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের দিকে গমন করিতে লাগিলাম। খানিক দূরে মনে হইল, এক বৃদ্ধা এক স্থানে দাঁড়াইয়া কুলার দ্বারা শস্যের জঞ্জাল উড়াইয়া শস্য পৃথক্ করিতেছে। মানুষ দেখিয়াও মানুষ বলিয়া বিশ্বাস হইল না। ভাবিলাম, বৃদ্ধা যে শকুনি হইবে না, তাহা কে বলিল? শকুনি না হউক, শঙ্খচিলও ত হইতে পারে।

যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই বৃদ্ধাকে মানুষ বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। কিন্তু মন কেমন কু, এখনও এক একবার বৃদ্ধাকে 'মানুষ নয়' বলিয়া সন্দেহ হইতে লাগিল।

যখন পাঁচ-সাত রশি পথ ব্যবধান আছে, তখন বৃদ্ধার দিকে প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। দৌড়িয়া গিয়া, উন্মত্তের ন্যায় 'মা আমাকে বাঁচাও' বলিয়া বৃদ্ধার একেবারে পদপ্রান্তে পতিত হইলাম। আমি যেন সংজ্ঞাহীন হইয়া রহিলাম। বৃদ্ধা চমকিত হইয়া আমার গায়ে হাত দিয়া উঠাইল। সত্য সত্যই এ কি মানুষের হাত আমার অঙ্গে ঠেকিল? আমি উঠিয়া বসিয়া জোড়হাতে বৃদ্ধাকে বলিলাম,—"মায়ি! হাম্ ব্রাহ্মণ হায! চার রোজসে রাস্তা ভুলে হুয়ে। আজ তোম্‌কো দেখা, নহি ত কই আদমি নজর নেহি পড়া।" আমি ব্রাহ্মণ শুনিয়া বৃদ্ধা আমাকে প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় দিল। বৃদ্ধা কহিল,—"বেটা! থোড়া বৈঠো, হম্ থোড়া আনাজ আউর উড়ালে তো তুমকো ঘর লে চলে।" বৃদ্ধা শীঘ্র-হস্তে খোসা-ভুসি উড়াইতে লাগিল। আমি তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম বৃদ্ধার বয়স ৭৫ বৎসরেরও অধিক হইবে: অথচ তাহার দেহ দৃঢ় আছে, পরিশ্রম করিতে বেশ পটু।

আমি সেখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে পর, সেই বর্ষীয়সী আমাকে সঙ্গে করিয়া নিজালয়ে লইয়া গেল। মাঠ হইতে তাহার ঘর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরের কম নহে। বৃদ্ধা পাহাড়ী, রাজপুতবংশীয়া। ইহারা পাহাড়েই থাকে। কেহ কেহ আবার কৃষিকার্য্যের জন্য জঙ্গলের খুব নিকটে বাস করে।

বৃদ্ধার গৃহে গিয়া দেখিলাম, চারিখানি ছোট ছোট খড়ের ঘর রহিয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে। সিন্দুর পড়িলেও স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লওয়া যায়। আর একটা দীর্ঘ গোয়াল-ঘর। তাহাতে সাত-আটটী দুগ্ধবতী গাভী থাকে এবং চাষের জন্য দুইটী বলদও থাকে। বাটীতে এক জন অশীতিবর্ষ বয়স্ক বুড়া থুব্-থুরে লোক। সে ব্যক্তি ঐ প্রাচীনার দেবর। আর একটী যুবতী স্ত্রী দেখিলাম। ঐ যুবতী বৃদ্ধার পুত্রবধূ।

বৃদ্ধার বাটীর নিকটে একটী ক্ষুদ্র বাগান ছিল। তাহা পর্ব্বতীয় কদলী-বৃক্ষে পূর্ণ। এক-আধটী তেঁতুল গাছও আছে। সেই বাগানে একটী কুঁড়ে ঘরে বৃদ্ধা আমাকে যত্নপূর্ব্বক বসিতে বলিল। বসিবার জন্য কম্বল বিছাইয়া দিল। তৎপরে বৃদ্ধা ও তাহার দেবর আমার নিকট হইতে আমার কাহিনী শুনিতে আসিল। আমার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এক মনে শ্রবণ করিয়া, বৃদ্ধা অশ্রু-ধারায় ধরাতল সিক্ত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধা অধিকক্ষণ আর তথায় বসিল না। উঠিয়া গিয়া, গোয়াল হইতে একটা গরু খুলিয়া আনিয়া, স্বয়ং গোদোহন করিতে আরম্ভ করিল। এক টানে পাঁচ সের আন্দাজ দুগ্ধ দোহন করিল। তৎপরে বৃদ্ধা আমাকে স্নানার্থ তৈল আনিয়া দিল। আমি তৈল মাখিয়া নিকটবর্ত্তী ঝরণায় গিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। স্নান করিয়া আসিবামাত্র বৃদ্ধা একখানি নব বস্ত্র আমাকে পরিধানার্থ দিল। দেশী কাপড়, মোটা কিন্তু খস্‌খসে নহে। আমি তাহা সানন্দে পরিলাম। বৃদ্ধা একটী পাথর-বাটীতে প্রায় অর্দ্ধ সের ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ আমাকে খাইতে দিয়া বলিল,—"বেটা! এখন এই অল্প দুগ্ধই পান কর; তোমার উদরে এককালে বেশী দুগ্ধ সহ্য হইবে না; আর একটু পরে অধিক আহার করিও।" আমি সেই দুগ্ধ পান করার পর, বৃদ্ধা আমাকে এক রকম সাদা গুড় খাইতে দিল। গুড় খাইয়া আমি এক ঘটী জল পান করিলাম।

বেলা প্রায় ১১টা অতীত হইয়াছে। প্রায় দুই দণ্ড পরে বৃদ্ধা আমার জন্য এক তাল গরম গরম ক্ষীর লইয়া আসিল। আমি সেই ক্ষীর খাইয়া আবার জল পান করিলাম। দুরন্ত ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে।

ক্ষীর ভক্ষণ শেষ হইলে বৃদ্ধা কিছু কম এক সের আটা, প্রায় এক পোয়া ঘৃত, উপযুক্ত পরিমাণে ডাল লবণ আমার জন্য লইয়া আসিল। স্বয়ং উনান ধরাইয়া দিল। আমি বড় বড় মোটা মোটা আটখানি রুটী তৈয়ারি করিলাম। সে রুটী কিন্তু মাখমের ন্যায় নরম। বাগাত্তর ঘণ্টার পর আহার, পাঁচখানি রুটী খাইতে না-খাইতে পেট দমসম হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা সস্নেহে কহিল,—"বেটা! তুমি আরও খাও, এ স্থানে অসুখ নাই, খুব পেট ভরিয়া খাইলেও কোন কষ্ট হইবে না।" বৃদ্ধার অনুরোধে আমি আরও দুইখানি রুটী খাইলাম।

বৃদ্ধার যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া আমি গলিয়া গেলাম। সেই পরিবারস্থ সকলেরই প্রকৃতি অতি সরল। বৃদ্ধার ভালবাসা দেখিয়া প্রকৃতই আমি মোহিত হইলাম। বৃদ্ধা আমাকে দিবানিদ্রা যাইতে নিষেধ করিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল।

আমার স্বভাব চঞ্চল। আমি আহারাদির পর বাগানের এ দিক ও দিক ঘুরিতে লাগিলাম। ইচ্ছা হইল, বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া অন্য স্থানে গিয়া একটু পা-চালি করি। কিন্তু ভয় হইল, পাছে আবার হারাইয়া যাই।

সন্ধ্যার পরে আবার বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসিল,—'বেটা! তুঁ কেয়া খায়গা?" আমি বলিলাম,—'তুমি যাহা দয়া করিয়া দিবে, তাহাই খাইব। এ বেলা যদি কিছু চাউল দেও, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। আমার অন্ন খাইবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। চাল আছে ত?"

বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল,—"চাল আছে বৈ কি।'

অর্দ্ধ দণ্ড মধ্যে বৃদ্ধা আমার আহারের জন্য চাল, ডাল, তরকারি, তৈল, লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, গুড, সন্দেশ, ক্ষীর,—একে একে সমস্ত আনিয়া হাজির করিল। আমি অতি পরিতোষের সহিত কয়েক দিনের পর অন্নাহার করিলাম। আমার গাত্র-বস্ত্র ছিল না বলিয়া বৃদ্ধা একখানি 'দোহর' মোটা চাদর আনিয়া দিল। রাত্রে শয়নের জন্য একখানি খাটিয়া ও আর একখানি কম্বল পাইলাম।

সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া এই কয়েক দিনের পর আবেগশূন্য—দুশ্চিন্তাশূন্য হৃদয়ে সুখে নিদ্রা গেলাম।

রজনী কিরূপে যে অবসান হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। আনন্দের রজনী সুনিদ্রায় সুপ্রভাত হইল। পাখীদের সুমধুর স্বর তমসাচ্ছন্ন জগতে মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিল, নিদ্রিত বিষাদ-মণ্ডিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আবার হাসাইয়া

তুলিল। তরুণ অরুণের নবীন আলোক পূর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া অবনী-মণ্ডলকে হর্ষোৎফুল্ল করিল। আমিও ইষ্ট-দেবতার নাম করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করত বৃদ্ধার নিকট বিদায় চাহিলাম, কিন্তু সে আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল,—"দো চার রোজ হিঁয়া রহো, যব্ মেরা বেটা আ যায়, তো তুম্‌কো রাস্তা বাতায়গা, তো যানা।" আমার আর যাওয়া হইল না। আমি সেই পর্ব্বতবাসীদের অসামান্য আতিথেয়তায় পরম সুখে পাঁচ দিন কাটাইলাম। বর্ষীয়সীর পুত্র আসিল, সেও যেন আমার কতদিনের পূর্ব্ব-পরিচিত। আমাকে সুখে রাখিবার জন্য তাহারও বিশেষ যত্ন। সে আমাকে বলিল,—"যব্ তক্ বলওয়া (বিদ্রোহ) হায়, হাম আপকো যানে নেহি দেঙ্গে, ইয়ে ঘর্ আপ্‌কা হায়, কুছ্ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।" আমি সেখানে আর অধিক দিন থাকিতে কোনমতে স্বীকৃত হইলাম না। আমি পুনরায় সকৃতজ্ঞ চিত্তে মুগ্ধান্তঃকরণে আমার সেই আশ্রয়দাত্রী সরল-প্রতিমা প্রাচীনার নিকট বিদায় চাহিলাম। বৃদ্ধা আমাকে বিদায় দিবার সময় কতই কাঁদিতে লাগিল।

এত বিপদেও আমি পান্না-প্রদত্ত সেই মোহর কয়টী ছাড়ি নাই। যাইবার সময় বৃদ্ধার হাতে একটী মোহর দিলাম, কিন্তু বৃদ্ধা তাহা কোনোমতেই লইতে চাহিল না। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"যখন আমি তোমাকে 'মাতা' সম্বোধন করিয়াছি, তখন পুত্রের প্রদত্ত বলিয়া ইহা অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে।" এইরূপ অনেক কথা বলার পর সে মোহরটী লইল। কিন্তু আমাকে যে কাপড, চাদর এবং কম্বল দিয়াছিল, তাহা আর লইল না এবং বলিল,—"ইহা লইয়া না গেলে পথে তোমার কষ্ট হইবে।" কিন্তু কম্বল ভারী বলিয়া তাহা লইলাম না, কেবল কাপড ও চাদরখানি লইলাম। বৃদ্ধার স্নেহমাখা মুখ মনে করিয়া যাত্রা করিলাম।

বাইশ

প্রাতঃকালে বেরিলির রাস্তা দেখাইবার জন্য প্রাচীনার পুত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ আসিল এবং বহেড়ির রাস্তা দেখাইয়া সে স্ব-গৃহে প্রতিগমন করিল। আমি সেই প্রদর্শিত পথে বহেড়ি অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। প্রায সতের মাইল রাস্তা হাটিয়া উক্ত স্থানে পঁহুছিলাম। তখন সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। কোথায় থাকিব, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সহরের ভিতর যাইতে সাহস হইল না; কারণ, সেখানকার সকলেই বিদ্রোহী। আবার তাহাদের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইব মনে করিয়া, রাস্তার ধারে একটী বড় গাছের তলায় গেলাম। সেখানে তিনখানি অতি সামান্য দোকান রহিয়াছে। তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

সমস্ত দিন অনাহারী, ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, কিন্তু দ্রব্য-সামগ্রী কিনিবার ত পয়সা নাই। সঙ্গে দশটী মোহর আছে বটে, কিন্তু তাহা ত বাহির করিবার যো নাই। দোকানীরা জানিতে পারিলে, তাহার লোভে আমাকে তৎক্ষণাৎ খুন করিয়া ফেলিবে। আমি ভিক্ষাবৃত্তি-রূপ অতি সহজ উপায অবলম্বনে তিনখানি দোকান হইতে তিন মুষ্টি আটা (ময়দা) সংগ্রহ করত কাপড়ে রাখিয়া তাহাতে জল দিলাম। শেষে তাহার নেচি পাকাইয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া দগ্ধোদরের কথঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ করিলাম। শেসে বৃক্ষমূলে শয়ন করত পথশ্রম-জনিত কষ্টে শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। সে স্থান হইতে বেরিলি প্রায় তেইশ মাইল। আমি পথিমধ্যে শ্রান্তি দূর করত অতি কষ্টে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে ঠিক সন্ধ্যার সময বেরিলি উপনীত হইলাম। সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, হঠাৎ এক জন অপরিচিত ব্যক্তি আমার বস্ত্র ধরিয়া কহিল,—"বাবুজী! কাঁহা যাতে হো? মারে যাওগে? আও, হামরা পিছে পিছে চলে আও।" ইহা শুনিবামাত্র আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, বড়ই ভীত হইলাম। মনে হইল,—আবার আমার জন্য কি বিপদ্ ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে নিহিত রহিয়াছে তাহা ত জানি না। আমি দ্বিতীয় বাক্য না বলিয়া সেই লোকটার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। কিছু দূর গিয়া সে আপনার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, আমিও গেলাম। সে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া কহিল, "আপনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, আবার এখানে কেন আসিলেন?

আপনার ভ্রাতা বাবু কালীপ্রসাদ এবং এই সহরস্থ আরও ছয় জন বাঙ্গালীকে খাঁ বাহাদুর খাঁ কয়েদ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পায়ে বেড়ী দিয়া কোতওয়ালীতে রাখিয়াছেন। জনরব এই যে, বাঙ্গালীরা ইংরেজদের সকল সংবাদ দিয়া থাকে, এ জন্য তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইবে। আপনি এখানকার এক জন বিশেষ পরিচিত লোক। আপনাকে দেখিবামাত্রই খাঁ বাহাদুর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। আপনাকে যে আমার বাড়ীতে রাখিব, সে উপায়ও নাই; কারণ চারি দিকে গুপ্তচর ফিরিতেছে, তাহারা সন্ধান জানিতে পারিলে আপনার যে গতি, আমারও সেই গতি হইবে। এক্ষণে যাহাতে সকল দিক রক্ষা হয় এমন উপায় চিন্তা করুন।"

আমি এই আসন্ন বিপদের কথা শুনিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। বিশেষত মধ্যম সহোদর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দিভাবে রহিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া বক্ষঃস্থল যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বোক্ত লোকটী আমাকে আপনার গৃহে রাখিয়া চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বে সে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। কিন্তু আমার তাহা স্পর্শ করিবারও প্রবৃত্তি ছিল না, তবে লোকটার অনেক অনুরোধে কিছু আহার করিলাম।

যাহা হউক, এ লোকটী কে তাহা জানিবার জন্য কিছু উৎসুক হইলাম। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল,—"আমাদের রেজিমেণ্টে একজন বাজারের 'চৌধুরী' ছিল, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা।" আমি তাহার সদ্ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইয়া বলিলাম,—"যদ্যপি তুমি কোন প্রকারে আমাকে হাফিজ নিয়ামৎ খাঁর বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হই।" সে আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে উক্ত হাফিজ নিয়ামৎ খাঁর বাড়ীতে লইয়া গেল। যে সময়ে আমি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, সে সময়ে তিনি একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থান করত আমার অভ্যর্থনা করিলেন এবং অতি সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কহো ভাই! কাঁহাসে আয়ে, আব আপ্‌কা ইয়ে ক্যায় হালে হুয়া হায?" আমি আমার সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত আমূল বৃত্তান্ত একে একে সকলই জ্ঞাপন করিলাম এবং শেষে অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলাম,— "এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি এই শরণাপন্নকে রাখিতে হয় রাখুন, মারিতে হয় মারুন।" আমি তাঁহাকে ইহাও বলিলাম যে,—"খাঁ

বাহাদুর খাঁ সকল বাঙ্গালীর উপর খড়্গাহস্ত হইয়াছেন, আমি এখানে আছি জানিতে পারিলে হয় ত আমাকে এথান হইতে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন।” আমার এই কথা শুনিয়া হাফিজ নিয়ামত খাঁ সরোষে কহিলেন,—“ক্যা হামারে মোকান সে আপ্‌কো লে যায় গা? এইসা কেস্‌কা মক্‌দুর হ্যায়? আপ বে-খট্‌কে (নির্ভাবনায়) রহিয়ে।” আমি তাঁহার নিকট হইতে অভয় পাইয়া কিছু আশ্বস্ত হইলাম বটে, কিন্তু মধ্যম ভ্রাতার জন্য বড়ই কাতর হইয়া রহিলাম। কি উপায়ে তাহাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব, অনুক্ষণ সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

যে হাফেজ নিয়ামৎ খাঁর গৃহে আমি অতি যত্নে অতি সমাদরে এই কয়েকদিন কাটাইলাম, তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত। হাফেজ নিয়ামৎ খাঁ, খাঁ বাহাদুর খাঁর জাঠতুতো ভাই এবং বয়ঃকনিষ্ঠ। যখন খাঁ বাহাদুর খাঁ বেরিলির শাসনকর্ত্তা হইয়া মসনদে বসেন, তখন তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি নিয়ামৎ খাঁকে উজীর বা দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু নিয়ামৎ খাঁ তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন। হাফেজজী বড় চতুর এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় অভিপ্রায় এইরূপে ব্যক্ত করেন যে, সত্য বটে ইংরেজরাজ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের হস্ত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মিত মাসহারা পাইয়া থাকেন এবং ইংরেজরাজ ভাল ভাল উচ্চ পদ দিয়া তাঁহাদের প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এমন লোকের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করা কখন উচিত নহে। বরং যাহাতে ইংরাজেরা বিদ্রোহীদের দমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন, ইহাই তাঁহার কামনা ছিল। ইনি ইংরেজদের বিশেষ অনুগত ছিলেন বলিয়া খাঁ বাহাদুর খাঁ ইঁহাকে ভয় করিতেন এবং ইঁহার আশ্রিত ব্যক্তির উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইতেন না। যে দুশ্চিন্তা আমার এখন চির-সহচর, এমন নিরাপদ্ স্থানে আসিয়াও আমি সে চিন্তা হইতে কোন-ক্রমে অব্যাহতি পাই নাই। আমি সর্ব্বদাই ভ্রাতা কালীপ্রসাদের কথা ভাবিতাম। একদিন হাফেজজীকে কহিলাম,—“আমি নাইনিতালে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, এখানে আর অধিক দিন থাকিতে অভিলাষ নাই। আপনি যদি এ সময়ে আমার একটী উপকার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হই।” তিনি বলিলেন,—“আমার যতদূর সাধ্য আপনার উপকার করিতে কখন বিমুখ হইব না।” হাফেজজীকে আমি বিশেষ

জানিতাম। তাঁহার সহিত আমার ইতিপূর্ব্বে বিশেষ সদ্ভাব ছিল; তিনি তখন আমাকে অতিশয় খাতির করিতেন। এখন বিপন্ন বলিয়া তাঁহার সদাশয়তা এবং সখ্যভাব আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যাহা হউক, আমার প্রতি তাঁহার সদয়-ভাব দেখিয়া বলিলাম,—"আমার সহোদর কাশীপ্রসাদ ও আর ছয় জন আমাদের স্বদেশবাসীকে খা বাহাদুর খাঁ বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি যদি দয়া করিয়া কোন প্রকারে রেহাই কারামুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আজীবন অতি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই কথা স্মরণ করিব।" ইহা শুনিয়া হাফেজজী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমার ক্ষমতায় যতদূর হইতে পারে, তাহা আমি অতি অবশ্য করিব।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন।

তেইশ

আমার বেরিলিত্যাগের পর দিনই, দাতা কাশীপ্রসাদ এবং বেরিলিস্থ আর ছয় জন বাঙ্গালী নবাব খাঁ বাহাদুরের আজ্ঞায় কারারুদ্ধ হন। ইঁহারা যে কোন বিশেষ বা সামান্যও অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা নহে। অপরাধের মধ্যে ইঁহারা বাঙ্গালী। উত্তর-পশ্চিম-দেশবাসিগণের তখন সাধারণত ধারণা ছিল,—ইংরেজ ও বাঙ্গালী এক-দেহ এক-প্রাণ। বাঙ্গালী ইংরেজের গুপ্তচর, গুপ্তমন্ত্রী। বাঙ্গালী ইংরেজের দক্ষিণ হস্ত, সিন্দুকের চাবি, অঙ্গুরীর হীরা, ব্যঞ্জনের লবণ। স্বভাবতই বাঙ্গালী ইংরেজের পক্ষে। অতএব মার, ধর, বাঁধ বাঙ্গালীকে। এইরূপ বিশ্বাস-বশেই বেরিলির বাঙ্গালী কয় জন ধৃত হইয়া যমালয়-সদৃশ ভীষণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁহাদের নামে অভিযোগ উঠিল যে, ইঁহারা মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, ইংরেজের সহিত গোপনে চিঠিপত্র লেখালিখি করিতেছেন, এবং সংগোপনে ক্ষুধার্ত্ত ইংরেজকে রসদ যোগাইবার চেষ্টায় আছেন। বলা বাহুল্য, এ অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহার মূল নাই, অঙ্কুর নাই, ফুল ফল পত্র কিছুই নাই। অথচ কেবল সন্দেহ করিয়া ধারণা বশে ইঁহাদিগকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, শেষে প্রাণদণ্ডের আদেশ পর্য্যন্ত আসিল।

বর্ষাকাল। বেরিলির কারাগার তখন কর্দ্দমময়। ছাদ ফাটা। বর্ষা-জল নল দিয়া বাহিরে পড়ে না,—প্রায় সবটুকু গৃহাভ্যন্তরে পতিত হয়। কারাগৃহ

অধম গোশালা অপেক্ষাও অধম। তাহার উপর ছত্রিশ জাতিতে এক সঙ্গে একত্রে বাস করিতে হয়। তাহার উপর অত্যাচার উৎপীড়ন প্রহার বিলক্ষণ আছে। শয়ন, উপবেশন জন্য প্রত্যেক কয়েদী এক একখানি পুরাতন দুর্গন্ধময় ছেঁড়া চট পাইয়াছেন। তাহাকেই কাদায় বিছাইয়া বসিতে হয়, শুইতে হয়। পায়ে বিষম বেড়ী। অভ্যাস নাই, কোমল শরীর,—চতুর্থদিনে বেড়ীভারে কাশীপ্রসাদের পায়ে ঘা হইয়া উঠিল। আহারের ব্যাপার আরও বিভীষিকাময়। ঘোড়ায় যে দানা খায়, সেইরূপ দানা অর্দ্ধপোয়া হিসাবে প্রত্যেক কয়েদীর প্রতি বরাদ্দ ছিল। আর ইহার উপর ছাতু, জল, আর লঙ্কা। বাঙ্গালী কয়জনের কি কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে।

দাতা কাশীপ্রসাদ এবং অন্য ছয় জন বাঙ্গালী দুই দিন কাল অনাহারে ছিলেন। তৃতীয় দিনে এক জন ব্যতীত আর আর সকল বাঙ্গালীই সেই সুখাদ্য খাইতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্থ দিনে আদৌ কারাগারে আহার আসিল না। কারাকক্ষে হা হা রব পড়িয়া গেল।

যিনি প্রথম দিন হইতে অনাহারে ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ—উচ্চ বংশজাত, পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান্। কারাগারে তিনি অনাহারে কাহারও সহিত বড় একটা কথা কহিতেন না, আপন মনে নীরবে বসিয়া, হাতে পৈতা লইয়া, অন্তরে কেবল দুর্গা দুর্গা নাম জপ করিতেন। চতুর্থ দিনে অপরাহ্ণে তিনি আর সোজা হইয়া বসিতে পারিলেন না। সেই চটের উপর শুইয়া পড়িলেন। জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা কহিবার তাদৃশ শক্তি নাই। চারি দিন অনাহারে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে, গা ঝিম্ ঝিম করিতেছে।

কারা-ভবনের সকল গৃহগুলিই যে এরূপ ভগ্ন, তাহা নহে। হঠাৎ এক জন কারা-প্রহরী আসিয়া, কয় জন বাঙ্গালীকে একটু সম্মান দেখাইয়া ধীরভাবে কহিল,—"আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।"

বাঙ্গালী সাত জন প্রহরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সেই নিষ্ঠাবান হিন্দুকে ভ্রাতা কাশীপ্রসাদ ও আর এক জন বাঙ্গালী উভয়ে ধরিয়া লইয়া যান। কারণ, তখন তাঁহার চলৎশক্তি একরূপ রহিত হইয়াছিল।

সেই কারা-ভবনের ভিতর যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘর, সেই ঘরে সাত জন বাঙ্গালী প্রবেশ করিলেন। এ ঘরটী বৃহৎ, ভগ্ন নহে। দিব্য চূণকাম করা। পরিষ্কার, থট্‌থটে। চারি দিকে চারিটী জানালা এবং দুইটী দ্বার। সাতখানি 'খাটিয়া' পাতা। বারান্দায় সাত জনের বসিবার উপযুক্ত একখানি শতরঞ্চ বিছানো।

হঠাৎ এরূপ সমাদর দেখিয়া সাত জনই হতবুদ্ধি। হঠাৎ কেন এমন হইল? এই নরকে পচিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহারা স্বর্গে আসিলেন কেন?

হঠাৎ এক জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ লুচি, সন্দেশ, দধি, ক্ষীর আনিয়া উপস্থিত করিল। আর এক জন ব্রাহ্মণ পবিত্র পানীয় জল আনিল। সেই জলবাহক ব্রাহ্মণ সাত জনের সাতটী 'পাত' করিয়া দিল। লুচি সন্দেশ পরিবেশনের পর সে কহিল,—"বাবু সাহেব! খাইতে বসুন।"

বাঙ্গালী সাত জন অবাক্, মুগ্ধ! এ কি এ? কাশীপ্রসাদ ভাবিয়াছিলেন,—বোধ হয় অদ্য সন্ধ্যার পর আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে, তাই শেষ ভক্ষণ এত সমারোহে হইতেছে। কাশীপ্রসাদ বলেন,—"আর একটু হইলেই আমি কাঁদিয়া ফেলিতাম।"

এমন সময় একখানি পাল্কী কারাভবনে প্রবেশ করিল। বাহকগণ পাল্কী লইয়া ধীর পদে সেই সাত জন বাঙ্গালীর সম্মুখ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। পাল্কী হইতে এক অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী যুবতী রমণী বাহির হইলেন। ইনি গন্ধর্ব্বকন্যা, নাগকন্যা, না—যক্ষকন্যা? এই বিদ্যাধরীকে দেখিয়া কাশী-প্রসাদ ভাবিয়াছিলেন,—"আমরা বুঝি মায়ারাজ্যে আসিয়াছি, অথবা স্বপ্ন দেখিতেছি।"

কিছুক্ষণ পরে কাশীপ্রসাদ বুঝিলেন,—ইনি আর কেহই নহেন,—সেই পরোপকারিণী পান্না। কাশীকে দেখিয়া পান্নার চোখে জল টস্ টস্ পড়িতে লাগিল। কাশীও কাঁদিতে লাগিল।

পান্না কারাগারে আসিল কিরূপে? সাত জন বাঙ্গালীর কষ্ট দূর হইল কিরূপে? হঠাৎ এরূপ লুচি সন্দেশই বা আসিল কিরূপে? এ সমস্তই পান্নার কীর্ত্তি। অর্থে জগৎ বশ। তা, কারা-প্রহরিগণ কোন্ ছার? পান্না বিশেষ তদ্বির করিয়া, কারাধ্যক্ষকে বশ করিয়া, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে প্রত্যহ একবার করিয়া ঐ সাত জনের জন্য লুচি সন্দেশ প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী বাহির হইতে আসিত।

সেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ কারাকক্ষে লুচি সন্দেশ ভক্ষণ করেন নাই। ব্রাহ্মণ দ্বারা আনীত জলে ছোলা ভিজাইয়া খাইতেন এবং কমণ্ডলু সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল পান করিতেন।

এই এক মাস কাল আহারাদি যোগাইবার জন্য এবং প্রথম তদ্বিরের জন্য পান্নার প্রায় এক সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

কারাবাসের বিংশতি দিনে সাত জন বাঙ্গালীর প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল। কিন্তু কবে যে প্রাণদণ্ড হইবে, তাহার কিছুই ঠিক হইল না। তখন চারি দিকে কেবল আমার অন্বেষণ হইতে লাগিল। নবাব খাঁ বাহাদুর বলিয়াছিলেন,—"দুর্গাদাস বড়ই বদমাইস,—তাহাকে একান্তই গ্রেফতার করিতে হইবে। সে ধৃত হইলে একত্র এক দিনে আট জন বাঙ্গালীর প্রাণবধ করা হইবে।"

কারাবাসের দ্বাবিংশতি দিনে প্রকাশ পাইল,—পান্না সাত জন বাঙ্গালীকে কারাগৃহে গোপনে আহার যোগাইয়া থাকে। নবাব খাঁ বাহাদুর পান্নাকে ধরিবার জন্য বার জন সিপাহীকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। গুপ্তচর-মুখে পান্না এ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রচ্ছন্নবেশে বেরিলি ছাড়িয়া পলাইলেন। পান্না ধরা পড়িলেন না;—কিন্তু কারাধ্যক্ষ কর্ম্মচ্যুত হইল। আর প্রত্যেক বাঙ্গালীর দশ দশ বেতের হুকুম হইল। মহা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। আমাকে ধৃত করিবার জন্য নানা দিকে গুপ্তচর ফিরিতে লাগিল।

আমি এখন হাফিজ নিয়ামৎ খাঁর ঘরে বসবাস করিতেছি। কিন্তু বড়ই সভয়ে। কখন ধরে,—কেবল এই সন্দেহই মনোমধ্যে উদিত হইত। কিন্তু হাফিজ নিয়ামৎ বলিতেন,—"বাবুজি! ভয় কি? আপনি আমার লোক লইয়া স্বচ্ছন্দে বেরিলি সহরে ভ্রমণ করুন,—খাঁ বাহাদুরের সাধ্য কি যে আপনাকে গ্রেফতার করে?" হাফিজ দারুণ গোঁয়ার ব্যক্তি, তাহার কথা শুনিয়া আমি অবশ্যই বাটীর বাহির হইতাম না।

ভ্রাতার অচিরে প্রাণদণ্ড হইবে, ইহাতে মন যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহা লিখিয়া কত জানাইব? ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে আমারও প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী; কারণ আমি ত ভ্রাতার প্রাণদণ্ডকালে আর লুক্কায়িত থাকিতে পারিব না, অবশ্যই বাহির হইয়া পড়িব। তখন নবাবের প্রহরিগণ আমাকে ধরিয়া সকলের সহিত একই স্থানে নিশ্চয় হনন করিবে। করি কি? উপায় কি? উদ্ধারের বিষয় হাফিজ সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিব কি? কিন্তু তিনি যেরূপ উদ্ধত-স্বভাব এবং নবাবের প্রতি খড়্গহস্ত, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা।

হাফিজ নিয়ামতের বাটীর সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র বাগান ছিল। সেই বাগানেই আমি থাকিতাম এবং স্বয়ং কূপ হইতে জল তুলিয়া আহারাদি করিতাম। কেবল হাফিজ সাহেব যখন তাঁহার বৈঠকখানায় বসিতেন, তখনই আমি তাঁহার নিকট যাইতাম।

আমি এক দিন নির্জ্জনে পাইয়া হাফিজ সাহেবকে ধরিয়া বসিলাম,—"সাত জন বাঙ্গালীকে উদ্ধার আপনাকেই করিতে হইবে, আপনি ভিন্ন গতি নাই।"

এই কথা শুনিয়া হাফিজ সাহেব যে উত্তর দেন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

চব্বিশ

পাঠক জানেন, হাফিজ নিয়ামৎ খাঁ বেরিলির বর্ত্তমান নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর অতি নিকট সম্পর্কীয়। উভয়ে খুড়তুত-জাঠতুত ভাই। হাফিজ ছোট, খাঁ বাহাদুর বড। উভযেই নবাব-বংশীয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে উভয়েই ইংরেজ-বাজের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট মাসহারা পাইতেন এবং উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্রোহ ঘটিলে, অবশ্যই উভয়েরই চাকুরী গেল এবং মাসহারা বন্ধ হইল।

বিদ্রোহের পূর্ব্বে নবাব খাঁ বাহাদুর অধিক সম্ভ্রান্ত এবং সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। হাফিজ নিযামৎ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, তাহার মান-খাতির সম্ভ্রম খাঁ বাহাদুর অপেক্ষা কিছু কম হইলেও নিতান্ত ন্যূন ছিল না। ঐ হাফিজের এক পুত্র আমার বাসায় সেতাব বাজাইতেন। ইনিই জ্যেষ্ঠ,—চুন্না মিঞা বলিয়া লোকে ডাকিত। পাঠকের স্মবণ আছে ত,—এই চুন্না মিঞাই এক্ষণে খাঁ বাহাদুরের চাকুরী স্বীকার করিয়া হলদোয়ানি প্রদেশেব গবর্ণরী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মৌলবী ফজল হক্ আমাকে হলদোযানিতে তোপে উড়াইবাব আজ্ঞা দিলে এই চুন্না মিঞা দ্বারাই আমি রক্ষা পাই।

হাফিজ নিযামতের আর এক পুত্র ছিল। তাহাব বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে কি? সুন্দর, সু-পুরুষ। তিনি পিতার পরম প্রিয়পাত্র, রাজ-ভোগে তাঁহার দেহ মাংসল, লাবণ্যযুক্ত, তেজোময়, সুদৃঢ় এবং সুদীর্ঘ—হঠাৎ দেখিলে মনে হয় পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবাপুরুষ। ইঁহাব নাম ছম্মন খাঁ।

চুন্না মিঞা হাফিজ নিযামতের জ্যেষ্ঠপুত্র; ছম্মন খাঁ কনিষ্ঠ। চুন্না মিঞা আমার সুহৃদ্ ছিলেন, সেই জন্য ছম্মন খাঁ আমাকে সম্মান ও ভক্তি করিতেন। বিদ্রোহের পূর্ব্বে ছম্মন খাঁ আমাব বাসায যাইতেন, কিন্তু আমার সাক্ষাতে সেতার বাজাইতেন না বা তামাক খাইতেন না।

নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর এক পরম রূপবতী গুণবতী কন্যা ছিল। পিতা ঐ কন্যাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। কন্যা পিতার অতীব আদরের, সোহাগের এবং যত্নের ছিল। কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। নানা স্থান হইতে, নানা দূরদেশ হইতে কন্যার সম্বন্ধবার্ত্তা লইয়া দূতগণ আসিতে লাগিল। রূপগুণের কথা শুনিয়া কত কত দূর-দেশস্থ প্রতাপবান্ নবাবপুত্র সেই কন্যার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু পিতা খাঁ বাহাদুর দূরদেশে কন্যার বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত নবাবগৃহে কন্যা সম্প্রদান করিতে পিতার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কেন না, তিনি জানিতেন, খুব বড় ঘরে কন্যা পড়িলে প্রতি তিন বৎসর অন্তর কন্যার একবার মুখটী দেখিতে পাইবেন কি না সন্দেহ। বরটী তাঁহার বাটীর নিকটবর্ত্তী হইবে, অথচ ধনবান্, সম্ভ্রান্ত, সদ্বংশজাত ও শুভলক্ষণযুক্ত হইবে। কিন্তু এরূপ বর সহজে মিলে কৈ?

কিয়দ্দিন পরে অতি নিকটেই বর মিলিল। খাঁ বাহাদুর খাঁ হাফিজ নিয়ামতের কনিষ্ঠ পুত্র ছম্মন খাঁর সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। এ বিবাহে কেহ সন্তুষ্ট, কেহ অসন্তুষ্ট হইল। খাঁ বাহাদুর কিন্তু পরম পরিতুষ্ট। কেন না, অনেক সময় কন্যা তাঁহার কাছেই থাকিতে পারিবে। প্রতিবেশিমণ্ডলী ভাবিল,—এ কি হইল? বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর, কোটীপতি নবাব-পুত্র পর্য্যন্ত এই কন্যাকে বিবাহের জন্য লালায়িত হইতেন,—এরূপ সুপাত্রে কন্যাদান না করিয়া খাঁ বাহাদুর হঠাৎ ছম্মন খাঁকে কন্যা অর্পণ করিলেন কেন? ছম্মন খাঁ অবশ্যই নবাব-বংশীয় বটেন, কিন্তু তাদৃশ সঙ্গতি ত নাই। যিনি যাহাই বিচার-বিতর্ক করুন, শুভ-বিবাহ শুভদিনে অতি সমারোহে সম্পন্ন হইল। জামাতা ক্রমশঃ শ্বশুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাফিজ নিয়ামৎ উদ্ধত-স্বভাব। কনিষ্ঠ পুত্রকে শ্বশুর-বাড়ী সদা যাতায়াত করিতে দেখিয়া তিনি চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। এক দিন প্রকাশ্যেই বলিলেন,—"খাঁ বাহাদুর আমার পুত্রকে মন্ত্রবলে বশ করিয়াছে। উহাকে শ্বশুরবাড়ী প্রত্যহ যাইতে দিব না। এক মাস অন্তর যাইবে।" যথাসময়ে অপরাহ্নে খাঁ বাহাদুরের বাটী হইতে ছম্মন খাঁকে লইতে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। হাফিজ নিয়ামৎ রাগিয়া বসিয়া ছিলেন,—অনর্থক কোচম্যানকে কতকগুলা গালাগালি দিলেন। সেই কটূক্তির মর্ম্ম এইরূপ,— "আমি আমার ছেলেকে কিছু বেচিয়া খাই নাই। বেবো ব্যাটারা আমার

কল্য এত সদয় ছিলেন, অগ্য হঠাৎ এত নির্দ্দয় হইলেন কেন? তবে কি আমি ধরা পড়িয়াছি? আমি যে হাফিজজীর ভবনে লুক্কায়িত আছি, তাহা নবাব খাঁ বাহাদুর জানিতে পারিয়া আমাকে ধরিয়া দিবার জন্ত কি অনুরোধ করিয়াছেন? শরণাগত ব্যক্তিকে বধাকাঙ্ক্ষী শত্রুর হস্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে,—তাই কি হাফিজজী এত কাতর হইতেছেন?

আমার নিদ্রা নাই,—আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম।

পঁচিশ

প্রত্যুষ। আমি মুসলমান-গৃহে মুসলমান-প্রদত্ত শয্যায় শয়ান। নিদ্রাও নহে, জাগরণও নহে, অথচ তন্দ্রাও নহে,—আমি তখন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর। এই উঠি উঠি,—আর উঠিতে পারি না; এই চক্ষু চাহি চাহি,—আর চাহিতে পারি না; এই কথা কহি কহি,—আর কহিতে পারি না। একবার বলপূর্ব্বক সাহসের সহিত চক্ষু চাহিলাম,—এ চাহনির মাত্রা পূর্ণ নহে, অর্দ্ধ। আলোক-সুন্দরীর উঁকিমারাটুকু দেখিয়াই অমনি নয়ন যুগল মুদ্রিত করিলাম। সুন্দরীর শুভাগমনে বুঝিলাম আর বিলম্ব নাই, এখনি গাত্রোত্থান করিতে হইবে,—এখনি সাজ-সজ্জা পরিয়া ভব-রঙ্গভূমে অভিনয় আরম্ভ করিতে হইবে!—জানিনা, অদৃষ্টে কি আছে! আজ কিসের পালা অভিনীত হইবে!—আজ কারাদণ্ড না প্রাণদণ্ড, মুক্তি না পলায়ন?

চক্ষু বুজিয়া এইরূপ ভাবিতেছি,—এমন সময় জুতার শব্দ পাইলাম। এত ভোরে অন্দরের দিক্ হইতে কে আসিতেছে? হাফিজজীর পায়ের শব্দ নয়? কেহ জাগে নাই, কেহ উঠে নাই, এরূপ অনুদয়ে হঠাৎ তিনি আজ উঠিলেন কেন? উঠিয়াই বহির্ব্বাটিতে আসিতেছেন কেন?—এই যে,—দেখিতেছি, তিনি আমার দিকেই অগ্রগামী হইতেছেন! ব্যাপার কি? গতিক কি? বুঝি আমার বধ বা বন্ধন নিকট,—তাই হাফিজজী আমাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিবার জন্যই এত প্রাতঃকালেই অন্তঃপুর হইতে আসিতেছেন।

আর অধিক ভাবিতে হইল না। ঈষৎ দূরে দাঁড়াইয়া হাফিজজী আমাকে বলিলেন,—"বাবু সাহেব! এখনও আপনার ঘুম ভাঙ্গে নাই কি? উঠুন, প্রভাত-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে।"

আমার প্রাণ তখন দুরু-দুরু করিতেছে। আমার প্রকৃতই তখন মনে হইল, যমদূত বুঝি ডাকিতেছে।

হাফিজজী। আসুন,—আমরা দুই জনে ঐ ফলবাগানে যাই চলুন।

আমি উঠিয়া কোন কথা কহিলাম না,—কেবল সসম্মানে হাফিজজীকে একটী সেলাম করিলাম। তিনিও কোন বাক্যব্যয় করিলেন না।

তিনি আগে আগে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ,—এইভাবে যাত্রা হইল। উদ্যানে গিয়া দেখি, হাফিজজীর কনিষ্ঠপুত্র ছম্মন খাঁ তথায় এক চৌকির উপর উপবিষ্ট। পিতার আগমন দূর হইতে দেখিয়া পুত্র জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। নিকটবর্ত্তী হইলে সে আমাদের উভয়কে যথাবিধি অভিবাদন করিল। নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র আসনে আমরা বসিলে, ছম্মন খাঁ আপন আসনে উপবেশন করিল।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ অবস্থিত। হাফিজজীর বদন গম্ভীর, চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত। অবশেষে তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"অদ্যকার পরামর্শ গুরুতর। কার্য্য সাধন অতীব কঠিন। কিন্তু তাহা করিতেই হইবে।"

আমার মনে হইল,—এইবার বুঝি খাঁ বাহাদুরের হাতে আমাকে ধরাইয়া দিবার কথা উঠিবে।

হাফিজজী। সে কাজ আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। পুত্র! তোমাকে সে কাজ করিবার ভার লইতে হইবে।

ছম্মন খাঁ জোড়হাতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তখনি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।'

আমার ঠিক এইরূপ মনে হইল,—চক্ষুলজ্জাবশত হাফিজজী স্বয়ং আমাকে ধরাইয়া দিতে স্বীকার নহেন। পুত্রকে দিয়া এ পাপ কাজ করাইবেন,—তাহারই বোধ হয় ভূমিকা করা হইতেছে।

হাফিজজী ছম্মন খাঁকে সম্বোধন করিয়া অতি মধুরস্বরে কহিলেন,—"পুত্র! তুমি আমার প্রাণতুল্য। তোমাকে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

ছম্মন খাঁ পূর্ব্ববৎ যুক্তকরে কহিল,—"আপনি আজ্ঞা করুন। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। সূর্য্য বরং পশ্চিম দিকে উদয় হইতে পারে, তথাচ আমি আপনার কথার অবাধ্য হইতে পারি না। আপনার কার্য্যে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ।"

হাফিজজী। পুত্র! তুমি জান, শরণাগতকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করে, তাহার নরকেও স্থান হয় না। এই বাবু দুর্গাদাস আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ ইঁহাকে ধৃত করিবার জন্য, ইঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য নূতন নবাবের চরগণ চারি দিকে ফিরিতেছে। আমি ইঁহাকে এক্ষণে ছাড়িয়া দিলে, ইঁহার আর নিস্তার নাই। একবার বেরিলি সহরে বহির্গত হইলেই নিশ্চয়ই দুর্গাদাস ধৃত হইবেন। আমার বাটীতে ইঁহাকে আর এরূপভাবে গোপনে রাখাও উচিত হইতেছে না। মানুষ কয়দিন লুকাইয়া থাকিতে পারে? দুই-চারি দিন মধ্যে নিশ্চয় প্রকাশ হইবে,—দুর্গাদাসকে আমি আশ্রয় দিয়াছি, আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি, এই সূত্র লইয়া তোমার শ্বশুরের সহিত আমার বিষম বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। এখন হইতেই ইহার উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য।

হাফিজজীর এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে আমার প্রাণ যেন কণ্ঠাগত হইয়া উঠিল। কখন তাঁহার মুখ দিয়া কি কথা বাহির হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আমি যেন মৃতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলাম।

হাফিজজী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"দেখ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।"

এই অমৃতময় বাক্য শুনিয়া আমার দেহে প্রাণ আসিল।

হাফিজজী। যে কোন উপায়ে হউক, দুর্গাদাসকে এবং কারাগারস্থ আর সাত জন বাঙ্গালীকে এ যাত্রা রক্ষা করিতে হইবে।

ছম্মন খাঁ। (জোড়হাতে) কি উপায় আছে, চিন্তা করিয়া আমাকে বলুন, আমি আপনার কথা অনুযায়ী এখনি সে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।

হাফিজজী। কি উপায় আছে বল দেখি? তোমার মনে কি কোন সৎ যুক্তি আসিতেছে না?

ছম্মন। কৈ, আমি ত কিছু দেখি না। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজের সাহায্যকারী বলিয়া অভিযুক্ত, যাহারা আজ কারারুদ্ধ, অচিরে যাহাদের প্রাণ-দণ্ড হইবে, তাঁহাদিগকে রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না। বিশেষ, বাবু দুর্গাদাসকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার জন্য দেওয়ান শোভারাম একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য চারি দিকে গুপ্তচর বেড়াইতেছে। এরূপ স্থলে রক্ষার ত সহজ উপায় দেখি না। তবে আমি বিশেষ তদ্বির ও চেষ্টা করিলে, এক দুর্গাদাস বাবুকে বাঁচাইতে পারি।

হাফিজজী। সে কিরূপ উপায়? তদ্বিরই বা কিরূপ?

ছম্মন। ছদ্মবেশে এ রাজ্য হইতে বাবু দুর্গাদাসের পলায়ন ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। অতি সাবধানে তাঁহাকে পলাইতে হইবে, এবং যতক্ষণ না তিনি এ রাজ্য পার হন, ততক্ষণ তাঁহার সহিত আমাকে স্বয়ং থাকিতে হইবে। পথে কোনরূপ বিপদ্ ঘটিলে আমি নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে পারিব। ইহা ভিন্ন আমি ত অন্য উপায় আর কিছু দেখি না।

তখন আমি কাতর-স্বরে কহিলাম,—"তাহাও কি কখনও হয়? আমার প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, এরূপ স্থলে আমি পলাইতে পারিব না। সাত জন বাঙ্গালীর প্রাণদণ্ড হইবে,—আমার ভ্রাতা কাশীপ্রসাদের প্রাণদণ্ড হইবে,—ইহা শুনিয়া আমি কেমন করিয়া পলাইব? আমি পলাইতে পারিব না। আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কাপুরুষের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, অধমের ন্যায়, নৃশংস পশুর ন্যায়, ভাইকে ছাড়িয়া, আত্মীয়-স্বজনকে এ বিপদে ছাড়িয়া পলাইতে পারিব না। আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি স্বচ্ছন্দে গিয়া খাঁ বাহাদুরকে ধরা দিই। যদি মরিতে হয়, যদি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়,—তবে সকলের সহিত একত্রই মরিব, একত্রই ঝুলিব।"

সেই সময় বালক কাশীর কারাকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার চক্ষে জল আসিল।

হাফিজজী আমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন,—"বাবু সাহেব, ভাবিবেন না,—আমার দেহে প্রাণ থাকিতে আপনাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে দিব না।"

আমি। নিজের প্রাণের মায়ায় আমি কাঁদি নাই। বিপাকে বন্দী হইয়া কাশী যে অকালে প্রাণ হারাইতে বসিল,—ইহা ভাবিয়াই আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। আমাকে রক্ষা করিতে হইবে না, আপনি কাশীকে রক্ষা করুন, আমার প্রাণ লইয়া কাশীকে জীবিত করুন,—ইহাই আমার প্রার্থনা।

হাফিজজী। স্থির হউন, চিন্তা নাই, আমি সকলকেই বাঁচাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। এই ছম্মন খাঁ মনে করিলে সকলকেই বাঁচাইতে পারে। মৃত্যু বা জীবন—সমস্তই ছম্মনের করতলগত।

আমি। (সাগ্রহে) বলেন কি! বলেন কি!

পুত্র ছম্মন খাঁ আপন আসন হইতে উঠিয়া যুক্তকরে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"পিতৃদেব! আপনি আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে

হইবে। বলুন, কোন্ কার্য্য দ্বারা ইহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

হাফিজজী। কাজ কিছুই কঠিন নয়। এ কাজ অতি সহজ, সরল এবং প্রীতিজনকও বটে।

এই কথা বলিতে বলিতে হাফিজজী একটু হাসিলেন। হাস্যমুখে আবার তিনি বলিলেন,—"বেটা! আজ বুঝিব তোর কত ক্ষমতা।"

আমি স্তম্ভিত। ছম্মনও চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরবে অবনত বদনে দণ্ডায়মান।

হাফিজজী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"বাবু সাহেব! আমার কনিষ্ঠ পুত্র-বধূকে উহার পিতা খাঁ বাহাদুর যত ভালবাসেন, এ সংসারে ততটা আর কাহাকেও নহে। পুত্রবধূর কথা তিনি কখনই লঙ্ঘন করিতে পারেন না। আকাশের চাঁদ যদি বধূ চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাহাই আনিয়া দিতে হইবে, অথবা আনিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন—চেষ্টা করিতে হইবে। এই কন্যা প্রাণাপেক্ষাও তাঁহার প্রিয়তম। কন্যার মুখ তিনি একদণ্ড না দেখিলে বাঁচেন না। কিন্তু কি করেন, বিবাহ দিয়াছেন, আমার হাতে পড়িয়াছেন, কাজেই প্রত্যহ তিনি কন্যাকে দেখিতে পান না। এই কয়েক দিন আমি বধূকে পিতৃগৃহে পাঠাই নাই,—ইহাতে নিশ্চয়ই তিনি জীবন্মৃত হইয়া আছেন। পুত্র! তুমি গিয়া এখনি বধূর নিকট এই কথা বল, বধূ যেন এখনি গিয়া সাত জন বন্দী বাঙ্গালীর মুক্তি চাহিয়া আনে। দেখ ছম্মন! আমার বধূকে তুমি আমার নাম করিয়া বলিবে,—তোমার স্ত্রীকে তুমি তোমার নাম করিয়া, অবশেষে আল্লার শপথ করিয়া বলিবে,—সে যেন পিতার কাছে এই সাত জন বাঙ্গালীর এখনি প্রাণ ভিক্ষা করিয়া আনে। এ জন্য বধূকে যদি তাহার পিতার চরণতলে সমস্ত দিন রোদন করিতে হয়, তাহাও তাহাকে করিতে বলিবে। আরও এক কথা বলিবে যে, এই শেষ! বধূ যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তবে তাহার সহিত আমার এই শেষ—তাহার এ বাটীতে আগমন এই শেষ। ছম্মন! তুমি ইহাতে রাজী আছ ত? তুমি কোরান স্পর্শ করিয়া প্রাণের কথা বল, আমার এই শেষ আদেশ পালনে তুমি স্বীকৃত আছ কি না?"

হাফিজজী একখানি হস্তলিখিত কোরান পুত্রের সম্মুখে ধরিলেন। পুত্র কোরান স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন,—"আমার স্ত্রী যদি এই সাত জন বাঙ্গালীকে উদ্ধার করিয়া দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে, আমার স্ত্রীর সহিত অদ্য এই শেষ সন্দর্শন,—এ কথা একবার নহে, দশবার আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিব।"

পিতাপুত্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং কার্য্য দেখিয়া আমি অবাক্! আমি কিন্তু আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি কহিলাম,—"এরূপ প্রতিজ্ঞা কখনই হইতে পারে না। ইহা অসম্ভব, অপূর্ব্ব এবং নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা। আপনার বধূর বহু যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও খাঁ বাহাদুর যদি সাত জন বাঙ্গালীকে খালাস না দেন, তাহা হইলে বধূর দোষ কি? বধূকে আমার জন্ম জন্মের মত অনাথিনী করেন কেন? সেই নিরপরাধিনী বালিকার মস্তকে শুধু শুধু বজ্রাঘাতের আদেশ কেন করিলেন? আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন। প্রকারান্তরে আমাকে আপনি স্ত্রীহত্যার পাতকে পাতকী করিবেন না।"

গম্ভীরভাবে অবনত-বদনে আমি এই কথা বলিয়া হাফিজজীর মুখপানে চাহিলাম। সম্মুখে দেখি ছম্মন খাঁ আর নাই, সে পিতার আদেশ পালনার্থ অন্দরাভিমুখে স্ত্রীর নিকট ছুটিয়াছে।

হাফিজজী হাসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনি ভীত হইবেন না। আপনাদের উদ্ধার নিশ্চয়। কন্যা খাঁ বাহাদুরের প্রাণ। চিন্তা নাই, চলুন, অন্য উত্তমরূপে আহারের উদ্‌যোগ করুন।"

এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাঁহার বৈঠকে বসিলাম।

ছাব্বিশ

আহারীয় সামগ্রীর আয়োজন প্রচুর হইল বটে, সমগ্র সামগ্রী যথানিয়মে রন্ধনও করিলাম বটে, কিন্তু আহারে রুচি হইল না। বার আনা জিনিষ পাতে পড়িয়া রহিল। চিত্ত উদ্বেগপূর্ণ, সর্ব্বদাই চারি দিকে বিভীষিকা দর্শন,—ঐ জল্লাদের শাণিত কুঠার, ঐ হাফিজজীর পুত্রবধূর অনাথিনী বেশ, ঐ কাশীপ্রসাদের কাতর-কণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ,—সর্ব্বদাই এইভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ,—অন্ন ভাল লাগিবে কেন?

কেবল আমার নহে, হাফিজজী এবং তাঁহার পুত্র—উভয়েই আজ উৎকণ্ঠিত, উভয়েই কেমন সশঙ্কিত ভাবময়। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিল। হাফিজজীর ভবন আলোকমালায় বিভূষিত হইল। আমার অন্তর কিন্তু পূর্ব্ববৎ অন্ধকারময়ই হইয়া রহিল।

এমন সময় ষোল জন অশ্বারোহী সৈন্য, পাল্কীসহ বেহারা আট জন এবং এক জন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী নবাব বাহাদুরের বাটী হইতে হাফিজজীর গৃহে আসিয়া উপনীত হইল। সংবাদ কি? জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম,—জামাতা ছম্মন খাঁকে লইতে নবাব খাঁ বাহাদুর লোক পাঠাইয়াছেন। ছম্মন খাঁ হর্ষোৎফুল্ললোচনে আমাকে বলিলেন,—বাবু সাহেব! কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আর ভাবনা নাই। আপনার ভ্রাতা ও অন্যান্য বাঙ্গালীগণ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবেন।"

আমি। কিসে বুঝিলেন?

ছম্মন। আমার স্ত্রীকে প্রাতে যখন আমি নবাব বাহাদুরের বাটীতে পাঠাই, তখন এই কথা স্পষ্টত বলিয়া দিই,—"বুঝি তোমার সহিত এই শেষ দেখা! যদি তোমার পিতাকে বলিয়া এই সাত জন বাঙ্গালীকে খালাস করিতে পার, তাহা হইলেই আমাকে লইতে লোক পাঠাইও। নচেৎ তোমার পিতাকে নিষেধ করিও, তিনি যেন আমাকে তথায় আর লইয়া না যান।" তাই বলিতেছি, যখন আমাকে লইতে লোক আসিযাছে, তখন নিশ্চযই শুভ সংবাদ।

আমি। আপনি শীঘ্র শ্বশুরবাড়ী গমন করুন।

ছম্মন। পিতার আদেশ ভিন্ন আমি ত যাইতে পারিব না। তিনি এখন অন্দরে আছেন, বাহিরে আসিযা অনুমতি দিলেই যাইব।

সেই রাজকর্ম্মচাবী একখানি পত্র, ছম্মনেব হস্তে দিল। পত্র গালামোহর আঁটা এবং হাফিজ নিযামতের শিবোনামাঙ্কিত।

পত্র লইয়া পুত্র পিতাকে অন্দরে দিতে গেলেন। পিতা তৎক্ষণাৎ পুত্রকে সঙ্গে লইযা বাহিবে আসিলেন এবং হাসিতে হাসিতে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"বাবু সাহেব! চিন্তা নাই, কল্যই নিষ্কৃতি। ভগবান্ রক্ষা করিলে কেহই মারিতে পারে না। খাঁ বাহাদুর লিখিয়াছেন,—এই সাত জন বাঙ্গালীর কল্য প্রাতে ফাঁসি হইবার কথা ছিল। আর ভয় নাই, কল্যই সকলে নিষ্কৃতি পাইবে। কারামুক্তিব আজ্ঞা অদ্য রাত্রেই কারাধ্যক্ষের নিকট গিয়াছে। তবে এক কথা, তিনি এই লিখিয়াছেন,—এই সাত জন বাঙ্গালী বেরিলি সহরে বা তাঁহার রাজ্যের সহরদ্দ মধ্যে থাকিতে পাইবে না। উপযুক্ত লোক ও ছাড়পত্র দিয়া কল্যই তাঁহাদিগকে রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসা হইবে।"

আমি। এ আদেশ অতি উত্তমই হইয়াছে। এখানে না থাকিলেই মঙ্গল। আমিও কল্য উহাদের সহিত যাত্রা করিব।

হাফিজজী। তাহা হইবে না। আপনার উপর খাঁ বাহাদুরের বিশেষ জাতক্রোধ। আপনাকে পথে দেখিতে পাইয়া যদি ধরাধরি করে বা অন্য কোন গোলযোগ বাধায়, তাহা হইলে রক্ষা করা মুস্কিল হইবে।

আমি। তবে উপায় ?

হাফিজজী। ভাবনা কি ? উহারা প্রাতে নগরের বাহির হইবে ; আপনি আহারাদির পর দুপুরবেলা প্রচ্ছন্নভাবে ছদ্মবেশে যাত্রা করিবেন।

আমি। তাহা হইলে আমি উহাদের নাগাল ধরিতে পারিব কেন ? উহাদের বহির্গমনের এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পরে আমাকে যাত্রা করিতেই হইবে।

হাফিজজী। আচ্ছা, কল্য প্রাতে এ সম্বন্ধে যাহা হয় হইবে। আপনি অদ্য রাত্রে উত্তমরূপ আহারাদিপূর্ব্বক সুখে নিদ্রা যাউন।

তখন পিতার আদেশে ছম্মন খাঁও শ্বশুরবাড়ী গমন করিলেন।

সূর্য্য উদয় হইতে না হইতেই ছম্মন খাঁ শ্বশুর-বাটী হইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"এত প্রভাতে কেন ? সংবাদ ভাল ত ?" ছম্মন উত্তর করিলেন,—"সমস্তই মঙ্গল। আপনার ভ্রাতা প্রভৃতি বাঙ্গালীগণ এতক্ষণ কারাগার হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবে,—আপনি প্রস্তুত হউন ; আপনাকে দুই ঘণ্টা মধ্যে উহাদের অনুসরণ করিতে হইবে এবং আমি সঙ্গে গিয়া আপনাকে এ নগরের বাহির করিয়া দিয়া আসিব। কারণ, আমি সঙ্গে থাকিলে, আপনাকে পথিমধ্যে কেহই ধরিতে পারিবে না।"

আমি। আপনার কথায় বড়ই অনুগৃহীত হইলাম। আমার আর উদ্-যোগ কি আছে—সঙ্গে কিছুই নাই, লইয়া যাইব কি ? আমি যাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

ছম্মন। আমাদের সঙ্গে জিনিষপত্র একটা মুটে করিয়া লইলে ভাল হইত। আপনার নিকট কি টাকা-কড়ি কিছুই নাই ?

আমি তখন প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া কহিলাম,—"আমার কাছে একটী মোহর আছে,—সেইটী ভাঙ্গাইয়া দিলে ঘটী, বাটী, কাপড় এবং কিছু ভাল আটা কিনিয়া লইয়া যাই।"

ছম্মন। মোহর এখন ভাঙ্গাইবার দরকার নাই ; আমি পাঁচটী টাকা দিতেছি, তাহাতেই আপনার আবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করুন।

আমি নানা কারণ দর্শাইয়া সে টাকা লইলাম না,—মোহর একটী ভাঙ্গাইলাম। হাফিজ নিয়ামতের এক জন কর্ম্মচারী আমার জিনিষপত্র বাজারে কিনিতে গেল।

আমার মনে বড় কৌতূহল জন্মিয়াছিল। কেবল কন্যার কথাতেই কিরূপে হঠাৎ নবাব খাঁ বাহাদুর সাত জন বাঙ্গালীকে খালাস দিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমি একান্ত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমি ছম্মনকে বলিলাম,—"আমি ত অদ্যই চলিলাম, আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে, যদি কোন দোষ না লন তবে বলি।"

ছম্মন। আপনি বলুন। আপনার কথায় দোষ লইব কেন?

আমি। আমাদিগের এরূপ হঠাৎ মুক্তি হওয়াতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আপনার স্ত্রী গিয়া নবাব বাহাদুরকে কি বলেন এবং নবাব বাহাদুরই বা সে কথার কি উত্তর দেন,—আপনি যদি সে বিষয় আপনার স্ত্রীর নিকট হইতে জানিয়া থাকেন, তবে আমাকে বলুন। ইহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিযাছে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলে, কোনরূপ কোন পক্ষে যদি দোষ ঘটে, তাহা হইলে বলিয়া কাজ নাই।

ছম্মন খাঁ হাসিলেন। বলিলেন,—"কথা বিশেষ কিছুই হয় নাই। আমার শ্বশুর সিদ্ধির নেশায় ছিলেন এবং সরবৎ খাইতেছিলেন; এমন সময় আমার স্ত্রী গিয়া পৌছিল। পিতার চরণতল ধরিয়া কন্যা কাঁদিতে লাগিল, নবাব বাহাদুর কন্যার ক্রন্দন দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। পিতার অনেক সাধ্য-সাধনার পর কন্যা সকল কথা ব্যক্ত করিল। নবাব বাহাদুর শুনিয়া হাসিযা বলিলেন,—'ইয়ে ক্যা বড়ী বাত হ্যায়? হাম অভি ছোড় দেঙ্গে।' ইহা ব্যতীত আমার স্ত্রীর সহিত শ্বশুরের আর কোন কথা হয নাই।"

দেখিতে দেখিতে আমার বাজার আসিযা পৌছিল। হাফিজজীও অন্দর হইতে সদরে আসিলেন।

এক জন চর সংবাদ আনিল,—সাত জন বাঙ্গালীর পায়ের বেড়ী মুক্ত করিয়া, চারি জন অশ্বারোহী তাহাদিগকে সহরের বাহিরে লইয়া যাইতেছে।

এ সংবাদ পাইবামাত্র আমিও হাফিজজীকে বলিলাম,—"যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি আমার ভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হই। বিশেষত তাঁহাদের নিকট পাথেয় কিছুই নাই, আমাকে শীঘ্র অনুমতি দিন।" হাফিজ নিযামৎ খাঁ অতি সদাশয় সজ্জন ব্যক্তি। তিনি এই কথা শুনিয়া আপনার

কনিষ্ঠপুত্র ছম্মনকে কহিলেন,—"বাবুকে সহর পার করিয়া দিয়া আইস। আর বাবুর যাহা-কিছু আসবাব আছে, তাহা এক জন বাঁকী দ্বারা লইয়া যাও।" বটের নামক পাখী শিকার করিবার জাল বাঁকে চাপাইয়া ছম্মন খাঁ অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। আমরা দুই জন পদব্রজে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সহর হইতে বাহির হইবার সময় প্রহরীরা আমাদের দুই জনের গতিরোধ করিয়া কহিল, "কাঁহা যাতে হোঁ?" ছম্মন অশ্বরজ্জু সংযত করত তাহাদের প্রতি সকোপ দৃষ্টিতে কহিলেন,—"ইযে দোনো আদমি হামারা সাত হ্যায়, হাম বটেরকে শিকারকো যাতে হে।" এই কথা শুনিবামাত্র তাহারা আমাদের ছাড়িয়া দিল। ছম্মন আমাদের সঙ্গে প্রায় তিন ক্রোশ পথ গিয়া বলিলেন যে,—"আপনি এক্ষণে অক্লেশে যাইতে পারিবেন।" এই কথা বলিয়া তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার সৌজন্যের জন্য অনেক সাধুবাদ প্রদান করিলাম। আমি এবং আমার সঙ্গী বাঁকী আমরা উভয়ে শীঘ্রপদে চলিতে লাগিলাম। বেলা ১১ ঘটিকার সময় দেখি, পথিপার্শ্বে একটী বাঁধানো কূপের উপর বসিয়া আমার দাদা আর সেই ছয় জন বাঙ্গালী স্নানাদি করিতেছেন। উক্ত ছয় জনের মধ্যে এক জন পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার এক জন হরকরার সেখানে বাড়ী,—সে আপনার মনিবকে তথায় দেখিতে পাইয়া তাঁহার অনেক আদর-অভ্যর্থনা করিতেছে, আহারের জন্য কিছু মক্কা-ভাজাও আনিয়া দিয়াছে, তাহাই তাঁহারা পরম উপাদেয় জ্ঞানে আহার করিতেছেন। আর সেই নিষ্ঠাবান্ পরম হিন্দু মুখোপাধ্যায় মহাশয় গামছাতে কাচা ছোলা বাঁধিয়া ঘটীতে ভিজাইয়া দিয়াছেন। ভিজিলে তাহার দ্বারা জঠরজ্বালা জুড়াইবেন বলিয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে আমি তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম। দাদা কাশী-প্রসাদ আমাকে দূর হইতে দেখিয়াই দৌড়িয়া আমার পদপ্রান্তে আসিয়া লুটাইয়া কতই কাঁদিতে লাগিল। আমিও চক্ষের জল কোনমতে সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাশীপ্রসাদের সঙ্গীরাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। সকলে আমার নিকট আসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আমি যে তাঁহাদের উদ্ধারের হেতুভূত, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া-ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি সকলকে যথাযোগ্য সান্ত্বনা এবং প্রবোধ দিতে লাগিলাম। অনেক দিনের পর এবং ঈদৃশ প্রাণ-সঙ্কট বিপদের পর, সহোদর এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত

মিলিত হইয়া হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যাতনার ভার যেন প্রশমিত হইল। সে যাহা হউক, বেরিলি হইতে আসিবার সময় আমি যে একটী মোহর ভাঙ্গাইয়া আনি, তাহা হইতে চারিটী টাকা চারি জন অশ্বারোহীর হাতে দিয়া তাহাদের বিদায় দিলাম। তাহারা প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল যে, আমরা এখনও খাঁ বাহাদুর খাঁর সীমা অতিক্রম করি নাই।" কিন্তু প্রত্যেকে এক একটী রজতখণ্ড পাইয়া আর কোন কথাও কহিল না। আমরা ৮ জনে রামপুরের নবাবের এলাকার দিকে চলিলাম। বেলা ১টার সময় আমরা মিলাক্ নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতেই রামপুরের নবাবের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা তথায় পৌঁছিয়া আহারাদির জন্য জিনিসপত্র ক্রয় করিলাম। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাক করিলেন; আমরা সকলে মিলিয়া পরম সুখে মনের আনন্দে আহার করিলাম। আহারাদি করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল, সুতরাং আর আমরা কোন স্থানে না গিয়া সেইখানেই নিশাযাপন করিলাম। প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করত রামপুরাভিমুখে চলিলাম।

সাতাশ

রামপুরের নবাব বিদ্রোহী সেনাদলের সহিত যোগ দেন নাই। কাজেই এ রাজ্যে দিবসে দস্যুভয় নাই, হঠাৎ নর-হত্যার ভয় নাই, লুণ্ঠনের আশঙ্কাও নাই। এই নিরাপদ্ স্থানে নির্ভয়ে সুখ-দুঃখের নানা কথা কহিতে কহিতে আমরা আট জন বাঙ্গালী চলিতে লাগিলাম। অদ্য আনন্দের আর অবধি নাই। সুখের কথাতেও আনন্দ, দুঃখের কথাতেও আনন্দ, সংসার আনন্দময়। পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন, তবুও আনন্দ। পথশ্রমজনিত কষ্ট, তবুও আনন্দ। উদরে ক্ষুধা, হাতে পয়সা নাই, তবুও আনন্দ। প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত, ছাতা নাই, তবুও আনন্দ। কেন না, সকলে আজ প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সকলেই অগাধ অনন্ত সলিলে ডুবিতে-ছিল, রক্ষা পাইয়া এক হাঁটু জলে আসিয়াছে, আনন্দ হইবে না ত কি।

আমাদের মনে মনে ইচ্ছা,—অদ্যই রামপুর নগরে গিয়া উপস্থিত হইব। দিবা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া উঠিল। সূর্য্যের বিশ্বদাহকর কিরণে আমরা সকলে যেন ঝলসিয়া উঠিলাম। রাজপথচারী পথিককে জিজ্ঞাসিলে বলে—"ঐ

রামপুর, ঐ রামপুর,"—কিন্তু রামপুর আর নিকটে আসে না। অর্দ্ধপোয়া পথ এক ক্রোশ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অবশেষে রামপুর নগর নয়নের পথবর্ত্তী হইল। নগরপ্রান্তে এক বৃহৎ সুরম্য উদ্যান ছিল। আম, জাম, তমাল প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষে সে উদ্যান পরিপূর্ণ। সে উদ্যান মধ্যে কৃত্রিম ঝরণা দিয়া জল অবিরত ঝর্ ঝর্ পড়িতেছে। তাহার নিকট গোলাপ, যূঁই, বেলা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা শ্যামল স্নিগ্ধকর তরুরাজির শীতল ছায়ায় ঝরণার নিকট কম্বল বিছাইয়া শ্রম দূর করিতে লাগিলাম। কেহ ঘাসে গিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কেহ ফুটন্ত গোলাপের নিকট নিজ নাসিকা লইয়া গিয়া তাহার আঘ্রাণ লইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় বাগানের দুই জন মালী আসিয়া কহিল, "এখানে থাকিবার হুকুম নাই। আপনারা কোথা হইতে আসিলেন, পাস আছে কি?' আমি প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন রাখিয়া মালীকে কহিলাম,—"আমরা রামপুরের নবাবের লোক। নবাব-বাড়ী যাইতেছি, কিন্তু বেলা অতিরিক্ত হওয়ায় এই স্থানে বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।" মালী কহিল,—"নবাবের হুকুম ব্যতীত এ স্থানে থাকিবার যো নাই।"

আমাদের এরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় এক জন দীর্ঘকায় দীর্ঘ দাড়িবিশিষ্ট মুসলমান বাম হস্তে গড়গড়া ধরিয়া তামাক খাইতে খাইতে আমাদের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিল। সে দূর হইতেই বিকটস্বরে কহিল, —"এই সকল লোককে বাহির করিয়া দাও। ইহা সরাই নয়, দোকান নয় যে, লোক আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিবে।"

মালী সাহস পাইয়া সুমধুর স্বরে বলিল,—"এখনি দূর হও, নহিলে গলা-ধাক্কা দিয়া জুতা মারিতে মারিতে বাগান হইতে বাহির করিয়া দিব।" আমি ভাবিলাম,—বিপদ্ ত মন্দ নয় দেখিতেছি, পরের রাজ্য, পরের বাগান এবং আমাদের গ্রহও বিগুণ। মালীকে কহিলাম,—"তোমার আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নেই, আমরা এখনি যাইতেছি, সরাই কোন্ দিকে বলিতে পার?"

মালী উত্তম-মধ্যম মিষ্টস্বরে বলিল,—'আমি কি তোর বাবার চাকর যে, সরাই কোথায় বলিয়া দিবার জন্য আমি এখানে বসিয়া আছি।" শেষে মালী একটী অশ্রাব্য এবং অকথ্য কথায় ব্যঙ্গ এবং ভ্রূকুটী করিয়া বলিল,— "সরাই অমুক স্থানে আছে।" মালীর কথায় মনে কষ্ট হইল না, কষ্টও

হইলাম না ; কেবল এই ভাবিতে লাগিলাম, সকল মালীই কি এইরূপ ? ভৃত্য-শ্রেণীর সকল ইতর লোকই কি অপরিচিত ব্যক্তির সহিত এইরূপ ব্যবহার করে ? বিদ্রোহের পূর্ব্বে এত বৃহৎ না হউক, আমারও এক দিনে একটী বাগান ছিল, মালী ছিল, ভিস্তি ছিল, দ্বারবানও ছিল। তাহারা কি যাকে তাকে এইরূপ কটুকথা বলিত ? এইরূপ ভাবিতেছি, আর কম্বল গুটাইতেছি, এমন সময় সেই দীর্ঘাকার ভীম-কলেবর মুসলমান তাম্রকূট-ধূম ফেলিতে ফেলিতে, গিলিতে-গিলিতে, রক্তচক্ষু করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। কাশী বলিল,—"দাদা ! এই বেটা বুঝি বা মারে।"

কিন্তু দেখিতে দেখিতে সমস্তই ভিন্ন ভাব হইয়া দাঁড়াইল। বিষাক্ত কণ্টক-বৃক্ষ সৌরভময় চন্দনবৃক্ষ হইল। বিষ সুধায় পরিণত হইল। সেই দীর্ঘকায় ব্যক্তি আমার দিকে তাকাইয়া কি কটুকথা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থতমত খাইয়া, গড়গড়াটী দূরে ফেলিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক সেলাম করিয়া কহিল,—"বাবু সাহেব ! আপ্‌কা এ কেইসা হাল হুয়া ?" আমি কহিলাম,—"দফেদার জী ! খোদার এইরূপই ইচ্ছা ছিল, তুমি দুঃখ করিও না।"

এই ভীমকায় মুসলমান আমাদের রেসালার দফাদার ছিল। বিদ্রোহ-সূচনার পরই এ ব্যক্তি কৌশলে কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিয়া বখ্‌ত খাঁর চক্ষে ধূলি দিয়া আপন জন্মভূমি রামপুরে পলাইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে রামপুরের নবাবের অধীনে এই বাগানের জমাদারী পদ পাইয়াছিল। আমার দুরবস্থার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে অবগত হইয়া, এই দফাদার অনেক হা-হুতাশ করিল। শেষে কহিল,—"বাবু সাহেব ! আপনি এই দিকে আসুন, বাগানের অপর প্রান্তে আমার ঘর আছে, সেই ঘরে থাকিবেন।" মুসলমানের গৃহ বলিয়া মুখুয্যা মহাশয় তথায় যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। আমরা একটী প্রকাণ্ড আম্রবৃক্ষের তলদেশ বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। জমাদারের অনুমতিক্রমে সেই মালী দুই জন আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র সেই গাছের তলায় লইয়া আসিল। মালী দুই জন হিন্দু ছিল। জমাদারের আদেশানুসারে তাহারা আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

জমাদার আমাদের টাকাকড়ির আবশ্যক আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—"না।" তখন সে উদ্যানদ্বারে গিয়া উপবেশন করিল।

আমরা যখন বাগানে ঢুকি, তখন ফটকদ্বারে কেহই ছিল না। দ্বার ঠেসাইয়া ভিতর হইতে ছিটকিনী লাগাইয়া দিয়া দ্বারবানগণ আহারার্থ স্বস্থানে

গিয়াছিল। আমরা সুরম্য উদ্যান দেখিয়া, ফটকের ফাঁক দিয়া হাত গলাইয়া ছিটকিনী খুলিয়া, বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিয়াছিলাম।

সে যাহা হউক, সকলে এখন স্নানের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। আমি দুই জন মালীকে লইয়া, জলখাবার এবং চাল-ডাল-তৈল-লবণ ক্রয় করিবার জন্য বাজারের দিকে বহির্গত হইলাম। বাগান হইতে বাজার আধ ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী, পথ বিষম উত্তপ্ত। অতি কষ্টে বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম। বাগান পার হইয়া খানিক দূর গিয়াছি, জনমানব নাই, হঠাৎ দুই জন মালি, দড়াম করিয়া আমার পদতলে পড়িয়া, পা ধরিয়া লুটাইতে লাগিল। আমি প্রথমত ব্যাপার বুঝিতে পারি নাই। পায়ে কি জড়াইয়া ধরিল বলিয়া 'আউ মাউ' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম। পায়ের ঝনা দিতে মালী দুইটা মুখ থাবড়াইয়া দূরে গিয়া পড়িল। দাঁত দিয়া, নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাচ তাহারা ক্ষান্ত হইল না। "বাবু সাহেব! রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া আবার আসিয়া পা জড়াইয়া ধরিল। আমি তখন বুঝিলাম,—জমাদারের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বে ইহারা আমাকে অনেক কটুকাটব্য বলিয়াছিল। এখন ব্যাপার বিপরীত বুঝিয়া ইহারা আমার ক্ষমা চাহিতেছে। আমি তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলাম,—"তোদের কোন ভয় নাই।" মালীদ্বয় তথাচ ছাড়ে না, তথাচ কাঁদে, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দেয়। আমি ভাবিলাম এ এক বড় মন্দ ব্যাপার নয়। বিড়ম্বনার বেড়াপাকে পড়িয়া পথ চলা ভার হইল। আমি তাহাদের প্রত্যেককে এক একটী সিকি দিয়া বলিলাম,—"বাপু হে, ভয় নাই, আমি জমাদারকে কোন কথা বলিব না। কিন্তু পথে যদি তোমরা এরূপ কান্নাকাটি কর, আমায় এরূপ বিরক্ত করিয়া মাব,—তাহা হইলে সমস্ত কথাই জমাদারকে বলিয়া তোমাদিগকে বাগান হইতে তাড়াইয়া দিব।" তাহারা কহিল,—"আর আমরা কাঁদিব না, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।" এই কথা বলিতে না বলিতে তাহারা আবার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। আমি কহিলাম,—"পায়ের ধূলা মাথায় দিবার আবশ্যকতা নাই, নীরব হইয়া ধীরভাবে পথ চল।"

বাজারে পৌঁছিয়া এক বেলার উপযোগী চাল ডাল হাঁড়ি কাঠ প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী সমস্তই ক্রয় করিলাম। জলখাবারের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইলাম। উভয় মালীর মাথায় বোঝা দিয়া হন হন চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় পথিমধ্যে আবদুল রহিমনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এ ব্যক্তি সেতারে

সিদ্ধহস্ত। ইহার বাড়ী রামপুর। বিদ্রোহের পূর্ব্বে রহিমন বেরিলি নগরে আমাকে সেতার শিখাইত। একুশ টাকা মাহিনা পাইত। ইহা ব্যতীত তাহাকে খোরাক পোষাক দিতে হইত। বেরিলিতে বিদ্রোহের সূচনা হইলে, রহিমন রামপুরে চলিয়া আসে। সে আমার ঈদৃশ অবস্থা হইবার কারণসমূহ অবগত হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। বাজারের নিকটেই তাহার ঘর। কাঁদিতে কাঁদিতে টানাটানি করিয়া আমার অনিচ্ছা সত্বেও তাহার ঘরে আমায় লইয়া গেল। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি তাহার বাটীতে থাকি। আমি বলিলাম,—"আমি একা নহি, আমার সঙ্গে আরও সাত জন বাঙ্গালী আছে। আমরা সকলে হিন্দু, কেমন করিয়া তোমার বাটীতে থাকিয়া আহারাদি করিব? আমরা অদ্য নবাবের উদ্যানে অবস্থিতি করিব স্থির করিয়াছি।" আবদুল রহিমন জোড়হাতে কহিল,—"আমি এই বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া আমার দাদার বাটীতে যাইতেছি। আপনারা সকলে আসিয়া হিন্দু-মতানুসারে ঘর-দ্বার পবিত্র করুন, করিয়া অবস্থিতি করুন। এই বাটী আপনারই, আপনার টাকায় ইহা তৈয়ারী হইয়াছে জানিবেন। আপনাকে বাগানে বৃক্ষতলায় কখনই থাকিতে দিব না।" আমি তাহার আদর অভ্যর্থনা দেখিয়া বাস্তবিকই প্রীত হইলাম। অবশেষে তাহাকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিয়া, দ্রুতপদে আমাদের আড্ডায় চলিয়া আসিলাম। বেলা প্রায় তখন দুইটা। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, সকলের জঠরানল বিষম জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কাশীপ্রসাদ ক্ষুধায় আকুল। আমি জলখাবার অতি সামান্যই লইয়া গিয়াছিলাম। জলযোগের বন্দোবস্ত দেখিয়া কাশী কহিল,—"জল আর খাইব না। আট জনে এই জলখাবার ভাগ করিয়া খাইলে ক্ষুধা কাহারও কমিবে না, বরং বৃদ্ধি হইবে।" কাশীপ্রসাদের অভিমান ও ক্রোধ দেখিয়া মুখুয্যা মহাশয় বলিলেন,—"কাশী! জল খাও, রাগ কর কেন? আমি এখনই এক মুহূর্ত্তে রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলকে খাওয়াইতেছি।

স্নান আহ্নিক করিয়া জলযোগার্থ সকলে প্রস্তুত ছিলেন। সকলে সেই জলখাবার বণ্টন করিয়া খাইলেন। কেবল খাইলেন না মুখুয্যা মহাশয়; কারণ জলখাবার বাজারের। আর খাইতে পাইলাম না আমি, কারণ, আমার ভাগটুকু পোষ্টমাষ্টার বাবু আমার উপর রাগ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মুখুয্যা মহাশয় এক মুঠা চাল লইয়া গামছায় ভিজাইয়া তাহাই পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিলেন। আমি স্নানার্থ ইঁদারার দিকে গেলাম,

এদিকে রন্ধনের মহা উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। স্বয়ং মুখুয্যা মহাশয় পাচক। তিনি কাহাকেও উনানের নিকটে আসিতে দিতেছেন না। শুদ্ধভাব, পবিত্রভাব বিরাশী সিক্কার ওজনে রক্ষিত হইতেছে। স্নান করিয়া গামছা দিয়া মাথা মুছিতেছি, এমন সময় দেখি আমার সেই সেতার-শিক্ষক আবদুল রহিমন এক জন ব্রাহ্মণ-মিঠাইওয়ালার মাথায় প্রচুর মিষ্টান্ন বোঝাই দিয়া আসিয়া উপস্থিত। প্রায় দশ সের জিনিষ হইবে। লুচী, কচুরী, বরফী, অমৃতি, মোহনভোগ, শাক ভাজা, ক্ষীর, দধি, কিছুরই অভাব ছিল না। সমস্তই টাট্‌কা গরম-গরম সামগ্রী। ক্ষুধাব্যাধিপ্রপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ইহাই একমাত্র মহৌষধ। কিন্তু অহো! কি বিষম কথা! মুখুয্যা মহাশয় আপত্তি ধরিলেন, যখন এ সকল সামগ্রী মুসলমানের অর্থে ক্রীত, মুসলমানের সঙ্গে আনীত এবং মুসলমানের প্রদত্ত, তখন ইহা কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মহা গোলযোগ বাধিল। এক পক্ষে মুখুয্যা মহাশয় একা, অন্য পক্ষে আমরা প্রায় সকলেই দণ্ডায়মান। আমাদের পক্ষীয় কোন ব্যক্তি কহিলেন,—“বিদেশে, পথে, এত বিচার-আচারের আটা-আঁটি করা ভাল নয়।” পরাশর-সংহিতাতে আছে,—‘বিদেশ-গমন কালে অখাদ্য খাইতে দোষ নাই।” মুখুয্যা মহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, —“তোমরা খাবে খাও, উৎসন্নে যাবে যাও, শাস্ত্রের দোহাই দাও কেন? শাস্ত্রে যাহা নাই, শাস্ত্রে তাহা আছে বলিয়া, শাস্ত্রের উপর মিছা কলঙ্ক-কালিমা ঢাল কেন?”

আমাদের এরূপ ঝগড়া-বিচার-বিতণ্ডা দেখিয়া ওস্তাদজী ত অবাক্, নিতান্ত অপ্রতিভ এবং জড়সড়। শেষে জনান্তিকে ধীরে ধীরে আমি মুখুয্যা মহাশয়কে বলিলাম,—“যদি এই মিষ্টান্ন না লইয়া ফিরাইয়া দিই, তাহা হইলে রহিমনকে নিতান্ত মর্ম্মাহত করা হয়।” মুখুয্যা মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—“আমার এ দিকে নয়, ঐ ইদারার দিকে গিয়া তোমরা যাহা জান, তাহা কর।” তখন ছয় জন বঙ্গবাসী মহাহ্লাদে গদগদ ভাবে সেই মিঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণকে লইয়া ইদারার নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং তথায় উপবিষ্ট হইয়া সহজে এবং শীঘ্র শুভকর্ম্ম সমাধা করিলাম। বেলা যখন চারিটা বাজিয়াছে, তখন মুখুয্যা মহাশয় ভাতের ফেন গড়াইলেন। অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটার সময় আমাদের আহার কার্য্য শেষ হয়,—মুসলমানের লুচী কচুরী খাইয়া কাহারও যে ক্ষুধা কমিয়াছিল, তাহা বোধ হইল না। আট জনে সমান সতেজে আহারে উদর পূর্ণ করিলাম। মুখুয্যা মহাশয়ের সেই মসুরির ডাল রন্ধন কখনও ভুলিবার নহে। অমৃত অপেক্ষাও সেদিন যেন তাহা বেশী মিষ্ট লাগিয়াছিল।

সেই মনোহর উদ্যানে ফুল্ল লতাকুঞ্জ মাঝে, ফুল্ল ফুলদল মাঝে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবদুল রহিমন সেতার বাজাইতে লাগিল। আমি ডুগিতে সঙ্গত করিতে লাগিলাম। মানব-মন মুগ্ধ হইল। শেষে পোষ্ট মাষ্টার বাবু প্রশ্ন করিলেন,—"অদ্যকার সেতার মিষ্ট, না, মসুরির ডাল মিষ্ট?" আমি কহিলাম,—"দুই সমান।"

সেই দিন সন্ধ্যার পর বাজারে আসিয়া এক বাসা ভাড়া লইলাম। রাত্রে কেহ আর জলযোগ করিলেন না। আমরা তিন দিন কাল রামপুর নগরে অবস্থিতি করি, কিন্তু নানা কারণে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইলাম না। চতুর্থ দিবসে কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাশীপুর কুমায়ুন-অধিপতি রাজা শিবরাজ সিংহের রাজধানী। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং ইংরেজরাজের পরম হিতৈষী বন্ধু। বিদ্রোহের সময় অর্থ দিয়া, সৈন্য দিয়া, আহারীয় সামগ্রী দিয়া তিনি ইংরেজরাজকে সাহায্য করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—হরদেব এবং হরগোবিন্দ দাদা বিদ্রোহের সময় বেরিলি হইতে সপরিবারে আসিয়া কাশীপুর-রাজের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা আপাতত কাশীপুর যাইয়া, হরগোবিন্দ দাদার সহিত মিলিত হইয়া, কিছুদিন বিশ্রামসুখ লাভ করিব এবং বিদ্রোহ দাবানল হইতে রক্ষা পাইব, এই উদ্দেশ্যেই কাশীপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।

আঠাশ

দুই দিবস পথ চলিয়া কাশীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সময়ে স্নান আহার নাই, রোদে রোদে পথ-চলা, মলিন বসন, নিশায় শয়নের শয্যা নাই, উপযুক্ত ঘর নাই, নিদ্রাও ভাল নাই, ইতিপূর্ব্বে কারাবাসের নিদারুণ কষ্ট,—এই সকল নানা কারণে আমরা বিশ্রী এবং বিবর্ণ হইয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিতে হরদেব দাদার বাসায় গেলাম। শুনিলাম,—তাঁহারা দুই ভাই নাইনিতালে গিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী পরিবার সকলেই বাসায় আছেন। অল্পক্ষণ পরে বড়বধূ আমায় চিনিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম,—"যখন বাঁচিয়া আসিয়াছি, তখন আর ক্রন্দন কেন? এখন আমোদ আহ্লাদ করুন।" প্রকৃতই সে দিন আনন্দের আর

অবধি রহিল না। অন্দরে স্ত্রী-মহলে রন্ধনের একটা ধুম পড়িয়া গেল। বড়-বধূ রাঁধিতে বসিয়াছেন, আমি নিকটে গিয়া নানা গল্প আরম্ভ করিলাম। আমায় তোপে উড়াইবার গল্পটা বলিলেই তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

বেলা একটার পর আমাদের সকলের চর্ব্ব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয়রূপে পরম পরিতৃপ্তিরূপে আহার হইল। আহারের পর বিশ্রাম। বেলা তৃতীয় প্রহরে হরদেব দাদার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—"নাইনিতালের সাহেবেরা তোমাকে খুঁজিতেছে, তোমার অনুসন্ধানের জন্য রাজা শিবরাজ সিংহকে তাহারা তিন-চারিবার চিঠি লিখিয়াছে। অতএব তুমি এখনই গিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ কর।"

শিবরাজ সিংহের সহিত ইতিপূর্ব্বে হইতে কিঞ্চিৎ আলাপ ছিল। রাজা মধ্যে মধ্যে বেরিলিতে আসিতেন এবং আমাদের অশ্বারোহিদলের সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই সূত্রেই আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

যখন রাজবাটীতে গেলাম, তখন বেলা প্রায় চারিটা। এক জন কর্ম্মচারী কহিল,—"রাজা এখন অন্দরে, আজ বাহির হইবেন কি না জানি না, তুমি কাল আসিও।" আমি কহিলাম,—"রাজার সহিত আমার অদ্যই সাক্ষাতের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নাম শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা আমাকে আজ কয়েক দিন হইতে অন্বেষণ করিতেছেন।" আমার নাম শুনিয়া কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ অন্দরে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, দুর্গাদাস বাবু আসিয়াছেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে রাজা দরবারে আসিলেন। তাঁহার সহিত দেখা হইবামাত্র তিনি খুব আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন,—"তুম্ আভিতক্ কাঁহা থে? তুমহারা তল্লাস নাইনিতালমে বহুৎ হো রহা।" আমি তাঁহাকে আপন দুঃখ-কাহিনী একে একে সমস্ত বিবৃত করিলাম। রাজা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত কষ্ট প্রকাশ করিলেন। শেষে আমাকে কহিলেন,—"আপনি এক্ষণে যেরূপ ক্লান্ত এবং পথশ্রান্ত, তাহাতে কল্য নাইনিতাল যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভবপর নহে। আপনি এক্ষণে দুই দিন বিশ্রাম করুন, তার পর যাইবেন। বিশেষ নাইনিতালে সাহেবদের বড়ই টাকার অভাব হইয়াছে। অর্থ ব্যতীত তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী প্রাপ্তি বিষয়ে বড়ই বিঘ্ন জন্মিয়াছে। উপযুক্ত লোক ব্যতীত আমি এত দিন টাকা পাঠাইতে পারি নাই। তোমার সহিত নগদ পঁচিশ হাজার টাকা পাঠাইব। বলা বাহুল্য, নোট বা হুণ্ডি পাঠাইলে চলিবে না। নগদ টাকা পাঠান যে কিরূপ বিপদ্‌জনক, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পার।

তোমার মত উপযুক্ত ব্যক্তি টাকা রক্ষণাবেক্ষণের ভার না লইলে আমি কিছুতেই টাকা পাঠাইতে পারি না।”

আমি মনে মনে ভাবিলাম,—এ আবার এক নূতন বিপদ্ ঘটিবার সূচনা হইল দেখিতেছি। নাইনিতাল যাইবার পথে শুধু হাতেই প্রাণ রাখা দায়, তাহার উপর আবার এত টাকা! একবার ভাবিলাম,—রাজাকে বলি, আমার শরীর অসুস্থ, কোমরে ব্যথা, পায়ে ব্যথা; পথ চলিয়া, পথে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া আমি উদরাময়-রোগগ্রস্ত। আমি এক্ষণে নাইনিতাল যাইতে পারিব না। দুই সপ্তাহ বিশ্রাম না করিলে আমি নাইনিতাল অভিমুখে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব না। আবার মনে হইল,—চোরের ন্যায় মিথ্যা কথা কহিয়া বসিয়া থাকা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। এ দিকে রাজা শিবরাজের অনুরোধ, ও দিকে অর্থ বিনা নাইনিতালস্থ ইংরেজসমূহের অন্নকষ্ট। মরি আর বাঁচি, এ সময়ে ইংরেজের এই দারুণ দুঃসময়ে আমি অবশ্যই ইংরেজগণকে সাহায্য করিব। রাজাকে কহিলাম,—“আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি কল্যই যাইতে প্রস্তুত।”

রাজা আমার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, “তোমার সঙ্গে যে যে লোক-লস্কর যাইবে, কল্য তাহা ঠিক করিব। টাকা সমস্ত তোড়া-বন্দী করিয়া গালা-মোহর করিব। তুমি পরশ্ব তারিখে প্রাতে আহারাদির পর রওয়ানা হইবে, কল্য যাত্রা করার তত সুবিধা হইবে না।” এই কথা বলিয়া, আমার স্বতন্ত্র বাসার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া রাজা অন্দরে গেলেন। রাজবাটীর অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড ভবনে আমার বাসা হইল, চাকর-নফর সমস্তই নিযুক্ত হইল। প্রকাণ্ড এক সিধা আসিল। বলা বাহুল্য, সিধার সমস্ত সামগ্রী আমি হরদেব দাদার বাটীতে পাঠাইয়া দিলাম। রাত্রে দাদার বাটীতে আহার করিয়া আমি এবং আমার সহচর স-কাশী সাত জন বাঙ্গালী বাসাবাটীতে আগমনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলাম। আমি যে পরশ্ব পঁচিশ হাজার টাকা লইয়া নাইনিতাল যাইব, তাহা এখনও কেহ জানে না। মনে করিলাম,—কাশীকে এইবার এই কথা বলি, এখন হইতে কাশী তাহার মনকে দৃঢ় করুক। আবার ভাবিলাম, কাশী ছেলেমানুষ, এ কথা এখনই শুনিলে কেবল কাঁদিতে থাকিবে, সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইবে না এবং কাহাকেও ঘুমাইতে দিবে না। না বলাই ভাল, যাইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বলিলেই হইবে। সে রাত্রি অগাধ নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

প্রাতঃকালে বেলা সাতটার সময় আমি, কালীপ্রসাদ এবং আর ছয় জন বাঙ্গালী সকলেই রাজভবনে উপস্থিত হইলাম। আটটা বাজিলে রাজা দরবারে আসিলেন। আমি প্রথমে ভ্রাতা কালীপ্রসাদের এবং আমার সঙ্গী অন্য ছয় জন বাঙ্গালীর পরিচয় রাজাকে দিলাম। রাজা ইহাদের কারাবাস প্রভৃতি কষ্টের কথা শুনিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। যত দিন না বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে থাকিবার স্থান, বস্ত্র ও আহারীয় সামগ্রী দিবেন বলিয়া রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন। ঐ সাত জন বাঙ্গালী রাজবাটী হইতে বিদায় হইয়া আসিলে, রাজা আমাকে নির্জ্জন-গৃহে লইয়া গেলেন। কহিলেন,—"তুমি কিরূপভাবে কোন্ পথ দিয়া কত সৈন্য সঙ্গে লইয়া নাইনিতালে যাইবার বিষয় স্থির করিয়াছ বল।"

আমি। কালাডুঙ্গি বা হলদোয়ানি দিয়া যে সকল বাঁধা পাকা রাস্তা নাইনিতালাভিমুখে গিয়াছে, এক্ষণে তৎসমস্তই বিদ্রোহী সৈন্যের অধিকারভুক্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদ্রোহীরা ঐ সকল পথ দিয়া কোনও ব্যক্তিকে নাইনিতালে যাইতে দিতেছে না। উহাদের ধারণা,—প্রত্যেক পথিকই ইংরেজের গুপ্তচর। আটা, গম প্রভৃতি রসদ গরুর পিঠে বোঝাই করিয়া কেহ আর ঐ সকল পথ দিয়া যায় না। রসদ দেখিলেই তাহারা লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং টাটুওয়ালাগণকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাদের টাটুসকল গ্রহণ করে। পথে একরকম দিনে ডাকাইতি চলিযাছে। হলদোয়ানিস্থ বিদ্রোহী দলের সেনা-নিবাস হইতে প্রাতে পাঁচ-সাত শত অশ্বারোহী এবং পদাতি সৈন্য বহির্গত হয়। তাহারা পথে সকলকে মারে, ধরে এবং কাটে। আমার সঙ্গে যদি দেড় শত বন্দুকধারী সিপাহী এবং পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সুশিক্ষিত সৈন্য দেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আমি ঐ বিপদপূর্ণ পথ দিয়া টাকা লইয়া যাইতে পারি।

রাজা। তোমার সঙ্গে মোটে দুই শত সেনা, আর বিদ্রোহীরা হইল পাঁচ-সাত শত লোক। তাহাদের সহিত যুদ্ধ কিরূপে সম্ভবে?

আমি। বিদ্রোহীরা এক সহস্র এবং ততোধিক হউক না কেন, তথাচ আমি তাহাদিগকে ভয় করি না, এবং শেষে আমাদের জয়লাভ নিশ্চয় জানিবেন। বিদ্রোহীরা ষণ্ডা-গুণ্ডা বটে এবং একরকম উন্মত্তও বটে, কিন্তু তাহারা কাপুরুষ; তাহাদের অধিনায়ক কেহই নাই। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সম্মুখ-সমরে তাহারা কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিবে না।

রাজা। কিন্তু এক কথা হইতেছে এই,—খাঁ বাহাদুরের আমার প্রতি বিষম আক্রোশ। শুনিতেছি, তিনি আমার রাজ্য আক্রমণ করিবেন এবং আমাকে বন্দী করিয়া তোপে উড়াইবেন। এ কথা কতদূর সত্য তাহা আমি জানি না, কিন্তু জনরব এইরূপই। খাঁ বাহাদুরের আক্রমণ প্রতিরোধার্থ আমি সদাই প্রস্তুত হইয়া আছি এবং সৈন্যসমূহকে সুশিক্ষিত করিতেছি; সুতরাং এরূপ স্থলে তোমার সহিত আমি দুই শত সৈন্য দিতে সক্ষম হইব না, সক্ষম হইলেও এরূপ বিপদ্-সঙ্কুল পথ দিয়া যাওয়ার আবশ্যকতা কি আছে? নাইনিতাল যাইবার এক সহজ গুপ্ত আরণ্য পথ আছে। নিবিড় জঙ্গল দিয়া সে পথ গিয়াছে। উপযুক্ত পথপ্রদর্শক চারি জন ব্যক্তিকে তোমার সঙ্গে দিতেছি, তাহারা পথ দেখাইয়া তোমাকে নাইনিতালে লইয়া যাইবে। সেই বনমধ্যে বিদ্রোহী সৈন্য আসিবার তত আশঙ্কা নাই, তবে বদমাইস দস্যুদল সন্ধান পাইয়া তোমাদের সঙ্গ লইতে পারে। সেই জন্য আমার প্রস্তাব এই, তুমি বাছিয়া বাছিয়া পঁচিশ জন মজবুত অশ্বারোহী সৈন্য লও। আর টাকা বহিয়া লওয়া যাইবার জন্য তোমার সঙ্গে দুইটী হাতী থাকিবে। এক হাতীতে তের হাজার নগদ ও তুমি এবং এক জন হাবিলদার অবস্থিতি করিবে। অন্য এক হাতীতে আমার এক জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ও বার হাজার টাকা নগদ এবং এক জন হাবিলদার থাকিবে। ইহা ব্যতীত পথ-প্রদর্শক চারি জন ভৃত্য পাচক ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বার জন সঙ্গে যাইবে। তোমাদের তিন দিনের রসদ বহিবার জন্য আর কয়েকটা টাটুও যাইবে।

আমি। আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হউক। আমার কিছুতেই দ্বিরুক্তি নাই। মৃত্যুকে আমার বড় একটা আর ভয় হয় না। মনে হয় আমি বুঝি মরিব না, আমি অমর। যে দিন বেরিলিতে প্রথম বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সে দিন মাঠে, পথে, ঘাটে, অনবরত গুলি-বৃষ্টি হইয়াছে, আমি সেই সকল স্থান দিয়া কতবার গিয়াছি, কতবার আসিয়াছি, তথায় কতবার দাঁড়াইয়াছি, অথচ আমাকে গুলি লাগে নাই কেন? মাথার উপর দিয়া কতবার গুলি বহিয়া গিয়াছে, মাথার চুল পর্য্যন্ত পুড়িয়াছে, তথাচ গুলি লাগে নাই। নাকের এক চুল মাত্র তফাৎ দিয়া গুলি চলিয়া গিয়াছে, তথাচ নাকে লাগে নাই। আমি মরিবার হইলে এত দিন কোন্ কালে মরিতাম। হলদোয়ানিতে তোপে উড়াইবার হুকুম হইল, সমস্তই ঠিক, কোথা হইতে চুন্না মিঞা আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিল। প্রবল-প্রতাপ বখ্ত খাঁ আমাকে ফাঁসি দিতে

চাহিয়াছিল, কিন্তু ধরিতে পারে নাই। বর্ত্তমান নবাব খাঁ বাহাদুর আমাকে ইংরেজের সাহায্যকারী বিবেচনা করিয়া, আমাকে নিধন করিবার চেষ্টায় নিয়ত ফিরিয়াছেন, আমি কিন্তু তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া বেড়াইতেছি। তাই বলিতেছি, মৃত্যুকে আমার ভয় নাই। পথ-প্রদর্শক পাইলে আমি একাই নাইনিতাল যাইতে পারি।

রাজা। বাবুজী! তোমার কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

আমি। পথ-প্রদর্শক ভাল ত? কার্য্যতৎপর ত? জঙ্গলকেই আমার ভয়। একবার আমি এই নাইনিতালের জঙ্গলে হারাইয়া গিয়া চারি দিন কাল ঘুরিয়াছিলাম; বাহির হইবার পথ পাই নাই। আমার বিশ্বাস, সে কয় দিন মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম।

রাজা। এবার আর পথ হারাইতে হইবে না। আমার এই পথ-প্রদর্শক চতুষ্টয় অতীব কার্য্যকুশল, পর্ব্বতীয় আরণ্য পথে গমনাগমনে ইহারা চির-অভ্যস্ত।

এইরূপ এবং অন্যরূপ নানা কথাবার্ত্তার পর রাজা আমাকে বিদায় দিলেন। আমি বাসায় আসিলাম। পরদিন প্রভাতে যাত্রা করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম।

ঊনত্রিংশ

নীরবে নিঃশব্দে অতি ধীরে আমি নাইনিতাল যাত্রার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। সংগোপনে, ইসারায় ইঙ্গিতে সর্ব্বকার্য্য সমাধা হইতে লাগিল। আমার এই নাইনিতাল-যাত্রা ব্যাপার কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না, কেহ বুঝিবে না;—এ সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও কেহ সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে পারিবে না,—ইহাই রাজা শিবরাজ সিংহের আদেশ ছিল। এই আদেশের গুরুত্ব এবং সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া আমিও তদাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রাণপণে যত্নবান্ ছিলাম। অধিক কি, ভ্রাতা কাশীপ্রসাদকে পর্য্যন্ত প্রকৃত কথা প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম না। কেন না, কাশী ছেলেমানুষ, অল্পেই আকুল। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গাও যা, আর কাশীকে কোন গোপনীয় কথা বলাও তা। এরূপভাবে নাইনিতাল যাইবার কথা শুনিলে, কাশী ত প্রথমত

একপ্রস্থ কাঁদিয়া লইবে। তার পর ক্রমশঃ একে একে সকলকেই বলিবে,—"দাদা গোপনে নাইনিতাল যাইতেছেন, এ কথা তুমি কাহাকেও বলিও না।" নানা দিক দেখিয়া, নানা বিষয় ভাবিয়া, যাত্রার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কাশীকে কহিলাম,—"ভাই! আমি এক সপ্তাহকাল এখানে থাকিতেছি না, রাজা শিবরাজ সিংহের অমুক জমিদারীতে খাজনা আদায়ের জন্য তহশীলদাররূপে যাইতেছি। কোন চিন্তা নাই, যত শীঘ্র পারি ফিরিব। ফিরিয়া আসিয়া রাজ-সংসারে তোমারও একটী চাকরী করিয়া দিব। এইরূপে দুই ভাই রাজ-সংসারে পরম সুখে প্রতিপালিত হইতে থাকিব।"

ভালমানুষ ভাইকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া, প্রতারিত করিয়া, মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু এই ঘোর সঙ্কটে, এ নিদারুণ রাজনৈতিক কার্য্যে প্রতারণা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় ছিল না। আমার আশ্বাস-বাক্যে কাশী বিশ্বাস করিলেও তাহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। আমি আবার বলিলাম, "ভাই! কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।"

অন্ন প্রস্তুত, তাড়াতাড়ি আহার করিলাম। রাজবাটী হইতে আনীত পোষাক পরিলাম। তামাক খাইবার বিলম্ব সহিল না, আমি দ্রুতপদে চলিলাম। যাত্রাকালে কাশীপ্রসাদের সেই শেষ কথাটী আজও আমার স্মৃতিপথে অঙ্কিত আছে। সজল নয়নে কাশী কহিল,—"দাদা! যদি আজই এত সকালে তাড়াতাড়ি তথায় যাইবার কথা ছিল, তবে এ বিষয় আমাকে গতকল্য রাত্রে বল নাই কেন?"

কাশীপুর নগর হইতে আমরা দলবদ্ধ হইয়া বহির্গত হই নাই। একে একে, দুয়ে দুয়ে, চারে চারে যাত্রা করিলাম। নগরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র দেবালয় এবং কয়েকটী বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। তথায় গিয়া সকলে মিলিত হইলাম। এই স্থান হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিলাম। ঐরাবতবৎ এক প্রকাণ্ড হস্তীর উপর আমি আরূঢ় হইলাম। সৈনিক বেশে বিভূষিত। মস্তকে উষ্ণীষ, কটীতটে তীক্ষধার তরবারি,—চর্ম্মবজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ, কোমরের দক্ষিণে ও বামে দুইটী পিস্তলবার সাত হাত লম্বা এক বিষম বর্শা হস্তীর উপর রক্ষিত এবং আমার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন। বীরবেশে যেন দিগ্বিজয় করিতে বহির্গত হইলাম। ঐ হস্তীর উপর আমার দক্ষিণ পার্শ্বে আর এক জন যোদ্ধা-পুরুষ। আমি যুবক, তিনি বৃদ্ধ। বন্দুক, বর্শা ও তরবারি-পরিচালনে তিনি বিশেষ পটু বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার সাহসও অতুল। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা। তাঁহার

কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই; মুখে সদাই 'বম্ বম্ হর হর' শব্দ। আমি তাঁহাকে হাসিমুখে জিজ্ঞাসিলাম,—"আমাদিগকে যদি এখন শতাধিক বিদ্রোহী আসিয়া বেষ্টন করে, তাহা হইলে আপনি কি করেন?" তিনি ভ্রূকুটীভঙ্গিপূর্ব্বক ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন,—"বাবু সাহেব! রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করায় আমার গুরুর আজ্ঞা নাই। দেহপাত পর্য্যন্ত আমার যুদ্ধের পণ। বিশেষ আমি ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত, সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার পরম ধর্ম্ম। আর শতাধিক বিদ্রোহী আসিলেও আমাদের পরাজয়ের কোন সম্ভাবনা দেখি না; কারণ আমাদের সহিত যে পঁচিশ জন অশ্বারোহী আছে, ইঁহারা সবলকায়, সুশিক্ষিত এবং অসীম সাহস-সম্পন্ন। ইহাদের ভীমবেগ সহ্য করে সাধ্য কার? অপর হস্তীতে যে দুই ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছেন, ইঁহারাও রণকৌশলে বিশেষ পরিপক্ক। আমাদের সহিত যে সকল পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য, ঘেসেড়া আসিতেছে, ইহারা নামে ব্রাহ্মণ, ভৃত্য এবং ঘেসেড়া মাত্র; কার্য্যত ইহারাও প্রভূত বলশালী শিক্ষিত সৈন্য। সর্ব্বশুদ্ধ আমরা পঞ্চাশের অধিক লোক হইব। সুতরাং শতাধিক বিদ্রোহীর আক্রমণে ভীত হইব কেন? দুই শত বিদ্রোহী আসিলেও আমার পরাজয়ের আশঙ্কা হয় না।"

বীরবরের এই বীর-রসময়ী কথা শুনিয়া আমার অন্তরে অসীম আহ্লাদ জন্মিল। বলা বাহুল্য, আমার হস্তীতে তের হাজার, অন্য হস্তীতে বার হাজার টাকা রহিল। দশ জন সওয়ার কিছু কম অর্দ্ধ ক্রোশ পথ আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিল। অবশিষ্ট অশ্বারোহী এবং অন্যান্য লোকজন আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। চিলকিয়ার পথ ধরিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। চারি-পাঁচ মাইল পথ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। তাহার পর নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গল। প্রধান পথ-প্রদর্শক আমাকে কহিল,—"বাবু সাহেব! তিন দিন কাল এই নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গল দিয়া যাইতে হইবে। এই ভীষণ আরণ্য পথ মধ্যে বাজার নাই, চটি নাই, অবস্থিতির স্থান নাই, মনুষ্যজাতির আদৌ সমাগম নাই।"

দেখিতে দেখিতে আমরা মহারণ্যরূপ মহার্ণবে পতিত হইলাম। দিক্-নির্ণয় আর হইল না। পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ জ্ঞানহীন হইয়া আমরা ঐরাবত-ষ্টীমারের উপর চড়িয়া, ভাসিতে ভাসিতে যাইতে লাগিলাম। সেই পথপ্রদর্শক-চতুষ্টয় নাবিকের স্বরূপ হইয়া ঐরাবত-ষ্টীমারকে যথাক্রমে যথানিয়মে চালাইতে লাগিল। প্রায় বার মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া দেখিলাম, চারি দিকে কেবল সিদ্ধিগাছের জঙ্গল। কিছুই নাই, কেবল সিদ্ধি গাছ, আর সিদ্ধিগাছ।

গাছসমূহ এত ঘনসন্নিবিষ্ট যে, তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যের রশ্মিও প্রবেশ করিতে অক্ষম ; অথচ সে জঙ্গলের মধ্য দিয়াও পথ আছে। কিন্তু সে পথ আমি এই চর্ম্মচক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, এবং পথধর্ম্মও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। পথরহস্য কেবল পথপ্রদর্শকগণই অবগত। কিন্তু এই পথ দিয়া হস্তি-দ্বয়ের যাইবার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, কারণ সিদ্ধি গাছগুলা হাতীর পায়ে ঠেকিতে লাগিল। ক্রমশঃ আমরা এমন এক জঙ্গলময় স্থানে উপস্থিত হইলাম যে, তাহার মধ্য দিয়া হস্তিদ্বয় যাইতে একেবারেই অক্ষম। জঙ্গল কাটিবার অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে কতক আনিয়াছিলাম। আমি হাতী হইতে নামিলাম। প্রায় চল্লিশ জন লোক একত্র হইয়া সিদ্ধিগাছ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ পরিস্কৃত হইল। আবার হস্তীর উপর উঠিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে সিদ্ধিগাছের জঙ্গল ফুরাইল। বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতীয় বৃক্ষ দেখা দিল। এক একটা বৃক্ষ আকাশপথ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া যেন অনন্তধামে পৌঁছিবার উপক্রম করিতেছে, আর যেন ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেছে—"হে ভাবুক! তুমি তুলনায় সমালোচনা করিয়া বল, আমি বড় না হিমালয় বড় ?"

বেলা যখন প্রায় তৃতীয় প্রহর, তখন একটি নির্ম্মল-সলিলা নির্ঝরিণী নয়নগোচর হইল। সেই স্থানে বৃক্ষমূলে বিশ্রামলাভার্থ সকলে অবতরণ করিলাম। পথপ্রদর্শকগণ বলিল,—"এইখানেই অদ্য নিশা যাপন করিতে হইবে। আমি কহিলাম,—"এখনও ত অনেক বেলা আছে, আর খানিক পথ গেলে হয় না ?" তাহারা কহিল,—"না। বেলা কিছু আছে বটে, কিন্তু ও দিকে থাকিবার এরূপ পরিষ্কার স্থান নাই এবং জলও নাই। এ স্থান হইতে ছয় ক্রোশ যাইতে না পারিলে আর জল পাওয়া যাইবে না।" সুতরাং এই স্থানে রাত্রি যাপন করাই ধার্য্য হইল।

আমরা প্রায় সকলেই পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত এবং পিপাসার্ত্ত। আসন বিছাইয়া ভূতলে বসিলাম ; ভৃত্য স্বচ্ছ সলিল ঝরণা হইতে আনিয়া দিল ; পদ-মুখ প্রক্ষালন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্গে আনীত কিঞ্চিৎ জলখাবার খাইয়া কিঞ্চিৎ উদর পূর্ণ করিয়া, আশ মিটাইয়া জলপান করিলাম। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বেই টাকা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নামান হইয়াছিল। উপদেশ-মত অদূরবর্ত্তী বৃক্ষমূলে হস্তিদ্বয়কে বাঁধাও হইয়াছিল। অশ্বারোহিগণ আপন আপন ঘোড়া আপন আপন পছন্দ অনুসারে বৃক্ষমূল বা বৃক্ষশাখা নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে বাঁধিয়া রাখিল এবং উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া তাহার উপর যথাসম্ভব

আসন বিস্তারপূর্ব্বক উপবেশন করিল। এ দিকে সর্ব্বাগ্রে হস্তিদ্বয়কে এবং ঘোটকসমূহকে খাওয়াইবার জন্য বন্দোবস্ত করা হইল। তৎপরে আমাদের রন্ধনের ধূম পড়িয়া গেল। জঙ্গলের ক্ষুধা অতি ভীষণা! আমার পাচক আসিয়া কহিল,—"বাবু সাহেব! কি রাঁধিব?" আমি বলিলাম,—"তুমি কি বল?" সে কহিল,—"হুজুর! সমস্তই মজুদ, মিহি আতপ চাল, আটা, ঘি, আলু, সবই আছে; বলেন তো পোলাও করি, অথবা রুটী বানাই।" আমি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলাম, "পাচক ঠাকুর! ক্ষুধা-দাবানল দশ গুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তুমি আজ রুটী এবং পোলাও উভয়ই প্রস্তুত কর,—'অথবা'য় আমি নাই। পাচক 'যে আজ্ঞা হুজুর' বলিয়া সেলাম করিয়া স্বকার্য্যসাধনে প্রস্থান করিল।

আমি তখন মহারণ্যের মহাশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। নানা জাতীয় পক্ষীর কলরব, বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অন্তরে কেমন এক অপূর্ব্ব আহ্লাদের উদয় হইল। পরক্ষণেই আবার বিষাদ দেখা দিল। নাইনিতালের অধিত্যকাপ্রদেশের সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের কথা মনে পড়িল। যে জঙ্গলে আমি তিন দিন কাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণান্ত হইয়াছিলাম, যথায় পাগলের ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে কত প্রলাপ বকিয়াছিলাম, যে জঙ্গল হইতে ইহজীবনে বহির্গত হইবার আশালতা ক্রমশঃ ছিন্নমূল হইয়া আসিয়াছিল, হঠাৎ সেই লোমহর্ষণ জঙ্গলের ছবি হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় প্রকৃতই নিদারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। চারি দিকে এত লোক জন, হস্তী, অশ্ব, তথাচ সেই ভীষণ ভয়াসুরের ভ্রূকুটীভঙ্গী হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না। গা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, আবার যদি সেইরূপ হয়! আবার যদি হারাইয়া যাই! তখন উপায়? অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু চেষ্টা বৃথা হইল। যত ভাবি, জঙ্গলের বিষয় আর ভাবিব না, ততই ভাবিতে বাধ্য হই। স্থির করিলাম নিষ্কর্ম্মা হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে এ ব্যাধি দূর হইবে না। উঠিলাম,—আমার সহচর সৈনিক পুরুষ যে স্থলে ভূমিষ্ঠ ছিলেন, তথায় গমন করিলাম। দেখিলাম, তিনি দিব্য এক হরিণের ছাল বিছাইয়া বসিয়া তাঁহার অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করিতেছেন। আমি কহিলাম, "এ হরিণচর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট। কোথায় পাইলেন?"

সৈনিক পুরুষ। এই বনেরই হরিণের চর্ম্ম। আমি স্বহস্তে হরিণ শিকার করিয়া এই চর্ম্ম লাভ করিয়াছি।

আমি। কৈ, এত পথ আসিলাম, এ বনে ত হরিণ দেখিলাম না! হরিণ কোথা আছে জানিতে পারিলে, আমি অদ্য হরিণ শিকারে প্রবৃত্ত হই। অদ্য হরিণ পাইলে পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক মাংসাহারও চলে এবং চর্ম্মখণ্ডও লাভ হয়।

প্রধান পথপ্রদর্শককে ডাকান হইল। সে কহিল, "হরিণ নিকটেই আছে। এতক্ষণ তাহারা ঝরণায় জল খাইতে আসিত, কিন্তু আজ এত অধিক মনুষ্য-সমাগম দেখিয়া বোধ হয় আসিতেছে না।"

আমার হরিণ শিকারে বড়ই সাধ জন্মিল। আমি সৈনিক পুরুষকে কহিলাম, "চলুন, আমরা পথপ্রদর্শকের সহিত বন্দুক লইয়া হরিণ-শিকারে বহির্গত হই।"

সৈনিক উত্তর দিলেন, —"এ অপরাহ্ণে এ বনে বন্দুকের আওয়াজ করিয়া কাজ নাই। কি জানি, যদি দস্যু দল বা বিদ্রোহী সেনা আমাদের আগমন-বার্ত্তা অবগত হয়। বিশেষ, হরিণকে বন্দুকের গুলি দ্বারা হনন করিয়া খাইতে নাই। হরিণ শিকার করিতে হইলে ধনুর্ব্বাণ দ্বারাই করা উচিত।"

আমি। আপনি কি এই মৃগচর্ম্ম ধনুর্ব্বাণ দ্বারা হরিণ শিকারপূর্ব্বক লাভ করিয়াছিলেন?

সৈনিক। হাঁ,—পুরাকালে ধনুর্ব্বাণই ক্ষত্রিয়দিগের প্রিয় এবং প্রশস্ত অস্ত্র ছিল। এখন কালবশে একরকম ধনুর্ব্বাণ উঠিয়া গিয়াছে, বন্দুক তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে আমি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-ব্যবহার রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি নাই, এখনও সময় বিশেষে ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার করিয়া থাকি।

আমি। আপনি সঙ্গে কি ধনুর্ব্বাণ আনিয়াছেন?

সৈনিক। না।

আমি। তবে কি আজ আমাদের হরিণ শিকার করা হইবে না?

সৈনিক পুরুষ হাসিলেন। বলিলেন,—"চলুন, বর্শা লইয়া হরিণ শিকার করিতে যাই। হরিণ ধরিতে না পারি, খানিক দৌড়াদৌড়ি করিলেও বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইবে।

আমি। দৌড়াদৌড়ি করিবার পূর্ব্বেই বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে; সুতরাং তদ্‌বৃদ্ধির আর আবশ্যক নাই।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা রঙ্গ-রহস্যের পর, আমরা দুই জন এবং আরও দুই জন সমুদয়ে চারি জন ব্যক্তি হরিণ-শিকারে বহির্গত হইলাম। বলা বাহুল্য,

পথপ্রদর্শক আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। আমাদের দুই জনের হাতে দুইটী বৃহৎ বর্শা ; কোমরে রিভলভার বাঁধা। অপর দুই জন ব্যক্তির হস্তে এক একটী করিয়া বন্দুক ছিল। হরিণদল আমাদের বর্শা উপেক্ষা করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেই যদি উদ্যত হয়, তাহা হইলে ঐ বন্দুকের সাহায্যে তাহাদের গতির প্রতিরোধ করা হইবে, এই অভিপ্রায়েই দুই জন বন্দুকধারী পুরুষকে সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। আমি কিন্তু তখন প্রতিবাদ করিয়া সৈনিক পুরুষকে বলিয়াছিলাম, হরিণ কখন মানুষ তাড়া করে না। মানুষ দেখিলে হরিণ সদলে দৌড়িয়া পলায়। সৈনিক পুরুষ তাহাতে উত্তর দেন, আপনার কথা সত্য বটে, কিন্তু সকল সময় নয়। উপায়হীন হইয়া সময়ে সময়ে অন্তিমে ইহারা বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। আরও এক কথা, আমরা ত দুইটী বর্শা লইয়া হরিণ শিকার করিতে যাইতেছি। কিন্তু হরিণের পরিবর্ত্তে হঠাৎ যদি বনে বাঘ দেখা দেয়, তখন কি উপায় হইবে বলুন দেখি ?

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া আমরা বনমধ্যে কতক দূর প্রবেশ করিলাম, কিন্তু হরিণ দেখিতে পাইলাম না। পথপ্রদর্শক কহিল,—"আর দূর বনে যাওয়া হইবে না। কেন না, সূর্য্যাস্ত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।" কাজেই আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। শূন্য মনে, ভগ্ন হৃদয়ে তখন কেবল যাত্রাকালেরই দোষ দিতে লাগিলাম। বলিলাম, "শুভক্ষণে শুভলগ্নে শিকার সন্ধানে বহির্গত হই নাই, তাই এ বিড়ম্বনা ঘটিল।" আমরা যে পথ দিয়া বনমধ্যে প্রথমত প্রবেশ করিয়াছিলাম, ঠিক সে পথ দিয়া না আসিয়া অন্য এক কিঞ্চিৎ বাঁকা পথ দিয়া আসিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় অদূরে দেখিলাম হরিণ দল বিচরণ করিতেছে। আহ্লাদে হৃদয় উথলিয়া উঠিল। সৈনিক পুরুষ কহিলেন, "গোল করিবেন না, নীরব হউন। বর্শা দ্বারা হরিণ শিকার হয় না, কেবল ছেলেখেলা হয় মাত্র। অথচ আপনার হরিণ চাই। কৌশলে কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। হরিণদলের স্বভাব, তাড়া পাইলে খানিক তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া যায়। আবার অল্পক্ষণ বা মুহূর্ত্তমাত্র থমকিয়া দাঁড়ায়। আবার তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে। এরূপ বন্দোবস্ত করা যাউক, আমরা দুই জন ঐ অদূরবর্ত্তী বৃহৎ বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরালে বর্শা হস্তে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া থাকি। যে দুই জন বন্দুকধারী পুরুষ আছেন, তাঁহারা এ স্থান হইতে ধীরে ধীরে গমন করিয়া অপর প্রান্তে অবস্থিতিপূর্ব্বক বন্দুক দেখাইয়া হরিণদলকে তাড়া করুন।

সম্ভবত মৃগযুথ আমাদের এই বৃক্ষের নিকট দিয়া দৌড়িয়া পলাইবে। পলায়ন কালে এই বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া আমরা এই বর্শা দ্বারা হরিণকে বিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইতে পারিব। কিন্তু দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফবিশিষ্ট দ্রুতগমনকারী হরিণকে বর্শা দ্বারা এইরূপভাবে বিদ্ধ করা বড়ই কঠিন কর্ম্ম। তবে এ বৃক্ষের নিকট আসিয়া হরিণদল যদি একবার থমকিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে শিকার সহজলভ্য হইতে পারে। আজ অদৃষ্টে কি আছে, জানি না।"

সৈনিক পুরুষের আদেশানুসারে বন্দুকধারী দুই ব্যক্তি অপর প্রান্তে গিয়া হরিণদলকে তাড়া দিল। হরিণদলের তখন দৌড় আরম্ভ হইল। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা হরিণ একত্র একভাবে দীর্ঘ দীঘ শৃঙ্গ দুলাইয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ লম্ফ দিয়া দীঘ দীর্ঘ নীল নয়ন বিস্তার করিয়া আমাদের দিকেই দৌড়িয়া আসিতে লাগিল।

সৈনিক পুরুষ ধীরে ধীরে আমাকে কহিলেন,—"বাবু সাহেব! মনোরথ বুঝি পূর্ণ হয়! আপনি কিন্তু ব্যস্ত হইবেন না। আমার ইঙ্গিত না পাইলে আপনি বর্শা পরিচালনা করিবেন না।"

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই বৃক্ষের নিকট আসিয়াই হরিণদল থমকিয়া দাঁড়াইল। ইঙ্গিত মাত্র উভয়েই একই সময়ে ভীষণ তীক্ষ্ণাস্ত্র শাণিত বর্শা দ্বারা এক একটা হরিণ বিদ্ধ করিলাম। আমি যে হরিণটা বিঁধিলাম, সেটী অপেক্ষাকৃত ছোট। বয়স বেশী নহে, তবে নিতান্ত বাচ্ছাও নহে। উদরে বর্শা বিদ্ধ হওযায় উদর একবারে এফোঁড় ওফোঁড় হইয়া গেল। হরিণ তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। সৈনিক পুরুষ যে হরিণটাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সে হরিণ বৃহদাকার, বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং অতীব বলশালী। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্শা উদরে বিদ্ধ না হইয়া কতকটা পাছার দিকে বিদ্ধ হইয়াছিল এবং বর্শাগ্রভাগও এক দিক্ ভেদ করিয়া অপর দিক্ দিয়া বহির্গত হয় নাই। কাজেই সেই বৃহৎ হরিণ মহাবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লাফাইতে থাকিল এবং কর-ধৃত বর্শার সহিত বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সৈনিক পুরুষ ক্ষত্রিয়সন্তান, সাহসী এবং বৃদ্ধ হইলেও ক্ষমতাবান। আমি কিন্তু আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাকে টানিয়া হিঁচড়িয়া বেগে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া, অথচ তিনি বর্শা সহজে ছাড়িয়া দিবার পাত্র নন বুঝিয়া, আমিও ভীমবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। আমার কিন্তু রিক্তহস্ত। আমার বর্শাটী যে হরিণ-দেহ হইতে খুলিয়া লইয়া

দৌড়িব, সে অবসর লাভ হয় নাই। আমি প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া সৈনিক পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া, সেই হরিণদেহ-নিবদ্ধ বর্শা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিলাম। হরিণের গমন-বেগ আরও খর্ব্ব হইল। বাস্তবিক হরিণ তখন বিশেষ জখম হইয়াছিল। বর্শার অগ্রভাগ যদিও অপর দিক্ দিয়া বাহির হয় নাই বটে, তথাপি বাহির হইতে অধিক বাকি ছিল না। দেখিতে দেখিতে তাহাও বাহির হইয়া পড়িল। হরিণ আর কিয়দ্দূর গমন করিয়াই গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া গেল। আমরা আনন্দোল্লাসে "জয় জয়, বম্ বম্, হর হর" করিতে লাগিলাম।

আমরা পাঁচ জন তখন একত্র হইলাম। হরিণদ্বয়কে আড্ডায় লইয়া যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বড় হরিণটী তখনও জীবিত ছিল। তখনও যেন আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে, আবার বিক্রম প্রকাশ করিবে, এরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমি নিজ বর্শা উত্তোলন করিয়া, তাহার হৃৎপিণ্ড একবারে বিদ্ধ করিলাম। দেখিতে দেখিতে হরিণ পঞ্চত্ব পাইল। সৈনিক পুরুষ কহিলেন, "আপনার এ কাজ ভাল হয় নাই, মুমূর্ষু জীবকে এমন করিয়া বধ করিতে নাই।"

ছোট হরিণটীকে টানিয়া লইয়া বড় হরিণটীর কাছে পূর্ব্বেই রাখা হইয়াছিল। বন্দুকধারী দুই ব্যক্তি হরিণদ্বয়ের পাহারায় রহিল। আমরা পথ-প্রদর্শকের সহিত নিজ স্থানে গমন করিলাম। হরিণদ্বয়কে বহিয়া আনিবার জন্য চারি জন লোক প্রেরিত হইল। হরিণদ্বয় আনীত হইলে আমাদের সেনাদল মধ্যে আনন্দের আর অবধি রহিল না। যথাযোগ্যরূপে সকলকে হরিণমাংস বণ্টন করিয়া দিলাম। রুটী এবং মাংসের কালিয়া, দুই রকম ভোজ্য বস্তু বনমধ্যে সকলে মহোৎসাহে রন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। আমার কিন্তু তিন রকম সামগ্রী তৈয়ারী হইতে লাগিল। রুটী, পোলাও এবং কালিয়া।

হায় রে ক্ষুধা! সে এক দিন গিয়াছে! সে ক্ষুধা এখন আর হয় না কেন? হা ভগবন্! বলিয়া দাও, কেন তুমি সে ক্ষুধা এখন হরণ করিলে? সে ক্ষুধা, সে হজমশক্তি, সে পরিশ্রম, সে সাহস, সে রৌদ্র-বৃষ্টি-শীত সহের ক্ষমতা, সে ভীমবল, সে শত্রু পক্ষকে তৃণজ্ঞান,—এ সমস্ত আজ কোথায় লুকাইল! আমার মনে হয়, আমি বুঝি এখন ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছি। আমার মনে হয়, আমি বুঝি আর আমি নাই। যার সব ফুরাইয়াছে, তার এই প্রাণবায়ু আর ফুরায় না কেন?

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা হইল। লণ্ঠনের ভিতর মোটা মোম-বাতির আলো দপ্ দপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এইরূপ দুইটী লণ্ঠন নিকটবর্ত্তী পাশাপাশি দুইটী গাছে টাঙ্গান হইল। ইহা ব্যতীত চারি দিকে রন্ধন-কাঁষ্ঠের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সমারোহ নিতান্ত কম হইল না—যেন বিবাহ-বাড়ী। আমি ১৩,০০০ তের হাজার টাকার তোড়া গাছের তলায় বিস্তার করিয়া রাখিলাম। টাকার থলের উপর আমার সতরঞ্চ ও কম্বল বিছাইলাম। বিছাইয়া, তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক তাম্রকূট-ধূমপান করিতে লাগিলাম, রিভলভার দুইটী কোমরে বাঁধা রহিল; সঙ্গে যে দ্বিনলা বন্দুকটী আনিযাছিলাম, তাহা ঠিক করিয়া বিছানার উপর সম্মুখে রাখিলাম। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে শয্যা রচনা করিয়া সেই বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষ উপবেশন করিলেন। আর চারি জন রক্ষক নিষ্কাষিত অসি-হস্তে আমাদের চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপর বৃক্ষ-তলেও ঠিক ঐরূপভাবে ১২,০০০ বার হাজার টাকার তোড়া বিছান হইল। তাহার উপর আসন পাতিয়া এক রাজকর্ম্মচারী উপবেশন করিলেন। চারি জন প্রহরী উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে সেইরূপভাবে সেখানেও পাহারা দিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় এক প্রহরের পূর্ব্বেই আমার আহার প্রস্তুত হইল। রুটী, পোলাও, কালিয়া অমৃতবৎ বোধ হইতে লাগিল। ক্ষুধাতেও আহারীয় সামগ্রীকে সুমিষ্ট করিয়া তোলে। দারুণ ক্ষুধার সময় আহার করিলে রন্ধনের ভাল-মন্দ বিবেচনা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। তা বলিয়া অদ্যকার রন্ধন যে মন্দ হইয়াছিল, কেবল ক্ষুধার জন্যই তাহা উত্তম লাগিল, তাহা বলিতেছি না। ক্ষুধায় উত্তমকে অত্যুত্তম অমৃতময় করিয়া তুলিল, এই মাত্র। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই সকলের আহার কার্য্য শেষ হইল। সৈনিক পুরুষকে আমি বলিলাম, আমাদের উভয়ের এককালীন নিদ্রা যাওয়া হইবে না। আমি অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিব, আপনি দ্বিতীয়ার্দ্ধ রাত্রি জাগিবেন। বার হাজার টাকার উপর যিনি উপবিষ্ট ছিলেন, তিনিও ঐরূপ আদিষ্ট হইলেন। রক্ষিগণের মধ্যে কে কখন ঘুমাইবে, কে কখন জাগিবে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি প্রভাত হইল। অতি প্রত্যূষেই আবার বনমধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই নামমাত্র পথের চতুর্দ্দিকে রন্ধ্রশূন্য নিবিড় বন। পথপ্রদর্শক কহিল,—"এই বন ভীষণ হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ। এখানে আর চোর-ডাকাইতের ভয় নাই এবং বিদ্রোহী দল হইতেও কোন আশঙ্কা নাই। কেবল ব্যাঘ্র ভল্লুকই এখন আশঙ্কার কারণ।" আমি উত্তর দিলাম, "বাঘ কৈ? একবার দেখাইয়া দিতে

পার ?" পথপ্রদর্শক কহিল, "আমাকে দেখাইতে হইবে না, বাঘ সম্ভবত আপনা-আপনি দেখা দিবে। আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকুন।"

আমি দ্বিনলা বন্দুকটীতে গুলি-বারুদ ভরিয়া হস্তীর উপর দাঁড়াইয়া হাওদার উপর ঠেস রাখিয়া, বাঘ-খুঁজিতে খুঁজিতে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তথাচ একটীও বাঘ নয়নের পথবর্ত্তী হইল না। বেলা আড়াই প্রহর হইল, আমরা সমান চলিযাছি, বিশ্রাম নাই, আবার সেইরূপ ক্ষুধার উদ্রেক হইতে আরম্ভ হইল। পিপাসাও নিতান্ত কম নয়। আমি এক পর্ব্বতীয ঝরণা দেখিয়া পথপ্রদর্শককে বলিলাম, "এই স্থানে থাকিলে হয় না ?" সে কহিল, "না। এখানে হাতী বাঁধিবার উপযুক্ত স্থান নাই। ঘোড়ারও থাকিবার কষ্ট হইবে। বিশেষ এই স্থানে শুষ্ক জ্বালানী কাষ্ঠ আদৌ মিলিবে না ; সুতরাং রন্ধনাদি চলিবে কিসে ? আর কিছুদূর অগ্রসর হউন, সেখানে বৃহৎ ঝরণা আছে, পরিষ্কার স্থান আছে এবং মাছও মিলিবে। আপনি ত মাছ খান ?"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পথপ্রদর্শকের কথামত যাইতে লাগিলাম। বেলা যখন সাড়ে তিনটা অতীত হইযাছে, তখন আমরা সেই বৃহৎ ঝরণার নিকট পৌঁছিলাম। হস্তী হইতে অবতরণ করিলাম। ঝরণার জলে স্নান তর্পণাদি সমস্ত কার্য্য সমাধা হইল। পথপ্রদর্শককে কহিলাম,—"মাছ কৈ ? এখানে নদীও নাই, পুষ্করিণীও নাই, মাছ কি আকাশ হইতে আসিবে ?" সে হাসিল। বলিল,—"আসুন আমার সঙ্গে এবং আপনার ভৃত্যদ্বয়কেও সঙ্গে লইয়া আসুন।" আমরা ঝরণার দিকে গেলাম। পথপ্রদর্শক কহিল,— "মাটী ও পাথর দিয়া ঝরণার স্রোত অন্য দিকে ফিরাইতে হইবে। ঝরণার স্রোত ঈষৎ ফিরাইতে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল লাগিল। যে স্থানে ঝরণার স্রোত প্রথম আসিয়া পড়িতেছিল, যেখানে এখন খুব কম বেগে অল্প অল্প জল আসিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"মাছ কই ? মাছ ধারবার জন্য কষ্টের ত অবধি রহিল না।" তখন পথপ্রদর্শক যে স্থলে ঝরণার জল অল্প অল্প পড়িতে-ছিল, সেই স্থলের পাথর এক একটী করিয়া ক্রমশঃ উঠাইতে লাগিল। দুই-তিনটী পাথর উঠাইতেই একটী দেড় পোয়া আন্দাজ মাছ পাওয়া গেল। ক্রমশঃ পাথর উঠাইতে উঠাইতে একপো, তিন ছটাক, আধপো করিয়া ছয়-সাতটী মাছ ধরা পড়িল। সেই পাহাড়ী মাছের কি এক পাহাড়ী নাম আছে, তাহা আমার মনে নাই। দেখিতে আমাদের দেশের বাচ্ছা কই মিরগেলের মত।

যখন দুই সের আন্দাজ মাছ উঠিল, তখন আমি বলিলাম,—"আর না।" কারণ, মাছ-খানেওয়ালা সে দলে আমি ভিন্ন আর কেহই ছিল না। আমার পাচক ব্রাহ্মণ মাছ রন্ধন করিতে অস্বীকৃত হইল। আমি স্বয়ং তাহা ভাজিয়া লইলাম। অদ্যকার আহার হইল, রুটী, পোলাও এবং মাছভাজা। গত কল্যের ন্যায় অদ্যও সেইরূপ নিয়মে সকলে রাত্রিযাপন করিলাম।

প্রভাত হইল, আবার চলিলাম। অদ্য তৃতীয় দিন। পথ-প্রদর্শক কহিল,—"বাবু সাহেব! শীত অনুভব করিতেছেন কেমন?" আমি কহিলাম, "দেখিতেছ না, আজ শেষরাত্রি হইতে তুলাভরা জামা গায়ে দিতেছি?"

পথপ্রদর্শক। আর ভয় নাই। নাইনিতাল নিকটবর্ত্তী। ঐ দেখুন গিরিশৃঙ্গসকল মেঘের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। অদ্য বেলা দ্বিপ্রহরে, না হয়, তৃতীয় প্রহরে নিশ্চয়ই নাইনিতালে সাহেবের নিকটে পৌঁছিব।

পথ প্রদর্শকের কথাই ঠিক হইল। ঠিক যখন বেলা তিনটা, তখন আমরা রোহিলখণ্ডের কমিশনর আলেকজাণ্ডার সাহেবের কুঠীতে গিয়া সদলবলে পৌঁছিলাম। এতদিনের আশা পূর্ণ হইল। নাইনিতালে নিরাপদ্ স্থান প্রাপ্ত হইলাম। আবার সেই লাল-আভাযুক্ত ইংরেজের শ্বেত মুখ সন্দর্শন করিলাম।

ত্রিশ

অন্ধ ব্যক্তি চক্ষু পাইলে, বন্ধ্যা নারী পুত্ররত্ন লাভ করিলে, চিরবিরহিণী স্বামিসন্দর্শন প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, কমিশনর শ্রীমান্ আলেক-জাণ্ডার সাহেব নগদ পঁচিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রাসহ আমাকে পাইযা বোধ হয় সেইরূপই আহ্লাদিত হইলেন। আমার করমর্দ্দনপূর্ব্বক তিনি আমাকে এক সুন্দর গদি-আঁটা আসনে বসাইলেন। মুক্তকণ্ঠে আমার সহস্ররূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"ভগবান্ আপনার অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। আর, জগদীশ্বরের কৃপায় যখন আমরা পুনরায ভারত সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইব, তখন আপনার কৃত এই মহদুপকার কখনই ভুলিব না। আপনি অসময়ে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন। আমরা এখন অর্থহীন, অর্থের অভাবে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহে বড়ই অসুবিধা ঘটিতেছিল, তাই এক্ষণে এই পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার মোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অদ্য কি

দিয়া আপনার সম্মান রক্ষা করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। আজ আমরাই ভিখারী, কাঙালী, অন্ন-বস্ত্রহীন, রাজ্যভ্রষ্ট, পলায়িত। কিছুই নাই. কিছুই নাই,—দিব কি; আমার বড় সাধের এই অঙ্গুরীয়টী আছে, আপনি গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া আলেকজাণ্ডার সাহেব আপন অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া আমার হস্তে দিতে উদ্যত হইলেন।

আমি জোড়হাতে সাহেবকে কহিলাম, "আপনি আমার প্রভু; আপনাদের অধীনেই আমি চাকুরী করিয়া আসিতেছি, আপনাদের নিমক খাইয়াছি। সুতরাং আপনাদের বিপদ্‌কালে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আমার কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি; সুতরাং অঙ্গুরীয় পাইবাব অধিকারী নই। আমাকে ক্ষমা করিবেন,—অঙ্গুরীয় দিতে আর উদ্যত হইবেন না।

সাহেবকে নাছোড়বন্দ দেখিয়া আমি তাঁহার হাত হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলাম, "আমার এ অঙ্গুরীয গ্রহণ করাই হইযাছে; এক্ষণে আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি লইযা পরুন।" এই বলিয়া আমি স্বয়ং সাহেবের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয পরাইয়া দিলাম। সাহেব নিশ্চল নীরব।

এ দিকে সকলের যেন মনে থাকে, বেলা এখন তৃতীয় প্রহর অতীত। আমাদের এ পর্য্যন্ত কাহারও আহার হয় নাই। শুষ্ক মুখ, শুষ্ক কণ্ঠ, শুষ্ক দেহ। সাহেবের সহিত প্রথম অভিনয শেষ করিতেই প্রায পাঁচ মিনিট লাগিয়াছিল। অঙ্গুরীয প্রত্যর্পণরূপ পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত করিযাই আমি সাহেবকে কহিলাম, "আপনার দ্বারদেশস্থ হস্তিদয়ের উপর এখন টাকাব তোড়া সজ্জিত রহিয়াছে। সমস্ত দিন উহারা ভার বহন করিয়া পথ চলিয়া আসিযাছে। যদি অনুমতি করেন, টাকা সমস্ত আপনার নিকটে আনাইয়া রাখি।"

সাহেব। আপনাদের কি এখনও আহার হয় নাই?

আমি। না।

সাহেব। উঃ!

আমি। সে জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, টাকাটা আপনার নিকট পৌঁছিয়া দিলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হই।

সাহেব। টাকা আমার নিকট আনিতে হইবে না। বাবু মতিরাম সাহের গদিতে গিয়া টাকা জমা করিয়া দিউন এবং তাঁহার নিকট হইতে একখানি রসিদ লইয়া আপনি রাখুন।

যাত্রাকালে সাহেব আমাকে কহিলেন, "আপনি নাইনিতালে কোথায় থাকিবেন এবং কোথায় আহারাদি করিবেন ? আপনার আত্মীয় হরদেব-বাবুর বাসায় অবস্থিতি করা আপনার কি সুবিধা হইবে না ?"

আমি। আমি সেইখানেই থাকিব।

সাহেব। যদি আপনি সক্ষম হন, তাহা হইলে সন্ধ্যার পর আমার কুঠিতে আসিবেন কি ? আপনাকে আমার অনেক কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

আমি। আসিব।

যে সকল অশ্বারোহী সৈন্য এবং ভৃত্যবর্গ আমাদের সহিত আসিয়াছিল, তাহারা সাহেবের আদেশানুসারে নাইনিতালের সেনানিবাসে গমন করিল। তথায় তাহারা উপযুক্ত উৎকৃষ্ট আহারীয় সামগ্রী, রন্ধনের ঘর ও থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হইল। আমি হাতী দুইটীকে লইয়া মতিরাম সাহের গদিতে গিয়া টাকার তোড়া নামাইলাম। ওজন-যন্ত্রে টাকা গণিয়া দিয়া মতিরামের নিকট হইতে টাকার রসিদ লইলাম। বেলা প্রায় তখন চারিটা। সাহেবের প্রধান চাপরাশী আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, সে আমাকে হরদেব দাদার বাসা দেখাইয়া দিল। আমি দাদাকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। তৎপরে উঠিয়া বলিলাম, "দাদা! আমি মরি নাই, বাঁচিয়া আসিয়াছি। বহুকষ্টে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।" দাদার চক্ষুকোণে জল আসিল, তিনি, 'ভাই রে!' বলিয়া আমাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "ভাই! তোকে যে আমি চিনিতে পারি নাই, তোর এমন চেহারা হইল কিসে ?"

ক্রন্দন থামিল। অপরাহ্ন হইল। স্নান করিলাম। স্নানের পর জলযোগ। তৎপরে বিশ্রাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আহার করিবার জন্য আহূত হইলাম। অন্ন, রুটী, ডাল, তরকারি, মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত সমস্তই ছিল; আহারও করিলাম আকণ্ঠপূর্ণ। কিন্তু বনমধ্যে সেই মোটা মোটা রুটী, সেই সম্যক্ মসলা-বিহীন হরিণ-মাংসের কালিয়া যেরূপ সুস্বাদু স্বর্গীয় সুতৃপ্তিকর হইয়াছিল, বহু মসলাসত্ত্বেও এবং রন্ধনকারীর গুণপণাসত্ত্বেও অদ্য ইহা সেরূপ ভাল লাগিল না।

দাদা কহিলেন,—"খাটের উপর বিছানা পাতিয়া দিয়াছি, শুইয়া নিদ্রা যাও।"

আমি। সাহেব আমাকে সন্ধ্যার পর যাইতে বলিয়াছেন; সুতরাং এখন শুইয়া নিদ্রা যাইব কেমন করিয়া ? বিশেষ শীলমোহর-অঙ্কিত রাজা শিবরাজ সিংহের পত্রখানি সাহেবকে দিতে ভুলিয়া আসিয়াছি, সুতরাং যাইতেই হইবে।

দাদা। যাও, কিন্তু এমন করিলে শরীর আর কত দিন টিকিবে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি।

দুই ভাই ধীরমন্থর গতিতে সাহেবের বাঙ্গলাভিমুখে চলিলাম। কুঠির দ্বারে উপস্থিত হইলে আমাদের আগমনবার্ত্তা চাপরাশী সাহেবকে বলিল। সাহেব স্বয়ং বাহিরে আসিয়া সাদরে আমাদের দুই জনকে ভিতরে লইয়া গেলেন। অতি সম্মানে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া স্বহস্তে চৌকি সরাইয়া সাহেব আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। প্রথমেই আমি শীলমোহর-অঙ্কিত শিবরাজ সিংহের সেই পত্র সাহেবের হস্তে দিলাম। বলিলাম, "তাড়াতাড়িতে ও-বেলা এ পত্র দিতে ভুলিয়াছিলাম। সাহেব তাহা গম্ভীরমূর্ত্তিতে পড়িলেন। পাঠ শেষ হইলে পত্র বাক্সে রাখিয়া চাবি দিলেন। তদনন্তর আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার বিশেষ অভিলাষ তিনি প্রকাশ করিলেন। আমি, বেরিলিতে বিদ্রোহ হইবার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই একে একে বিবৃত করিতে লাগিলাম। তিনি সোৎসুক হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। কালাডুঙ্গিতে বিদ্রোহি-হস্তে যৎকালে বন্দী হই, যখন সাহেবের নিকট এ কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, তখন সাহেব আপনার বাক্স হইতে হস্তলিখিত স্মারক-পুস্তক বাহির করিলেন এবং বলিলেন, —"বাবু! আপনি চুপ করুন, এই সময়কার বৃত্তান্ত আপনার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছি, তাহা পাঠ করিতেছি, আপনি শুনুন। যেখানে প্রকৃত ঘটনার সহিত আমার এই লেখার অনৈক্য হইবে, তখন আপনি তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।"

সাহেব পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পাঠ সমাপ্ত হইল। আশ্চর্য্য এই, সাহেবের লেখায় একটিও ভুল পাইলাম না। আমার সম্বন্ধে যেমন যেমন ঘটনা ঘটিয়াছিল, ঠিক আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সেই পুস্তকে লিখিত। সত্য সত্যই এ ব্যাপার অলৌকিক। কেবল নাইনিতালের পার্ব্বত্য প্রদেশটী ইংরেজের এখন অধিকৃত। নীচে সমতলক্ষেত্রে ইংরেজ-পক্ষীয় কোনও লোকের যাইবার যো নাই এবং নীচে হইতে কোনও লোকের উপরে উঠিবার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ স্থলে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মৎ-সম্বন্ধীয় পর পর সমস্ত কথা সাহেব শুনিলেন কিরূপে? বলা বাহুল্য, গুপ্তচরমুখে এ সকল কথা সাহেব অবগত হন। ইংরেজ পলায়িত লুক্কায়িত বটেন, কিন্তু ইংরেজের গুপ্তচর চারি দিকেই। হলদোয়ানিস্থ বিদ্রোহী মুসলমান সৈন্য কি

তরকারী দিয়া রুটী খায়, তাহা পর্য্যন্ত ইংরেজ অবগত ছিলেন। সৈন্যের সংখ্যা,—তন্মধ্যে হিন্দু কত, মুসলমান কত, অশ্বারোহী কত, পদাতি কত, বন্দুক কেমন, কামান কেমন, তরবারি কেমন, সৈন্যের অধ্যক্ষ কে, তিনি রণদক্ষ কি না, প্রত্যহ সৈন্যগণ কি করে, ঘাটিতে ঘাটিতে পাহারার বন্দোবস্ত কিরূপ, রাত্রে বিদ্রোহিগণ কিসের আলো জ্বালে, কতক্ষণ পর্য্যন্ত সে আলো জ্বলিয়া থাকে, রসদ কতদিনের সংগ্রহ আছে, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের বিবরণও সেই স্মারক-পুস্তকে লিখিত ছিল। আমি মনে মনে কহিলাম,—"ইংরেজ! তুমিই ধন্য! তুমিই এদেশের রাজা হইবার উপযুক্ত! তোমার লীলা-কৌশল অদ্ভুত!"

সাহেব আমাকে কহিলেন, "বাবু! আপনি একটী কাজ বোকার ন্যায় করিয়াছেন। সে কাজটী যদি না করিতেন, তাহা হইলে বন্দী হইয়া এত যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইত না এবং তোপে উড়াইবারও হুকুম হইত না।"

আমি। সে কাজটী কি?

সাহেব। আপনি ত টাটুওয়ালার সহিত কালাডুঙ্গি হইয়া নাইনিতাল পর্ব্বতের উপর অনেক দূর উঠিয়াছিলেন, হঠাৎ নামিলেন কেন? এ রহস্য আমরা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। ক্রমশঃ শুনিলাম, নীচে ঘাটিওয়ালার নিকট হইতে নাইনিতাল-প্রবেশের জন্য ছাড়পত্র লইবার অভিলাষে নীচে নামিয়াছিলেন। নামিয়াই ত যত অনর্থ ঘটাইলেন। আপনি যদি পাহাড়ের দিকে আর কিছু অগ্রসর হইয়া আসিতেন, তাহা হইলে আমাদের ঘাটি দেখিতে পাইতেন। সেই ঘাটির অধ্যক্ষকে যদি আপনি আত্মকাহিনী বর্ণন করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিত। অথবা আপনাকে তথায় কিছুক্ষণের নিমিত্ত আটক রাখিয়া আমার নিকট সংবাদ পাঠাইত। আপনি কোন্ বুদ্ধিতে নীচে নামিয়াছিলেন?

আমি। দুর্ব্বুদ্ধিতা। অদৃষ্টের ফল কেহ খণ্ডাইতে পারে না। যখন আমি ধৃত হইলাম এবং আমার হাতে দড়ি বাঁধিয়া বিদ্রোহিগণ আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন আমার ঐ কথাই মনে হইয়াছিল,—পাহাড় হইতে যদি আর না নামিতাম, তাহা হইলে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

এই অঙ্ক সমাপ্ত হইলে তৎপরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি বলিলাম। অবশেষে সাহেব বেরিলি-বিদ্রোহ বৃত্তান্ত আমার মুখে শুনিতে চাহিলেন। আমি তাহা আবেগ-সংক্ষুব্ধ-হৃদয়ে সবিস্তারে বলিতে আরম্ভ করিলাম। সেই

লোকভয়ঙ্কর, লোমহর্ষণ ঘটনাবলী,—যাহা অদ্যাবধি আমার স্মৃতিপটে পূর্ণভাবে দেদীপ্যমান,—তাহা সাহেবকে সোৎসাহে প্রদীপ্তভাবে জলন্ত ভাষায় বিবৃত করিলাম। তিনি অভিনিবেশপূর্ব্বক নীরবে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সমস্ত শুনিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কেবল এক একবার তিনি দন্তে দন্ত সংঘর্ষণপূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গী করিয়াছিলেন।

রাত্রি সাড়ে দশটা অতীত হইয়াছে। সাহেব কহিলেন, "আমার অদ্য বিশেষ কোন কথা শুনা হইল না, অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। বাবু! যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ঐ দুরাচার পাষণ্ড কাপুরুষদিগের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে হইবে। আপনি ভীত হইবেন না, শীঘ্রই শুভদিন আসিবে। অদ্য রাত্রি হইয়াছে, বাটী যাউন। কল্য বেলা আটটার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

একত্রিশ

কমিশনার সাহেবের আদেশ অনুসারে আমি প্রাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় তাঁহার কুঠিতে গেলাম। পূর্ব্বের ন্যায় আবার আদর অভ্যর্থনা করিয়া সাহেব আমাকে বসাইলেন। আমি চেয়ারে উপবেশন করিয়াছি মাত্র, এমন সময় মুহূর্ত্তমধ্যে জেনারেল কলিনট্রুপ মসমস শব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি সৈনিক বেশে বিভূষিত; কটীতটে তরবারি দোদুল্যমান। খর্ব্বকায়, বক্ষঃ প্রশস্ত, দেহে অসীম বল। যেন লোহার মুগুর। বড় চালাক। আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জেনারেল ট্রুপ কহিলেন, "Halo! দুর্গাদাস বাবু! ভাল আছেন? এখন সব মঙ্গল ত?" আমি তাঁহার সম্ভাষণ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার প্রাণ ভরিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন। উভয়েই স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হইলাম।

কিছুক্ষণ আমরা তিন জনেই নীরব। কাহারও মুখ দিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। এইরূপ প্রায় দশ মিনিট কাটিল। ইংরেজ শাসন-কর্ত্তার এবং ইংরেজ-সেনাপতির দশ মিনিট সময় নষ্ট—বড় কম কথা নহে। জেনারেল ট্রুপ বড় চঞ্চল,—স্থির হইয়া থাকিবার লোক নহেন; তিনি মাঝে মাঝে ঘড়ি খুলিয়া দেখেন—আর কমিশনার আলেকজাণ্ডার সাহেবের মুখপানে

চাহিয়া থাকেন। উভয় চক্ষে পরস্পর সন্দর্শন হইলে কমিশনার সাহেব অমনি বদন অবনত করেন। আমিও তখন ব্যাপার ভাল বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে এইরূপ হইল, "বুঝি আমারই কোন অমঙ্গলকর কথা বলিবেন, অথবা আমার প্রতি কোন গুরুতর বা অন্যায় আদেশ করিবেন,— তাই সাহেবদ্বয় সহজে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না।"

আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। প্রাণটাও কেমন ধুক্ ধুক্ করিতে লাগিল। আমার এখনও মনে হইতে লাগিল, বোধ হয় কোন ষড়যন্ত্রকারী মিথ্যা সাক্ষ্য এবং মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা জেনারেল টুরুপকে বুঝাইয়াছে, "দুর্গাদাস বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইয়াছে; সে বিদ্রোহীদের গুপ্তচর,—নাইনিতালে কেবল সন্ধান লইতে আসিযাছে।" অতএব দাও দুর্গাদাসকে ফাঁসী।

ব্যাপার কি? গোড়া হইতে একটু বুঝাইয়া বলা ভাল। এই সময় নাইনি-তালও নিবাপদ্ স্থান নহে। এখানে তখন কেবল এক দল গোর্খা পদাতি-সৈন্য আছে—আর কিছুই নাই। পূরবীয়া সৈন্য দ্বারা পরিচালিত যে তোপখানা ছিল, সম্প্রতি তাহাও আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেন না, আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল, তোপ-পরিচালক সমস্ত দেশীয় সৈন্যকে কর্ম্মে জবাব দেওয়া হইয়াছে। হঠাৎ এক দিন রাষ্ট্র হইল তোপখানার সমস্ত সৈন্য বিদ্রোহী হইবে; তাহাদের অধ্যক্ষ কর্ণেল ম্যাকসলেন সাহেবকে হত্যাপূর্ব্বক তাহারা তোপ দ্বারা সমুদয় ইংরেজ উড়াইবে, বাড়ী ঘর উড়াইবে, আর ইংরেজের বিবিগণের উপর বলপূর্ব্বক অত্যাচার করিবে। কমিশনার আলেকজাণ্ডার, জেনারল টুকপ এবং কর্ণেল ম্যাকসলেন,—এই তিন জনে গোপন অনুসন্ধানে জানিলেন,—এ কথা কতক সত্য। তখন কেহ বলিলেন, "তোপ-পরিচালক দেশীয় সৈন্য দলকে কৌশল করিয়া তোপে আজই উড়াইযাদেওয়া হউক।" কেহ বলিলেন,—"উহাদিগকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা যাউক।" কেহ বলিলেন, "যখন প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তখন উহাদের বেতন চুকাইয়া দিযা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে নাইনিতাল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক।" শেষে শেষ পরামর্শই স্থির হইল। তোপখানার সৈন্যদলকে বেতন দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। কেবল ছয় জন মাত্র প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত দেশীয় অফিসার তোপখানার জিম্মায় রহিলেন। ইহারাই গোয়েন্দা-স্বরূপ হইয়া এই ভাবী বিদ্রোহের আশঙ্কার কথা ইংরেজকে জানাইয়াছিলেন।

তোপখানা ফাঁক হইল। হঠাৎ যদি পাঁচ সাত হাজার বিদ্রোহী সেনা নাইনিতাল আক্রমণ করে, তখন নাইনিতাল রক্ষার উপায় কি? তাই কর্ণেল ম্যাকসলেন পদাতিক গোর্খাদল হইতে কয়েক জন সৈন্য বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকে তোপখানার কাজ শিখাইতে লাগিলেন.।

এ দিকের ত অবস্থা এই। ওদিকে বিদ্রোহী সেনা নাইনিতাল পর্ব্বতের পাদমূল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। খাঁ বাহাদুর বেরিলি হইতে দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্য নাইনিতাল আক্রমণার্থ পাঠাইতেছেন। তাহারা আসিয়া মহা হল্লা করিয়া জঙ্গলভূমি অধিকার করিতেছে। নাইনিতাল অভিমুখে ইংরেজের রসদ আসিতে দেখিলেই তাহা লুঠপাট করিয়া লইতেছে। ইংরেজপক্ষীয় কত কত গুপ্তচরকে তাহারা লাঞ্ছিত ও নিহত করিতেছে, তাহারা পাখিটী পর্য্যন্ত নাইনিতাল অভিমুখে আসিতে দিতেছে না। যেরূপ গতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বিদ্রোহী-সেনা শীঘ্রই যে তোপ লইয়া নাইনিতাল আক্রমণ করিবে, তখন এরূপ আশঙ্কা ইংরেজই করিতেছেন।

ইংরেজের নাইনিতালে সৈন্য নাই। ভরসা, একদল মাত্র গোর্খা সিপাহী। সে দল হইতেও প্রায় এক শত ভাল ভাল লোক লইয়া তোপখানায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাজেই গোর্খাদলও হীনবল হইয়া পড়িয়াছে।

ইংরেজ এক্ষণে চাহেন,—নাইনিতাল সুরক্ষা করিতে এবং সহজে যাহাতে রসদের আমদানী হয়,—তাহার বন্দোবস্ত করিতে। বড়ই সঙ্কটকাল উপস্থিত। একদিকে বিদ্রোহী-সেনা মার্ মার শব্দে সততই নাইনিতাল অভিমুখে ধাবিত হইতেছে; অন্যদিকে নাইনিতালস্থ ইংরেজ-সেনা ক্রমশঃই ক্ষীণবল হইতেছে। নাইনিতালে এক্ষণে অর্থের অভাব, আহারীয় সামগ্রীর অভাব, বস্ত্রের অভাব এবং অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ঘটিয়াছিল। তত্রত্য ইংরেজগণেরও বড় ভয় হইয়াছিল। "আর বাঁচিলাম না, এইবার মরিলাম," ইহাই অনেকের ধারণা জন্মিয়াছিল।

আজ এক সপ্তাহকাল হইতে নাইনিতালস্থ যত সৈনিক এবং সিভিল ইংরেজ কর্ম্মচারী একত্র হইয়া নাইনিতাল রক্ষার্থ কেবল যুক্তি-পরামর্শ করিয়া বেড়াইতেছেন। জজ, মাজিষ্টর, প্রভৃতি ইংরেজগণও অস্ত্র-পরিচালন কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যহ প্যারেড-ভূমে গিয়া তাঁহারাও সামান্য পদাতি সৈন্যের ন্যায় প্যারেড অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ইংরেজ সওদাগর, ইংরেজ নীলকর এবং চা-কর, ইংরেজ কেরাণী,—নাইনিতালে যে যেখানে ছিলেন, সকলেই এই যুদ্ধশিক্ষা কার্য্যে যোগ দিলেন।

ইংরেজ ভীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ভয়ে অভিভূত হয় নাই। স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব, ইহাই ইংরেজের প্রতিজ্ঞা ছিল। ইংরেজ মহা আতঙ্কগ্রস্ত বটে, কিন্তু তথনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছাড়ে নাই। অহো! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ইংরেজ রমণীকুলও বন্দুক ছোড়ার কার্য্য শিখিতে লাগিলেন। "প্রাণ দিব, বন্দী হইব না"—ইহাই তথন নাইনিতালস্থ ইংরেজ নরনারীর মূল মন্ত্র হইয়াছিল।

এই সময় আট-দশটি তোপ, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং আড়াই সহস্র পদাতি সৈন্য লইয়া বিদ্রোহিগণ যদি নাইনিতাল আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহাদের নাইনিতাল করতলগত হইত। ইংরেজ একটী মাত্র গোর্খা পল্টন লইয়া কিছুতেই তথন নাইনিতাল রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন না। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ, বেরিলি হইতে প্রায় এগার হাজার সৈন্য নৈনিতাল আক্রমণার্থ পাঠাইয়াছেন। তাহারা কিন্তু হলদোয়ানি প্রভৃতি নানা স্থানে আড্ডা করিয়া বসিয়া আছে, কেবল শুভকালের প্রতীক্ষা করিতেছে। কোন বিদ্রোহী সেনানায়ক বলিতেছেন, "আক্রমণের আবশ্যকতা নাই; এস, আমরা নাইনিতাল পথের ঘাঁটা আগুলিয়া বসিয়া থাকি, আদৌ নাইনিতালে রসদ পৌছিতে দিব না; তাহা হইলেই সমস্ত অনাহারে শুকাইয়া মরিয়া থাকিবে।" কেহ বলিতেছেন, "অশ্বারোহীদল, আগে আক্রমণ করুক, পদাতি ও তোপথানা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাকিবে।" ও দিকে অশ্বারোহী দলের অধ্যক্ষ প্রতিবাদ করিতেছেন, "যুদ্ধের তাহা নিয়ম নহে; আগে পদাতি সৈন্য নাইনিতালে উঠুক,—আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।" ফল কথা, অগ্রগামী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে নাইনিতাল আক্রমণে কেহই স্বীকৃত নহেন। এই-রূপ বাক্‌বিতণ্ডায়, আলস্যে এবং উপেক্ষায় দিন কাটিতে লাগিল। নাইনিতাল আক্রমণ আর করা হইল না।

বিদ্রোহী সেনাদল মধ্যে আরও একটা বিষম গোলযোগ ঘটিয়াছিল। সে ঘটনার মূলীভূত কারণ—আহারীয় সামগ্রীর অপ্রাচুর্য্য। এগার হাজার সৈন্য—তাহার সঙ্গে লোক-লস্কর পাঁচ হাজারের কম নহে; এই প্রায় ষোল হাজার লোকের প্রত্যহ আহারের বন্দোবস্ত করা বড় সহজ কথা নহে। বিদ্রোহীদের কমিশরিয়েট বিভাগ একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যিনি সেনাপতি, তিনিই রসদ বণ্টনের কর্ত্তা ছিলেন। আবার এ দিকে অশ্বারোহী দলের সেনাপতির সহিত পদাতি দলের সেনাপতির সদ্ভাব ছিল না। মনে করুন,

নবাব খাঁ বাহাদুর অশ্বারোহী সেনাদলের জন্য একশত গাড়ী আটা পাঠাইলেন। পদাতি সেনাদলে সে দিন আটা মোটে নাই; পদাতিদলের সেনাপতি, অশ্বারোহী দলের সেনাপতির নিকট পঞ্চাশ গাড়ী আটা ধার চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "তাহা কখন হইতে পারে না—এ আটা আমার। আমি আজ যদি তোমাকে পঞ্চাশ গাড়ী আটা দি, আর কাল আমার জন্য যদি আটা না আইসে,—তাহা হইলে আমার সৈন্য কল্য খাবে কি?"

এমনও শুনা গিয়াছে, এই আটা ঘৃত বা চাউলের গাড়ী লইয়া অশ্বারোহী ও পদাতি সেনাদল মধ্যে দাঙ্গা মারামারিও কতবার ঘটিয়াছে। খুনও হইয়াছে।

ইংরেজের সৌভাগ্য, ভারতের সৌভাগ্য যে, বিদ্রোহী সেনাদল মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল।

মনোমালিন্যের আর একটা গুরুতর কারণ ছিল,—বারাঙ্গনা। সুন্দরী নাচনেওয়ালী সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে দুষ্প্রাপ্য নহে। ভাবিয়া দেখুন,—সেনাগণের কোন কাজ-কর্ম্ম নাই,—উদর পুরিয়া আহার, দিবা দ্বিপ্রহরে গভীর নিদ্রা, অপরাহ্ণে ভ্রমণ। কাজের মধ্যে ছিল, প্রাতে একবার প্যারেড-ভূমিতে গিয়া হৈ হৈ করিয়া বন্দুক ছোড়া। ইহা ভিন্ন চব্বিশ ঘণ্টাই ভাঙ চলিতেছে, গাঁজা চলিতেছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে বদ্-ইয়ারকি, বদ্-রসিকতা, বদ্-অঙ্গভঙ্গী চলিতেছে। সুতরাং সেনাদল মধ্যে পাশব বৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় প্রবল।

এই সেনাদলের প্রকৃত নেতা, কর্ত্তা বা শাসনকর্ত্তা প্রকৃতপক্ষে কেহ ছিলেন না। এক এক দলের সেনাপতির উপর কর্ত্তৃত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু সে সেনাপতি অধীনস্থ সৈন্যদল হইতে তাদৃশ সম্মান পাইতেন না, তাদৃশ সম্মান গ্রহণ করিবার তাঁহার শক্তিও ছিল না। নিজের বিলাস বাবুগিরি, উত্তম আহার এবং উত্তম বারনারী লইয়াই তিনি ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন। যুদ্ধের নামে দেহে কাঁটা দিত, কাঁচা মাথা আগে দিতে কিছুতেই স্বীকার ছিল না।

বেশ্যাপল্লী বিদ্রোহি-সেনানিবাসে ছিল না। দুই-চারি দল নর্ত্তকী মাঝে মাঝে নাচিতে আসিত, অথবা তাহাদিগকে বায়না করিয়া আনা হইত। এই নর্ত্তকীগণের যখন শুভাগম হইত, তখন সেনাদল মধ্যে এক মহামারী ব্যাপার পড়িয়া যাইত। মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক সেনাই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিত। লজ্জা, সরম, গুরুজনের প্রতি সম্মান,—সমস্তই দূরে পলাইত। যেন শ্মশানভূমে পিশাচের হাট বসিত। সে লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিলে চক্ষু মুদ্রিত

করিতে হয়, সে পাপ কথা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। সে ক্রিমি-কীটপূর্ণ নারকীয কাহিনী কীর্ত্তন করা আমার ধর্ম্ম নহে। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি, কোন কোন সময়ে এই নর্ত্তকীবৃন্দ লইয়া সেনাদল মধ্যে বন্দুক বল্লম তরবারির ভৈবব-লীলা দৃষ্ট হইত। উভয় পক্ষে দশ-বার জন করিয়া খুন-জখম হইত।

ইংরেজ এক্ষণে আত্মরক্ষার্থে নাইনিতালে সেনাদল বৃদ্ধি করিতে চাহেন। নাইনিতাল পর্ব্বতের পাদমূলে, জঙ্গলভূমে এক সুদৃঢ় ঘাটি বসাইতে চাহেন। আর বিদ্রোহী সেনাদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে চাহেন।

নাইনিতালে ইংবেজের সুশিক্ষিত পদাতি সৈন্য একদল আছে, তোপখানাও একরকম আছে,—অভাব কেবল অশ্বারোহী সৈন্যদলেব। এক পল্টন 'রেসেলা' না থাকিলে কিছুতেই বিদ্রোহী সেনাদলকে দমন কবা সম্ভব হইবে না। অশ্বারোহিগণ ভীমবেগে তাড়া কবিয়া না গেলে, বিদ্রোহী সেনা কিছুতেই নাহনিতালেব মুখ হইতে পলাইবে না। বিদ্রোহী সেনা নাইনিতালের নিকটে আসিলে, সর্ব্বদাই ধব্ ধব্ করিয়া ধাবিত হইতে হইবে, নচেৎ তাহারা পশ্চাৎপদ হইবে না।

একটী অশ্বারোহী দল গঠিত কবা নাইনিতালস্থ ইংরেজ সম্প্রদায়ের সঙ্কল্প। কিন্তু লোক কৈ? ঘোড়া কৈ? এবং শিক্ষকই বা কৈ?

নাইনিতালে এক্ষণে যতগুলি ইংরেজ আছেন, তাহার মধ্যে কেহই অশ্বারোহী দল পবিচালনা কবিতে জানেন না, তাঁহারা অশ্বারোহীর ড্রিল প্যাবেড সম্বন্ধে একেবাবে অনভিজ্ঞ। জেনাবেল টুকপ, বেবিলির ১৮ নং পদাতি সৈন্যদলেব সেনাপতি ছিলেন, লেফ্‌টেনাণ্ট বারওয়েল, কাপ্তেন হণ্টার ইঁহাবাও ঐ পদাতি সৈন্যদলের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কর্ণেল ম্যাকস্‌লেন তোপখানাব অধ্যক্ষ। কর্ণেল ক্রশম্যান কানপুবের বিগ্রেড-মেজারপদে অভিষিক্ত ছিলেন;—মিউটিনীর পূর্ব্বেই তিমি ছুটি লইয়া, হাওয়া খাইবার জন্য এবং পীডাশান্তিব জন্য নাইনিতালে আসিয়াছিলেন। তিনিও অশ্বারোহী দলের কাজ কখনও হাতে-কলমে কবেন নাই, কিছু কাজ জানিলেও, তিনি একা এবং পীড়িত বলিয়া অশক্ত। নাইনিতালে আরও অনেক যোদ্ধা ইংবেজ ছিল বটে,—কিন্তু অশ্বারোহী দল পরিচালন সম্বন্ধে জ্ঞান তাদৃশ কাহারও ছিল না।

বেরিলি হইতে আমাদের ৮ নং অশ্বারোহী দলের বড় সাহেব এবং আরও কয়েক জন প্রধান ইংরেজ-কর্ম্মচারী বিদ্রোহের সূচনা হইবার সময় পলাইয়া নাইনিতালে উপস্থিত হন। তাঁহারা তিন দিন মাত্র নাইনিতালে থাকিয়াই গবরমেণ্টের কোন গূঢ় আদেশ অনুসারে মিরাট যাত্রা করেন। সুতরাং নাইনিতাল ফাঁক। অশ্বারোহী দল গঠন করিবার এক জনও উপযুক্ত দক্ষ ইংরেজ-কর্ম্মচারী ছিল না। অথচ অশ্বারোহী সেনাদল অবশ্যই চাহি—একান্তই আবশ্যক। নহিলে, এই নাইনিতালের সমগ্র ইংরেজের প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা।

আত্ম-প্রশংসার জন্য আমি কোন কথা বলিতেছি না। অশ্বারোহী দল সম্বন্ধে আমি সর্ব্বকর্ম্মে অভিজ্ঞ। ইস্তক হিসাব-পত্র রাখা, রেজেষ্টারি বহি রাখা,—নাগাইদ সেনা-সংগঠন অশ্বারোহণ-শিক্ষা, ড্রিল, বন্দুক ছোড়া, বল্লম ও তরবারির খেলা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই আমার নখদর্পণে ছিল।

কমিশনর আলেকজাণ্ডার এবং জেনারেল টুরুপ—উভয়েই আমার গুণ ও শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। অশ্বারোহী দল সংগঠন সম্বন্ধে আমাকে এক জন প্রধান অধ্যক্ষ করিবেন,—ইহা তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু আমি বাঙ্গালী, হঠাৎ আমাকে যুদ্ধ-ব্যাপারে এরূপ উচ্চপদ দান, কতদূর যুক্তিসঙ্গত, ইহাও তাঁহাদের ভাবনার বিষয় হইয়াছিল। তাঁহারা মুখ ফুটিয়া বলিলে, যদিই আমি এ কার্য্য লইতে অস্বীকৃত হই, এ জন্যও তাঁহাদের অন্তর ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। অথচ আমি ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। এ দিকে আমার তখন বয়সও অল্প,—বাইশ বৎসরের অধিক হইবে না। এই বালক এবং বাঙ্গালীর নিকট পাছে অবমানিত এবং অপ্রস্তুত হইতে হয়, এই ভয়েই কমিশনার আলেকজাণ্ডার সাহেব এ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে ইতস্তত করিতেছিলেন। এই জন্যই ইংরেজ কমিশনারের দশ মিনিট সময় বৃথা নষ্ট হয়। কিন্তু আমি ভিন্ন তখন অন্য গতি ছিল না। আমি তখন ইংরেজের অগতির গতি হইয়াছিলাম।

বলা বাহুল্য, এ সব বৃত্তান্ত সে সময়ে আমি আদৌ অবগত ছিলাম না। সাহেবদ্বয়কে দশ মিনিটকাল নীরব থাকিতে দেখিয়া, আমি তখন আত্ম-প্রাণেরই আশঙ্কা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, আবার বুঝি বা ফাঁসীরই হুকুম হয়।

দশ মিনিটকাল নীরব থাকিয়া কমিশনার আলেকজাণ্ডার সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবু! তুমি কোন্ লাইন চাও? মিলিটারি লাইন ভাল-

বাস, না সিভিল-লাইন ভালবাস? তোমার যেরূপ সবল শরীর, চালাকি-চতুরতা, জ্ঞান-বুদ্ধি,—তাহাতে তোমার পক্ষে মিলিটারি লাইনই উপযুক্ত। আমরা তোমার নিকট ঋণী। তোমার উপকার করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

আমি। আমি বাঙ্গালী। সুতরাং আমার আবার মিলিটারি লাইন কি? কমিশরিয়েটের গোমস্তাগিরি অথবা পে-মাষ্টারের কাজ, তাহা কেরানীগিরি বৈ ত নয়? এরূপ মিলিটারি লাইনে থাকিয়া আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমাব আর মিলিটারি লাইনে থাকিবার ইচ্ছা নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যদি একটী তহশীলদারি কাজ দেন, তাহা হইলেই আমি বিশেষ উপকৃত হইব। ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবি, শীঘ্রই আপনারা রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হউন।

কমিশনার। মিলিটারি বিভাগে গৌরব অধিক। এ বিভাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের ইচ্ছা, তুমি এক্ষণে মিলিটারি বিভাগেই থাক। ভবিষ্যতে রাজ্য-প্রাপ্তির পর, তুমি প্রার্থনা করিলে অবশ্যই তহশীলদারি পদ পাইবে। বাবু! তহশীলদারি ত সামান্য পদ,—সিভিল বিভাগে যে পদ সর্ব্ব উচ্চ, তাহাই তখন তোমাকে প্রদান করিব।

আমি। (জোড়হাতে) আমি আপনাদের নিমক খাইযাছি। আমাকে যে কাজ করিতে অনুমতি কবিবেন, তাহাই আমি করিব। বাঘের মুখে বিনা অস্ত্রে যাইতে বলিলে যাইব। আমার প্রাণ দিয়া আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিব। কেবল যে অর্থের প্রত্যাশায় আপনাদের নিকট কাজ করিতেছি, মনে করিবেন না। আমাব কেমন সদাই মনে হয, আপনাদের মঙ্গলেই আমার মঙ্গল। আপনাদেব কোন দুঃসংবাদ শুনিলে রাত্রে আমাব ঘুম হয় না। কোন শুভ সংবাদ পাইলে হৃদয় আপনা-আপনি আনন্দে উথলিয়া উঠে। আমি সকল কার্য্যেই প্রস্তুত, আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।

কমিশনার। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যে তোমাকে আমাদের সাহায্য করিতে হইবে। আমরা এখানে একটী নূতন অশ্বারোহী-সেনাদল গঠিত করিব স্থির করিয়াছি। নাইনিতালে এক্ষণে এমন কোন সাহেব নাই যে, তিনি রেসেলার (Cavalry) কাজ বিশেষরূপ অবগত আছেন। তুমি এই সকল কার্য্য পূর্ব্বে করিয়াছ এবং তুমি এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই ভালরূপ জান। সুতরাং এই রেসেলা গঠিত করিবার সর্ব্বপ্রথম বন্দোবস্তই তোমাকে করিতে হইবে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত অশ্বারোহী দলের সেনাপতি হইবেন—কর্ণেল ক্রশ-

ম্যান সাহেব। লেফটেনাণ্ট হণ্টার এবং লেফটেনাণ্ট বারওয়েল এই দুই জন এডজুটেণ্ট হইবেন। ইঁহাদিগকে এইরূপ পদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম বটে, কিন্তু তোমাকেই সকল কাজ দেখিয়া শুনিয়া করিতে হইবে। সৈন্যগণকে অশ্বারোহণে সুশিক্ষিত করা, প্যারেড ও কাওয়াজ শিখান, রেজিমেণ্টাল নিয়মানুসারে দলবদ্ধ করা,—এ সমস্ত কার্য্যভারই প্রধানত তোমার উপর রহিল। ইহা ব্যতীত তোমাকে আফিসের কাজ, খাজনা আদায় ও পে-মাষ্টারের কাজ, ঘোড়া খরিদ করার কাজ,—ইহাও করিতে হইবে। সর্ব্বকর্ম্মের উপর দৃষ্টি তোমার থাকিবে। এ রেজিমেণ্ট সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়ে তুমি দায়ী থাকিবে। আর এক কথা, এখানে ডাক্তার সাহেব নাই। এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু নন্দকুমার মিত্রকে এই নবগঠিত রেজিমেণ্টের চিকিৎসা বিষয়ে ভার দিব স্থির করিয়াছি। কিন্তু কস্মিন্‌কালে এ সকল কাজ তাঁহার করা নাই। তুমিই তাহাকে সকল বিষয়ে শিখাইয়া লইবে। বেসেলার যাহা যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহার বন্দোবস্ত তুমিই করিবে। অধিক আর কত বলিব, সংক্ষেপত তোমার উপর সর্ব্ব ভার অর্পণ করা হইল।

এই কথা শুনিয়া আমি অতি বিনীতভাবে বলিলাম, ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপর গুরুভার রক্ষিত হইল। আমার এই সামান্য ক্ষমতা দ্বারা যাহা হইবে, তাহা আমি প্রাণান্ত পণ করিয়া করিব।

কর্ণেল টুরুপ এবং কমিশনার আলেকজাণ্ডার উভঁয়েই আমার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। বাষ্প-গদ্‌গদকণ্ঠে কমিশনার কহিলেন,—"দুর্গাদাস! তোমার কথা আমি কখন ভুলিব না। প্রকাণ্ড মরুভূমে তুমি আমাদের পক্ষে স্বচ্ছ সলিল—সুশীতল সরোবর-তুল্য।"

কর্ণেল টুরুপ আমার সহিত কোন কথা কহিলেন না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া, আমার করমর্দ্দন করিয়া আমার সহিত কোলাকুলি করিলেন।

ভাবের আবেগে আমার চক্ষু দিয়া তখন জল পড়িতে লাগিল।

আজও ১৮৯৩ অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমার এই অস্তিমে, এই ঘটনাবলী লিখিতে লিখিতে চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মনে হইল,—"সেই এক দিন, আর এই এক দিন! সেই ইংরেজ তখনও ছিল, সেই ইংরেজ এখনও আছে। আমি কিন্তু এখন পথের ভিখারী।"

বত্রিশ

এইরূপ কথাবার্ত্তায় এবং আদর আপ্যায়িতে বেলা প্রায় দশটা বাজিল। কমিশনার সাহেব একখানি পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিয়া কহিলেন—"কার্য্যারম্ভে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। এই পত্রখানি লইয়া এখনি তুমি কর্ণেল ক্রশম্যানের নিকট যাও, তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিবে।"

আমি কহিলাম, "তথাস্তু।"

কমিশনার সাহেব আরও কহিলেন, "কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কেহই এক্ষণে মাহিয়ানা পান না। টাকার বড়ই অপ্রতুল। সেই হেতু কেবল প্রাণ-ধারণের জন্য মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ সকলকে দেওয়া হয়। এক্ষণে বন্দোবস্ত এই, বিবাহিত উচ্চপদস্থ প্রত্যেক ইংরেজ কর্ম্মচারী মাসিক ১৫০৲ টাকা, অবিবাহিতগণ প্রত্যেকে মাসিক ১০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন। সিভিল-বিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারিগণ (যথা, সদরালা, মুন্সেফ, ডেপুটী, কলেক্টার ইত্যাদি) প্রত্যেকে মাসিক ৩০৲ টাকা প্রাপ্ত হন। আপনি এক্ষণে নিজ খরচের জন্য মাসিক এক শত টাকা করিয়া লইবেন। ইহাতে আপনার কুলাইবে ত?"

আমি। এক্ষণে মাসিক এক শত টাকায় আমার যথেষ্ট হইবে।

কমিশনার। বলা বাহুল্য, আমরা রাজ্য যখন পুনঃপ্রাপ্ত হইব, তখন আপনারা সকলে আপনাদের বাকি প্রাপ্য মাহিনার টাকা পাইবেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর আমি উঠিলাম। কমিশনার সাহেব আমাকে তাঁহার একটী বেগগামী ঘোড়া চড়িবার জন্য দান করিলেন। আমি সেই ঘোড়ায় চড়িয়া অবিলম্বে কর্ণেল ক্রশম্যান সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলাম। চাপরাশী আমার পত্র লইয়া সাহেবকে দিতে গেল। পত্র পাইয়া স্বয়ং ক্রশম্যান সাহেব সেই মুহূর্ত্তেই বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। দেখিলাম, সম্মুখে এক বিরাট মূর্ত্তি উপস্থিত। সুদীর্ঘ দেহ; বক্ষঃস্থল মাংসল এবং প্রশস্ত; আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন; ঘোর কৃষ্ণ উজ্জ্বল গোল নয়ন-তারাদ্বয় সদা ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে; সুদীর্ঘ দাড়ি নাভি পর্য্যন্ত বিলম্বিত। দেখিলেই মনে হয়—ইনি এক জন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বটেন। তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে আমার দেখা-সাক্ষাৎ বা আলাপ-পরিচয় ছিল না। তিনি কান-

পুরে ব্রিগেড মেজার ছিলেন; কি শুভক্ষণে তাঁহার সহিত আমার সেই প্রথম সন্দর্শন হইল। তাঁহার সেই অকৃত্রিম ভালবাসা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। দয়াময়ের দয়া আমার হৃদয়ে আজও অহঃরহ জাগরূক রহিয়াছে। এরূপ তেজোবলসম্পন্ন অথচ শান্তস্বভাব ইংরেজ আমি কখন দেখি নাই।

দর্শন হইবামাত্রই তিনি আমার করমর্দ্দনপূর্ব্বক অতি সমাদরে আমাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর আমাকে তিনি কহিলেন, "বাবু! আমি রেসেলার কাজ সম্পূর্ণ অবগত নহি। কর্ণেল টুরূপ এবং কমিশনার আলেকজাণ্ডারের নিকট আমি শুনিয়াছি, আপনি রেসেলার কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। তাঁহারা এ সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই নূতন অশ্বারোহী দল গঠনের সকল বন্দোবস্তই আপনাকে করিতে হইবে। আর আপনি আমাকে যে সকল কাজ করিতে বলিবেন, তাহাই আমি করিব।"

কর্ণেল ক্রশম্যানের সদাই সরল ভাব,—কুটিল ভাব তাঁহাতে ছিল না,—বক্র রাজনীতি তিনি জানিতেন না।

আমি বিনীতভাবে তদুত্তরে কহিলাম, "আমার সাধ্যানুসারে যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহার কিছুই ত্রুটি হইবে না। আপনার কার্য্যে আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছি।"

কর্ণেল সাহেব আমার পৃষ্ঠদেশে করতল দ্বারা ধীরমন্দ আঘাত করিয়া কহিলেন, "বাবুজী! আপনার ন্যায় ব্যক্তি ভারতে কয় জন আছেন বলিতে পারি না। বুঝি আর নাই।"

এইরূপ কথাবর্ত্তার পর আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় দাদার বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমার বৃহৎ ঘোড়া দেখিয়া দাদা জিজ্ঞাসিলেন, "এ ঘোড়া কোথায় পাইলে?"

আমি। কমিশনার সাহেব দিয়াছেন।

দাদা। এই গো! আবার দেখিতেছি, সর্ব্বনাশের যোগাড় হইয়া উঠিয়াছে! আমার বোধ হচ্ছে, নিশ্চয় তোকে কোথায় লড়াইয়ে পাঠাবে। তা নৈলে, তোকে এত বড়—এই হাজার টাকা দামের ঘোড়া দিবে কেন? তুই মুস্কিল বাধালি দেখচি!

আমি। না—দাদা—না। আমাকে লড়াই করিতে যাইতে হইবে না। আমাকে চড়িবার জন্য এই ঘোড়া দিয়াছেন।

দাদা। এ ঘোড়া আমার বাসায় থাকতে পাবে না। এ সর্ব্বনেশে ঘোড়া যে বাসায় থাকে, সে বাসার লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়। যিনি ঘোড়া দিয়েছেন, তুই তাঁকেই বল্,—তিনি যেন দূবে এর জন্য একটা আস্তাবল তৈয়ার করে দেন।

আমি। এ বেলা এই বাসার নিকট আস্তাবলেই এ ঘোড়া থাক্। ও বেলা আমি ইহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিব।

দাদা ঘোড়া দেখিয়া মহা বিরক্ত হইলেন। তিনি সকলকেই বলিতে লাগিলেন, "এ ত ঘোড়া নয়,—যম।"

দেখিয়া শুনিয়া আমি অবাক্।

তেত্রিশ

সৎসাহসই সর্ব্ব-মূলাধার। গায়ে খুব জোর থাকিলেও কোন কাজ হয় না। তরবারির ধার খুব তীক্ষ্ণ হইলেও কোন কাজ হয় না। লোকবল অধিক হইলেও কোন কাজ হয় না। সাহসের সহিত সুবুদ্ধির সংযোগ না হইলে যুদ্ধে জয়লাভ করা সহজ হয় না। কাঁচা কাঠে শুধু ফুঁ দিলে তাহা কিছুতেই জ্বলিয়া উঠে না। কাঠ যতই বড় হউক, ফুৎকার যতই অধিক হউক, তবু তাহা জ্বলিবে না। কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত একবার অগ্নির সংযোগ হইলে, তাদৃশ ফুৎকার না দিলেও তাহা আপনা-আপনিই জ্বলিয়া উঠিবে।

সৎসাহস, বুদ্ধি-বিবেচনা, স্থির-প্রতিজ্ঞা এবং তন্ময়ত্ব—যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ইহাই প্রধান উপযোগী। কেবল বাহুবলে যদি কাজ হইত, তাহা হইলে আজ বাঘ দেশের রাজা হইত, সিংহ বাদশাহ হইত, হস্তী বড়লাট হইত, ভল্লুক ছোটলাট হইত। কেবল লোকসংখ্যার আধিক্যে যদি কাজ হইত, তাহা হইলে, ষাট ষাট হাজার অস্ত্রধারী রণদক্ষ সৈন্য থাকিতে সিরাজউদ্দৌলা পলাশীক্ষেত্র হইতে রাজমহলে পলাইতেন না। নেপোলিয়ান্ অষ্ট্রালিট্জ-ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইতেন না। বীর ওস্মান পাশা ভীষণ পেভ্না সমর-প্রাঙ্গণে লক্ষাধিক রুষসৈন্যকে বার বাব পরাজিত করিতে পারিতেন না। অস্ত্র কেবল তীক্ষ্ণধার হইলেই যদি সর্ব্ববিজয়ী হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে বিলাতের রজস এণ্ড সন্স্ কোম্পানী আজ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইতেন।

একদা বাদশাহ আকবর অস্ত্রাগার পরিদর্শন করিতে করিতে দুইখানি বহুমূল্য তীক্ষ্ণধার তরবারি বাছিয়া হাতে লইয়া, মন্ত্রিবর বীরবলকে জিজ্ঞাসিলেন,—"বীরবল! বল দেখি, কোন্ তরবারিখানি ভাল?" মহাপ্রাজ্ঞ বীরবল উত্তর দিলেন,—"ভাল-মন্দ তরবারিতে নাই,—মানুষের বুদ্ধিরূপ ধারই তরবারির তীক্ষ্ণধার।"

বুদ্ধিবলেই ইংরেজ ভারতের অধীশ্বর। ইংরেজ ত তখন নাইনিতালে পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় টল্ টল্ কাঁপিতেছেন; কিন্তু ইংরেজ তখন তাঁহার স্বভাবজাত রাজবুদ্ধিহারা হন নাই। নাইনিতালে তখন প্রায় দুই শত ইংরেজ বাস করিতেছিলেন; কিন্তু দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা যেন এক-দেহ এক-প্রাণ। সর্ব্বদেহ একত্র হইয়া যেন এক বিরাট দেহের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে সর্ব্বপ্রাণ এক হইয়া এক মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সে ভীমভৈরব বিরাট আকৃতির নিকট কে অগ্রসর হইবে? একের দেহে ধাক্কা লাগিলে সর্ব্বদেহ কাঁপিয়া উঠিত। দুই শত ইংরেজ যেন একটী তাল, একটী সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অথবা সমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যেন ফুলের একটী তোড়ারূপে পরিণত হইয়াছেন। পরস্পরের শক্তির পৃথক্‌ভাব নাই,—পরস্পরের শক্তিসমূহ, পরস্পর-সম্মিলিত হইয়া তাহা হইতে যেন এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। মহাসমুদ্রে ভাসমান এক একটী ইংরেজ-তৃণ আপনা-আপনি সংযুক্ত হইয়া মহারজ্জু রূপ—মহানাগপাশ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আর ওদিকে বিদ্রোহী সেনাদল-মাঝে অভাব কিছুরই ছিল না, লোক-সংখ্যা অগণ্য, তরবারি-বন্দুক উৎকৃষ্ট, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র বহু; প্রত্যেক সেনা ইংরেজী রীতি অনুসারে শিক্ষিত এবং বলবান্। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, হৃষ্টপুষ্ট এক এক জন মুসলমানের গায়ে ঠিক যেন অসুরের ন্যায় বল। লোহার ন্যায় কঠিন দেহ—এমন ভারি ভারি জোযান,—কুস্তিগীর পালোয়ানের সংখ্যাই বা কত! ইহাদের পাশব বলের নিকট ইংরেজ কোথায় লাগে? অভাব কিছুরই ছিল না; অভাব যাহা ছিল, তাহা সদ্‌বুদ্ধির। কিন্তু ঐ অভাবেই সব মাটি হইয়াছে। যেমন প্রাণবায়ু ব্যতীত দেহ কিছুই নয়, সেইরূপ সদ্‌বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত শুধু সেনাদলের সমাবেশ কিছুই নয় এক প্রকাণ্ড মাংস-পিণ্ডের মহাস্তূপ মাত্র।

বিদ্রোহী-সেনাদলে বুদ্ধিমান্ পরিচালক কেহই ছিল না। প্রত্যেক সৈন্যই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই আদেশ করিতে পরিপক্ক, কিন্তু আদেশ পালনে কেহই

উক্ত নহে। এক দল যদি এক পা অগ্রসর হয়, পাঁচ দল অমনি দশ পা পশ্চাৎ-পদ হয়। এক জন যদি বলিবে হাঁ, পাঁচ জন বলিবে, না। সমস্তই পৃথক্‌ভাব,—একতা বা একপ্রাণতা ছিল না। রজ্জু এলাইয়া এক এক খণ্ড তৃণও আবার শতধা ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বিদ্রোহী সেনা দল কর্তৃক জয়ের কোন আশাই ছিল না।

বিদ্রোহী সেনার আছে সব,—কিন্তু নাই কিছুই। ইংরেজরাজের নাই কিছুই, কিন্তু সবই আছে। ইংরেজের দেহ নাই, প্রাণ আছে। বিদ্রোহী-সেনার প্রাণ নাই, দেহ আছে। বিদ্রোহী সেনার পাশব বল আছে,—সিংহ-ব্যাঘ্র-গণ্ডারের বিজাতীয় শক্তি আছে,—ইংরেজ দুর্ব্বল, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান্ মনুষ্য।

পাঠক! আপনিই বলুন,—এরূপ স্থলে, বিজয়লক্ষ্মী কার গৃহ আলোকিত করিবেন? ইংরেজের, না মুসলমানের?

চৌত্রিশ

মানুষের ঘাড়ে যেমন খুন চাপে, আমার ঘাড়ে তেমনি 'যুদ্ধ' চাপিয়াছিল। মুখে অন্য কথা নাই, কেবল যুদ্ধের গল্প। কিরূপে অশ্বারোহী সৈন্যদল ভীমবেগে গমনপূর্ব্বক শত্রুহস্ত হইতে কামানশ্রেণী কাড়িয়া লয়; কিরূপে অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষ বল্লম দ্বারা পলায়িত সৈন্যকে বিদ্ধ করিতে থাকে; কিরূপে নানা অস্ত্রে বিভূষিত হইয়া অশ্বারোহী বীর বন্ধুর পর্ব্বতোপরি আরোহণ করে,—যখন-তখন যথা-তথা এই সকল গল্পই চলিত। অধিক কি, আমি তখন যুদ্ধের স্বপ্নও দেখিতাম। কখন মনে হইত, আমাদের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু-সৈন্য, তাহারা আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নানা অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে। আমরা পাঁচ জন মাত্র শত্রু-পরিবেষ্টিত থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছি,—আর মুখে বলিতেছি, আমরা পলাইব না, পশ্চাৎপদ হইব না, যুদ্ধে প্রাণ দিব, সম্মুখ-সমরে পড়িয়া সশরীরে স্বর্গে যাইব।

ফল কথা, যুদ্ধের বাতিক হইয়াছিল। যুদ্ধের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা ভাল লাগিত না। মাঝে মাঝে ভাবিতাম,—কমিশনার সাহেবের নিকট একটী ঘোড়া পাইয়াই আমার এই দশা ঘটিল; না জানি, যে দিন আমি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিব, সে দিন আমার কি অনির্ব্বচনীয় দশা ঘটিবে!

যুদ্ধে মরিব বলিয়া আমার কখন ভয় হইত না। মরিবার কথা কখনও মনেই আসিত না। বীরদর্পে হৃদয় কেমন সদাই পরিপূর্ণ থাকিত। শত্রুদলকে কেমন যেন তৃণবৎ বলিয়া বোধ হইত। কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতাম না, কাহাকেও গ্রাহ্য করিতাম না। নির্ভয়ে অশ্বে আরোহণ করিয়া স্ফীত-বক্ষে মনের আনন্দে নাইনিতাল পর্ব্বতোপরি বিচরণ করিয়া বেড়াইতাম। আজ এ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ, কাল ও সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ,—কখন বা সাহেবগণের সহিত একত্র বসিয়া গুপ্ত-মন্ত্রণা, কখন বা অস্ত্রাগার পরিদর্শন,—কখন বা ঘোড়া খরিদের ব্যবস্থা,—ইহাতেই আমার দিন কাটিতে লাগিল। আর ও দিকে দাদার বাসায় প্রত্যহ চারি বেলা উত্তম-মধ্যম ১২০ সিক্কার ওজনে আমার লঘু আহার হইত।

এইরূপে দুই সপ্তাহের অধিক কাল কাটিয়া গেল। আমরা নাইনিতাল আগমনের উনবিংশ দিবসে দেখিলাম, কাশীপুরের রাজা শিবরাজ সিংহ দুই শত সওয়ার পাঠাইয়া দিয়াছেন। বৈকালে আমি বেড়াইতে গিয়াছিলাম,—পথে উক্ত অশ্বারোহিগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বিশেষ যত্ন দেখাইয়া একেবারে কর্ণেল ক্রশম্যানের নিকট লইয়া গেলাম। সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। অশ্বারোহী দল ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে কর্ণেল সাহেবের কুঠি হইতে সঙ্গে করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া উপনীত হইলাম। শীঘ্র বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং ডাল-রুটীর বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। আমার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া অশ্বারোহিগণ বিশেষ আহ্লাদিত হইল। পরদিনই আবার রামপুরের নবাবের নিকট হইতে এক শত অশ্বারোহী সৈন্য আসিল। সর্ব্বশুদ্ধ তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহীত হইল। আমি সেই দিনই সন্ধ্যার সময় কমিশনার আলেকজাণ্ডার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—"আর কাল-বিলম্ব কেন? উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। তিন শত অশ্বারোহী সৈন্য সমাগত হইয়াছে, ইহাদিগকে লইয়াই আপাতত কার্য্যারম্ভ করা হউক।" কমিশনার সাহেব উত্তর দিলেন,—'আরও অধিক সংখ্যক সৈন্যের জন্য রাজাকে ও নবাবকে পত্র লেখা হইয়াছিল। তাঁহারাও প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, 'এক্ষণে এই সৈন্য পাঠাইলাম, বাকি সৈন্য পরে পাঠাইব।' একেবারে সমস্ত সৈন্য এক হইলে শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করাই ভাল নহে কি?"

আমি। রাজা শিবরাজ সিংহ যে আর অধিক সওয়ার পাঠাইতে পারেন, তাহা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কারণ তিনি তাঁহার স্বরাজ্য রক্ষার্থ

স্থানে ঘোড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল। বন্ধনের পর ঘোড়ার গা মালিস করাইল, তৎপরে আহার দেওয়া হইল। অশ্ব-সম্বন্ধীয় সর্ব্বকার্য্য শেষ হইলে সেনাগণ নিজ নিজ তাঁবু খাটাইল, ঝরণার জলে স্নান করিল, শেষে রন্ধনের উদ্‌যোগ করিল। আমি সঙ্গে করিয়া দুই জন ভৃত্য, দুই জন সহিস এবং এক জন পাচক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলাম। তাহারাই আমার তাঁবু খাটাইল এবং আহারাদির বন্দোবস্ত করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের এই অশ্বারোহী দলের সেনাপতি হইয়াছেন কর্ণেল ক্রশম্যান সাহেব। আহারান্তে বেলা দুইটার পর আমি তাঁহার তাঁবুতে গমন করিলাম। নানা কথাবার্ত্তার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"কিভাবে আমি এই অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের গঠন করিব? বিদ্রোহের পূর্ব্বে আমাদের অশ্বারোহী দলের যেরূপ গঠন ছিল, আপনি কি সেইরূপ করিতে চাহেন?"

ক্রশম্যান। হা, ঠিক তদনুরূপ করা আবশ্যক। কেন না, পূর্ব্ব পথই প্রশস্ত পথ।

আমি। তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। সেরূপভাবে ঠিক কার্য্য করিতে গেলে কিছুতেই আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। বিশেষ, অশ্বারোহী দলে অনেক পাহাড়ী লোককে ভর্ত্তি করিতে হইবে। তাহারা এককালে ২০০৲ টাকা দিতে কোথায় পাইবে?

ক্রশম্যান। এ চাকুরীতে ভর্ত্তি হইতে গেলে কি প্রথমে ২০০৲ টাকা করিয়া জমা দিতে হয়? হ্যা ত আমি কখন শুনি নাই।

আমি। আরও নানারূপ কঠোর নিয়ম আছে। আমাদিগকে এক্ষণে তোষামোদ করিয়া, বাবু-বাছা করিয়া, লোক জুটাইতে হইবে। তাহারা হঠাৎ সে সকল কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হইবে কেন?

ক্রশম্যান। বাবু সাহেব। আমি অশ্বারোহী দল সম্বন্ধে কোন নিয়মই অবগত নহি। আপনি আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত সকল বিষয় বিবৃত করুন।

আমি বলিতে লাগিলাম,—সেনাপতি সাহেব একাগ্র-চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। আজ ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে কর্ণেল ক্রশম্যানকে যে কথা বলিয়াছিলাম কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের নিকট আজ তাহার কথঞ্চিৎ বিবৃত করিব।

অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যাপার অপেক্ষাকৃত কিছু বিস্তৃত। কিন্তু ইহা খুব সংক্ষেপে কহিব। কেহ বিরক্ত হইবেন না,—বাজে কথা বলিয়া এ সব

কথাকে কেহ উপেক্ষা করিবেন না। এরূপ কথা বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন,—অন্তত নূতনত্বের খাতিরেও ইহা পাঠ করা উচিত।

পদাতি-রেজিমেণ্ট আট দলে (কোম্পানীতে) বিভক্ত। কিন্তু অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট ছয় দলে (টুরুপে) বিভক্ত।* এখানে কতগুলি ইংরেজ আছেন দেখুন,—(১) সৈন্যাধ্যক্ষ, (২) দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ, (৩) এক জন আডজুটাণ্ট, (৪) এক জন ইংরেজ ডাক্তার।

কতগুলি দেশীয় লোক আছেন দেখুন,—১৩ জন নেটিভ-অফিসার, ৫৪ জন নন্-কমিশণ্ড অফিসার, ছয় জন ভিস্তি, ছয় জন বংশীবাদক এবং ৫০৪ জন অশ্বারোহী সৈন্য। তের জন নেটিভ অফিসারের মধ্যে তিন জন রেসেলাদার আছেন। ইঁহাদের পদ খুব উচ্চ। ১ম রেসেলাদারের মাসিক বেতন—৩০০৲; ২য় রেসেলাদারের মাসিক বেতন—২৫০৲; ৩য় রেসেলাদারের মাসিক বেতন—২০০৲। ১ম রেসেলাদার 'রেসেলাদার মেজার' নামে অভিহিত হন। তিনি মাহিনা ব্যতীত আরও ৩০৲ টাকা মাসিক 'এলাউয়েন্স'-স্বরূপ অধিক পাইয়া থাকেন। তিন জন রেসাইদার আছেন। প্রথম রেসাইদারের মাসিক বেতন ১৫০৲; দ্বিতীয়ের বেতন ১৩৫৲; তৃতীয়ের ১২০৲ টাকা। ছয় জন জমাদার আছেন। প্রথম দুই জন জমাদারের মাসিক বেতন ৮০৲ টাকা হিসাবে; দুই জনের ৭০৲ টাকা হিসাবে; বাকী দুই জনের ৬০৲ টাকা হিসাবে। এক জন 'উর্দ্দী মেজার' আছেন, তাঁহার পদ রেসাইদারের তুল্য,—মাসিক বেতন ১৩৫৲ টাকা। সর্ব্বশুদ্ধ এই তের জন নেটিভ অফিসার।

৫৪ জন নন্-কমিশণ্ড অফিসারের হিসাব। ৬ জন কোৎদফাদার; প্রত্যেকের বেতন মাসিক ৪৭৲ টাকা। ৪৮ জন দফাদার; মাসিক বেতন প্রত্যেকের ৩৮৲ টাকা।

ছয় জন যে বংশীবাদক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের মাহিনা মাসিক ৩০৲ টাকা। এই ছয় জনের মধ্যে এক জন কর্ত্তা আছেন, তিনি ৫৲ টাকা 'এলাউএন্স'স্বরূপ অধিক পান।

প্রত্যেক ভিস্তির মাসিক বেতন ৫৲ পাঁচ টাকা।

সওয়ার বা অশ্বারোহী সেনা যখন প্রথম ভর্ত্তি হয়, তখন সে মাসিক ২৭৲ টাকা করিয়া মাহিনা পায়। ছয় বৎসর পরে ঐ বেতন ২৮৲

* এক্ষণে অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট আট টুরুপে বিভক্ত।

টাকা হয়। দশ বৎসর পরে ঐ বেতন ২৯৲ টাকা হয়। ১৫ বৎসর পরে ঐ বেতন ৩০৲ টাকা হয়। বস্,—আর বেতনের বৃদ্ধি নাই। সৈন্যগণের যদি স্বভাব-চরিত্র ভাল হয়, যদি উত্তমরূপ কাজ কর্ম্ম করে,—তাহা হইলেই উপরোক্ত নিয়মে বেতন-বৃদ্ধি হয়, নচেৎ নহে।

সওয়ারগণের কস্মিন্‌কালে আর কোন উপায়েই যে বেতন-বৃদ্ধি হয় না, তাহা নহে। এই সওয়ার হইতেই সে সর্ব্বোচ্চপদস্থ রেসেলাদার-মেজার হইতে পারে। তখন তাহার বেতন হয় মাসিক ৩০০৲ টাকা। যেমন জয়েণ্ট মাজিষ্টর হইতে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায়, সেইরূপ সওয়ার হইতে রেসেলাদার মেজার হওয়া যায়। গুণাগুণ দেখিয়া সওয়ারগণের ক্রমশঃ পদোন্নতি হয়। ৩০৲ টাকা বেতনের সওয়ার প্রথম উন্নতিতে দফাদার হন। দফাদার হইতে কোৎদফাদার হন। কোৎদফাদার হইতে জমাদার হন। এইরূপে পদবৃদ্ধি হইতে থাকে।

অন্তিমে যাহাই হউক, প্রথমে সওয়ারকে ভর্ত্তি হইতে হয় মাসিক ২৭৲ টাকায়। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, এক জন পদাতি সৈন্যের ৭৲ টাকা, আর এক জন সওয়ারের বেতন ২৭৲ টাকা! কেন এত পার্থক্য হইল? পদাতির অপেক্ষা অশ্বারোহীর বেতন না হয় দ্বিগুণ হউক,—এ একেবারে প্রায় চতুর্গুণ কেন?

সওয়ারের বেতন শুনিতে সাতাইশ বটে, কিন্তু বস্তুত মাহিনা খুব কম। সওয়ার ২৭৲ টাকায় ভর্ত্তি হন সত্য, কিন্তু ঘোড়ার খরচ বলিয়া ঐ বেতন হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা কাটিয়া লওয়া হয়। ঐ ১৫৲ টাকা হইতে ঘেসেড়া সহিসের বেতন, ঘোড়ার দানা, ঘোড়ার শীতবস্ত্র, কম্বল, ঘোড়া বন্ধনের আগাড়ি পিছাড়ি দড়ি,—ইত্যাদি ইত্যাদি গবরমেণ্ট ক্রয় করেন। এই ১৫৲ টাকা ছাড়া, আরও ২॥৵০ গবরমেণ্ট মাসিক কাটিয়া লন। ইহার নাম খরচা-ফণ্ড। এই ২॥৵০ হইতে সওয়ারের জন্য তাঁবু খরিদ, বস্ত্র খরিদ এবং বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি মেরামত হয়। ধোপা, নাপিত, মেথরের খরচ—ঐ ২॥৵০ হইতে হয়। যখন উহাতে উপরোক্ত খরচ না কুলায়, তখন মাসিক ৩৲ বা ৩॥০ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইয়া থাকে। সাধারণত এক জন সওয়ার মাসিক বেতন পায় ৯।৵০ নয় টাকা ছয় আনা।

সওয়ারদের আরও একটী ফণ্ড আছে। তাহার নাম আমানত ফণ্ড। তাহাতে প্রত্যেক সওয়ার দেড় মাসের মাহিনা জমা দিতে বাধ্য। শুধু

সওয়ার কেন, ঐ ফণ্ডে সকলেই—মায় রেসেলাদার মেজার পর্য্যন্ত ঐ দেড় মাসের মাহিনা জমা দিয়া থাকেন। যিনি এককালে ঘর হইতে আনিয়া ঐ দেড় মাসের মাহিনার টাকা আমানত ফণ্ডে ফেলিয়া দিতে না পারেন, তিনি মাসে মাসে এক আধ টাকা করিয়া দিয়া ক্রমশঃ ঐ দেড় মাসের মাহিনা পূরণ করেন। এইরূপে কোন কোন রেজিমেণ্টে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা জমিয়া যায়। যদি পুত্র-কন্যার বিবাহ বা পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ, গৃহ নির্ম্মাণ বা অন্য কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যে সিপাহীর টাকা কর্জ্জের দরকার হয়, তবে সিপাহী ঐ আমানত ফণ্ড হইতে বার্ষিক শতকরা ৬৲ টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ লয়। টাকা কর্জ্জ লইতে হইলে, প্রথমত সৈন্যাধ্যক্ষকে দরখাস্ত করিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষের হুকুম হইলে সওয়ার টাকা কর্জ্জ পায়; হুকুম ব্যতীত টাকা পাইবার যো নাই।

কোন সওয়ার যখন পেনশন লইয়া অথবা নাম কাটাইয়া ঘরে যায়, তখন ঐ দেড় মাসের মাহিনা আমানত ফণ্ড হইতে ফেরত পায়; কিন্তু সুদ পায় না। ঐ ২৫।৩০ হাজার টাকা গবরমেণ্ট সুদে খাটান। রেজিমেণ্টের বেণিয়া-মুদিগণ শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা সুদে প্রায় ৯ হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া থাকে। আরও নানা রূপে ঐ টাকা সুদে খাটে। এইরূপে খাটিতে খাটিতে কোন কোন রেজিমেণ্টের ৭০।৮০ হাজার টাকা মজুদ হয়। সওয়ারদের টাকা এইরূপে আমানত ফণ্ডে গিয়া সুদে সুদে যতই ফাঁপিয়া উঠুক না কেন,—সওয়ারদিগকে যখন টাকা কর্জ্জ লইতে হইবে, তখনই শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকা সুদ দিতে হইবে। অর্থাৎ নিজের টাকা, সুদ দিয়া নিজেকেই কর্জ্জ লইতে হইবে।

অনেক রকম পরীক্ষা দিয়া সিপাহী ভর্ত্তি হয়। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির কম লম্বা হইলে, তাহাকে পদাতি-সৈন্য মধ্যে লওয়া হয় না। কিন্তু পাঁচ ফুট চারি ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা লোকও সওয়ার হইতে পারে। তবে অতিশয় লম্বা—যথা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি হইলে, তাহাকে অশ্বারোহী দলমধ্যে কেহ গ্রহণ করে না। এইরূপ বুকের নির্দ্দিষ্ট মাপ আছে। এই সব মাপ-জোখ ঠিক হইলে, ডাক্তার সাহেব তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করেন। অবশেষে বুক-পিঠ, হাত-পা টিপে-টুপে দেখা হয়। তাহার চোখের তেজ দেখিবার জন্য তাহাকে দূরে দাঁড় করাইয়া, লাল নীল রঙ দেখান হয়; অঙ্গুলি দেখান হয়। ফল কথা, বড় বিষম পরীক্ষা। রেজিমেণ্টের ডাক্তার সাহেব এ বিষয়ের পরীক্ষক।

সওয়ার ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট ভর্ত্তি হইবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রথমে আবেদন করে, আবেদনকালে সৈন্যাধ্যক্ষ একবার তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করেন। তীব্রদৃষ্টিতে এইরূপ পরিদর্শনের পর ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"রূপেয়া মজুদ হ্যায় ?" সে ব্যক্তি উত্তর দেয়— "হাঁ খোদাবন্দ, মজুদ হ্যায়।" টাকা নাই বা কম আছে,—যদি এইরূপ উত্তর সে ব্যক্তি দেয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়। টাকা মজুদ আছে জানিলে, তবে সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে পরীক্ষার জন্য ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ডাক্তার সাহেব তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ বিষম অগ্নি-পরীক্ষা করিয়া, পছন্দ হইলে লেখেন 'উপযুক্ত', অপছন্দ হইলে লেখেন 'অনুপযুক্ত'। অনুপযুক্ত কর্ম্মপ্রার্থী অবশ্যই শূন্য মনে ঘরে ফিরিয়া যায়।

সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ম্মপ্রার্থী সওয়ারকে প্রথম দর্শনেই যে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "রূপেয়া সব মজুদ হ্যায় ?' এ কথার অর্থ কি ? রহস্য কেহ বুঝিয়াছেন কি ? অশ্বারোহী হইবার জন্য চাকুরীপ্রার্থী হইয়া আসিলে, সঙ্গে করিয়া নগদ প্রায় আড়াই শত বা পৌনে তিন শত টাকা আনিতে হইবে। অশ্বারোহীকে নিজের ঘোড়া নিজে কিনিতে হয়। অশ্বারোহীর ঘোড়া গবরমেণ্ট নিজ খরচায় কিনিয়া দেন না। প্রথমে ঘোড়া খরিদ দরুণ সেই কর্ম্মপ্রার্থীর নিকট নগদ ২০০৲ টাকা লওয়া হয়। ঐ দুই শত টাকা 'চাদা-ফণ্ডে' জমা হয়। ঐ দুই শত টাকা লইয়া গবরমেণ্ট সেই সওয়ারকে একটী ঘোড়া দেন। গবরমেণ্টের অনেক ঘোড়া খরিদ হইয়া, শিক্ষিত হইয়া আস্তাবলে মজুদ আছে। সেই মজুদী ঘোড়া হইতে সওয়ারকে একটী ঘোড়া দেওয়া হইল। ঘোড়ার জিন, লাগাম এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম খরিদ করিবার জন্য আরও ৭০৲।৮০৲ টাকা সেই ব্যক্তিকে জমা দিতে হয়। এই ৭০৲।৮০৲ টাকা একান্ত নগদ না দিতে পারিলে ধারে কাজ চলে। অর্থাৎ সওয়ার মাসে মাসে কিছু টাকা উহার জন্য দিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট টাকা শোধ হইলে তখন আর কিছুই দিতে হয় না। পেনশন লইয়া বা নাম কাটাইয়া সওয়ার যখন ঘরে ফিরিয়া যায়, তখন ঐ ২০০৲ টাকা এবং ঐ ৭০৲।৮০৲ টাকা পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সে ব্যক্তি এই গচ্ছিত অর্থের জন্য সুদ কখনও কিছুই পায় না।

প্রতি দুই জন সওয়ারের একটী করিয়া সহিস চাকর থাকে। প্রত্যেক সহিসের একটী করিয়া টাটুঘোড়া আছে। এই টাটু লইয়া সে মাঠে ঘাস কাটিতে যায়। রেসেলা যখন অন্য স্থানে 'কুচ' করে, তখন সওয়ারের তাঁবু

ইত্যাদি ঐ টাটু দ্বারা বাহিত হয়। সওয়ারদের ক্ষুদ্র নামমাত্র তাঁবু। সহিস এবং টাটুর জন্য খরচ-পত্র সওয়ারপ্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত ১৫৲ টাকা হইতে নির্ব্বাহিত হয়।

কর্ণেল ক্রশম্যান এই সমস্ত কাহিনী, একাগ্রমনে শুনিয়া আমাকে কহিলেন,—"বাবু সাহেব। অশ্বারোহী দল গঠন সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই করুন। এ বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করিব না।

পঁয়ত্রিশ

কালাডুঙ্গি গ্রাম নহে। তথায় বসবাস কাহারও নাই; দোকান নাই, বাজার নাই; খাদ্যদ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। আছে কেবল একটী প্রশস্ত বাঁধা রাস্তা। এ পথ দিয়া নাইনিতালে যাইতে হয় এবং নাইনিতাল হইতে মোরাদাবাদ, বেরিলি অঞ্চলে আসিতে হয়। মেরামত অভাবে, বর্ষাজলে এ পথ এখন স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। আর আছে, একটী অগভীর পর্ব্বত-নদী। নির্ম্মল শীতল জল খরবেগে বহিতেছে। আর আছে, দুইটী বাঙ্গলা-ঘর। একটী ছোট, একটী প্রকাণ্ড। ইংরেজ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত। ইংরেজের এই বাঙ্গলাদ্বয় বিশ্রামগৃহ ছিল। ইংরেজের যখন রাজ্য ছিল, তখন এই বাঙ্গলা-ঘরে রক্ষক, খানসামা, বাবুর্চ্চি,—চা, বিস্কুট, রুটী, অল্প নেশাকর নানারূপ উৎকৃষ্ট মদ্য, মাংস এবং সোডা-লেমনেড চব্বিশ ঘণ্টাই থাকিত। ইংরেজ-যাত্রী আসিয়া এই ঘরে দুই চারি ঘণ্টা, বা চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন। কেহ বা শিকার সন্ধানে আসিয়া দুই তিন দিন কাল এখানে কাটাইতেন। তখন এই গৃহদ্বয়ের বাহার কতই ছিল; প্রত্যেকের সম্মুখে এক একটী ফুলের বাগান ছিল। তাহাতে নানাজাতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় পুষ্প সদাই ফুটিয়া থাকিত। এখন সে বাঙ্গলা আছে, সে ফুলের বাগানও আছে,—কিন্তু সবই কেমন বিগতশ্রী। বাগানের বেড়া কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে, কোথাও আদৌ বেড়ার চিহ্নমাত্র নাই; কোন ফুলগাছের ডাল ভাঙ্গা, কাহারও গোড়া কে উপড়াইয়া ফেলিয়াছে, কোন ফুলগাছের টব্‌টী উল্টানো,—ফুলগাছটী তবুও ভূমে গড়াগড়ি দিয়াও কথঞ্চিৎ জীবিত আছে, কোথাও ফুলগাছের নাম মাত্র নাই,—তথায় ছোট ছোট আগাছা জন্মিয়া জঙ্গল হইয়াছে। এত অনাদরে, এত অযত্নে, এত দুঃখের দশাতেও, ফুল দুই চারিটী আপনা আপনি ফুটিয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। আমি তখনও কর্ণেল ক্রশ-ম্যানের নিকট বসিয়া, অশ্বারোহী সেনাদল-গঠন সম্বন্ধে আরও নান কথা-বার্ত্তা কহিতেছিলাম। এমন সময় আমাদের নিকট কমিশনার আলেকজাণ্ডার, কর্ণেল টুরুপ, লেফটেনাণ্ট বারওয়েল এবং হণ্টার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের সঙ্কুলান হয়, বসিবার এমন আসন ছিল না। আমি নিজ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কমিশনার কহিলেন, "না না,—আপনি বসুন। আমরা বসিব না,—দাঁড়াইয়াই দুই চারিটা কথা কহিতেছি।" ইতি-মধ্যে চাপরাশীগণ ক্যাম্প-চৌকি কয়েকখানি আনিয়া দিল। তাহাতে আমরা সকলে বসিলাম,—বসিলেন না কেবল কমিশনার আলেকজাণ্ডার। তিনি পা-চালি করিতে করিতে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "এই বড় বাঙ্গলাটীতে লেফটেনাণ্ট বারওয়েল এবং হণ্টার থাকিবেন। আর এ ছোট বাঙ্গলাটী আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাবু! আজ এই বাঙ্গলাদ্বয়কে এত খারাপ দেখিতেছেন, কিন্তু এক দিন উহার কতই শোভা ছিল। ঐ দুইটী উদ্যানকে রক্ষা করিবার জন্য মাসে মাসে অনেক টাকা ব্যয় হইত। উহাদের জন্য কত ভাল ভাল গাছ কলিকাতা এবং লণ্ডন হইতে আনাইয়াছিলাম। উদ্যান অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু আমার যত্নের ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি ছিল না। আমি যখন এখানে আসিতাম, তখন স্বহস্তে কত গাছের তলায় জল দিতাম।"

এই কথা বলিতে কমিশনার সাহেবের নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে লাগিল এবং চোখের কোণে জল আসিল। তিনি আর অধিক কথা কহিতে পারি-লেন না।

কর্ণেল টুরুপ আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এস্থান তাদৃশ নিরাপদ্ দেখি না। নূতন অশ্বারোহিগণ এখনও সুশিক্ষিত হয় নাই। সেই জন্য আমি বলি যে, নাইনিতালে যে গোর্খা পদাতি আছে, তাহা হইতে অন্তত এক শত সৈন্য কালাডুঙ্গিতে আসিয়া আপাতত অবস্থিতি করুক। কি জানি, হঠাৎ যদি বিদ্রোহী সৈন্য আক্রমণ করে, তাহা হইলে তখন ঐ এক শত গোর্খা-পদাতি দ্বারা অনেক কাজ হইবে।"

আমি। না,—গোর্খা সৈন্যের এখানে আবশ্যকতা নাই। আমরা তিন শত অশ্বারোহী এখানে থাকিতে, বিদ্রোহিগণ কিছুতেই আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইবে না। তাহাদের বল-বুদ্ধি আমার অগোচর নাই। তাহারা ভীরু, কাপুরুষ। বেশী লোক দেখিলে তাহারা দূরে পলায়।

এইরূপ বন্দোবস্ত স্থির হইল ;—অশ্বারোহী দল এক্ষণে তিন অংশে বিভক্ত হইবে। প্রথম অংশের পরিদর্শক বা আড্‌জুটাণ্ট আমি হইব। দ্বিতীয় অংশের পরিদর্শক হইবেন,—লেফটেনেণ্ট বারওয়েল। আর লেফটেনেণ্ট হণ্টার তৃতীয় অংশের পরিদর্শক হইবেন। এই পরিদর্শনকার্য্য ব্যতীত আমার উপর কেরানিগিরিরও ভার পড়িল। এই অশ্বারোহী সেনা দল সম্বন্ধে যত কিছু লেখা-পড়া, হিসাব-পত্র সমস্তই আমাকে করিতে হইবে। কর্ণেল ক্রশম্যান সেনাপতি হইলেন। তিনি কিন্তু কালাডুঙ্গিতে থাকিবেন না ; প্রত্যহ নাইনি-তাল হইতে যাওয়া-আসা করিবেন। কেন না, তাঁহাব শরীর অসুস্থ। এই অশ্বারোহী দলের নাম হইল, 'রোহিল্লা হর্শ'। কয়েক মাস পরে, 'রোহিল্লা' নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নাম হইল,—'রোহিলখণ্ড হর্শ'। অবশেষে, বিদ্রোহ অবসানে এই দল ১৬ সংখ্যক বেঙ্গল অশ্বারোহী সেনা নামে অভিহিত হয়।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। কমিশনার আলেকজাণ্ডার, কর্ণেল ক্রশম্যান এবং কর্ণেল টুরুপ,—ইঁহারা অশ্বারোহণে নাইনিতালে যাত্রা করিলেন। কালাডুঙ্গিতে রহিলেন কেবল দুই জন ইংরেজ,—বারওয়েল এবং হণ্টার। বাঙ্গালীও আমরা দুই জন রহিলাম,—আমি শ্রীদুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় এবং ডাক্তার শ্রীনন্দকুমার মিত্র। ইহা ব্যতীত, বাকি সমস্ত লোকই এখন আমাব একরূপ অপরিচিত।

সেদিন আমরা তাঁবু খাটাইয়াই রাত্রি যাপন করিলাম, কেন না, বাঙ্গলা-ঘর দুইটী অপরিষ্কার ছিল।

সন্ধ্যার সময় আমি সেনা-নিবাসে গমন করিলাম। অশ্বারোহী দলের তাৎকালিক প্রধান কর্ত্তাকে কহিলাম,—"এক্ষণে অদ্য রাত্রে দুইটী বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে। প্রথম, বহুসংখ্যক তাঁবু বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ; স্থানে স্থানে প্রদীপ জ্বলিতেছে ; কেহ কেহ তামাকু আদি সেবন করিতেছে ; কেহ বা রন্ধন-কার্য্যে এখনও ব্যাপৃত আছে। কাপড়ের তাঁবু, কি জানি যদি কোন গতিকে একটা তাঁবুতে অনবধানতা বশতঃ আগুন ধরিয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইতে পারে।" আমার এই কথা শুনিয়া সেই প্রধান ব্যক্তি মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া হুঙ্কার-রবে সকলকে কহিলেন, "ভাই সকল! সাবধান! আগুনকে সকলে সাবধান হইও! বস্ত্রাবাস আজ তোমাদের শয়ন-ঘর। দেখিও, যেন উহাতে কোনরূপ আগুন না লাগে।" সেনানায়কের এই কথা অশ্বারোহিগণ শ্রবণ-মাত্র যে যেখানে বসিয়াছিল, সে তথা হইতে এইভাবে উত্তর দিল, "আদেশ শিরোধার্য্য।"

আমার দ্বিতীয় কথাটী এই,—"বিদ্রোহী সেনা নিকটেই হলদোয়ানিতে আড্ডা করিয়া আছে। আমরা যে অদ্য কালাডুঙ্গি অধিকার করিয়াছি, এ সংবাদ অবশ্যই তাহারা জানিয়া থাকিবে। অন্তত তাহাদের জানাও উচিত। এই কালাডুঙ্গি তাহারা পূর্ব্বেই অধিকার করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান আমরা হঠাৎ অধিকার করিয়াছি দেখিয়া, তাহারা সম্ভবত ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। এমন কি, তাহারা অদ্য নিশাযোগে প্রচ্ছন্নভাবে আমাদিগকে আক্রমণও করিতে পারে। সেই জন্য অদ্য আমাদিগকে সজাগ থাকিতে হইবে। ঘোর ঘুমে অভিভূত হওয়া হইবে না। অদ্য রাত্রেই এই রাজপথের অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী বড় ঘাটি বসাইতে হইবে, ইহার এক পোওয়া পথ পশ্চাতে আর একটী ছোট ঘাটি বসাইতে হইবে। বিদ্রোহী সেনার আক্রমণ-লক্ষণ দেখিলে, ইহারা হয় দৌড়িয়া আসিয়া, না হয় বংশীবাদন দ্বারা আমাদিগকে সংবাদ দিবে। সংবাদ পাইবামাত্র আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সত্বর প্রস্তুত হইয়া থাকিব এবং শত্রু দমনের চেষ্টা করিব।"

প্রধান ব্যক্তির আদেশ মাত্র অমনি দুইটী ঘাটি বসিল। দূরবর্ত্তী ঘাটিতে ষোল জন লোক রহিল, নিকটস্থ ঘাটিতে আট জন অবস্থিতি করিল।

আমি আপন তাঁবুতে প্রত্যাগত হইলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাই শয়ন, অমনি নিদ্রা। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। মনে মনে একটু লজ্জিত হইলাম, রাত্রে বেশ সজাগ ছিলাম বটে!

ছত্রিশ

প্রভাতে উঠিয়া আমার সেই ক্ষুদ্র বাঙ্গলা-ঘরে গেলাম। বড় বাঙ্গলাটীর তুলনায় এইটী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বস্তুত তাদৃশ ক্ষুদ্র নহে। চারিটী বড় বড় ঘর তাহাতে ছিল এবং বিস্তৃত একটী হল ছিল। বাঙ্গলার অদূরে—এক বিঘা জমির পর রসুই ঘর, স্নানের ঘর এবং পাইখানা বিরাজিত। সর্ব্বপ্রথমে আমি বাঙ্গলা পরিষ্কার করাইতে নিযুক্ত হইলাম। হলে আফিস হইল। হলের সাজ,—একখানি ক্যাম্প-টেবিল, দুইখানি ক্যাম্প-চৌকি, দুইটী মোড়া। হলের পাশেই যে ঘরটী ছিল, সেইটীকে শয়ন-ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাতে এক খাট পাতিলাম। বাঙ্গলার আর একটী ঘর রসুই ঘর হইল।

দূরে যে রসুই ঘর স্বতন্ত্র ছিল, তাহা পাইখানার সহিত সংলগ্ন বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। অবশিষ্ট ঘরগুলি ভৃত্যগণকে থাকিতে দিলাম।

বেলা প্রায় আটটা। হলে টেবিলের সম্মুখে, চৌকির উপর বসিয়া প্রধান কেরানী সাজিয়া খাতাপত্র, দোয়াত-কলম-কাগজ সাজাইয়া রাখিতেছি, এমন সময় দেখি ডাক্তার নন্দকুমার মিত্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত। তিনি আসিয়াই আমাকে ক্রোধ এবং অভিমানভরে কহিলেন,—"আপনার বেশ আক্কেল যা হোক! আমি এদিকে যে মরি,—আপনি তা দেখবেন না! আপনার নিজের সুখটাই সর্ব্বস্ব।"

আমি। হইয়াছে কি?

নন্দ। তাঁবুর ভিতর সমস্ত দিনরাত থাকা কি আমার কম্ম? আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলেও, আমি তাঁবুর ভিতর বসবাস করিতে পারিব না। আর, আপনার কথাতেই আমি রেজিমেণ্টের ডাক্তার হইয়া এতদুর আসিয়াছি। শেষে, আমাকে এরূপ করিয়া বধ করা কি আপনার উচিত?

আমি। (হাসিয়া) আপনি এই বাঙ্গলাতেই থাকুন না কেন? অনেক ঘর আছে; যে ঘরটী আপনার পছন্দ হয়, সেইটাই লউন।

নন্দ। আঃ—বাঁচিলাম! ভাই দুর্গাদাস! তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু।

সেইদিন হইতে ডাক্তারবাবু আমার বাসাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার নন্দকুমার মিত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ। বেরিলি সহরের সিভিল হাসপাতালের ভার তাহার উপর ছিল। যেদিন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার পরদিন মিত্র একা জঙ্গলে জঙ্গলে—অপথ-কুপথ দিয়া পলাইয়া আসিয়া, শেষে নাইনিতালে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নন্দকুমার বয়সে আমা অপেক্ষা বড়। বয়স তখন তাহার ২৬।২৭ বৎসর হইবে। নবীন নধর গড়ন—গৌরবর্ণ—যেন কাঁচা সোনার আভা উথলিয়া উঠিতেছে। আকর্ণবিস্তৃত নয়ন; নাসিকা বাঁশরীকে লজ্জা দেয়; অঙ্গ কোমল, মাংসল, যুবতীজন-মনোহর। বাঙ্গালীর চক্ষে তিনি এক জন সুপুরুষ। সুপুরুষ হইলেও নন্দকুমার কেমন একটু থপ্‌থপে,—শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে বড়ই কাতর; তেজ নাই, স্ফুর্ত্তি নাই,—কেমন যেন ঢেপ্‌ঢেপে, অশ্বরোহণে একান্ত অক্ষম; দৈহিক বল নাই বলিলেই হয়।

ডাক্তার নন্দকুমার স্বভাবত ভীরু। বৃষ্টি পড়িতেছে, নন্দকুমার ঘরের বাহির হইবেন না; ভয়,—পাছে, জলে গলিয়া যান। তাঁহার রৌদ্রকে ভয়;

পাছে রোদের তাতে ঝলসিয়া বা পুড়িয়া যান। রাত্রে একা থাকিতে ভয়, পাছে ভূতের উপদ্রব ঘটে, বা ডাকাত আসিয়া কাটিয়া যায়। আর বলাই বাহুল্য, যুদ্ধে তাঁহার বিষম ভয়,—পাছে তিনি কাটা পড়েন।

সুতরাং ইংরেজের চক্ষে তিনি সুপুরুষ নহেন।

কালাডুঙ্গিতে আসিয়া আমাদের প্রথম কাজ হইল, সৈন্যগণের নাম রেজেষ্টারি করা। রেজেষ্টারি বহিতে প্রথমত প্রত্যেক সৈন্যের পর পর নম্বর, তৎপরে নাম, পিতার নাম, বাসস্থান ও জেলা, জাতি, বয়স, দৈহিক দৈর্ঘ্য এবং ভর্ত্তি হইবার তারিখ লেখা হইল।

যে কয় জন অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়াছিল, তাহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করিলাম। উহাদের মধ্য হইতেই রেসালাদার, নায়েব-রেসালাদার, জমাদার, কোৎ-দফাদার, দফাদার, বাদক প্রভৃতি নির্ব্বাচন করিয়া লইলাম।

ধওকল সিং প্রধান রেসালাদার হইলেন। জাতিতে ইনি রাজপুত ঠাকুর, বয়স পঞ্চাশের উপরে। কেশ শুভ্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যুবকের ন্যায় কার্য্যতৎপরতা। শরীরে তখনও বিলক্ষণ বল। কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি। বক্ষঃস্থল বিশাল। দেহ দৃঢ়। তাঁহার হুঙ্কার রবে শত্রু দল স্তব্ধ। অশ্বারোহণে বিশেষ পটু। কর্ত্তব্যপরায়ণ। শিক্ষাকার্য্যে সুদক্ষ। হাস্যবদন। ধীর স্বভাব। কিন্তু রাগিলে আর রক্ষা নাই। ধওকল সিংহের প্রধান দোষ গোঁয়ারতুমি।

ঝব্বা সিং,—ধওকল সিংএর পুত্র। ঝব্বার বয়স ২৭ বৎসর। অতুল সাহস, অতুল বিক্রম। সুন্দরবনের বৃহদাকার বাঘের ন্যায় যেন বলবীর্য্যসম্পন্ন। ঝব্বা সিং দ্বিতীয় রেসালাদার হইলেন।

হীরা সিং—লাল টুকটুকে মূর্ত্তি,—দেখিতে ঠিক যেন রাজপুত্রের ন্যায়। ইঁহার অঙ্গে টুসি মারিলে যেন রক্ত পড়ে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ। বর্শা-বন্দুক-তরবারি পরিচালনা-বিদ্যায় হীরা সিং অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি হইলেন, তৃতীয় রেসালাদার।

প্যারেডভূমি আমাদের বাসার কিছু দূরে নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রভাতে এবং অপরাহ্ণে সৈন্যগণকে শিক্ষাদানকার্য্য সম্পন্ন হইত। কোন কোন দিন দুপুরবেলায়ও শিক্ষা দেওয়া চলিত।

সৈন্যদের যুদ্ধশিক্ষা সাধারণত বৃহস্পতিবার এবং রবিবার বন্ধ থাকে। কিন্তু এক্ষণে আমাদের রবিবার-বৃহস্পতিবার ছিল না,—সর্ব্ববারেই সমভাবে শিক্ষা-কার্য্য সম্পাদিত হইত।

প্রত্যহ নূতন নূতন ঘোড়া আনিতে লাগিলাম; প্রত্যহ দুই চারি জন করিয়া সৈন্যও অশ্বারোহী দলে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। পাহাড়ী লোকগণ অশ্বারোহী হইতে বড়ই অনিচ্ছুক, তাহারা সানন্দে পদাতি হইতে চাহে। সুতরাং স্থানীয় সংগ্রহকার্য্যে বড়ই ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল।

রামপুরের নবাবকে এবং কাশীপুরের রাজাকে অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য আবার পত্র লেখা হইল। তাঁহারা আবার প্রায় এক শত সওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইলেন। এক সপ্তাহ পরে, রামপুর হইতে আরও পঞ্চাশ জন মুসলমান সওয়ার আসিল। কিন্তু মুসলমানকে সৈন্যশ্রেণী মধ্যে তখন ভর্ত্তি করা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কতকগুলি রাজপুত ঠাকুর দূরদেশ হইতে আপনা আপনি আসিল, বিশেষ সন্ধান লইয়া তাহাদিগকেও ভর্ত্তি করিয়া লইলাম।

এই সময়ে আমার পরিশ্রমের অবধি ছিল না। প্রাতঃকাল পাঁচটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত সমান দমে খাটিয়াও আমি দিবসের সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতাম না। কোন কোন দিন কার্য্য শেষ করিতে প্রভাত হইয়া যাইত।

বালকগণকে ক, খ, গ শিক্ষা দিবার ন্যায়, এই নূতন অশ্বারোহিদলের শিক্ষা ক, খ, গ হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই শিক্ষাবিভাগের প্রত্যেক কার্য্য আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে বাবওয়েল এবং হণ্টার সাহেবকেও শিখাইতে হইত। ধওকল সিং অশ্বপরিচালনে পটু বটেন,—কিন্তু ইংরেজী নিয়মানুসারে তাদৃশ পটু ছিলেন না। যদিও তিনি ইতিপূর্ব্বে ইংরেজের অশ্বারোহী দলে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন,—তথাচ তাঁহার সাবেক দেশীয় নিয়মেই অধিক অভ্যস্ত ছিল। সকালে, বিকালে, দুই প্রহরে আমাকে প্যারেড-ভূমিতে থাকিতে হইত, সন্ধ্যার পর লেখা-পড়ার কার্য্য আরম্ভ হইত। কমিশেরিয়েট বিভাগও আমার হস্তে ছিল। বোঁ বোঁ শব্দে যেমন চাকা ঘুরে, কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই আমি সেইরূপ ঘুরিতাম। আমার কার্য্যকারিতা ও পরিশ্রম দেখিয়া কি ইংরেজ, কি হিন্দুস্থানী সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সমর-শিক্ষা বিষয়ে আমার নৈপুণ্য দেখিয়া, একদিন বাবওয়েল সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবু! শুনিতে পাই, আপনি বাঙ্গালী। মূর্ত্তি আপনার কিন্তু ঠিক হিন্দুস্থানীর ন্যায়; প্যারেড-ভূমে আপনার দক্ষতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া এবং আপনার ইংরেজী ভাষা উচ্চারণের সুর শুনিয়া আমার মনে হয়, আপনি ইংরেজ। তাই বলি,—আপনি কে? তাহার পরিচয় দিউন।"

সাঁইত্রিশ

এত পবিশ্রমেও শরীর ভগ্ন হয় নাই। বরং এ-দেহ দিন দিন অধিক বলবান্ এবং দৃঢ় হইতে লাগিল। পরিশ্রমের কার্য্যেই তখন আমার অপার আনন্দ, অপার স্ফূর্ত্তি। নীরবে বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হইত।

ক্ষুধা কত! খাইতাম কত! ঘোড়ায় চড়িয়া দৌড়িতাম কত! ডাল, আটা, ঘৃত এবং মাংস প্রচুর পরিমাণে মিলিত। হরিণ, খরগোস, বটের, তিত্তির প্রভৃতিব মাংস যথেষ্ট পাওয়া যাইত। রবিবারে আমরা শিকার সন্ধানে বাহির হইয়া অনেক আহার্য্য পশু-পক্ষী হনন করিতাম। অন্যান্য বারে পাহাড়ীরা আমাদের ছাউনিতে মাংস বেচিতে আসিত। সুতরাং অভাব একদিনও হইত না। দাবানলে কাষ্ঠ যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ আমাদের জঠরানলে ডাল-রুটী-মাংস প্রমুখ খাদ্যবস্তু পড়িয়া অবিলম্বে ভস্মীভূত হইত। এই আহার, এক ঘণ্টা পরে আবাব ক্ষুধা! সুতবাং আবার জলযোগ। কিছুক্ষণে আবার পুবাদমে আহার। সে সমযেব কথা ভাবিলে মনে হয়, আমবা তখন এক একটী জীবন্ত রাক্ষস ছিলাম। ক্ষুধা হইবে না ত কি? এক একবার প্যারেডের পর, নাইনিতালের নিদারুণ শীতেও যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত।

ইংরেজেব সহিত তখন যেন আমি একপ্রাণ হইয়াছিলাম। ইংরেজের কার্য্য আমার নিজেব কার্য্য ছিল, অথবা আমাব নিজেব কার্য্য ইংরেজের কার্য্য ছিল। ইংবেজও তখন আমাকে ভাইযেব ন্যায় দেখিতেন;—স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা কিছুরই ত্রুটি ছিল না। ইংরেজ যদি একটা হবিণ শিকার করিয়া আনিতেন,—তাহাব অর্দ্ধেকটা আমাব জন্য অমনি পাঠাইয়া দিতেন। ইংবেজ পাচটী ভাল ফল পাইলে, আমাব জন্য তাহার দুইটী আসিত। অধিক কি, ফুল বা ফুলের তোড়া পাইলে, ইংবেজ তাহার অংশও আমাকে না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তখন প্রকৃতই আমার মনে হইত, আমি ইংরেজের এবং ইংরেজ আমাব। কেহ হাসিবেন না, সত্য সত্যই আমাব মনে হইত, বিদ্রোহিগণের দমন হইলে, ভাবত বাজ্যটা যেন আমিই ফিরিয়া পাইব। এই হিসাবেই আমি তখন ইংবেজের কার্য্য কবিযাছিলাম।

সুখ সর্ব্বদিকেই ছিল, দুঃখ কেবল এক নন্দকুমার মিত্রকে লইয়া ঘটিয়াছিল। সদাই তাঁহার খুঁত খুঁত ঘুঁত ঘুঁত ভাব। ডাল-রুটী এবং হরিণমাংসে তাঁহার মন উঠিত না। তিনি চাহিতেনমিহি চাল, বাটা মাছ এবং পুরানো

তেঁতুলের অম্বল। কিন্তু কালাডুঙ্গির বিজন বনে,—এরূপ খোস্-খোরাক কিরূপে মিলিবে? শীতে তিনি চাহিতেন নূতন মটরশুঁটির ডাল্‌না, সুক্তানি এবং মোচার ডাল্‌না। দুধ যদি একদিন একটু কম হইত, তাহা হইলে নন্দকুমারবাবুর অসুখের আর সীমা থাকিত না। আমার কাছে আসিয়া, পেটে হাত দিয়া, কেবল 'মোলাম, গেলাম' করিতেন,—'সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, কেবল ঢেঁ-ঢেকুর উঠিতেছে'—ইত্যাকার নানা কথা তখন কহিতেন। নন্দবাবু কিছুতেই মহিষের দুধ খাইবেন না। খাঁটি গো-দুগ্ধ না হইলে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন। অশ্বারোহী সেনাদলের খাদ্যদ্রব্যের জিম্মাও আমার কাছে ছিল। অর্থাৎ কমিশেরিয়েট বিভাগের কর্ত্তা আমিই ছিলাম। কাজেই নন্দ বাবু সদা আমারই নিকট আহার বিষয়ে আবদার অভিযোগ করিতেন।

অশ্বারোহী সেনাদলের যিনি ডাক্তার হইবেন, তাঁহাকে ঘোড়া-চড়া শিখিতে হইবে। নন্দবাবু অশ্বারোহী সেনাদলের ডাক্তার, সুতরাং তাঁহারও অশ্বারোহণে পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। হরিণশাবক যেমন বাঘ দেখিলে ভীত হয়, পাঠশালার ছেলে সেকেলে গুরু মহাশয় দেখিলে যেমন ভীত হয়, নন্দবাবু সেইরূপ ঘোড়া দেখিলে ভয় পাইতেন। আমি যদি বলিতাম, "চলুন নন্দবাবু! প্যারেড-ভূমিতে, আজ আপনাকে ঘোড়া-চড়া শিখিতে হইবে।" নন্দবাবু জোড়হাতে ছল্‌ছল্ নয়নে কহিতেন, "দুর্গাদাস বাবু! আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

এরূপ ভীত হইবার একটা কারণও ঘটিয়াছিল। কালাডুঙ্গিতে প্রথম আসিয়াই আমি আমার এবং নন্দবাবুর জন্য দুইটা ঘোড়া কিনিলাম। তন্মধ্যে নন্দবাবু যে ঘোড়াটীকে সুবোধ শান্ত স্থির করিলেন, সেইটাই তিনি পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। নন্দবাবুর ঘোড়াটী দারুণ দুষ্ট হইল; আমার ঘোড়া অতীব তেজস্বী, তখন 'বড় ভাল মানুস' শান্ত হইল। নন্দ বাবু প্রথম দিন আপন ঘোড়ায় চড়িতে গিয়া চিৎপাত হইয়া পড়িয়া যান। আঘাতও সু-কিঞ্চিৎ লাগিয়াছিল। সেই দিন হইতে তাঁহার আতঙ্ক উপস্থিত। আমি তখন তাঁহাকে আমার ঘোড়াটী দিয়া তাঁহার ঘোড়াটী লইলাম। তথাপি তাঁহার আতঙ্ক ঘুচিল না। ঘোড়ায় চড়িবার নাম হইলেই তাঁহার মুখ শুকাইয়া যাইত। আমি এক-এক দিন মজা দেখিবার জন্য বলিতাম,—"আপনি এই রেজিমেণ্টের ডাক্তার, অথচ ঘোড়া চড়িতে জানেন না, শিখিতেও চাহেন না; কাজেই এ কথা আমাকে শীঘ্রই

কর্ণেল ক্রশম্যানের নিকট বলিতে হইবে।" ডাক্তার নন্দকুমার মিত্র অমনি ভয়ে জড়সড় হইয়া আমার পা-দুখানি ধরিতেন। রেসালাদার মেজার ধওকল সিং কখন কখন আমার বাঙ্গলায় আসিয়া আমাকে চোখ টিপিয়া নন্দবাবুর সাক্ষাতে এইরূপ গল্প আরম্ভ করিতেন, "অতি গোপনীয় সংবাদ। পরশ্ব দিন আমাদিগকে হলদোয়ানি গিয়া বিদ্রোহী সেনাসমূহকে আক্রমণ করিতে হইবে। বড় সাহেবের হুকুম হইয়াছে 'প্রস্তুত হও।' বিদ্রোহিগণ দশ হাজার; আমরা তিন চারি শত মাত্র। বিদ্রোহীদের বড় বড় বত্রিশটী কামান; আমাদের একটীও কামান নাই। বিদ্রোহীদের অস্ত্রের ধার তীক্ষ্ণ; কালাডুঙ্গিতে এমন উপযুক্ত মিস্ত্রী নাই যে, আমাদের অস্ত্রগুলিকে ভাল করিয়া শানাইয়া দেয়। তাই ভাবিতেছি, যুদ্ধে জয়লাভের কোন আশা নাই। সম্ভবত আমরা সদলে কাটা পড়িব বা তোপে উড়িয়া যাইব। কিন্তু বড় সাহেবের হুকুম,—যুদ্ধ করিতেই হইবে। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার যো নাই। মরি আর বাঁচি,—প্রাণপণে যুদ্ধ করিব, প্রাণের জন্য আমি তিলার্দ্ধ ভয় করি না। দুঃখ এই, যুদ্ধে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। সম্ভাবনা না থাকুক, —কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া সম্মুখ-সমরে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিব,—নিশ্চয়ই স্বর্গধামে আমাদের বাস হইবে। তাই বলি, দুর্গাদাস বাবু!—আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। যদি স্বর্গবাস করিবার আপনার সাধ থাকে, তবে আর বিলম্ব করিবেন না,—প্রস্তুত হউন। পরশ্ব যুদ্ধ, মধ্যে আর একটি দিন আছে মাত্র।

আমি এইভাবে উত্তর দিতাম,—যুদ্ধে আমি বিশেষ ভয় করি না। যুদ্ধকার্য্যে আমার বড়ই আনন্দ উপস্থিত হয়। বালকে সন্দেশ পাইলে যেমন সন্তুষ্ট হয়, যুদ্ধ পাইলে আমি সেইরূপ সন্তুষ্ট হই। তবে কি জানেন,—সময়ে সময়ে ভয় একটু হয় বৈ কি? রক্তমাংসের শরীর বৈ ত নয়?—ধারালো তরবারির কোপটা গায়ে পড়িলে জ্বালা করে বৈ কি? যখন শত্রুগণ বোঁ বোঁ শব্দে গোলা ছুড়িবে, শন্ শন্ শব্দে গুলি চালাইবে, ঝন্ ঝন্ শব্দে তরবারির খেলা আরম্ভ করিবে, তখন তাহার ভিতর গমন করা যে কি কষ্টকর ব্যাপার, —তাহা মন জানে, অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন। হঠাৎ এই কাঁচা মাথাটা দেওয়া কি সহজ কথা?

ধওকল সিং। তবে কি আপনি যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার করিতেছেন?

আমি। অস্বীকার কেমন করিয়া করিব? যুদ্ধে না গিয়া যাই কোথায়? ও-দিকে ইংরেজ, এ-দিকে মুসলমান। যদি যুদ্ধে যাই, তবে বিদ্রোহী মুসল-

মানের হাতে প্রাণ হারাইব ; যদি যুদ্ধে না যাই, তবে এখনি ইংরেজ নাইনিতাল হইতে নামিয়া আমাকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। গেলেও মৃত্যু, না গেলেও মৃত্যু,—সুতরাং যুদ্ধে যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

ধওকল সিং। আপনি মনের কথা সরলভাবে কহিলেন শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। যাহা হউক, তবে আপনি প্রস্তুত হউন। মধ্যে আর একটী দিন মাত্র। আপনি যে যে সামগ্রী খাইতে ভালবাসেন, কল্য তাহা সংগ্রহ করিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন করুন।

আমি। যে সামগ্রী ভালবাসি, তাহা এখন মিলিবে না।

ধওকল সিং। সে জিনিষ কি ?

আমি। পায়েস এবং সরুচাকলি।

ধওকল সিং। কেন, ডাক্তার বাবু ভাল রাঁধিতে জানেন, নয় ? দুধ, গুড় এবং চাল,—এই কয়টা জিনিষ একত্র মিশাইয়া ত আপনাদের পায়েস হয়, নয় ? ডাক্তার বাবু উত্তম পাচক শুনিয়াছি।

আমরা এইরূপ গল্প করিতে করিতে এক-একবার ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে চাহিতেছিলাম। ডাক্তার বাবুর মুখটা জ্যা-আরোপিত ধনুকের ন্যায় হাঁ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটা ঠেলিয়া কপালে উঠিতেছে ; আর তিনি কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ নড়ন-চড়নহীন নিঃশব্দ।

ধওকল সিং ডাক্তার বাবুকে কহিলেন, "বাবু সাহেব ! আপনিও তবে প্রস্তুত হউন। শুনিলেন ত সব ? পরশ্ব যুদ্ধ। আপনার ঔষধ-পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র বাক্সবন্দী করুন।"

এই কথা শুনিবামাত্র ডাক্তার বাবু সেই হাঁ-করা মুখ অবস্থায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সে কাঁপুনি কি থামে ? ধওকল সিং উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিতে লাগিলেন, "বাবু সাহেব ভয় নাই, ভয় নাই। আপনি থামুন।" আমি গিয়া নন্দবাবুকে ধরিলাম। নচেৎ তিনি যেরূপভাবে কাঁপিতেছিলেন, তাহাতে তিনি চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছা যাইতেন।

নন্দবাবু যে অশ্বারোহণ আদৌ শিখিতেন না, তাহা নহে। না শিখিলে উপায় ছিল না, কাজেই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অশ্বারোহণ শিক্ষা হইত গোপনে। তথায় অন্য কেহ থাকিতে পাইত না। থাকিতাম কেবল আমি এবং চারি জন সহিস। আমার বাঙ্গলার অদূরে যেখানে জন-মানবের সম্পর্ক ছিল না, সেইখানে তিনি ঘোড়ায় চড়িতেন।

আমি ছিলাম শিক্ষক। প্রথম প্রথম তাঁহাকে অশ্বের সহিত চামড়ার দড়ি দিয়া বাঁধিতাম। এক জন সহিস তাঁহাকে ধরিত, অন্য এক জন সহিস অশ্বের মুখ ধরিত। আর দুই জন সহিস ঘোড়ার উপর সম্মুখে এবং পশ্চাতে থাকিত। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় লইয়া খানিকক্ষণ ঘুরিতাম। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কেবল হাস্যরসের সমাবেশ। সহিসগণ হাসিত, আমি হাসিতাম,—নন্দবাবুর ঘোড়াটাও বোধ হয় হাসিত।

ধওকল সিং এর কাণে ক্রমশঃ এ কথা উঠিল। একদিন নন্দ বাবুর এইরূপ অশ্বারোহণ শিক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, এমন সময় (ইঙ্গিত-মত) আমাদের রেজিমেণ্টের সমুদায় অশ্বারোহী ধওকল সিং কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া নিঃশব্দে হঠাৎ একেবারে নন্দবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। 'এ কি এ?' 'এ কি এ?' 'ব্যাপার কি?' 'কাণ্ড কি?' এইরূপ একটা মহাধ্বনি পড়িয়া গেল। অশ্বারোহিগণ হাসিয়া লুটিপুটি খাইতে লাগিল। দুই চারি জন হাসিয়া হাসিয়া ধূলায় পড়িয়া কেবল গড়াগড়ি দিতে লাগিল। নন্দবাবু ত অধোবদন। তিনি ঘোড়া হইতে নামিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন, কিন্তু নামিবার যো নাই,—কেন না চামড়ার দড়িতে ঘোড়ার সহিত দৃঢ়বদ্ধ আছেন। তখন তিনি কেবল জোড়হাত করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। আমি গিয়া চামড়া খুলিয়া দিলাম। নন্দবাবু অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ছলছল-নেত্রে আমাকে কহিলেন, "এ কাজ আপনারই। ভদ্রলোক হইয়া ভদ্রলোককে এরূপ অপমানিত লাঞ্ছিত করিতে নাই। আমার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা হইতেছে।" আমি ব্যাপার কিছু গুরুতর বুঝিয়া অশ্বারোহিগণকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলাম। তাহারা হাসিমাখা-মুখে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এই দিন হইতে নন্দবাবু অশ্বশিক্ষায় অধিকতর মনোযোগ দিলেন। এক মাসের মধ্যেই আপন অশ্ব পরিচালন করিতে এক প্রকার শিখিলেন। বলা উচিত, ক্রমশঃ তিনি এক জন ভাল অশ্বারোহী হইয়াছিলেন।

আটত্রিশ

আনন্দে, উৎসাহে, শিক্ষায় এবং পরীক্ষায কালাডুঙ্গিতে আমাদের এক মাসের অধিককাল অতিবাহিত হইল। একদিন বেলা চারিটার সময় শিক্ষা দিবার জন্য সৈন্যগণকে আমরা প্যারেডভূমিতে লইয়া যাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম, হলদোয়ানির রাস্তার দিক্ হইতে গুলি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা বিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিলাম, যে সকল বিদ্রোহী সৈন্য রসদাদি লুটপাট করিতে আসিত, তাহারাই আজ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। দেখিতে দেখিতে একটা গুলি এক জন সহিসেব পায়ে লাগিল। সে ধড়াস্ কবিয়া পড়িয়া গেল। আর দুইটা গুলি আসিয়া দুইটা ঘোড়ার পেট বিদ্ধ করিল। ঘোড়া দুইটা ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া শেষে পঞ্চত্ব পাইল। আমার কানের কাছ দিয়া একটা গুলি সশব্দে চলিয়া গিয়া একটা গাছের ডালে লাগিল। সৈন্যগণ হঠাৎ কেমন বিভীষিকা দেখিয়া উঠিল। একজন অশ্বারোহীর হাতের চেটোতে একটা গুলি পড়িল।

আমাদের সঙ্গে উপযুক্ত গুলি-বারুদ ছিল না বা যুদ্ধের আর কোনও সরঞ্জাম ছিল না। আমরা প্যারেডভূমি হইতে দৌড়িয়া 'লাইনে' আসিলাম। ছাউনিতে আসিতে হইলে এক পর্ব্বতীয় 'গুল' অর্থাৎ জলপ্রবাহ পার হইয়া আসিতে হয়। সেই গুলে এক সেতু ছিল। পাছে বিদ্রোহী সৈন্য হঠাৎ সেতু পার হইযা আসে, সেই জন্য সেতুর দুই ধাবেব ছোট প্রাচীবের উপর ষাট-সত্তরখানা বড় বড় মোটা মোটা কাঠ চাপাইয়া দিলাম। বিদ্রোহী অশ্বারোহিগণ বেগে আসিয়া আমাদের উপর আব আক্রমণ করিতে পারিবে না। ছাউনিতে আসিয়া 'শত্রু আগতপ্রায়'—এই মর্ম্মে বংশীধ্বনি করিলাম। সৈন্যগণ তাড়াতাড়ি আপন আপন সাজ পরিতে লাগিল, নিমেষ মধ্যে অস্ত্রে-শস্ত্রে বিভূষিত হইল। কেবল দুই শত অশ্বারোহী লইযা আমরা হর-হর—বম্-বম্ রবে শত্রু-আক্রমণার্থ ভীমবেগে বহির্গত হইলাম। এ দুই শত সৈন্য চার দলে বিভক্ত। লেফটেনাণ্ট বারওয়েল দুই দলের সেনাপতি; আমি দুই দলের সেনাপতি। প্রথম দল অর্থাৎ পঞ্চাশ জন সওয়ার লইয়া ধওকল সিং সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইয়াছেন; দ্বিতীয় দল লইয়া হীরা সিং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন,—আমি এই দুই দলেব অধ্যক্ষ-স্বরূপ অবস্থিত। ধওকল সিং যেমন সাহসী, সেইরূপ যুদ্ধপণ্ডিত।

প্যারেডভূমি হইতে যখন আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইতে ছাউনিতে দৌড়িয়া আসি, তখন বিদ্রোহী সেনাদল দূর হইতে ইহা দেখিয়া, মনে ভাবিল,—আমরা বুঝি ভয়ে পলাইয়া যাইতেছি। এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ আরও আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল। শেষে তাহারা বেগে অশ্ব চালাইয়া সেতুর নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সেতুর অবরোধ-স্বরূপ সেই কাঠগুলা সরাইয়া দূরে·ফেলিতে লাগিল। সর্ব্বশুদ্ধ বিদ্রোহী সেনা প্রায় পাঁচ শত ছিল; তন্মধ্যে তিন শত অশ্বারোহী এবং দুই শত পদাতি। যখন সেতুর সমস্ত কাঠ বিদ্রোহী সেনাগণ কর্ত্তৃক অন্য স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন আমি ধওকল সিংকে বিদ্রোহী সেনাব উপর বেগে পতিত হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলাম। মুখে এইমাত্র ধ্বনি,—"Gallop, Gallop, Charge, Charge" আমাদের প্রথম দলস্থ সেই পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী যেন পঞ্চাশটী ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিতে দিতে তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় বেগে ধাবিত হইল। সে বেগ রুদ্ধ করে সাধ্য কার? বিদ্রোহী সেনাদল সে বেগ থামাইবার জন্য সেতুব নিকট হইতে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল। কিন্তু গুলিতে কি সে বেগ রুদ্ধ হয? গুলিতে সে বেগ কিছুই হ্রাস হইল না দেখিয়া এবং জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সে বেগ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া, শত্রুসেনা ভয-বিহ্বল হইয়া রণে ভঙ্গ দিল। পশ্চাৎ পানে আর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল না,—কেবল দৌড আব দৌড়। কতক সৈন্য প্রশস্ত রাজপথ দিযা হলদোযানিব দিকে দৌড়িল, কতক সৈন্য প্রাণভয়ে জঙ্গলপথে প্রবেশ করিল। অধিকাংশ পদাদি সৈন্য বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণবক্ষা কবিল।

আমরা রাজপথ দিযা প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের পশ্চাৎ ধাবিত হইযাছিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে কিছুতেই ধরিতে পারিলাম না। কেবল দুই জন অশ্বাবোহীকে ধরিয়া আনিযাছিলাম। বেগে গমন করিতে করিতে তাহারা টক্কর খাইয়া ঘোড়ার সহিত ভূতলে পডিযা যায়। ইহা ব্যতীত নয় জন পদাতি সৈন্য ধৃত হইযাছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, আরও এক মাইল ধাবিত হই; কিন্তু বারওয়েল সাহেব কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, হলদোয়ানিতে বিদ্রোহীদের প্রায় দুই সহস্র অশ্বারোহী এবং তিন সহস্র পদাতি আছে, সুতরাং আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। বিশেষ, সন্ধ্যা শীঘ্রই সমাগত হইবে, এরূপ স্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য।

আমার কিন্তু বিষম জাতক্রোধ ছিল। আমার মনে তখন এই ভাব উদয় হইয়াছিল,—এই দুরাচার বিদ্রোহিগণই আমাকে একা পাইয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়া কষ্ট দিয়াছিল ; অতএব ইহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিতে হইবে। ইহাদের শাসন না করিয়া অস্ত্র আর প্রত্যাগত হইব না। কিন্তু বারওয়েল সাহেবের জেদে ভগ্নমনে প্রত্যাগত হইতে বাধ্য হইলাম।

উনচল্লিশ

যে কয়েকজন বিদ্রোহী সেনাকে আমরা ধরিয়া আনিয়াছিলাম, তাহাদিগকে মৌখিক আদর-যত্ন করিলাম। কোনরূপ অত্যাচার-উপদ্রব করিলাম না। উত্তম পানীয় জল, উত্তম আহার দিলাম। তখন রাত্রে বিলক্ষণ শীতবোধ হয়। তাহাদের শয়নের জন্য তাঁবু ও কম্বলের বন্দোবস্ত করিলাম। এরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিয়াও শেষে তাহাদের হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি লাগাইয়া রাখিলাম। বন্দী বিদ্রোহীদের দুইটী তাঁবু বেষ্টন করিয়া, শাণিত তরবারি হস্তে রাত্রে প্রহরিগণ পাহারা দিতে লাগিল।

যুদ্ধে অথবা বিনা যুদ্ধে এক রকম জয়লাভ করিলেও যুদ্ধজয়ের চিহ্নস্বরূপ বিপক্ষ পক্ষের কয়েক জন সৈন্যকে বন্দী করিয়া ঘরে আনিলেও, বারওয়েল সাহেবের মনের উদ্বেগ কিন্তু দূর হইল না। সেই যুদ্ধ-জয়ের নিশীথে নিভৃতে বারওয়েল সাহেবের বাঙ্গলায় বসিয়া আমি এবং মিঃ বারওয়েল উভয়ে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম। বারওয়েল সাহেব কহিলেন,—"বাবু দুর্গা-দাস! আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। আমি অনর্থপাতের সূচনা যেন স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমার মনে হইতেছে, আজই এই রাত্রেই অথবা প্রভাতে হলদোয়ানিস্থ সমগ্র বিদ্রোহী সেনা এক হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। আমরা কেবলমাত্র এখানে তিন শত অশ্বারোহী লইয়া আছি। আমাদের সঙ্গে কামান নাই, পদাতি সৈন্যও নাই। ওদিকে বিদ্রোহীদের সৈন্য-সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম নহে। অন্তত চারি হাজার বিদ্রোহী সৈন্য আমাদিগকে যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা পরাজিত হইব এবং আমাদের এক প্রাণীও জীবিত থাকিবে না। চারি হাজার লোকের সহিত তিনশত সৈন্য কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে?"

আমি। কিঞ্চিৎ চিন্তার কথা বটে এবং অন্য রাত্রে যুদ্ধের জন্য বিশেষরূপ প্রস্তুত থাকা উচিত বটে।

আমার এই কথায় বারওয়েল সাহেব আরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "এখনি নাইনিতালে চারি জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে এ সংবাদ লইয়া গমন করুক এবং আপনি কর্ণেল ক্রশম্যানকে এই বলিয়া পত্র লিখুন, অন্য রাত্রেই যেন ২৫০ আড়াই শত গুর্খা পদাতি এবং দুইটী কামান কালাডুঙ্গিতে পাঠান হয়।"

বারওয়েলের ভয় দেখিয়া আমার মনে মনে হাসি আসিল। আমি হাসির ভাব গোপন রাখিয়া সাহেবকে কহিলাম,—"এত উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যকতা নাই। বিদ্রোহিগণ যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে একদিনও আমরা কালাডুঙ্গিতে তিষ্ঠিতে পারিতাম না। ছাতুখোর ডাকাতগুলা কাপুরুষের একশেষ। তাহারাই আজ ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে। তাহারাই এতক্ষণ হয়ত ভাবিতেছে,—যদি কালাডুঙ্গিস্থ ই বেজ-সেনা আমাদিগকেই আজ আক্রমণ করে, তাহা হইলে আমরা কি করিব? বিদ্রোহিগণকে আমি বেশ চিনি; সুতরাং এত অধিক উৎকণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। তবে অন্য রাত্রি হইতে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে। যখন একবার আক্রমণ করিয়াছে, তখন বিদ্রোহিগণ পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে।"

বারওয়েল। সতর্কতা সম্বন্ধে আপনি কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাহেন?

আমি। অন্য আর কিছুই নয়,—কেবল একটু সজাগ থাকা এবং ঘাটি দুইটীতে প্রহরীর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া।

সাহেবের হুকুমে অমনি ধওকল সিং রেসালাদার আমাদের কাছে আনীত হইলেন। সজাগ থাকিবার কথা এবং ঘাটিদ্বয়ে লোকবৃদ্ধির কথা তাঁহাকে বলা হইল। তিনি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি বারওয়েলকে কহিলাম,—"এক্ষণে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করা,—ইহাই হইল আমাদের প্রধান কার্য্য। যদি ছয়-সাত শত রণদক্ষ অশ্বারোহী এই কালাডুঙ্গিতে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে বিদ্রোহী দলকে হলদোয়ানিতে কিছুতেই তিষ্ঠিতে দিব না। দিবসে, রাত্রে, প্রত্যূষে, সন্ধ্যায় তাহাদের উপর এমন উপদ্রব করিব যে, তাহারা তখন পলাইতে পথ পাইবে না। তাহাদের রসদ লুঠিব, তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া দিব, ঘোড়া কাড়িয়া আনিব, কৌশলে কামান দুইটা উঠাইয়া লইয়া আসিব,

—বিদ্রোহিগণ আর কতক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবে? কিন্তু যতদিন না সৈন্য-সংখ্যা বাড়াইতে পারিতেছি, ততদিন আমাদিগকে এইরূপ নীরবে এইখানেই বসিয়া থাকিতে হইবে।”

বারওয়েল। সৈন্যবৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করুন না কেন?

আমি। চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু সফলকাম হইতে পারিতেছি না। এই পাহাড়ী জাতি অশ্বারোহণে একান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং বিশেষ অপটু। অশ্বারোহী দলে ভর্ত্তি হইতে হইবে শুনিলে পাহাড়ী ভয়ে পলায়। পদাতি সৈন্য হইবার জন্য তাহারা লালায়িত। তথাচ আমি অনেক বুঝাইয়া এই এক মাস মধ্যে কেবল সাতজন পাহাড়ীকে অশ্বারোহী দলে ভর্ত্তি করিয়াছি। ইহারা যেমন সাহসী, সেইরূপ বলবান্। কর্ত্তব্যকর্ম্মে ইহাদের একান্ত আস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়? ‘রেসেলায়’ ভর্ত্তি হইবার কথা শুনিলে, ইহাদের শরীর কণ্টকিত হয়। এক্ষণে দেখিতেছি রামপুরের নবাব বা রাজা শিবরাজ সিং সৈন্য পাঠাইযা না দিলে আমাদের আর কোন উপায়ান্তর নাই।

বারওয়েল। সৈন্যের জন্য তাহাদিগকে পত্র লিখুন না কেন?

আমি। এই এক মাস মধ্যে দুইবার পত্র লিখিয়াছি। সাত দিন হইল রামপুর রাজ্যের এবং কাশীপুরের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য দুইজন গুপ্তচর পাঠাইযাছি। কিন্তু চর দুইজন আজও ফিরিল না। রামপুরের নবাব এবং শিবরাজ সিং—ইহারা বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন নাকি? ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

আমার এই কথায় বারওয়েল সাহেব আরও ভীত হইলেন। কাতর অন্তঃকরণে বলিলেন,—“তবে উপায় কি হইবে?”

আমি কহিলাম,—“ভরসা ভগবান।”

এই কথা বলিয়া আমি আপন বাঙ্গলায় আসিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

পাঠকগণকে বলিয়া রাখি, বিদ্রোহের সময় দুই চারি জন ইংরেজ বড়ই ভীত হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদাই ভাবিত, বিদ্রোহীর হাতে শীঘ্রই তাহাদের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। কেহ কেহ রাত্রিকালে ঘুমাইয়া ঘুমাইযা বিদ্রোহিগণের পাশবাচারের স্বপ্ন দেখিত এবং আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সর্ব্বলোককে জাগাইত। কিন্তু এরূপ ভীতিগ্রস্ত ইংরেজের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বলিয়াই ইংরেজ ভারতরাজ্য পুনঃ গ্রহণে সমর্থ হন।

চল্লিশ

পরদিন প্রাতঃকালে বিদ্রোহী বন্দিগণকে নাইনিতালে চালান দিলাম। কর্ণেল ক্রশম্যান সাহেবকে বিশেষ করিয়া লিখিলাম,—"ইহাদিগকে যেন কোনরূপ কষ্ট দেওয়া না হয়। ইহারা যেন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায়,—প্রচুর পরিমাণে আহারীয় সামগ্রী যেন পায় এবং শীত নিবারণার্থ উপযুক্ত বস্ত্রও যেন পায়। ভবিষ্যতে ইহাদের দ্বারা অনেক কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

অদ্য বিশেষ আনন্দের দিন। রামপুরের নবাবের নিকট হইতে আরও দেড় শত অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল। তার পরদিন কাশীপুরের রাজা শিবরাজ সিংহের প্রেরিত আরও এক শত সওয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ আমাদের ৫৫০ সাড়ে পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য হইল। ইহাদিগকে প্রাণপণ যত্নে শিক্ষা দিতে লাগিলাম। গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা—ছেলে শিখাইয়া মানুষ করা—বড় কঠিন কাজ সন্দেহ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কঠিন অশ্বরোহী সৈন্য গঠন করা। ভুক্তভোগী ভিন্ন এ কর্ম্মভোগের ব্যাপার আর কেহই বুঝিতে সক্ষম নহে।

এইরূপ শিক্ষাকার্য্যে আরও এক সপ্তাহকাল কাটিয়া গেল। ভয়ঙ্কর কোলাহল শব্দে শেষ রাত্রে এক দিন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। তরবারির ঝঞ্চনা, অশ্বের খুরশব্দ, বন্দুকের আওয়াজ, গভীর আর্ত্তনাদ এবং বাজে গোলমাল,—এই শব্দসমূহ একত্র মিশ্রিত হইয়া এক মহাগভীর শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেনানিবাস হইতে ভীতিব্যঞ্জক এবং শত্রুর আগমনসূচক বংশী ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া যুদ্ধের উপযুক্ত পোষাক পরিলাম। চাপরাশীদ্বয় আসিয়া কহিল,—"হুজুর! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বিদ্রোহী সেনা আক্রমণ করিয়াছে। আমি কহিলাম,—"কোন ভয় নাই। শীঘ্র ঘোড়া লইয়া আইস।" চাপরাশী দুইজন ঘোড়া আনিতে গেল; আমি এদিকে ডাক্তার নন্দকুমার মিত্রকে উঠাইতে গেলাম। আমার ঘরের পার্শ্বের কুঠরীতেই তিনি শয়ন করেন। তাঁহার ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলাম, গোলমাল শুনিয়া তিনিও জাগিয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভয়ে কাঁপিতেছেন। তাঁহার গা ঘামিতেছে। লেপ দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে কেবলমাত্র ঢিলা ইজার। আমাকে দেখিয়াই নন্দবাবু কাতর কণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে কহিলেন,—'দুর্গাদাস বাবু! আমাকে রক্ষা করুন। এইবার বুঝি আমি নিশ্চয়

মরিলাম। হলদোয়ানি হইতে সমস্ত বিদ্রোহী সেনা আসিয়া পড়িয়া আমাদিগকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছে।" আমি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলাম—"নন্দবাবু। ভীত হইবেন না। ভয় করিবার ইহা সময় নহে। বিশেষ, ভয় করিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু ভয়ে সমধিক ক্ষতি। এমন কি প্রাণনাশের পর্য্যন্ত সম্ভাবনা। বিদ্রোহী সেনা এখনও সেনানিবাসে আসিতে পারে নাই; আমাদের ঘাটিতে যে কয়জন প্রহরী আছে, তাহাদের সহিতই বিদ্রোহীদের যুদ্ধ হইতেছে। চলুন, আমরা শীঘ্র যাই; আপনি ডাক্তার;—আপনি সৈন্যের সঙ্গে না গেলে ত যুদ্ধ কিছুতেই চলিতে পারে না। আমি তামাসা করিতেছি না, সত্য সত্যই অদ্য আপনাকে ঔষধ এবং ডাক্তারীর অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া আমাদের সহিত অশ্বারোহণে যাইতে হইবে। আপনার কম্পাউণ্ডারকেও সঙ্গে লইতে হইবে।"

ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইল। কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ অসাড়, অনড়, অচল। আমি কহিলাম,—"সময় নাই, শীঘ্র উঠুন।" আমি একটু রোষকষায়িত নেত্রে রুক্ষস্বরে কহিলাম,—"ডাক্তার বাবু! আপনি জানেন, যুদ্ধের সময় আপনি যদি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন, তাহা হইলে আপনার কি দণ্ড হইবে?—আপনার প্রাণবধ পর্য্যন্ত সম্ভব।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে শেষরাত্রের ঘোর-ঘোর কাটিয়া আকাশ একটু একটু ফরসা হইয়া আসিতে লাগিল। ওদিকে সৈন্যকোলাহল এবং গোলযোগ আরও বাড়িতে লাগিল। আমি বাঙ্গলার বাহিরে আসিয়া একটু উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া দুরবীক্ষণ দ্বারা স্থিরভাবে ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলাম। অনুভবে বুঝিলাম,—লেফটেনাণ্ট হণ্টার প্রায় এক শত অশ্বারোহী লইয়া অগ্রগামী হইয়াছেন। বিদ্রোহী সেনা ছয় শতের কম হইবে না। এক ক্রোশ দূরে আমাদের যে প্রধান ঘাটিটী আছে, সেইখানেই বিদ্রোহী সেনার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে ভাবিয়া আমি সজ্জিত অশ্বের উপর আরোহণ করিলাম এবং 'নন্দ বাবু! নন্দ বাবু!' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। আবার ডাকিলাম। কোন উত্তর পাইলাম না। তখন বাঙ্গলার নিকট গিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখি, নন্দবাবু কেবল সেই ঢিলা ইজারটী পরিয়া খালি গায়ে নাইনিতালের পথের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছেন। আমি "করেন কি নন্দবাবু! করেন কি নন্দবাবু!"—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। নন্দবাবু দৌড়ানকালে মাঝে মাঝে পশ্চাতের দিক্‌টা এক একবার দেখিতেছিলেন। আমাকে তিনি দেখিতে পাইয়া প্রাণপণে আরও ভীমবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্থূলকায়, সেই লম্বোদর, সেই 'সুখী' শরীব,—নন্দবাবু আর কতক্ষণ দৌড়িবেন! দৌড়িতে দৌড়িতে সেই ঢিলা ইজাবেব কোমরবন্ধ ফিতা ছিঁড়িয়া গেল। কোমর হইতে ইজার খুলিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমে পড়িয়া গেল। নন্দবাবু উলঙ্গ হইলেন। অহো! কি বিষম দৃশ্য! কিন্তু তখনও ক্ষান্ত নাই, নিমেষ মধ্যে নন্দবাবু আবার ইজার উঠাইয়া পরিলেন। বাম হাতে করিয়া ইজারের 'মুঠ' নাভি-দেশের নিকট ধরিয়া, ডান হাত নাড়িয়া নন্দবাবু দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার দুই চারি পদ অগ্রসব হইয়া হঠাৎ হোঁচট খাইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন। যখন তিনি পতিত হইলেন, ঠিক সেই সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম নন্দবাবু মূৰ্চ্ছিত, তাঁহার পা কাটিয়া মুখ ছিঁড়িয়া রক্ত বাহির হইতেছে। নন্দবাবুকে দুই জন লোকেব জিম্মা করিয়া দিয়া আমি সেনানিবাস অভিমুখে গমন কবিলাম।

সেনানিবাস হইতে আমাব বাঙ্গলা কিঞ্চিৎ দূবে অবস্থিত। সেনানিবাসে আমার পৌছিবার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ধওকল সিং স্বয়ং অশ্বারোহণে আমার বাঙ্গলা-অভিমুখে বিশেষ ব্যগ্র হইয়া আসিতেছেন। মধ্যপথে পর-স্পরের সাক্ষাৎ হইল। ধওকল সিং কহিলেন,—"আপনি শীঘ্র আসুন, তবে বিশেষ চিন্তাব কোন কাবণ নাই। হণ্টাব সাহেব এক শত অশ্বারোহী লইয়া অগ্রগামী হইযাছেন।"

আমি। ব্যাপার কি?

ধওকল। বিদ্রোহিগণ প্রথম ঘাটি আক্রমণ কবিযাছে।

আমি। আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম।

আমরা সেনানিবাসে পৌছিয়া দেড় শত অশ্বারোহী সঙ্গে লইযা মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে দৌড়িলাম। আমরা যখন রণক্ষেত্রে উপনীত হইলাম, তখন তপনদেব উজ্জ্বল প্রভায় সমুদিত হইযাছেন। যাহা দেখিলাম, তাহা বড়ই ভয়ঙ্কর, লোমহর্ষণ ব্যাপাব। নবরক্তে ধরাতল অভিষিক্ত হইয়াছে। কাহারও দেহ সম্পূর্ণরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, কাহাব উদর মধ্য দিয়া গুলি প্রবেশ করিয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়াছে, কেহ হাত-পা কাটা হইয়া কাঁধুড়িসার হইয়া আছে। কাহাবও নাক ও মুখ দিয়া ভল্ ভল করিয়া রুধির নির্গত

হইতেছে। কাহারও ধড়টা পড়িয়া আছে, মাথা নাই। কাহারও মাথা পড়িয়া আছে, ধড় নাই। বহুসংখ্যক আঘাতপ্রাপ্ত অশ্ব মুমূর্ষ অবস্থায় ছট্ ফট্ করিতেছে। দেখিলাম অন্তত আশীজনের মৃতদেহ তথায় পতিত।

বলা বাহুল্য, বিদ্রোহিগণ তখন তথায় আর নাই। আমরা পৌছিতে না পৌছিতেই তাহারা এই প্রথম ঘাটির সমস্ত লোককে নিহত করিয়া প্রস্থান করিয়াছে।

এই ঘাটিতে ৫০ জন লোক ছিল, তন্মধ্যে ৩২ জন কাটা পড়ে। বিদ্রোহী সেনা প্রায় ৫০ জন নিধনপ্রাপ্ত হইযাছিল।

'সৎকারে'র সময় দেখা গেল, বিদ্রোহিগণ চারি জন অশ্বারোহীর মাথা লইয়া গিয়াছে। তাহাদেব কেবল দেহ পড়িয়া আছে।

একচল্লিশ

যুদ্ধ-ব্যাপাবে গুপ্তচব এক প্রধান উপকবণ,—এক মহান্ পাশুপত অস্ত্র। আমার বিবেচনায ইংবেজের যুদ্ধ গোয়েন্দা ব্যতীত বোধ হয় একদিনও চলে না। বিশেষ সিপাহী-যুদ্ধেব কালে ত কথাই ছিল না। তখন গুপ্তচরই প্রাণসর্ব্বস্ব, প্রাণধন, প্রাণনাথ ছিল। উপযপ্ত গুপ্তচরের সম্মান আবাধ্য দেবতা অপেক্ষা অধিক ছিল। শুধু সম্মান নহে,—তাহাব উপব ভাব, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, যত্ন,—অনন্ত অপরিমেয ছিল। গোয়েন্দা দেখিলে পুলকে অঙ্গ পূর্ণ হইত। ইচ্ছা হইত তাহার সহিত কোলাকুলি করিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করি। তাহার বদনচন্দ্র-বিনিঃসৃত বাক্য-সুধা কর্ণ দ্বাবা প্রাণ ভরিয়া পান করিতাম।

আমাদের অশ্বারোহী সৈন্যদল এক বকম শিক্ষিত হইল। সেনাগণের স্ফূর্ত্তি, সাহস, তেজস্বিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্তবে এবং মুখে—ভিতরে এবং বাহিরে, সকলেই ইংরেজের জন্য যুদ্ধ করিয়া ইংরেজের মঙ্গলার্থ প্রাণ দিব বলিয়া প্রস্তত হইয়া উঠিল। বিশেষ যে দিন বিদ্রোহী সৈন্য নিশাশেষে আসিয়া দস্যুর ন্যায় আমাদের ঘাটি আক্রমণ করে এবং অধিকাংশ প্রহরীকে নিহত করত কয়েক জনের কাটামুণ্ড বিজয়চিহ্নস্বরূপ লইয়া যায়, সেইদিন হইতে বিদ্রোহী সেনার উপর আমাদের অশ্বারোহী দলের

ক্রোধ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক অশ্বারোহীর অন্তরে প্রতিশোধ লইবার চিন্তা অহরহ জাগরূক। ভাব দেখিয়া আমার হৃদয়ে আহ্লাদ আর ধরে না।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে ধওকল সিং প্রমুখ কয়েকজন সর্দার আমাকে কহিল, "বাবু সাহেব! আমাদিগকে আজ্ঞা দিন, আমরা সদলে সজ্জিত হইয়া হলদোয়ানিতে গিয়া বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করি। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত সওয়ার আমরা একত্র মিলিত হইয়াছি। আকার-প্রকারে, বল-বীর্য্যে প্রত্যেক সওযারই এক-এক জন বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বিদ্রোহিগণকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে সকলেরই হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ। আপনি এরূপ সুযোগ, এরূপ শুভ সময় সহজে আর পাইবেন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা সাড়ে পাঁচ শত সওযার যদি ভীমবেগে মার মার শব্দে বিদ্রোহিদের ছাউনিতে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে কখনই তাহারা আমাদের সে বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইবে না। ছত্রভঙ্গ হইযা তাহারা নিশ্চযই পলাযন-পরাযণ হইবে। অতএব আমাদিগকে আক্রমণের আজ্ঞা দিন।"

আমি। সে এক্তিয়ার আমার নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য, আপনারা এত উতলা হইবেন না, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনাদের বল-বিক্রম এবং সুশিক্ষা দেখিয়া সাহেবগণ বডই সন্তুষ্ট হইযাছেন। কিন্তু আমাদের এখনও এক বিশেষ অভাব আছে। উপযুক্ত সুশিক্ষিত বিশ্বাসী গুপ্তচর চাই। এখন যে দুই তিন জন চর আছে, তাহাদের দ্বারা ভাল কাজ হইতেছে না।

ধওকল সিং কহিল,—"তাহার আর অভাব কি?"

পরদিন আট জন গুপ্তচর মনোনীত হইল। ইহারা বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষ, এবং চতুর-চুডামণি। ইহাদের মধ্যে কেহ সন্ন্যাসী সাজিল, কেহ নাপিত হইল, কেহ গোয়ালা হইল,—একজন বেশ সেতার বাজাইতে জানিত, সে ব্যক্তি সেতার-বাদক হইযা বিদ্রোহি-সেনাদল মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপ বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া, চারি জন গোয়েন্দা নবাব খাঁ বাহাদুরের গতি-মতি জানিবার জন্য বেরিলি সহরে গমন করিল, বাকী চারি জন ক্রমান্বয়ে হলদোয়ানিতে উপস্থিত হইল। যে গোয়ালা সাজিযাছিল, সে দুধ দই বেচিবার ভাণ করিয়া চলিল, নাপিত ভাঁড় হাতে করিয়া চলিল।

বেরিলিতে খাঁ বাহাদুর কি করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য আমরা উৎসুক ছিলাম। কয়েকদিন পরে এক জন গোয়েন্দা তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া এইরূপ সংবাদ প্রদান করিল,—

যে ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া শেষরাত্রে আমাদের ঘাটি আক্রমণ করে, তাঁহার নাম হবিবউল্লা খাঁ। তিনি আমাদের থানাদারের ছিন্ন মস্তক স্বয়ং বেরিলিতে লইয়া আসেন এবং খাঁ বাহাদুরকে বলেন, "আমি ছয় ঘণ্টাকাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া ইংরেজ সেনা পরাজিত করিয়াছি এবং জয়-চিহ্নস্বরূপ ইংরেজের দেশীয় সেনাপতির মাথা কাটিয়া আনিয়াছি।" এ কথা শুনিয়া নবাব বড়ই সন্তুষ্ট হন এবং হবিবউল্লাকে তিনি এক সুন্দর বহুমূল্য পরিচ্ছদ দিয়া সম্মানিত করেন। বেরিলিতে এক জন হিন্দুর এক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা ছিল; হবিবউল্লা সেই বাড়ীটী চাহেন; নবাব সে বাড়ী বাজেয়াপ্ত করিয়া লন; কিন্তু শেষে তাহা হবিবউল্লাকে না দিয়া নিজেই তাহা দখল করিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে হবিবউল্লা লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেল।

দেখিলাম, রাজত্বে কোনরূপ নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, কেবল অত্যাচার অবিচার। নবাব বাহাদুরের রাজ্যশাসন বিড়ম্বনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নবাব একদিক্ নিয়মবদ্ধ করিতে গেলে অন্যদিকে অনিয়ম হইয়া পড়ে। ধনাগারে তাঁহার টাকা নাই। সৈন্যগণ দুই মাসের করিয়া বেতন পায় নাই। অন্যান্য সিভিল কর্ম্মচারিগণের তিন মাসের করিয়া বেতন বাকী পড়িয়াছে। যখন টাকার জন্য বিশেষ টানাটানি পড়িল, তখন আবার হতভাগ্য মিশ্র বৈজনাথের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নবাবের কয়েক জন কর্ম্মচারী বৈজনাথের বাটী উপস্থিত হইয়া বলিল,—"তোমাকে নবাব শীঘ্র ডাকিতেছেন, আমাদের সঙ্গে চল। তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ আসিযাছে। নবাব বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ পাইয়াছেন, তোমার বাটীতে ইংরেজ লুক্কায়িত আছে এবং তুমি নাইনিতালস্থ কমিশনার সাহেবকে চিঠি-পত্র লিখিয়া থাক।"

'কর্ম্মচারিগণের কথায় বৈজনাথ নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব কহিলেন,—"তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমস্ত প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তুমি যদি আপনার মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এখনই জরিমানাস্বরূপ আমাকে পাচ লক্ষ টাকা প্রদান কর, নচেৎ নিস্তার নাই।" বৈজনাথ জোড়হাতে উত্তর করিলেন,—"প্রকৃতই আমি নিরপরাধ, আমার গৃহে কোন ইংরেজ লুক্কায়িত নাই এবং কমিশনারকে চিঠি-পত্রও আমি লিখি নাই। আমাকে ক্ষমা করুন। বিশেষ, আমি পাঁচ লক্ষ টাকা কোথায় পাইব?"

টাকা দিতে একান্ত অস্বীকার করায়, মিশ্র বৈজনাথকে নবাব সাহেব কারাগারে রুদ্ধ করেন এবং অশেষ যন্ত্রণা দিতে থাকেন। এইরূপে কিছুদিন

অতিবাহিত হয়। শেষে বৈজনাথ কারাধ্যক্ষ সাইফুল্লা খাঁকে কুড়ি হাজার টাকা ঘুষ দিয়া অতি গোপনে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

বৈজনাথের পলায়ন-বার্ত্তা শুনিয়া, নবাব ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন এবং বৈজনাথের গৃহদ্বার লুণ্ঠন করিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু দেওয়ান শোভারামের প্ররোচনায় লুণ্ঠন-কার্য্য হইতে সে যাত্রা ক্ষান্ত হন। এক্ষণে বৈজনাথ কোথায়, তাহা আমি জানি না। শুনিলাম, তিনি বেরিলি পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে গিয়া লুক্কায়িত আছেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, টাকা সংগ্রহের জন্য কি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, সে বিষয় লইয়া খাঁ বাহাদুর খাঁ এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ প্রকাশ্য রাজদরবারে পরামর্শ করিতে বসিয়া গেলেন। শেষে স্থির হইল, একটী টাকশাল বসান প্রয়োজন। নানা দেশ এবং বেরিলি নগর লুণ্ঠন করিয়া বহুমূল্যের বহুরূপ রূপার এবং সোনার অলঙ্কার সংগৃহীত হইয়াছে। রাজভাণ্ডারে বিস্তর সোনা-রূপার বাসনও আছে। কিন্তু এ সমস্ত জিনিষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কাজেই আসিবে না। সেই গহনায় ও বাসনে টাকা এবং মোহর প্রস্তুত করিতে হইবে; টাকা এবং মোহরে সাহ আলমের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে। বেরিলিতে রামপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির বাটীতে একটী টাকশাল ছিল। সেই টাকশাল বলপূর্ব্বক নবাব-বাটীতে উঠাইয়া আনা হইল এবং তাহাতেই টাকা ও মোহর হইতে লাগিল। এই নূতন টাকা ও মোহর প্রচলিত হইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। কারণ, টাকা ওজনে পুরা ষোল আনা অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল। সুতরাং সকল অধিবাসী তাহা লইতে লাগিল। কিন্তু খাঁ বাহাদুর খাঁর অপরিসীম আশা ইহাতে মিটিল না। প্রত্যহ তাঁহার অর্থের যত প্রয়োজন, টাকশালে প্রত্যহ তাহার সিকি টাকাও প্রস্তুত হইয়া উঠে না। সুতরাং এক্ষণে খাঁ বাহাদুর অর্থাভাবে চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতেছেন।"

মীর আলম খাঁ, খাঁ-বাহাদুরের এক জন আত্মীয় ব্যক্তি। তিনি আসিয়া খাঁ বাহাদুরকে সংবাদ দিলেন,—"নারা নামক মৌজার অধিবাসী বলদেব গীর গোসাই ধনশালী ব্যক্তি। তাঁহার ভাণ্ডারে নগদ তিন লক্ষ টাকা মজুদ আছে।" এই সংবাদ পাইবামাত্র নবাব পরদিন কুড়ি জন অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ জন পদাতি সঙ্গে দিয়া পেস্কার আকবর খাঁকে বলদেব গীরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আকবর খাঁ সৈন্য সমভিব্যাহারে

নারায় গিয়া পৌঁছিলেন। বলদেব গীর এক জন সম্মানিত এবং বিশেষ প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তাঁহার দ্বারদেশে তখন ষোল জন লাঠিয়াল ছিল এবং তিনি নিজেও একজন প্রতাপশালী সাহসী ব্যক্তি। তিনি নবাব-সৈন্যের আগমন-বার্ত্তা এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বাটীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দ্বারবানগণকে কহিলেন, "তোমরা দ্বার রক্ষা কর। আমি স্ত্রীলোকগণকে রক্ষার জন্য অন্দরে চলিলাম।" নবাব-সৈন্য বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু লৌহ-নির্ম্মিত বিষম কপাট কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিল না; বিশেষ দ্বারবানগণ ভিতর দিক্ হইতে এরূপ ইটপাটকেল, পাথর অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিল যে, নবাব-সৈন্য কিছুতেই তখন তিষ্ঠিতে পারিল না। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া নবাব-সৈন্য খিড়কীর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আর রক্ষা নাই। বলদেব গীরের পরমসুন্দরী পত্নী তখন নিতান্ত কাতর হইয়া বাটী হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি পাষণ্ড আকবর খাঁ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। শুনিলাম, আকবর খাঁ তাঁহাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া সতী রমণীর মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মুসলমানের হস্তে স্ত্রীর এরূপ অবমাননা এবং লাঞ্ছনা দেখিয়া বলদেব গীর বাঘের মত তথায় লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িলেন এবং তৎদণ্ডেই গুলি করিয়া আকবর খাঁকে শমন সদনে পাঠাইয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই ষোলজন লাঠিয়াল বলদেব গীরের নিকট উপস্থিত হইল এবং লাঠির চোটে বহু সংখ্যক নবাব-সৈন্যের মাথা গুঁড়া করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

নবাবের নিকটস্থ তহশীলদারের নিকট অবিলম্বে এই সংবাদ পৌঁছিল। তিনি পাঁচ শত সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ বলদেব গীর গোসাইয়ের গৃহ অবরোধ করিলেন। বলদেব তহশীলদারকে আত্মসমর্পণ করিলেন। তহশীলদার ভদ্র ব্যক্তি। তিনি কোনরূপ কাহারও উপর অত্যাচার করিলেন না। তিনি বলদেব গীর, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়কে বন্দী করিলেন বটে, কিন্তু সকলকেই বিশেষ সম্মানের সহিত বেরিলিতে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মুফ্‌তি সৈয়দ আহম্মদের উপর এই ব্যাপারের বিচারভার অর্পিত হইল। তিন দিন কাল বিচার করিয়া নানারূপ সাক্ষী ও প্রমাণ লইয়া তিনি বলদেব গীরকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া অব্যাহতি দিলেন। এইরূপ

বিচার-ফল দেখিয়া পাঠানেরা বড়ই উত্তেজিত হইল। মৌলবী খাঁ আপন রেজিমেণ্ট হইতে কতকগুলি সৈন্য লইয়া হঠাৎ একদিন বলদেব গীরকে আক্রমণ করত তরবারি দ্বারা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বিচারকর্ত্তা মুফ্‌তি সৈয়দ আহম্মদও বড় বেশী নিরাপদে থাকিতে পারেন নাই। নবাব কর্ত্তৃক হঠাৎ তিনি একদিন পদচ্যুত হইলেন এবং লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে, পাষণ্ডগণ তাঁহাকেও একদিন হঠাৎ হত্যা করিয়া ফেলিবে। তিনি প্রাণভয়ে দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে পলাইয়া গিয়াছেন। নবাব তাঁহার অন্বেষণার্থে চারিদিকে চর পাঠাইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না।

এইরূপ এবং অন্যরূপ নানা কারণে বেরিলিস্থ যাবতীয় হিন্দু সম্প্রদায় নবাবের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্তরে ইংরেজের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন।

বেরিলি হইতে একজন মাত্র গোয়েন্দা প্রত্যাগত হইয়া উপরি-উক্ত কথা সকল প্রকাশ করিল। তৎপরে আরও এক সপ্তাহ গত হইল, অন্য কোনও গোয়েন্দা ফিরিল না। হলদোয়ানির সংবাদ জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ উৎকণ্ঠা জন্মিল। একদিন আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা প্রায় ২॥ টা হইবে। একজন ভিক্ষুক আসিয়া উপনীত হইল। সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছে জানাইল। তাহার দীর্ঘ দাড়ি, দীর্ঘ কেশ, মুখে তিন চারিটা আঁচিল। রং কৃষ্ণবর্ণ। আমি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দেখিয়া ভৃত্যকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কহিলাম। তখন সেই অতিথি আমাকে হাসিয়া কহিল,—"বাবু সাহেব! চিনিতে পারিলেন না? আমিই সেই গুপ্তচর—বিদ্রোহী সেনার মতিগতি অবগত হইবার জন্য হলদোয়ানিতে গিয়াছিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখপানে চাহিলাম, বলিলাম,—তুমিই কি সেই? তোমার মুখে আঁচিল হইল কিরূপে?

গুপ্তচর কহিল,—"ঐ আঁচিল কৃত্রিম। বহুরূপী সাজিতে শিখিয়াছি। আমি স্ত্রীবেশ ধারণ করিলে, হঠাৎ আমায় কেহ চিনিতে পারে না। ঠিক স্ত্রীলোকের সুরে আমি কথা কহিতে পারি।"

গুপ্তচরের মুখে আমি এই কথা শুনিয়া পুলকিতাঙ্গ হইলাম। তাহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। শেষে জিজ্ঞাসিলাম, "হলদোয়ানির সংবাদ কি বল।"

গুপ্তচর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল —

"বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষ মৌলবী ফজল হক সসৈন্যে স্বয়ং কালাডুঙ্গি আক্রমণার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। কারণ, বেরিলি হইতে নবাব খাঁ বাহাদুর তাঁহাকে বারংবার চিঠি লিখিতেছেন যে, 'তুমি শীঘ্র গিয়া কালাডুঙ্গি এবং নাইনিতাল আক্রমণ কর এবং ইংরেজদিগকে অস্ত্র দ্বারা নিহত করিয়া ফেল। শেষ চিঠি এই আসিয়াছে, যদি তুমি এ কাজ করিতে অক্ষম হও, তবে পদত্যাগ করিয়া বেরিলি চলিয়া আসিবে।' এই কথা ফজল হক শুনিয়া আপাতত কালাডুঙ্গি আক্রমণ করা সঙ্কল্প করিয়াছেন।"

আমি গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কিরূপে এ সব বৃত্তান্ত অবগত হইলে?"

গুপ্তচর কহিল,—"আমি গোয়ালা সাজিয়া তিন ক্রোশ পথ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে থাকিতাম। আপনাদের প্রদত্ত টাকা হইতে দুধ, দই, ছানা কিনিয়া লইয়া প্রত্যহ বিদ্রোহীদের ছাউনিতে গিয়া ঐ সমস্ত সামগ্রী বেচিতাম। যে ব্যক্তি নগদ পয়সা দিতে অক্ষম হইত, তাহাকে ধারে দিতাম। ধারে জিনিষ দেওয়ায় আমার খুব পসার বৃদ্ধি হইল। ক্রমে মাখামাখি ভাব হইল। শেষে আমি বিদ্রোহীদের গোয়েন্দা হইয়া ইংরেজ-সেনার গতিমতি জানিবার জন্য কালাডুঙ্গিতে আসিয়াছি। আমার উপর তাহাদের খুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমাকে তাহারা খুব ভালবাসে।"

আমি। বল কি? বল কি? তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতেছি!

গুপ্তচর। আমি এখানে দুই তিন দিন থাকিয়া হলদোয়ানিতে যাইব। যে দিন তথায় পৌঁছিব, সে দিন রাত্রেই পথপ্রদর্শক হইয়া, আমি কালাডুঙ্গি আক্রমণার্থ বিদ্রোহী সেনাকে কালাডুঙ্গি অভিমুখে লইয়া আসিব। ঠিক সোজা পথে না আসিয়া, পশ্চিম দিক্ দিয়া যে বাঁকা পথ আছে, তাহা দিয়া আসিব। আপনারা তন্নিকটবর্ত্তী ঝোপের আড়ালে সসৈন্যে লুকাইয়া থাকিবেন। যেমন তাহারা এই পথ দিয়া আসিবে, আপনারা অমনি বাঘের মত লম্ফ দিয়া তাহাদের উপর পড়িবেন এবং কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন। সম্ভবত বার শত বিদ্রোহী সেনা আমাদের সঙ্গে থাকিবে। আপনারা প্রস্তুত হউন। কিন্তু দেখিবেন, অতি গোপনে, অতি নীরবে, অতি সাবধানে এ কার্য্য সাধন করিবেন। কোন অশ্বারোহীকেই এখন এ কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই।

আমি সেই গুপ্তচরকে সঙ্গে লইয়া বারওয়েল এবং হণ্টার সাহেবের নিকট আসিলাম। তাঁহারাও সেই গুপ্তচরকে বিশেষ সাদর সম্ভাষণ এবং সম্মান

দেখাইলেন। আর গুপ্তচরের কথা অনুমোদন করিয়া, নিশাযোগে তিন শত সৈন্যসহ তথায় লুকাইয়া থাকিবার জন্য আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন।

অনুমতির জন্য তৎক্ষণাৎ কর্ণেল ক্রশম্যানকে নাইনিতালে পত্র লেখা হইল। তিনি পত্রের উত্তর না দিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে কালাডুঙ্গি আসিলেন, এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুপ্তচরের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিদ্রোহী সেনাকে গোপনে আক্রমণ করিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

গুপ্তচর দুই দিন থাকিয়া তৃতীয় দিনে হলদোয়ানি চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার পর আমরা নীরবে সজ্জিত হইতে লাগিলাম। তিন শত পঁচিশ জন অশ্বারোহী লইয়া আমি এবং বারওয়েল সাহেব সেই বাঁকা পথের দিকে ধীরে ধীরে অতি ধীরে যাত্রা করিলাম। সেই রাস্তার ধারেই জঙ্গল ছিল। আমরা একধারে সেনা স্থাপন না করিয়া দুই ধারেই স্থাপন করিলাম। এক দিকে দুই শত সওয়ার রহিল, অন্য দিকে এক শত পঁচিশ জন মাত্র রহিল। জঙ্গলে এরূপভাবে লুক্কায়িত রহিলাম যে, এখানে যে সেনাদল আছে, তাহা ঠিক করিতে সহজে কেহ সক্ষম হইত না। শিক্ষিত ঘোটকবৃন্দও আজ্ঞামত নীরবে রহিল। ক্ষুরে শব্দ পর্য্যন্ত করিল না। সেই বাঁকা পথের এক পোয়া পথ দূরে আমরা অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। রাত্রি দুইটা বাজিল। এমন সময় দেখি, বিদ্রোহী সৈন্য দলে দলে বাহির হইয়াছে এবং কালাডুঙ্গি অভি-মুখে অগ্রসর হইতেছে। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলো আছে, কিন্তু তাহা তত উজ্জ্বল নহে এবং সংখ্যাতেও তাহা কম। সেই রাস্তা বড়ই উচু-নীচু এবং সরু। কোন কোন বিদ্রোহী সেনা দ্রুতগমন জন্য হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল।

আমরা বংশীরব করিলাম না। ইঙ্গিতমাত্র আমরা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া যাত্রা করিলাম। নিকটে আসিয়াই বেগে আক্রমণ করিলাম। উভয় দিক্ হইতেই এককালে আক্রমণ করা হইল। বিদ্রোহী সৈন্য এরূপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাঁহাদের কাঁধের বন্দুক কাঁধেই রহিল আর এ দিকে আমাদের এক এক তরবারির আঘাতে তাহারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ভীষণ গোলযোগ বাধিল। শেষে শত্রু-মিত্র স্থির করা দুরূহ হইয়া পড়িল। কিন্তু সুবিধা এই, অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। বিদ্রোহী সেনা পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে কোথায় যে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল, তাহার আর ঠিকানা রহিল না। এই যুদ্ধে তাহাদের ৮০ জন হত হয়;

আহতের সংখ্যা দেড় শতের কম নহে। আমাদের পক্ষে পাঁচ জনের অধিক হত হয় নাই; বার জন মাত্র আহত হইয়াছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, মৌলবী ফজল হক্‌কে বন্দী করা। যখন বিদ্রোহিগণ আমাকে বন্দী করিয়া কালাডুঙ্গি হইতে হলদোয়ানিতে লইয়া যায়, তখন এই ফজল হক্‌ই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সুতরাং তাহার উপর আমার বিলক্ষণ রাগ ছিল। কিন্তু সে রাত্রে সে ঘোর অন্ধকারে ফজল হক্‌কে খুঁজিয়া পাইব কোথায়? তিনি বোধ হয় সর্ব্বাগ্রেই পলাইয়া থাকিবেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আমার মনটা কেমন বিমর্ষ হইল।

এক দিন পরে সেই গুপ্তচর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসিলাম, এ আবার কি রকম ভাব? সে কহিল, "এবার ভাব বড় শক্ত। সেই দিন রাত্রে আমি বড়ই আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমাদের সৈন্যের অস্ত্র দ্বারা আমার প্রাণনাশ হইয়াছিল আর কি! যাহা হউক, দৈব আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। শেষে পায়ে এই চোট লাগিয়াছে। আমার উত্থানশক্তি একরকম রহিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

ডাক্তার নন্দলালকে ডাকিলাম। তিনি আসিয়া তাহার পায়ে উত্তমরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। এই গুপ্তচরের সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটি করিলাম না। এক মাস মধ্যে সে আরোগ্য হইল। সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে, ইংরেজের স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর, সে অনেক টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল।

যে গোয়েন্দা নাপিত হইয়া বিদ্রোহীদের শিবিরে গিয়াছিল, সে আর ফিরিল না। বোধ হয় ধরা পড়িয়া ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়া থাকিবে।

গুপ্তচরের কার্য্য বড়ই কঠিন। একটু পদস্খলনেই সর্ব্বনাশ। কেবল লড়াই করিতে জানিলেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না,—কল-কৌশল সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র,—তন্মধ্যে গুপ্তচর ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিয়াল্লিশ

কিছুদিন পরে অন্য এক জন গুপ্তচর বেরিলি হইতে প্রত্যাগত হইল। তাহার নিকট এইরূপ সংবাদ অবগত হইলাম,—নবাব খাঁ বাহাদুর প্রায় বিশ হাজার সেনা একত্র করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক সৈন্য সুশিক্ষিত। নানা দিক্ হইতে বিদ্রোহী সিপাহী আসিয়া তাঁহার দলে যোগদান করিয়াছে। নবাব আরও সৈন্যবৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন; কিন্তু ধনাগার শূন্য বলিয়া তাঁহার সৈন্যবৃদ্ধির আশা ফলবতী হইতেছে না। তিনি নাইনিতাল আক্রমণের জন্য প্রায় দশ হাজার সেনা পাঠাইয়াছেন। তিনি প্রকাশ্য রাজদরবারে সর্ব্বসমক্ষে প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "নাইনিতালস্থ ইংরেজসমূহকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, আমার নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার কিছুমাত্র আশা নাই।"

বারওয়েল সাহেব জিজ্ঞাসিলেন,—"হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাব কেমন?"

গোয়েন্দা বলিতে আরম্ভ করিল,—সহরে হিন্দুর দুরবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়। গো-রক্তে হিন্দুর মন্দির রঞ্জিত হইতে দেখিয়াছি। যদি কোন হিন্দু ইহার প্রতিবাদ করিতে যায়, তাহা হইলে মুসলমানের তরবারির প্রহারে সে তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত হয়। সাধারণত তিলক কাটিয়া বা গলায় মালা দিয়া কোন হিন্দু একাকী পথ চলিতে সাহস করে না। দল বাঁধিয়া হিন্দুগণ রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ইদানী কোনও হিন্দু স্ত্রী, কি পাল্কীতে, কি গাড়ীতে, বাটীর বাহির আর হয় না। বিশেষ, গোঁসাই বলদেব গীরের হত্যাকাণ্ডের পর মুসলমানগণের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। যে মুসলমান বিচারক, গোঁসাই বলদেব গীরকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি প্রদান করেন, সেই মুসলমান বিচারকই কেবল এ মুক্তিপ্রদান-হেতু পদচ্যুত হইল দেখিয়া মুসলমান গুণ্ডা-গণের মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রম বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভীষণাকার গুণ্ডাগণ বুক ফুলাইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে লইয়া, বিশাল রক্ত-চক্ষু বিস্ফারিত করত সদাই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। নিশাকালে অধিকাংশ রাজ-পথেই আলোক দেওয়া হয় না। ঘোর অন্ধকারে নিশাচর গুণ্ডাগণের শয়তানি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তখন ছুরি, ছোরা, তরবারি, লাঠি প্রভৃতির খেলা অনবরত চলিতে থাকে। হিঃ হিঃ হোঃ হাসি,—বিকট হুহুঙ্কার রব, দ্রুত গমন, পতন, বা অভ্যুত্থানের দুপ্ দুপ্ হুড়্ হুড়্ ধুপ্-ধাপ শব্দ—এই সমস্ত ব্যাপারে তিমিরাবৃতা রজনী সদাই পরিপূর্ণা। নারীরূপিণী

রাক্ষসীরও অভাব নাই। ইহাঁরা আরও ভীষণা—অতীব উন্মত্তা এবং লজ্জা-ভূষণ-বিবর্জ্জিতা। বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না,—ইহাদের মধ্যে কেহ উলঙ্গিনী, পূর্ণ-দিগম্বরী, মায়াবিনী, কামচারিণী! অন্ধকারে প্রকাশ্য রাজপথে পরপুরুষকে আলিঙ্গনদানে উদ্যতা। শ্রবণ-পথ রুদ্ধ করুন, নয়ন মুদ্রিত করুন! এ পৈশাচিক প্রক্রিয়ার কথা কেহ শুনিবেন না, কেহ দেখিবেন না। গুণ্ডাগণের এই সকল রমণী লইয়া রজনীযোগে পথে পথে রঙ্গ-ভঙ্গ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইংরেজ-রাজত্বকালে, যে স্থলে কস্মিন্‌কালে গোহত্যা হইত না, এক্ষণে দিবসে সর্ব্বজনসমীপে, মহা-সমারোহে, বাদ্য-বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তথায় গোহত্যা হইয়া থাকে। কখন জীবন্ত বা অর্দ্ধ-মৃত গরুর ছাল খুলিয়া, তক্তারামায় বিবাহার্থী বরকে যেরূপভাবে লইয়া যায়, সেইরূপভাবে সেই মুক্ত-ত্বক্ গোকে লইয়া মুসলমানগণ পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

আমি কানে হাত দিয়া বলিলাম,—"আর না,—তোমার অন্য কিছু বলিবার থাকে ত বল।"

বারওয়েল সাহেব কহিলেন,—"আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই, নবাব খাঁ বাহাদুর এ সব অত্যাচার অনুমোদন করিতেছেন কি? দেওয়ান শোভারাম শুনিয়াছি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং তাঁহার ক্ষমতাও অতুল, তিনিই বা কেন নীরব আছেন? কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না কেন? এ সকল বিষয়ের যদি কোন সন্ধান আনিয়া থাক, তবে তাহা আমাদিগকে বল?"

গোয়েন্দা। শুনুন, বলি। নবাব খাঁ বাহাদুরের অধিকাংশ সৈন্যই মুসলমান। তিনি মুসলমান পাইলে হিন্দুকে সেনাদলে ভর্ত্তি করিতে চাহেন না। তবে উপযুক্ত শিক্ষিত বলবান্ হিন্দু সেনাকেও তিনি উপেক্ষা করেন না। কারণ, তিনি জানেন হিন্দু সৈন্য বড়ই বিশ্বাসী এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। এইরূপে এক-চতুর্থাংশ হিন্দু সেনা নবাবের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রথম প্রথম হিন্দু সেনা আসিলে মুসলমান রেজিমেণ্টেই ভর্ত্তি করা হইত। কিন্তু হিন্দুগণ মুসলমান দলে থাকিতে ভালবাসিত না, তাহাদের আহারের, রন্ধনের অসুবিধা হইত। পাঁচ শত মুসলমানের মধ্যে এক শত মাত্র হিন্দু কেমন করিয়া তিষ্ঠিবে? হিন্দু সেনাগণ নবাবের নিকট দরখাস্ত করে যে, "আমরা মুসলমান দলে থাকিতে পারিব না; হিন্দুর স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট গঠিত

হউক।" প্রথমে নবাব এ কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। নবাবের ঔদাস্য দেখিয়া অনেকগুলি হিন্দু সেনা চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন নবাবের চৈতন্য হইল। দেওয়ান্ শোভারামের পরামর্শে হিন্দু সেনার স্বতন্ত্র দল সংগঠিত হইল। একদিন একদল হিন্দু সেনা বেরিলি সহরের মধ্য দিয়া মাঠে ছাউনি অভিমুখে যাইতেছে; কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত মুসলমান এক জন ভদ্র হিন্দুর গৃহে গোমুণ্ড ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে;—তখন সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে। একজন বৃদ্ধ হিন্দু দ্বিতল গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে জোড়হাতে তাহাদিগকে এ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু পাষণ্ডগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না; বরং অট্ট হাসিয়া বৃদ্ধকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছে। বৃদ্ধ বলিতেছেন, তোমাদের কাছে আমি কি দোষ করিয়াছি যে, "তোমরা আমার উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?" বাস্তবিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃদ্ধ উহাদের নিকট কোনও দোষে দোষী নহেন। শেষে জানিতে পারিলাম, বৃদ্ধের পুত্রের সহিত সহরের এক ব্যক্তির মনান্তর ছিল। ইংরেজের রাজত্বকালে জমি-জায়গা লইয়া সেই পুত্রের সহিত মোকদ্দমাও হইয়াছিল। মোকদ্দমায় পুত্র জয়লাভ করে। এক্ষণে সেই মুসলমান—বৃদ্ধকে এবং তাঁহার পুত্রকে জব্দ করিবার মানসে গুণ্ডাদ্বারা গোমুণ্ড বৃদ্ধের বাড়ীতে ফেলাইতেছে। গুণ্ডাগণ সুরাপানে উন্মত্ত এবং অসুর-অবতার। দেখিতে দেখিতে একজন গুণ্ডা বৃদ্ধের ছাদে একটা গোমুণ্ড ফেলিল, আর মুখে বলিতে লাগিল, "আর দুইটী যে মুণ্ড আছে, তন্মধ্যে একটী তোর জন্য, অপরটী তোর ছেলের জন্য।" যখন এইরূপ বাকবিতণ্ডা চলিতেছে, তখন ঐ হিন্দু সেনা দল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ এই সুযোগ পাইয়া করুণ স্বরে, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই রহিত হইল। এদেশে হিন্দুর বাঁচিয়া থাকা বৃথা। হিন্দুর মৃত্যুই মঙ্গল। এদেশে এমন কোন হিন্দু নাই, বীর্য্যবান, জ্ঞানবান, ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দু নাই, যিনি আজ এই ঘোর বিপদে পতিত এই হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করিতে পারেন?"

নিম্ন হইতে সেই হিন্দু সৈন্যদল উত্তর দিল,—"ভয় নাই, ভয় নাই! আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তোমাকে রক্ষা করিব। হিন্দুর ধর্ম্মনাশ আমরা চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

প্রায় বার জন গুণ্ডা তথায় উপস্থিত ছিল। হিন্দু সেনাগণ তাহাদিগকে বলিল,—"যদি মঙ্গল চাও, যদি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে এ স্থান

পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও এবং শপথ করিয়া, নাকে খত দিয়া বল, এমন কর্ম্ম আর কখন করিবে না।"

মুসলমান গুণ্ডাগণ উন্মত্ত ছিল। তাহাদের তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান কিছুই ছিল না। হিন্দুর মুখে এই অপমানসূচক কথা শুনিয়া, তাহারা নিমেষ মধ্যে কটীবন্ধ হইতে শাণিত ছোরা বাহির করিয়া, একেবারে সেই ছোরা হাতে লইয়া হঠাৎ হিন্দু সেনাকে আক্রমণ করিল। হিন্দু সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ সেখানে পথ সঙ্কীর্ণ, অন্ধকারময়। এক এক শ্রেণীতে চারিজন চারিজন হিন্দু সেনা দাঁড়াইয়া কিছু কম অর্দ্ধপোয়া পথ জুড়িয়া ছিল। সেই গুণ্ডাগণের আক্রমণে প্রথম শ্রেণীতে চারিজন হিন্দু সেনা বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল। গুণ্ডাগণ তাহাদের উদরে, বক্ষে, এবং গ্রীবাদেশে এরূপ সতেজে ছোরা বসাইয়াছিল যে, চারিজন হিন্দু সেনা ভূতলে পড়িয়া অল্পক্ষণ মধ্যে পঞ্চত্ব পাইল। দেখিতে দেখিতে আরও চারিজন হিন্দু সেনা বিষম অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এক মহা কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হইল।

হিন্দু সেনা অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে শত্রু মিত্র চেনা ভার। হিন্দু সেনা দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল এবং বন্দুকের সঙ্গীন এমনভাবে ঘন-সন্নিবেশ করিল যে, গুণ্ডাগণ তাহা ভেদ করিয়া আর অগ্রগামী হইতে পারিল না। যে গুণ্ডা অগ্রগামী হয়, সেই গুণ্ডাই তৎক্ষণাৎ অমনি সঙ্গীন-বিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পাঁচ জন উন্মত্ত গুণ্ডা নিহত হইল। এ দিকে গুণ্ডার দল কিন্তু ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। অন্যান্য পল্লীর গুণ্ডাগণ এ সংবাদ পাইয়া এ দলে যোগদান করিল। শেষে প্রায় পঞ্চাশ জন গুণ্ডা দূর হইতে একটা মহা হল্লা করিয়া 'মার মার' রবে হিন্দু সেনাকে আক্রমণ করিতে চলিল। হিন্দু সেনাগণ ব্যাপার বিষম বুঝিয়া, সেই গুণ্ডাদল লক্ষ্য করিয়া অজস্রধারে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। গুণ্ডাগণ গুলির আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িল। কে কোথায় তখন যে পলাইল তাহার আর ঠিক রহিল না। শেষে দেখা গেল, ষোল জন গুণ্ডা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ গুণ্ডাশূন্য হইল। তখন অন্ধকারের সহিত নীরবতার সংযোগ হইল। হিন্দু সেনাদল যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া

থাকিয়া শেষে আপন গন্তব্য পথাভিমুখে ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। আমি যে বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সে বাটীর জানালা রুদ্ধ করিলাম। রাত্রে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা জানি না, কারণ আমি সে রাত্রে সে স্থানে ছিলাম না। অন্য গুপ্ত গলি-পথ দিয়া আসিয়া নবাব-বাটীর নিকটস্থ কোন গৃহে আশ্রয় লইয়া রহিলাম।

প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব ষোল কলায় সমুদিত হইলেন। আজ নবাব নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পূর্ব্বেই রাজদরবারে সিংহাসনে আসিযা উপবেশন করিলেন। আজ দরবারে মহা সমারোহ। সভাতে সহরের প্রধান প্রধান বার জন হিন্দু আসিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রায় বিংশতি জন প্রধান মুসলমান আসিয়া সমবেত হইলেন। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে বাঙ্-নিষ্পত্তি নাই। শেষে নবাব খাঁ বাহাতুর আল্লার নাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"কেন এমন হয? হে আল্লা! কেন এমন হয়? হিন্দু-মুসলমানে—ভাযে ভায়ে এত বিবাদ, এত রক্তপাত কেন হয়? হিন্দু আমার দক্ষিণ হস্ত, হিন্দু আমার দক্ষিণ নয়ন, হিন্দু আমার দক্ষিণ কর্ণ,—হিন্দুর বল-বীর্য্যের সাহায্য পাইয়াই আমি এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হহতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। শোভারাম পরম ভক্তিমান্ হিন্দু; তাঁহাকে আমি রাজ্যের প্রধান পদে, স্বীয় প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হীরালাল, গোকুলানন্দ, ব্রজকিশোব প্রভৃতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ-গণকে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছি। আজ রাজদববারে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি, যদি কোন মুসলমান বিনা কারণে কোন হিন্দুব উপর অত্যাচার করে, অথবা নিষিদ্ধ স্থানে গোহত্যা করে, তবে তাহাকে আমি গুরুতর দণ্ড দিব। 'হিন্দু-মুসলমান এক' 'হিন্দু-মুসলমান এক'—ইহাই অদ্য হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে থাকুক। আজ হইতে ভেদ-জ্ঞান উঠিয়া যাউক। আজ হইতে হিন্দু-মুসলমান এক-দেহ, এক-প্রাণ হউক!"

নবাবের মুখনিঃসৃত এই বক্তৃতার মর্ম্ম অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। পূর্ব্ব দিনের রাত্রে সেই হত্যাকাণ্ডের পর সহরের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত হিন্দু এবং ছয় দল হিন্দু সেনা রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে নবাব-বাটীতে সমাগত হন, এবং মুসলমান কর্ত্তৃক উৎপীড়নের কথা কাতর-বচনে ব্যক্ত করেন। সেই আবেদনের ফলেই আজ এই বক্তৃতা। আমি গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসিলাম,—

"তুমি ত এক মাসের অধিক বেরিলিতে ছিলে। নবাব মুখে যেমন হিন্দুদের প্রতি সদয়, অন্তরেও কি সেইরূপ সদয়?"

গোয়েন্দা। নবাব গোঁড়া মুসলমান। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তিনি প্রকাশ্যে বড়ই সৌজন্য দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টাও করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলে কি হইবে? কার্য্যত কিছুই দাঁড়ায় না। ফল কথা,—নবাব তাঁহার মুসলমান অনুচর-বর্গকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। বাস্তবিকই নবাব বিপদে পড়িয়াছেন। নবাব উভয়ের মন রাখিতে গিয়া এক্ষণে উভয় দলেরই বিরাগভাজন হইয়াছেন। সে দিনের আর একটা তামসিক ব্যাপার শুনুন। নবাব উভয় দলের বিরাগ-ভাব প্রশমিত করিবার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য একটী বৃহৎ পতাকা বা পবিত্র ধ্বজ এবং মুসলমানদের মহম্মদীয় ঝণ্ডা অর্থাৎ পবিত্র ধ্বজ তুলিয়া তাহার তলদেশে প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমানকে আহ্বান করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই দিন বৈকালে শোভারাম, গোকুলানন্দ, নেওয়ালানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন ব্রাহ্মণ এবং গণেশ রায়, হরসুখ রায় প্রভৃতি কয়েক জন কায়স্থকে সঙ্গে লইয়া নবাব নগর-ভ্রমণে চলিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দুগণ আপন ধ্বজের সন্নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন; মুসলমানগণ মহম্মদীয় ঝণ্ডার তলায় অবস্থিতি করত যাত্রা করিলেন। স্বয়ং নবাব মহা-সমারোহে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করত সহর প্রদক্ষিণ করিলেন। আর মধ্যে মধ্যে ধ্বনি উঠিতে লাগিল,—"হিন্দু-মুসলমান এক,—রাম-রহিম এক,—শ্রীকৃষ্ণ-আল্লা এক" এবং এই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইল,—"যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ হিন্দু আছে, তাহারা অস্ত্র-ধারণপূর্ব্বক হিন্দুর ধ্বজের তলদেশে উপস্থিত হউক, অস্ত্রধারী মুসমানগণ মহম্মদীয় ঝণ্ডার তলদেশে সমবেত হউক এবং ইংরেজের উচ্ছেদ কামনায় সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউক।" অনেক দর্শক একত্র হইল। সে জনতা অতিক্রম করিয়া পথ চলে সাধ্য কার? মহা হৈ হৈ শব্দে হিন্দুর পবিত্র ধ্বজ রামগঙ্গাতীরে প্রোথিত করা হইল, এবং সেই দিনই সহরের নিকটস্থ বাগানে মহম্মদীয় ঝণ্ডা পোঁতা হইল। রামগঙ্গাতীরে দেওয়ান শোভারাম, হিন্দু মতানুযায়ী আহারীয় সামগ্রী,—লুচি, সন্দেশ, ক্ষীর বিতরণ করিতে লাগিলেন। বাগানে কালিয়া, কাবাব, কোর্ম্মা প্রভৃতি বণ্টন হইতে

লাগিল। নবাব খাঁ-বাহাদুর এই সকল কার্য্য সমাধাপূর্ব্বক রাত্রি প্রায় এক প্রহরের পর বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহাতে ফল যে বিশেষ কিছু ফলিল, তাহা বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমানে' সদ্ভাব এক কড়াও বৃদ্ধি হইল না।

এইরূপে সেই দিন সেই গুপ্তচরের নিকট হইতে এইরূপ নানা কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। স্মারক-লিপিতে সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিলাম।

তেতাল্লিশ

এইভাবেই কালাডুঙ্গিতে কাল কাটিতে লাগিল। সৈন্যগণকে শিক্ষাদান, দূত-মুখে গুপ্ত সংবাদ শ্রবণ, উদ্ধারের উপায় চিন্তা, এই সমস্ত ব্যাপার লইয়াই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতাম। এ ছাড়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই রণসাজে সজ্জিত হইয়া থাকিতে হইত। যুদ্ধের পোষাক পরিয়া রাত্রে ঘুমাইতাম। অশ্বশালায় সমুদায় অশ্বের উপর জিন প্রভৃতি সর্ব্বদা লাগানই থাকিত। বল্লম, তরবারি, বন্দুক রাত্রে শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যাইতাম। প্রত্যহ রাত্রে তিনবার করিয়া ঘোড়দৌড় হইত। অর্থাৎ প্রায় এক শত অশ্বারোহী রাত্রি ১০টা, ২টা এবং সাড়ে চারিটা এই তিন সময়ে কালাডুঙ্গির চারি ধারে দ্রুতবেগে এবং সদম্ভে বেড়াইত। শত্রুপক্ষ কখন হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে, ইহাই আমাদের ভয় ছিল।

সময়ে সময়ে আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইত। ইংরেজের হাতে টাকার সচ্ছলতা নাই; আর, মোরাদাবাদ রামপুর কাশীপুর অঞ্চল হইতে নাইনিতাল অভিমুখে রসদের রপ্তানি হইলেও, মাঝে মাঝে মধ্যপথে বিদ্রোহিগণ তাহা লুঠিয়া লইত। 'প্রথমত টাকা কম, দ্বিতীয়ত রসদের আমদানি কম। এই উভয় কারণে অনেক সময়ে ঘৃত, আটা, ডাল প্রভৃতি আমরা পূর্ণমাত্রায় পাইতাম না। কিন্তু জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিবার অন্য এক প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। আমরা প্রায়ই বড় বড় হরিণ শিকার করিয়া আনিতাম। কালাডুঙ্গিতে পক্ষীরও অভাব ছিল না। আটার অল্পতা দোষ মাংসের আধিক্য গুণে দূর হইত। এইরূপে দেহের পুষ্টিসাধনও বিলক্ষণ হইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে মনে একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইত। আমরা কোথায় আছি? কোথায় আত্মীয়-স্বজন পরিবার, আর কোথায় আমরা! আজ বনবাসী, আজ

পর্ব্বতের অধিত্যকাবাসী! উদ্ধারের কি উপায় সহজে হইবে না? ইংরেজদের পুনরায় রাজত্ব করিতে আর বিলম্ব কত? বিদ্রোহিগণেরই শেষে যদি বল অধিক হয়? সুবিধার মধ্যে এইটুকু যে, বিদ্রোহী দলের কর্ত্তা নাই। কিন্তু শেষে যদি এক জন কর্ত্তা আসিয়া জুটেন, তখন উপায়? বিদ্রোহীদের নৌকা আছে, হাল আছে, মাঝি নাই; কিন্তু মাঝি জুটিতে কতক্ষণ! আজ কলিকাতায় কি হইতেছে জানি না, কাশীতে কি হইতেছে জানি না, লক্ষ্ণৌ নগরে কি হইতেছে জানি না। তথাকার সমগ্র ইংরেজ কি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছেন? না,—এখনও তাঁহারা বিদ্রোহিগণের সহিত অকাতরে যুঝিতেছেন? আজ দিল্লীর অবস্থা কিরূপ? দিল্লী হইতে ইংরেজ বিতাড়িত, দূরীভূত, ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে শতধা খণ্ডীকৃত। আজও কি দিল্লী সহরে মুসলমান বাদশাহের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? রক্ষার বুঝি আর উপায় নাই! বুঝি ডুবিলাম, মরিলাম! আবার মনে হইত,—ভয় কি? বোকা বিদ্রোহিগণ কখনই বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। অল্পদিন মধ্যে আবার বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজদের অঙ্কশায়িনী হইবে। এইরূপ আশায় এবং নিরাশায় কাল কাটিতে লাগিল।

আমরা যে সদাই যোদ্ধবেশে সাজিয়া থাকিতাম, তাহা নিরর্থক নহে। আরও পাঁচবার বিদ্রোহী সেনা আমাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ পাইয়া, পূর্ব্বাহ্ণেই তাহাদের কালাডুঙ্গি আগমনের পূর্ব্বেই আমরা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া, মহা হৈ হৈ রবে তাহাদের প্রতি ধাবিত হইতাম। বিদ্রোহিগণ আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিত না, আমাদিগকে দেখিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া পলাইয়া যাইত। আমরা কিছুক্ষণ মহা লম্ফঝম্ফ করিয়া, বহু আস্ফালন করিয়া, দুই দশটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতাম।

আবার হঠাৎ একদিন রামপুরের নবাব ১৭৫ জন অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিলেন। ইহার তিনদিন পরেই কাশীপুর-রাজ শিবরাজ সিংহের নিকট হইতে এক শত সওয়ার আসিল। এইরূপে আমাদের প্রায় আট শত অশ্বারোহীর অধিক হইল। কিন্তু এত অধিক সৈন্য লইয়া আমরা কি করিব? প্রথমত অর্থাভাব; দ্বিতীয়ত উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাব; তৃতীয়ত তাঁবুর অভাব; চতুর্থত উত্তম বন্দুকের অভাব; পঞ্চমত খাদ্যসামগ্রীর অসচ্ছলতা। সুতরাং অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ায় আমাদের যেন একটা মহা বিপদ্ উপস্থিত হইল।

একদিন কালাডুঙ্গির সেই বৃহৎ বাঙ্গলায় সাহেবদের এক কমিটী বসিল ;—আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নানা বাদানুবাদের পর শেষে স্থির হইল, সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করাই কর্ত্তব্য। সেনাদের মধ্যে যাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ভাল নহে, যাহাদের ঘোড়া ভাল নহে, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যাহারা রুগ্ন, যাহারা ক্ষীণশরীর, তাহাদিগকে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ১৭০ জন সওয়ারকে বেতন চুকাইয়া দিযা জবাব দেওযা হইল,—আর জবাব দেওয়া হইল সেনাগণের মধ্যে যাহারা মুসলমান ছিল। ইহাতে ৫৫ জন সওয়ার কমিল। এখন কিঞ্চিৎ অধিক ছয শত বাছাই কবা খাঁটি হিন্দু অশ্বারোহী মজুত রহিল। নবাগত সেনাগণ অল্পদিন মধ্যেই ইংরেজী রীতি অনুসারে কাওয়াজ এবং ড্রিলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল।

একদিন একটা লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। পথে কাহাকেও কিছু সে বলে না,—কেবলই সে দৌড়িতেছে। প্রাত:কাল। আমি সৈন্যদের শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিতেছি। সে লোকটা আমারই দিকে আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমিও তাহার দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইলাম। আমি অশ্বারোহণে,—সে বেগে দৌড়িয়া আসিযাই আমার অশ্বের সম্মুখে নিপতিত হইল। একেবারে ভূতলশাযী হইল। তাহার মুখে আব কথা সরে না,—যেন অচেতনপ্রায। আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম। সেই ব্যক্তিকে চিনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এত দৌড়িযা আসিতেছ কেন? এত বেগে দৌড়িয়া আসিতে আছে কি? এখনই যে মারা পড়িয়াছিলে?"

শীত ঋতুর প্রাতঃকালে তাহার অঙ্গ দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। পতনকালে তাহার নাকে আঘাত লাগিযা রুধির নির্গত হইতেছে। এ ব্যক্তি আমাদের গুপ্তচর। আজ প্রায দুই মাস কাল হলদোযানিতে বিদ্রোহী সেনার সহিত বসবাস করিতেছিল।

শীঘ্রই সেই গুপ্তচর সামলাইযা উঠিল। মুখে কথা ফুটিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম, "কি হইয়াছে? সংবাদ কি?" সে কহিতে লাগিল,—"সংবাদ শুভ। বিদ্রোহি-সেনা হলদোয়ানি ছাড়িয়া পলাইতেছে। গতকল্য রাত্রি দুইটা হইতে তাহারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মোট পুঁটুলি বাঁধিতেছিল। তাঁবুর খোটা খুলিতেছিল। ঘোড়া সাজাইতেছিল। কামান লইয়া যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। আমি ঘোড়ার ঘেসেড়ারূপে তথায় চাকুরি লইয়াছিলাম। রাত্রি যখন সাড়ে তিনটা, তখন হঠাৎ হুকুম হইল, আর বিলম্ব নাই, দশ

মিনিটের মধ্যে এস্থান ছাড়িয়া চারপুবা নামক স্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এ আজ্ঞা প্রচার হইবামাত্র সেনাগণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কারণ, অধিকাংশ সেনা তখনও আপন আপন আসবাব গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাড়াতাড়িতে মহা গোলযোগ বাধিযা গেল। অন্ধকাব বাত্রি। আলোকের ভাল বন্দোবস্ত নাই। শেষ রাত্রিব বোঁ বোঁ বাতাসে অধিকাংশ দীপ নিবিয়া গেল। তখন এক কলকল হলহল ধ্বনি উত্থিত হইল। কে কাহার যে পুঁটুলি কাড়িয়া লইতে লাগিল, তাহাব কিছু ঠিক হইল না। কেহ দৌড়িতে লাগিল, কেহ হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল, কেহ কাহাবও সহিত পুঁটুলি লইয়া মারামারি আরম্ভ করিল, কেহ কাহাবও পাযেব চাপনে পড়িযা 'গেলাম গেলাম' করিতে লাগিল। প্রায় ছয সাত হাজার লোক একত্র জমাট বাঁধা। সে ঘোর অন্ধকারে মহা-ভিড়ের কথা কত কহিব। দুই চারিটা তেজস্বী ঘোড়া এই সময়ে হঠাৎ কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিযা ভীমবেগে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কাহার সাধ্য যে, তখন সেই অশ্বগণকে ধবে ? অশ্বের বিপুল বিক্রমেও দুই চারিটা লোক খুন হইতে লাগিল। প্রলয়কালের এক মহা 'বিতিকিচ্ছি' ব্যাপার হইযা উঠিল। দেখিতে দেখিতে বংশীধ্বনি হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে যাত্রা করিবার আদেশ চাবি দিকে প্রচার হইল।

শৃঙ্খলা রহিল না। সর্ব্বত্রই এলোমেলো ছোড়-ভঙ্গ ভাব। কে যে কোন্ দিকে কোন্ মুখে যাইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই। কে যে কাহার গাযে পড়িতেছে, তাহার ঠিক নাই। কে যে কাহাব সহিত কোন্ পথে চলিযাছে, তাহারও স্থিরতা নাই। এই সময়ে এক লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইল। কয়েকটা তাঁবু একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিযা উঠিল। 'দেখ দেখ, গেল গেল' এইরূপ ধ্বনি করিতে করিতে কতকগুলি লোক সেই দিক্ পানে ছুটিল। তখন চারি দিকে মূর্ত্তিমান বিশৃঙ্খলা বিরাজ কবিতে লাগিল। আমিও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এক দিক্ দিযা পলাইলাম। ঘোব অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইযাছিলাম ; নহিলে, ইহার বহু পূর্ব্বে আমি এখানে আসিতে পারিতাম। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই,—আপনারা শীঘ্র অগ্রসর হইয়া যদি বিদ্রোহী সেনাকে এখনি আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চযই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। কারণ, তাহারা এখন শৃঙ্খলাবিহীন এবং অধিক দূরও যাইতে পারে নাই।"

আমি। তাহারা কোথায় যাইতেছে ? তাহাদের হঠাৎ এরূপ পলাইবার কারণ কি ?

গোয়েন্দা। হঠাৎ পলায়নের কারণ কিছুই জানি না। তাহারা যাইতেছে চারপুরায়। এ স্থান হলদোয়ানি হইতে আট নয় ক্রোশ হইবে। সে যাহা হউক, আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র সজ্জিত হইয়া পলায়মান বিদ্রোহী সেনাকে আক্রমণ করুন।

আমি। আমি স্বয়ং এরূপভাবে আক্রমণের অনুমতি দিতে পারি-না। বারওয়েল সাহেব, হণ্টার সাহেব আছেন; এরূপ গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের সহিত যুক্তি করা আবশ্যক।

তৎক্ষণাৎ সেই গোয়েন্দাকে লইয়া মিঃ বারওয়েল এবং মিঃ হণ্টার—সাহেবদ্বয়ের নিকট গেলাম। সকল কথা আমার নিকট শুনিয়া, তাঁহারা আমাকেই এইভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কি বলেন? বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত কি না?"

আমি। না। বিদ্রোহীদের ছয় সহস্রের অধিক সেনা একত্র মিলিত। ইহার মধ্যে দুই হাজারের অধিক অশ্বারোহী, চারি হাজার পদাতি। পাঁচটি তোপ তাহাদের সঙ্গে আছে। আমাদের এ অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করা উচিত নহে। হিতে বিপরীত হইতে পারে। আমাদের এখানে অন্তত যদি তিন শত পদাতি সেনা থাকিত, তাহা হইলেও এক দিন আক্রমণ করা চলিত।

সাহেবদ্বয় কহিলেন,—"আমাদেরও অভিপ্রায় তাহাই।"

গোয়েন্দা কিন্তু করজোড়ে কহিতে লাগিল,—"বিদ্রোহী সেনাগণ ভীরু, কাপুরুষ। তাহারা যুদ্ধের নামে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইবে। অতএব আপনারা কালবিলম্ব না করিয়া অতি শীঘ্র আক্রমণ করুন। ইহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে পারিলে, অনেক রসদ, অনেক তাঁবু, অনেক ঘোড়া এবং অনেক অস্ত্র আপনাদের হস্তগত হইবে।

আমি কহিলাম, "আমাদের সেনাপতি কর্ণেল ক্রশম্যান ব্যতীত এরূপ-ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য হুকুম দিতে আর অন্য কেহই সক্ষম নহেন। বিদ্রোহী সেনা যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত, তাহা হইলে আমরা আত্মরক্ষার্থ আত্ম-হুকুমেই সকল কাজ করিতে পারিতাম। কিন্তু ইহা ত তাহা নহে।

তৎক্ষণাৎ কর্ণেল ক্রশম্যানের নিকট নাইনিতালে আমরা এই সংবাদ পাঠাইলাম।

গোয়েন্দাকে লইয়া আমি আপন বাঙ্গলায় আসিলাম।

বৈকালে কর্ণেল ক্রশম্যান, কর্ণেল টুরুপ এবং কমিশনার আলেকজাণ্ডার —এই তিন জন প্রধান ব্যক্তি কালাডুঙ্গিতে আগমন করিলেন। আমাদের সহিত রুদ্ধগৃহে গোপনে তাঁহাদের পরামর্শ হইল। নানা বাক্-বিতণ্ডার পর ইহাই স্থির হইল, বিদ্রোহী সেনাকে এ সময় আক্রমণ করিবার আবশ্যকতা নাই; আমরা আপাতত হলদোয়ানি দখল করিয়া লইব। তথায় আমাদের প্রধান সেনা-নিবাস হইবে। কালাডুঙ্গিতে এক শত প্রহরী ঘাটি রক্ষা করিবে মাত্র।

নাইনিতাল হইতে চারিটি তোপ আসিল। চারি শত গুর্খা পদাতি সৈন্য আসিল এবং আমাদের সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য,—সর্ব্বশুদ্ধ এগার শত রণনিপুণ সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া, পরদিন অতি প্রত্যূষে কালাডুঙ্গি হইতে হলদোয়ানি যাত্রা করিলাম।

বীরবর কর্ণেল ক্রশম্যান সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অশ্বারূঢ় থাকিয়া, তাঁহার আদেশ পালনার্থ কেবল প্রস্তুত হইয়া থাকিলাম। বিজয়-ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। যুদ্ধার্থী সেনাদলের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

চুয়াল্লিশ

হলদোয়ানি প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় জন-মানব নাই। মানবের কণ্ঠধ্বনি বা পদধ্বনি শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিলাম। কিন্তু কোন ধ্বনিই শ্রুতি-গোচর হইল না। সেই দ্বিতল-গৃহের দিকে চাহিলাম—যে গৃহে ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি মৌলবী ফজল হক্ বাস করিত, যে গৃহের মঞ্চোপরি বসিয়া দুর্ব্বৃত্ত ফজল হক্ জলদগম্ভীর স্বরে আমাকে তোপে উড়াইবার আদেশ দান করে, সেই দ্বিতল গৃহের দিকে আবার তীব্র-দৃষ্টিতে কটমট করিয়া চাহিলাম। মনে মনে কহিলাম, রে নররাক্ষস ফজল হক্! আজ তুমি কোথায়? পলাইলে কেন? থাক ত, একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও না?

সেই গৃহের সম্মুখে দুইটী বিশাল বৃক্ষ নয়ন-গোচর হইল। সেই বৃক্ষের তলদেশে আমি দুই রাত্রি বন্ধন-দশায় যাপন করিয়াছিলাম। যে তক্তাপোষ-

দ্বয়ে আমার হাত-পা বাঁধা ছিল, সে তক্তাপোষ দুইখানি তথায় আর দেখিতে পাইলাম না। আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম। ফজল হকের সেই দ্বিতল গৃহোপরি তীরবেগে উঠিলাম। গৃহের অভ্যন্তরে একখানি ভাঙ্গা খাট; খাটের উপর এক ছেঁড়া গদি দৃষ্ট হইল। গদির নীচে হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির হইল। খুলিয়া দেখিলাম,—অনেকগুলি পত্র উর্দ্দু ভাষায় লিখিত। শত্রু-পক্ষীয়ের এই পত্রগুলি ভবিষ্যতে অনেক কার্য্যে আসিতে পারে ভাবিয়া তাহা সযত্নে লইলাম। গৃহে অনেক অনুসন্ধান করিলাম, আর কিছুই পাইলাম না।

কর্ণেল ক্রশম্যান্ সাহেবের নিকট আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি হঠাৎ ঐ দ্বিতল গৃহের উপর উঠিলে কেন?" আমি কহিলাম,—"উহা মুসলমান সেনাপতি ফজল হকের গৃহ ছিল। জনশূন্য গৃহে কোন আসবাব আদি পড়িয়া আছে কি না, তাহাই দেখিতে গিযাছিলাম।"

ক্রশম্যান। কোন দ্রব্য পাইলে কি?

আমি। কতকগুলি পত্র পাইয়াছি; উর্দ্দুতে লেখা। সম্ভবত ইহা দ্বারা শত্রু-পক্ষীয়ের অনেক রহস্য জানা যাইবে।

ক্রশম্যান। আপনি এই উর্দ্দু পত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করুন। অদ্য রাত্রে সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইবেন।

আমি। তথাস্তু।

প্রথম, সেনা-সমাবেশের স্থান নিরূপণ করা হইল। বিস্তৃত পর্ব্বতীয় ময়দানে সেনাগণকে তাঁবু খাটাইয়া থাকিবার আজ্ঞা দান করা হইল। অশ্বারোহী দল এক দিকে রহিল। পদাতি দল ঠিক তাহার বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করিল। একটী উচ্চ স্থানে কামান দুইটীকে রাখা হইল। উপযুক্ত প্রহরী দল কামানের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকিল।

হলদোয়ানি গ্রাম নহে,—ইহা মণ্ডী বা বাজার নামে তখন খ্যাত ছিল। প্রায় পঁচিশ বিঘা চৌকোণা জমি,—এই জমির চারি দিকেই এক সারি করিয়া ঘর; ঘরগুলি গায়ে গায়ে সংলগ্ন; জমির মধ্যস্থলটা ফাঁক। অর্থাৎ সেই জমিটা গৃহরূপ প্রাচীর দ্বারা চারি দিকে বেষ্টিত। সেই গৃহগুলি দোকান-ঘর; বহু সংখ্যক দোকানদার বিদ্রোহের পূর্ব্বে এইখানে বেচা-কেনা করিত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিষ-পত্র কিনিত। সপ্তাহের মধ্যে একদিন হাট বসিত। সেই চতুষ্কোণ জমির মধ্যস্থলে ফাঁকা

জমিটিতে হাট হইত। এই হাটে দ্রব্যসামগ্রী কিনিতে বহুদূর হইতে লোক আসিত। নানারূপ জিনিষের আমদানি হইত। সে প্রদেশের এইরূপ বচন তখন প্রচলিত ছিল, হলদোয়ানির হাটে যাহা পাওয়া যায় না, তাহা অন্য কোথাও মিলে না।

মণ্ডীর দুই দ্বার। বৃহৎ ফটক। এক দ্বার পূর্ব্বে, অন্য দ্বার পশ্চিমে। পূর্ব্বের দ্বার দিয়া সেই খোলা জমিতে প্রবেশলাভ করিতে হয়, পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইতে হয়। প্রত্যেক দ্বারের নিকট সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিত।

আমরা যখন হলদোয়ানিতে উপনীত হইলাম, তখন তথায় জনমানব নাই। দোকান-ঘরগুলি অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। ফটক দুইটীতে কবাটের কাঠ মাত্রও নাই। দ্বারদ্বয় খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। বাসের জন্য, কয়েক-খানি 'উহারই মধ্যে ভাল' দোকানঘর বাছিয়া লইলাম। আমার তৎকালের চির-সহচর ডাঃ নন্দকুমার আমার পাশেই দোকানঘরে বাসা লইলেন এবং হাসপাতালের জন্য আর চারিটী ঘর দখল করিলেন।

ভয়ঙ্কর শীত পড়িয়াছে। নাইনিতালের পাহাড়ে শীত, সন্ধ্যার পর হইতে হাড়শুদ্ধ কন্ কন্ আরম্ভ করে। তাঁবু অপেক্ষা দোকানঘরে শীত কম লাগিবে এই ভাবিয়া আমি দোকানঘরে বাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সাহেবগণ কিন্তু দোকান-ঘর পছন্দ করিলেন না,—তাঁহারা তাঁবু খাটাইয়া রহিলেন।

আমাদের কালাডুঙ্গি অবস্থানকালে প্রধান সেনাপতি ক্রশম্যান সাহেব নাইনিতালেই থাকিতেন। মাঝে মাঝে এক-আধ দিন কালাডুঙ্গিতে আসিয়া সেনাগণের শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। হলদোয়ানিতে কিন্তু তিনি আপনার আবাসভূমি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। চারিটা বৃহৎ তাঁবুতে তাঁহার গৃহ তৈয়ারি হইল। এক তাঁবুতে শয়ন এবং ভোজন, এক তাবুতে বৈঠকখানা, তৃতীয় তাঁবু রান্নাঘর, চতুর্থ পাইখানা। দূরে একটী তাঁবুতে তাঁহার ভৃত্যবর্গ বাস করিতে লাগিল।

সকলের বাসা ঠিক হইলে, রন্ধনের উদ্‌যোগ। তার পর আহার। আহারান্তে আমি মণ্ডীর প্রত্যেক ঘর খুঁজিতে লাগিলাম। শত্রুপক্ষের যদি কিছু জিনিষ-পত্র পাই, ইহাই অভিলাষ। কোথাও কিছু পাইলাম না। কেবল একটা ঘরে কয়েক বস্তা আটা এবং কয়েক হাঁড়ি ঘৃত পাইলাম। আটা ঘি অতি উৎকৃষ্ট। আমাদের সৈন্যদল যেরূপ আটা ঘৃত পাইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা এই শত্রুদল-পরিত্যক্ত ঘৃত আটা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। ঘৃত মিঠা

খোস্‌-বুদার এবং দানাদার। আমি নিজের আহারের জন্য সেই ঘৃত এবং আটা আপন বাসায় আনিলাম। হলদোয়ানিতে কত দিন যে থাকিতে হইবে, তাহার ঠিক নাই;—সুতরাং উত্তম রসদ সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিয়া রাখা ভাল।

বৈকালে সেই উর্দ্দু পত্রগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পড়িতেছি, আর মনে মনে হাসিতেছি; মনের হাসি মাঝে মাঝে মুখেও প্রকাশ পাইতেছে। ডাক্তার নন্দকুমার কহিলেন, "আপনি কি পাগল হইলেন নাকি?—একা বসিয়া আপনা-আপনি এত হাসিতেছেন কেন? আমরা ত দুঃখের সমুদ্রে ভাসিতেছি। সম্মুখে এমন একগাছি কুটা নাই যে, তাহা ধরিয়া উদ্ধারের উপায় চিন্তা করি। এ বিপদে আপনার হাসি যে কিসে আসিল, তাহা আমি বুঝিতেছি না।"

আমি। ওহে ভায়া! কাহাকেও বলিও না, "স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোক!" বিজন বনে "সুন্দরী স্ত্রীলোক!"

ডাক্তার নন্দকুমার চমকিয়া উঠিয়া, কহিলেন,—"কৈ, কৈ?"

আমি। স্ত্রীলোক এখন সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু এই পত্রের ভিতর আছে।

নন্দকুমার। পত্রের ভিতর স্ত্রীলোক? এ আবার কি রকম কথা?

আমি। এই পত্রে স্ত্রীলোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নন্দকুমার। আপনার সকল বিষয়েই হাসি-তামাসা।

আমি। নন্দবাবু! রাগ করিবেন না। প্রকৃতই স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার। উপস্থিত এই পত্রগুলি আমি মৌলবী ফজল হকের গৃহে কুড়াইয়া পাই। ভাবিয়াছিলাম, এই পত্র পাঠে কোন গূঢ় রাজনৈতিক বিষয়ের তত্ত্ব বা যুদ্ধ সজ্জার সন্ধান পাইব। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পাইলাম,—গুপ্ত প্রেমের কথা, কুলকলঙ্কিনীর কথা, বিচ্ছেদের কথা, মিলনের কথা, রূপবর্ণনা, গুণবর্ণনা, বিরহবর্ণনা, গান, ছড়া, হেঁয়ালি এবং অশ্লীল অনুচ্চার্য্য কথা।

ডাক্তার মহাশয় বোধ হয় মনে মনে একটু আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—"বলেন কি? বলেন কি? একখানি পত্র পড়ুন দেখি,—শুনি।"

আমি। এ সব বড় বিশ্রী কথা, আপনার শুনিয়া কাজ নাই।

নন্দকুমারের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাইল। এদিকে তিনি বিদ্যাপতি চণ্ডী-দাসের গানকে অশ্লীল বলিতেন; আমি যদি গাহিতাম,—

কৈশোর যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।
শ্রবণ কি পথ দুহুঁ লোচন নেল॥

তাহা হইলে তিনি বলিতেন,—"এ সব সঙ্গীত কেন? ঈশ্বর বিষয়ক্ গান আরম্ভ করুন।" বিদ্যাসুন্দরের নামে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। আমি যদি এইরূপভাবে টপ্পা ধরিতাম,—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

তাহা হইলে তিনি রাগিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন।

অদ্য কিন্তু ডাক্তার বাবু এ ভাব ভুলিয়াছেন। বিপরীত ভাবে বিপরীত দিকে যাইতেছেন। আমি যখন কহিলাম,—"এ বিশ্রী কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই", তিনি তখন অম্লান বদনে উত্তর দিলেন,—"তা হউক, আপনি পড়িয়া যান , তাহাতে দোষ কি?"

আমি। আপনার শুনিতে লজ্জা না হইতে পারে, আমার কিন্তু পড়িতে লজ্জা হইতেছে। এ কাজ আমি পারিব না।

নন্দকুমার। একান্ত সে কথাগুলা পড়িতে যদি লজ্জা বোধ হয়, তবে সে কথাগুলা বাদ দিয়া পত্র পড়িলে হানি কি? পত্র ত গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত অশ্লীল কথায় পূর্ণ হইতে পারে না,—স্থানে স্থানে যে দুই একটা অশ্লীল কথা আছে, তাহা না পড়িলেই চলিবে।

আমি। অশ্লীল কথা বাদ দিতে গেলে, এ পত্রে আর কিছুই থাকে না। যেমন পূর্ণচন্দ্র ব্যতীত পূর্ণিমা সম্ভবে না, সেইরূপ বিশ্রী কথা—খাঁটী বিশ্রী কথা ব্যতীত, এ পত্রের রচনাও সম্ভবে না।

নন্দকুমার। বটে! বটে। পত্র কি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা? কি দুরদৃষ্ট! আমি যে হাতের লেখা উর্দ্দু পড়িতে জানি না।

আমি। এক সুন্দরী রমণী, এক নব-যবতী স্বহস্তে এই তিনখানি পত্র লিখিয়াছেন। অবশিষ্ট পাঁচখানি পত্র যে কামিনী লিখিয়াছেন, তাঁহার বয়স একটু বেশী এবং বামকর্ণে একটী আঁচিল আছে। তবে ইঁহার অগাধ ধন-সম্পত্তি আছে।

নন্দকুমার কেবল আফশোষে ছটফট্ করিতে লাগিলেন। আর ম্লান মুখে মাঝে মাঝে একদৃষ্টে আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। শেষে জিজ্ঞাসিলেন,—"যার বেশী বয়স বলিতেছ, তাঁর কত আন্দাজ বয়স হইবে?"

আমি। বয়স আর বেশী কি? এখনও বাইশ উত্তীর্ণ হয় নাই।

নন্দকুমার। তা বই কি?—ইহাকে বেশী বয়স বলে না। ইহার নগদ কত টাকা আছে?

আমি। নগদ তিন কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। মোহরের সংখ্যা নিরানব্বই লক্ষ। ইহা ব্যতীত হীরা এবং মুক্তা দুই সিন্দুক আছে।

আমার যাহা মনে আসিতে লাগিল, তাহাই তখন নন্দকুমারকে বলিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য এই,—নন্দকুমার তাহাই তখন পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার নন্দকুমার মিত্রজ মহাশয় এবার ভাবে গদ্‌গদ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"এই বয়োজ্যেষ্ঠা কামিনীটী কি জাতি?"

আমি। কেন,—তোমার কি কুল করিতে হইবে নাকি। এই কামিনীর উৎপত্তি বসু বংশ হইতে।

নন্দকুমার। সকল বিষয়েই আপনার তামাসা।

আমি। তামাসা করি নাই,—তোমার অর্ব্বাচীনতায় বলিহারি দিতেছি। বারাঙ্গনার জাতি জানিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? তুমি কি তাহার সহিত কুটুম্বিতা পাতাইতে চাও?

নন্দকুমার তখন ঘোর নেশায় অভিভূত। কহিলেন, জাতি জানিলে দোষ কি? তিনি হিন্দু, কি মুসলমান,—ব্রাহ্মণ-কন্যা, কি যবন-কন্যা,— এ জাতিতত্ত্ব অবগত হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই উচিত।

আমি। পশুমাত্রেরই উচিত।

নন্দকুমার। তবে কি আমি পশু?

ডাক্তার নন্দকুমার যে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য অদ্য সেই বহুকাল পূর্ব্বে সংঘটিত উপরি-উক্ত ঘটনাটী এস্থলে বিবৃত করিলাম। নন্দকুমার,—ভালমানুষ, সৎ লোক, নিরীহ এবং পরদুঃখ-কাতর। কিন্তু তাঁহার কেমন একটু বাতিক ছিল। আমি যদি বলিতাম,—মধুকর-চুম্বিত প্রফুল্ল গোলাপ পুষ্প;—তিনি অমনি শিহরিতেন। তাঁহার ঐ এক কেমন ধরণ ছিল। এদিকে, কোন স্ত্রীলোকের কুৎসা-ঘটিত কথা হউক দেখি, তিনি অমনি হাঁ করিয়া সে গল্প গিলিতেন। এই দোষটী এবং ঘোড়া-চড়ার আতঙ্ক ও স্বভাবত ভীরু স্বভাব—এই ত্রিদোষ ছাড়া নন্দকুমারের আর কোন দোষ ছিল না। সাহেবমহলে তিনি সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত

ছিলেন। কোন সৈন্যের কঠিন রোগ হইলে, তিনি এক বারের স্থলে দশ বার তাহা দেখিতেন। হঠাৎ রাগ নাই। এক কথা দশ বার জিজ্ঞাসিলেও তাঁহার রাগ নাই। সদাই প্রসন্নবদন,—কর্কশ কথা কালেভদ্রে কদাচিৎ তিনি প্রয়োগ করিতেন, অথবা কখনও করিতেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নন্দকুমারের সহিত সেদিন একহাত খুব ঝগড়া করিলাম। কেন ঝগড়া? কাহার জন্য ঝগড়া? কিসের ঝগড়া? তাহার কিছুই ঠিক নাই, কেবল কথা কাটাকাটি করিয়া, বৃথা ছল ধরিয়া ঝগড়া। নন্দকুমার ঝগড়ায় আমায় পারিবেন কেন? বিশেষ তাঁহার প্রকৃতি ধীর। ক্ষণমাত্র যুদ্ধেই তিনি পরাস্ত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। বিবাদ মিটিল।

সেই সকল উর্দ্দু-লেখা পত্র প্রকৃতই প্রণয়-পত্র। মৌলবী ফজল হক্ অতীব লম্পট। সেই মুসলমান-সৈন্যাধ্যক্ষের প্রকাশ্য উপপত্নীর সংখ্যা আট-নয়টীর কম নহে। ইহা ব্যতীত, পরস্ত্রী হরণে ইনি সদাই তৎপর। একখানি পত্র, কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-ঘরের কুলবধূকে বাহির করিয়া আনিবার উপায় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। কুলবধূ কুলে কালি দিয়া, পুরুষ-বেশে মৌলবী ফজল হকের নিকট হলদোয়ানি আসিতে সম্মত। আমি সে পত্র পড়িয়া মনে মনে বলিলাম,—ধন্য সৈন্যাধ্যক্ষ! তুমিই ধন্য! তুমিই না বীরবেশ ধরিয়া বাহুবলে ইংরেজদিগকে নাইনিতাল হইতে তাড়াইতে আসিয়াছিলে?

আমি সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ণেল ক্রশম্যান সাহেবের নিকট উপনীত হইয়া কহিলাম, “পত্রগুলি প্রণয়পত্র, কেবল স্ত্রীলোক-ঘটিত কথা।” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেল।”

মে মাসে সংক্রান্তি দিনে দুরন্ত গ্রীষ্মের সময়, দিবসে, দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বেরিলি সহরে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়। গ্রীষ্মকাল অতীত হইল, বর্ষাকাল অতীত হইল, শরৎকাল আসিল, আকাশে ষোল-কলায় শশধর উদিত হইল,—ধরামণ্ডল হাসিল,—আমি কিন্তু তখনও প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া ঘুরিতেছি,—উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ইংরেজের কেবল শুভকামনা করিতেছি। শরতের পর হেমন্ত; হেমন্তের পর শীত। কালের ক্ষয় হইয়া নূতন কালের উদয় হইতেছে;—ঘুরিয়া ফিরিয়া এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসিতেছে,—আমি কিন্তু তাহাই আছি! পরিবর্ত্তন নাই, পরিবর্দ্ধন নাই, পরিশোধন নাই,—সেই বিদ্রোহিদল-পরিবেষ্টিত হইয়া কেবল উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছি।

প্রথম প্রথম হলদোয়ানিতে আসিয়া স্থানের নূতনত্ব হেতু একটু ছিলাম ভাল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। সেই ড্রিল, সেই প্যারেড, সেই গোয়েন্দার গল্প, সেই ডাল রুটী মাংস আহার, সপ্তাহের মধ্যে সেই দুই বার শিকাব সন্ধানে গমন, নন্দকুমারের সহিত সেই মাঝে মাঝে ভাব ও ঝগড়া, কেবল এই উপকরণগুলি লইয়া আর কতদিন তিষ্টিব? ঐ বিদ্রোহী সেনা আসিল, ঐ রসদ লুঠিয়া লইল, ঐ আমাদের দুরস্থ ঘাটি আক্রমণ করিল, কেবল ইহা লইযা আব কতদিন থাকিব? ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। মরি কি মারি, তখন ইহাই মনে হইতে লাগিল। বিদ্রোহী সেনা ভেদ করিয়া বেবিলি অভিমুখে ছুটিযা যাই,—মনোমধ্যে মাঝে মাঝে এমনও অভিলাষ জন্মিতে লাগিল। বাস্তবিকই দিন আর যায় না,—কেবল পথ পানে চাহিযা থাকি,—আজ চর-মুখে কি সংবাদ পাই। ডাকের চিঠি নাই, জননী-ভার্য্যার সংবাদ নাই,—আত্মীয়-স্বজনেব সংবাদ নাই,—সুতরাং সদাই শুষ্কমুখ, বিষণ্ণ বদন। সত্য সত্যই সহ্য আর হয না।

কিন্তু এই বিরক্তির দিন কি শীঘ্র ফুরাইবে না? শুভদিন কি আব সহজে আসিবে না? ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যে প্রাণ কি আব সুশীতল হইবে না? বিদ্রোহীদেব সহিত ঘোর সংগ্রামে, সম্মুখ-সমবে প্রাণেব পিপাসা কি মিটাইতে পারিব না?' বীরদর্পে ভীরু বিদ্রোহী সেনাদল-মাঝে পড়িয়া, অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবাব কি সুযোগ পাইব না? একবাব অন্তবে কালী কালী বলিয়া, —মুখে কালী কালী বলিয়া, হস্তে খড়্গ লইযা রণভূমে প্রবেশপূর্ব্বক মনের আশা পূর্ণ কবিবাব কি অবসর ইহজন্মে আব পাইব না? জানি না, অদৃষ্টে কি আছে? হয় বিদ্রোহিগণ আসিযা আমাদিগকে হনন করুক, না হয় আমবা গিযা বিদ্রোহিগণকে সমূলে নির্ম্মূল করি। হয এ দিক্, না হয় ও দিক্—যা হয একটা হইযা যাউক। কিন্তু এমন করিযা আর বসিয়া থাকিতে পারি না।

পঁয়তাল্লিশ

হলদোয়ানিতে গোয়েন্দার সংখ্যা কিছু কিছু বৃদ্ধি হইল। অনেক লোকই গোয়েন্দা হইতে চায়। কারণ, গোয়েন্দা-গিরি কার্য্যে সফলকাম হইলে পুরস্কার লাভের বিশেষ সম্ভাবনা। গুপ্তচরের কাজ কিন্তু বড় কঠিন। যে-সে লোককে এ কাজে নিযুক্ত করা উচিত নহে। এদিকে আবেদনকারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে গুপ্তচরের সংখ্যা ক্রমশঃ আপনা-আপনিই অধিক হইয়া পড়িল। কর্ণেল ক্রশম্যান আমাকে তামাসা করিয়া বলিতেন, "বাবুজী! আপনি দেখিতেছি, ক্রমশঃ গোয়েন্দার একটী রেজিমেণ্ট তৈয়ারি করিয়া ফেলিবেন!"

কোন কোন গোয়েন্দা ফাঁকি দিত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে না গিয়া, অম্লান বদনে বলিত, 'গিয়াছি'। জেবায ধরাও পড়িত, বেত খাইত, অথবা কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা সহ্য করিত!

একদিন একজন গোয়েন্দা আসিয়া হণ্টার সাহেবের নিকট মহা গল্প জুড়িয়া দিয়াছে; কতরূপ অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছে, হাত-পা নাড়িতেছে, চক্ষু ঘুরাইতেছে। দূর হইতে দেখিয়া আমি নিকটে গেলাম। সে বলিতেছে, "আমাকে বিদ্রোহিগণ কিছুতেই চিনিতে পারে নাই। আমি এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, বিদ্রোহিগণ আমি যাহা বলিতাম, তাহাই বিশ্বাস করিত।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তাঁহাদের বন্দুক কত আছে, তাহার হিসাব লইয়াছ কি?"

গোয়েন্দা। হাঁ। যাহার জন্য গিয়াছি, সে কাজ সমাধা না করিয়া কি আমি অমনি ফিরিয়া আসিয়াছি?

আমি। বন্দুকের সংখ্যা কত?

গোয়েন্দা। নয় হাজার ছাব্বিশ।

আমি। কিরূপে তুমি বন্দুক গণনা করিতে?

গোয়েন্দা। যখন কেহ কোথাও থাকিত না, সে সময় তাহাদের ঘরে ঢুকিয়া বন্দুক গণিতে বসিতাম।

আমি। তুমি তাহাদের ঘরে ঢুকিলে অন্য কেহ তোমাকে কোন কথা বলিত না কি?

গোয়েন্দা। না,—আমার উপর সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সুতরাং কেহই কিছু বলিত না।

আমি। তুমি কি তখন সঙ্গে করিয়া দোয়াত কলম লইয়া যাইতে?

গোয়েন্দা। দোয়াত কলম লইয়া যাইবার দরকার কি? সেখানে দোয়াত কলম পাইবই বা কোথায়?

আমি। গণিয়া যাহা হইত, তবে তাহা মনে করিয়া রাখিতে?

গোয়েন্দা। আজ্ঞে, হাঁ।

আমি। এরূপ কয় দিন গণিয়াছিলে?

গোয়েন্দা। নয় দিন কাল।

আমি। তোমার ত স্মরণশক্তি খুব প্রখর দেখিতেছি।

গোয়েন্দা। আমরা মূর্খলোক, তাদৃশ লেখাপড়া জানি না, কিন্তু একবার যাহা গণিব, তাহা কস্মিন্‌কালে ভুলিব না।

আমি। বটে, অতি আশ্চর্য্য ত! পনের দিনের ধারাবাহিক গণনা তোমার মনে আছে! তুমিই উপযুক্ত গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা। (জোড়হাতে) আজ্ঞে, তা আছে বৈ কি? পনের দিন কেন, যদি পনের বছর হইত, তথাচ আমি ভুলিতাম না।

আমি। আচ্ছা, বাপু! বল ত, তুমি প্রথম দিন কত বন্দুক গণিয়াছিলে?

গোয়েন্দা থতমত খাইল। হণ্টার সাহেবের মুখ হইতে হাসি বাহির হইল। আমি গুপ্তচরকে কহিলাম,—"বল, বল শীঘ্র বল, বিলম্ব করিতেছ কেন?"

গোয়েন্দা। আজ্ঞে, আজ্ঞে, ৭১২টী বন্দুক।

আমি। দ্বিতীয় দিন কত গণিয়াছিলে?

গোয়েন্দা আবার বিলম্ব করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, গোয়েন্দা বুঝি মনে মনে কি হিসাব করিতেছে। আমি কহিলাম,—"তুমি এত বিলম্ব করিতেছ কেন? এবং মনে মনে হিসাবই বা কি করিতেছ? খবরদার! ফের যদি বিলম্ব করিবে, তবে এই বেত তোমার পৃষ্ঠের উপর পড়িবে। শীঘ্র বল।

গোয়েন্দা। দ্বিতীয় দিন,—৯২০টী।

আমি। তৃতীয় দিন কত? বলিতে বিলম্ব করিতে পারিবে না। যেমন আমি প্রশ্ন করিব, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে হইবে। তোমার ১৫ বৎসরের পুরানো কথা সমস্তই মনে থাকে, আর পনের দিনের টাট্‌কা কথা কি মনে থাকে না?—ইহার জন্য ভাবিতে হয় কেন?

এই কথা বলিয়া আমি বেত ঘুরাইতে লাগিলাম।

গোয়েন্দা। তৃতীয় দিনে ৫০০ শত।

আমি। চতুর্থ দিনে কত?

গোয়েন্দা। ২৫৮।

আমি। পঞ্চম দিনে?

গোয়েন্দা। ৬৯৯।

আমি। ষষ্ঠ দিনে?

গোয়েন্দা। ২০০০ দুই হাজার।

আমি। সপ্তম দিনে?

গোয়েন্দা। ৩১৯।

আমি। অষ্টম দিনে?

গোয়েন্দা। ৫১২।

আমি। নবম দিনে?

গোয়েন্দা। ৯০৬।

হণ্টার সাহেব মনে মনে টিপি-টিপি হাসিতেছেন। হাসি বেগ সংযত করিয়া আমাকে ইংরেজীতে কহিলেন,—"বাবু সাহেব! বেশ মজা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় আপনি উহাকে প্রথম দিন কত বন্দুক গণিয়াছিলে, দ্বিতীয় দিন কত বন্দুক গণিযাছিলে,—এইরূপ জিজ্ঞাসা করুন। তাহা হইলে ও ব্যক্তি আপনা-আপনিই ধরা পড়িবে।"

আমি ইংরেজিতে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—"না।"

হণ্টার সাহেব। (ইংরেজিতে) ও ব্যক্তি ঐ আট দিন কাল ক্রমান্বয়ে যত বন্দুক গণিয়াছে বলিল, উহাকে একবার তাহা ঠিক দিতে বলুন,—তাহা হইলেই সে আপনার মিথ্যা কথারূপ জালে বদ্ধ হইবে।

আমি হাসিয়া ইংরেজীতে কহিলাম, "না, সে কথা এখন থাক্—আরও একটু মজা করা যাউক।"

ধূর্ত্ত গোয়েন্দা আমাদের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছে, সে ধরা পড়িয়াছে। সে তখন পলাইবার পথ খুঁজিতেছে।

গোয়েন্দা কহিল,—"রাত্রি জাগিয়া পথ হাঁটিয়া আসায়, আমার জল-তৃষ্ণা পাইয়াছে। আমি এখন চলিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসিব।"

আমি। তুমি আর একটু থাক, আর গোটা-দুই প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাস্য আছে।

গোয়েন্দা। একবার ছাড়িয়া দিন, আমি একটু জল খাইয়া শীঘ্র আসিতেছি।

আমি। তা হইবে না। একটু ব'সো। আচ্ছা, বল দেখি, যে স্থানে এক্ষণে বিদ্রোহিগণ আছে, তথায় শীত কেমন?

গোয়েন্দা। ভয়ঙ্কর শীত।

আমি। সমস্ত রাত্রই কি সেনাগণ আগুন পোহাইয়া থাকে?

গোয়েন্দা। হা হুজুর। আগুন ব্যতীত তথায় তিলার্দ্ধকাল তিষ্ঠিবার যো নাই।

আমি। বিদ্রোহিগণ তথায় নূতন যে কূপটী কাটাইয়াছে, তাহার জল সুস্বাদু না বিস্বাদ?

গোয়েন্দা। (একটু স্থিরভাবে থাকিয়া) অতীব সুস্বাদু।

আমি। এইবার তুমি একবার স্মরণ করিয়া বল ত,—৫ম দিনে কত বন্দুক গণিয়াছিলে?

গুপ্তচরের মুখে আর কথা নাই। কি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিল।

আমি হস্তে বেত লইলাম। বলিলাম, 'কূপের জল অতীব সুস্বাদু নয়?" বেত উত্তোলন করিলাম। সজোরে গোয়েন্দার পশ্চাদ্ভাগে বেত্রাঘাত করিয়া কহিলাম, "বিদ্রোহিগণ সমস্ত রাত্রি আগুন পোহায় নয়? এরূপ নিদারুণ মিথ্যা কথা কহিয়া তোমার লাভ কি? তুমি আদৌ সে স্থলে যাও নাই, অথচ ঘোর মিথ্যা কথা কহিয়া তুমি বলিতেছ, তুমি স্বয়ং তথায় গিয়াছিলে। বাপু! সেখানে কূপ নাই। ঝরণার পবিত্র জলই বিদ্রোহীদের একমাত্র পানীয়। তাঁবুতে আগুন লাগার পর হইতে তথায় কেহ রাত্রি ৯টার পর আর আগুন জ্বালিতে পায় না। অথচ তুমি বলিতেছ, বিদ্রোহী সেনানিবাসে সমস্ত রাত্রিই আগুন জ্বলে। এই বেতনই তোমার উপযুক্ত ঔষধ, এই বলিয়া সেই গোয়েন্দার পৃষ্ঠদেশে গণনা করিয়া দশবার বেত্রঘাত করিলাম। সেই মিথ্যাবাদী গুপ্তচর প্রথমত বিপরীত রবে চীৎকার আরম্ভ করিল; অবশেষে নিস্তেজ হইয়া ধরাশায়ী হইল। সেই যৌবনারম্ভ কালের আমার হাতের দশ বেত বড় কম কথা নহে। আমি নিকটস্থ অনুচরকে কহিলাম,—"এ ব্যক্তিকে হাজতঘরে লইয়া যাও এবং শুশ্রূষা কর।"

'কোন কোন' পাঠক হয়ত আমাকে নিষ্ঠুর মনে করিতেছেন। প্রকৃতই সঙ্গদোষে আমার প্রকৃতি তখন বড়ই কঠোর হইয়াছিল। তখন তরবারি-বন্দুক-বল্লম লইয়া সদাই কাজ, মুখে সদাই মার-ধর-কাট্ বুলি, ব্যাঘ্র-হরিণ পক্ষী শিকারই তখন ধর্ম্ম, ঘোর যুদ্ধে শত্রুমুণ্ডচ্ছেদনই তখন এক মাত্র ব্রত ছিল। সুতরাং প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন? আহার ছিল মাংস, মাংসাশী ইংরেজের সহিত ছিল বসবাস, বীরপুরুষ কঠিনদেহ ক্ষত্রিয়গণের সহিত ছিল সদা রহস্যালাপ,—প্রকৃতি কঠিন হইবে না কেন? নিকটে মাতা নাই, ভার্য্যা নাই, কন্যা নাই,—প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন? প্রসন্ন পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী নাই, স্বভাবের শ্যামল সুন্দর শস্যক্ষেত্র নাই, মল্লিকা-মালতী-যূথিকা নাই, তমাল তরু নাই, নিশীথে বংশীধ্বনি নাই,—এ পাথরময় অরণ্য প্রদেশে এতকাল বাস করিয়া প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন?

বেতের চোটে অন্যের পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে দেখিলে আমার তাদৃশ কষ্ট বোধ হইত না। অন্যের হাত-পা-মুখ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হউক,—আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। মানুষ সাক্ষাতে হস্তি-পদদলিত হইলেও আমার চাঞ্চল্য নাই। বেদান্ত-ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

ছেচল্লিশ

নিয়ম হইল, বিশেষ পরীক্ষা এবং বিশেষ নিদর্শন ব্যতীত গুপ্তচরের কথা গৃহীত হইবে না। যে স্থলে বিদ্রোহিগণ ছাউনি করিয়াছিল, তথায় এক জাতীয় নূতন বৃক্ষ ছিল। সেরূপ বৃক্ষ এবং সেরূপ পাতা এ অঞ্চলে আদৌ ছিল না। যে গুপ্তচর সেই বৃক্ষের পাতাসহ ক্ষুদ্র একটু ডাল না আনিতে পারিত, তাহার কথা শ্রুতিযোগ্য নহে বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ ধরাধরি কড়াকড়ি করাতে জুয়াচোর গোয়েন্দার দল কিছু কমিল।

রবিবার। অপরাহ্ণ। শিকার-সন্ধানে বহির্গত হই নাই। চেয়ারে বসিয়া আছি এবং ডাক্তার নন্দকুমারকে জ্বালাতন করিতেছি। একজন আরদালি আসিয়া কহিল,—"অল্পবয়স্কা এক সুন্দরী স্ত্রী ছাউনিতে আসিয়া সেতার বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিতেছেন। সুন্দরী কাহারও সহিত কথা কহেন না। তাঁহার সহিত একটী বৃদ্ধ পুরুষ আছে, সে গান গায়, ডুগি বাজায়

এবং লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। হুজুরের যদি অনুমতি হয়, তবে সেতার-ওয়ালীকে এইখানে লইয়া আসি।"

আমি। আচ্ছা, লইয়া আইস।

দূত প্রস্থান করিলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি এক রকম নূতন ঘটনা ঘটিল! আমাদের আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কোন নারীই ত হলদোয়ানিতে আইসে নাই। রমণীর শুভাগমন শুভফলসূচক সন্দেহ নাই। অথবা ইহা কোন মায়াবিনীর মায়া! জানি না, কোন্ ছলে কোন্ কামিনী কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সেতারবাদিনী আসিল। রমণী সুন্দরী, আয়তলোচনা। বয়ঃক্রম বুঝি যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। করুক। তাহাতেই কিন্তু সৌন্দর্য্যকে, সেই রূপরাশিকে অধিকতর প্রগাঢ়, মধুর এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কামিনীর প্রকৃতি গম্ভীর, ধীর, স্থির। পুরুষের পানে দৃষ্টি নাই। তাহার নয়নযুগল কেবল সেতারের দিকে নিহিত।

আমি কম্বল আসন পাতিয়া দিয়া শশিমুখীকে বসিতে বলিলাম। শশি-মুখী সেতার-হস্তে সম্মুখে উপবিষ্ট, তৎপশ্চাতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে ঘেঁসিয়া সেই বৃদ্ধ ডুগি লইয়া বসিল। আমি সেতারবাদিনীকে কহিলাম,—"আপনার নিবাস কোথায়? এবং শিক্ষাই বা কোথায়?" তিনি কথা কহিলেন না; কেবল নিম্নে সেতার পানে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ কিন্তু আমার কথার উত্তর দিল, কহিল,—"ইনি কথা কহেন না, গুরুর আজ্ঞা সেরূপ নহে। ইঁহাকে সেতার বাজাইতে অনুমতি করুন, বোধ হয় সেতারে আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। যে রাগ, যে সুর, যে গান আপনি আলাপ করিতে বলিবেন, ইনি তাহাই হৃষ্টচিত্তে করিবেন।

আমি। আমার কোন ফরমাইস নাই। যাহা উঁহার ইচ্ছা, তাহাই আলাপ করুন।

রমণী অমনি বাম করে সেতার ধরিয়া দক্ষিণ পাণির তর্জ্জনীর সাহায্যে সেতারে ঝঙ্কার দিলেন। কি অপূর্ব্ব মধুর রব! প্রথম একবার 'সা-রে-গ-ম' সাধিয়া লইলেন। হাতের কায়দা দেখিয়া ভাবিলাম, এ রমণী বড় সামান্যা নয়। তৎপরে তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া মেঘরাগের আলাপ করিলেন। যাঁহারা সঙ্গীত কি, রাগ কি, সেতার কি বুঝেন,—তাঁহাদের মন মোহিত হইল। প্রায় এক হাজার শ্রোতা বা দর্শক রমণীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সকলে সাবাস্ সাবাস্ ধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ কহিল, রমণী মানবী নহে, দেবী। কেহ কেহ মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—এ রমণীর গুরু কে? কোন্ ওস্তাদ ইঁহাকে এ অলৌকিক রসের অবতারণা করিতে শিখাইয়াছে। সেই ওস্তাদের কি একবার দেখা পাই না?

মেঘরাগ আলাপের পর রমণী কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইলেন। তার পর আবার সেতার ধরিলেন। কিন্তু সেতার বাজাইবার পূর্ব্বে রমণী দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে কহিলেন, এইবার সমস্ত দর্শককে এ স্থান হইতে সরাইয়া দাও। আমার আদেশ অনুসারে, লোকসমূহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও একে একে, দলে দলে, ধীরে ধীরে, নিতান্ত ভগ্নমনে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। রহিলাম আমি, ডাক্তার নন্দকুমার এবং দশ-বার জন উচ্চপদস্থ হিন্দুস্থানী সৈনিক কর্ম্মচারী।

এবার খাম্বাজ রাগিণীতে সেতারে আলাপ হইতে লাগিল। গৎ বাজাইয়া শশিমুখী শেষে সেতারে খাম্বাজের গান ধরিলেন। কি মধুর! কি মধুর! চলুক, চলুক! যেন আজ আর শেষ হয় না! চলুক, চলুক! যেন আজ আর ফুরায় না! দিন ফুরাইয়া যাউক, রাত্রি ফুরাইয়া যাউক,—কিন্তু এ গান যেন ফুরায় না! সংসার চাহি না, পৃথিবী চাই না, স্বর্গ চাহি না,—কিন্তু এ গান যেন ফুরায় না!

সেতারে গান চলিতেছে, মনুষ্যকণ্ঠে গান যেন গীত হইতেছে, সেতার যেন কথা কহিতেছে, কিন্তু গানটী কি আমরা বুঝিতেছি না। গানটী কি? জানিবার জন্য আমাদের লালসা বলবতী হইল। যখন আর থাকিতে পারিলাম না, তখন জোড়হাতে কহিলাম, সত্যসত্যই জোড়হাতে কাতরকণ্ঠে কহিলাম,—"হে সুন্দরী! হে গায়কে! হে মৌনবতি! তুমি সেতারের সঙ্গে সঙ্গে আপন কলকণ্ঠে ঐ গানটী গাহিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।"

চক্ষু চাহিয়া দেখি সম্মুখে হণ্টার এবং বাবওয়েল সাহেবদ্বয় উপস্থিত। তাঁহারা গোলযোগ দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি সসম্ভ্রমে তাঁহাদের বসিবার জন্য উপযুক্ত আসন আনাইয়া দিলাম এবং সংক্ষেপে রমণীর বৃত্তান্ত ইংরেজী ভাষায় কহিলাম।

সাহেবদ্বয় উপবিষ্ট হইলে রমণী মধুরস্বরে আবার সেই গান সেতারে বাজাইতে লাগিলেন। আমি পুনরায় অনুনয়-বিনয় করিয়া রমণীকে ঐ গান সেতারের সহিত তদীয় কণ্ঠে গাহিতে অনুরোধ করিলাম।

রমণী আকাশপানে চাহিয়া দেবগণকে প্রণাম করিলেন। শেষে তিনি সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির মুখপানে চাহিলেন। বৃদ্ধ কহিল,—"আচ্ছা গাও; সময় ঠিকই হইয়াছে।"

বমণী তখন সেতারের সহিত স্বীয় কণ্ঠে গান আবম্ভ করিলেন। সেতারের সুমধুব স্ববেব সহিত কামিনীব সেই কোবিল-বিনিন্দিত কলকণ্ঠস্বর মিশাইয়া গেল। সেতাব বাজিতেছে, কি কণ্ঠস্বব ধ্বনিত হইতেছে, তখন আর কিছুই বুঝা গেল না। কেবল এক অনির্ব্বচনীয় সুধারস শ্রোতৃবৃন্দ পান করিতে লাগিলেন।

সে গান হিন্দী ভাষায় বিবচিত। প্রথম ছত্র ব্যতীত সে গানের অন্য কোন অংশ আমার মনে নাই। আমাব স্মাবক-লিপির যে অংশে এই গান লিখিত ছিল, সে অংশেব কতক একেবাবে কীটদষ্ট, কতক জল পাইয়া পচিয়া গিয়াছে, কিছুই ভাল পডিবাব যো নাই। তবে গানেব ভাব আমার মনে আছে। ভাব লইয়া বাঙ্গালাভাষায় সে গানেব কতক অনুবাদ করিয়া দিলাম।

খাম্বাজ—একতালা।

শুন হে বাজন্, অমিয় বচন,
হয়েছে হে আজ্ দিল্লীব পতন।
বাদশা বেগমে ইংবেজ-চরণে
লুটিয়া পডেছে, লয়েছে শবণ।
উঠ উঠ উঠ, উঠ স্ববা কবি,
দুঃখময় তৃণশয্যা পবিহবি,
বণসাজে ধাও, জয়গান গাও,
স্মবণ করিয়া শ্রীমধুসূদন।
(ওহে) ভয নাই আব, ভয় নাই আব,
নয়ন মেলিয়া দেখ একবাব,
প্রভাত হইল, আঁধাব ঘুচিল,
কমল ফুটিল, ঐ রবি-কিরণ।

ছাপায় গানটী সমুদায় একত্র দেখিলেন। কিন্তু রমণী যখন গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথম চারি ছত্র ব্যতীত অর্দ্ধদণ্ডকাল গান আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। রমণীকে শ্রোতৃবৃন্দ কেহই সে গান সহজে সম্পূর্ণরূপে গাহিতে দেন নাই।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে, হিমালয় উড়িয়া চলিলে, সম্মুখে হঠাৎ শত শত বিষম বজ্রাঘাত এককালে হইতে থাকিলে, মানুষ যত না চমকিত হয়, ত্রস্ত কম্পিত-কলেবর হয়, প্রথম দুই ছত্র গান শুনিয়া আমরা তাহারও অধিক হইলাম। অদ্য 'দিল্লীর পতন কি?'—তবে কি ইংরেজের জয় হইয়াছে? পুনরায় কি ইংরেজ দ্বারা দিল্লী নগরী অধিকৃত হইয়াছে? এ শুভ সংবাদ এতদিন আমরা জানিতাম না। কিন্তু এই গায়িকা কেমন করিয়া জানিল? দিল্লীর পতন! তাও কি কখন সম্ভব হয়? আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি। দেহও গুরুগুরু কাঁপিতে লাগিল। শুভ সংবাদকে সত্য বিবেচনা করিয়া এক একবার উচ্ছ্বাসে উল্লাসে আনন্দে চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। কিন্তু যখন শুনিলাম,—"বাদশা-বেগমে ইংরেজ-চরণে লুটিয়া পড়েছে, লয়েছে শরণ"—তখন বাস্তবিকই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া সেই গায়িকাকে কহিলাম,—"হে সুন্দরি! বল, তুমি কে? তোমার কথা সত্য কি না? তোমাকে এ গান কে শিখাইল? বল,—বল,—দিল্লীর পতন।—এ সংবাদ সত্য কি না?"

ধওকল সিং প্রমুখ কয়েক জন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী ঠিক আমার ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"কথা সত্য কি না?—কথা সত্য কি না?"

হণ্টার সাহেব ইংরাজীতে জিজ্ঞাসিলেন,—"বাবু! ব্যাপার কি? সত্য সত্যই কি দিল্লীর পতন হইয়াছে? অথবা এ রমণী আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য শত্রুদল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে?

আমি। (ইংরেজিতে) কিছুই ত বুঝিতেছি না। ভিতরে অবশ্যই গভীর রহস্য আছে। কিন্তু রমণীর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া এবং সরল স্বর শুনিয়া, আমার ত এমন মনে হয় না যে, এ রমণী মায়াবিনী, নিশাচরী।

হণ্টার। সুন্দর মূর্ত্তিটুকু এবং রসাল কথাটুকু, এই দুইটী একত্র হইয়াই ত মানুষকে মাটী করে। ভুবন-ভুলানীর ভাব সহজে কে বুঝিতে পারে? বহুরূপীকে বহুরূপী বলিয়া সহজে যদি চিনিতে পারিবেন, তবে আর 'সাজা'র সার্থকতা এবং বাহাদুরী কি হইল?

এত অনুনয়-বিনয় এবং আগ্রহ প্রদর্শন সত্ত্বেও রমণী কথা কহিলেন না। তবে এবার তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া গান আরম্ভ করিলেন,—

উঠ উঠ উঠ, উঠ ত্বরা করি,
দুঃখময় তৃণশয্যা পরিহরি,

রণসাজে ধাও, জয়গান গাও,
স্মরণ করিয়া শ্রীমধুসূদন ॥

আবার যুক্তকরে রমণীকে সাধিলাম। আবার ছল্ ছল্ নেত্রে রমণীকে কহিলাম, "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন,—কথা কহুন!"

কঠিনা কামিনী কাহারও কথা শুনিলেন না, একটী কথাও কহিলেন না। কেবল দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিতে (ইঙ্গিতে) বলিলেন।

আমরা নীরব, নিস্পন্দ। রমণী পুনরায় সেতারের সহিত গান আরম্ভ করিলেন,—

(ওহে) ভয় নাই আর, ভয় নাই আর,
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার।
প্রভাত হইল, আঁধার ঘুচিল,
কমল ফুটিল,—ঐ রবি-কিরণ ॥
(হয়েছে হে আজ দিল্লীর পতন।)

আমার অঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অন্যান্য শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধীর, স্থির। কথা কহেন, এমন শক্তি বুঝি আর কাহারও নাই। গান শেষ হইলে হণ্টার সাহেব হিন্দী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আপনার গানে আমরা বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্য করিয়া বলুন, দিল্লীর পতন যথার্থ ঘটিয়াছে কি না? ইংরেজের জয় হইয়াছে কি না? বাদশাহ বেগম বন্দী হইযাছে কি না? আপনি এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? এ গান কাহার তৈয়ারি? এ গান কাহার নিকট আপনি গাহিতে শিখিলেন?"

রমণী সেতার রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া জোড়হাতে উত্তর করিলেন,—"বাবু সাহেব! আমাকে কি আপনি চিনিতে পারিতেছেন না?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। বিস্ময় শতগুণে বৃদ্ধি হইল। ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলাম, "তুমি কি মিশ্র বৈজনাথের লোক! তুমি স্ত্রী নহ, পুরুষ!"

তখন সেই রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রী-বেশ ফেলিয়া দিল। ভিতরে পুরুষবেশ আঁটা ছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই পুরুষ দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিল, "হুজুর! সত্য সত্যই ইংরেজের জয় হইয়াছে। দিল্লীর পতন হইয়াছে।" আমরাও সেই সঙ্গে ধ্বনি করিয়া

উঠিলাম, "জয়, ইংরেজের জয়! জয়, ইংরেজের জয়।" শত শত সেনা-কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "জয়, ইংরেজের জয়! জয় জয়—দিল্লীর পতন।" নিয়ম রহিল না, প্রকরণ রহিল না, পদ্ধতি রহিল না, লঘু-গুরু ভেদ রহিল না,—সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিল,—

জয় ইংরেজের জয়,
জয় ইংরেজের জয়!

সাতচল্লিশ

আনন্দ-উল্লাসের উৎসব-ভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইলে আমি গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসিলাম,—"মিশ্র বৈজনাথের কোন পত্র আছে কি?"

গুপ্তচর। না। আপনি আমাকে চেনেন বলিয়াই তিনি কোন পত্র দিলেন না। প্রভু মহাশয় এই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাবু সাহেব জিজ্ঞাসিলে কহিও,—"পত্র দিবার আবশ্যকতা নাই, যুক্তিযুক্তও নহে। যদি কোন-গতিকে পত্র ধরা পড়ে, তাহা হইলে পত্রপ্রেরক এবং পত্রবাহক উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইবে।"

আমি। তুমি স্ত্রী-বেশ ধরিয়া আসিলে কেন?

গুপ্তচর। আপনি বোধ হয় জানেন, 'বিশেষ পাস' ব্যতীত, বেবিলি সহর হইতে কাহারও বাহির হইবার গো নাই। সহরের চারিদিকেই ঘাটির পাহারা আছে। শুনিলাম, পূর্ব্বদিকের ঘাটির যিনি অধ্যক্ষ, তিনি বড়ই সেতার-প্রিয়। নারী-বেশ ধারণ করিলে সহজেই অধ্যক্ষের মন মোহিত করিতে সক্ষম হইব ভাবিয়া আমি নারী-বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। একদিন, দুইদিন, তিন-দিন,—ক্রমান্বয়ে চারিদিন গিয়া তাঁহার নিকট সেতার বাজাইলাম। দেখি-লাম তাঁহার মন পূর্ণমাত্রায় মোহিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি প্রস্তাব করিলাম, "একবার রামপুর যাইবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। পিতা মাতা ভ্রাতার অনেক দিন কোন সংবাদ পাই নাই। আপনি কৃপা করিয়া রামপুর গমনের যদি একখানি পাস বা অনুমতিপত্র দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।" অধ্যক্ষ কহিলেন, "ইহা কোন্ বিচিত্র কথা? পাস ত দিবই; ইহা ব্যতীত দুইজন সওয়ার

আমাদের সীমানা পর্য্যন্ত আপনার পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে।” আমি কহিলাম, “তাহাই হউক।” এইরূপ কৌশলে আমি বেরিলি হইতে এই শুভ সংবাদ লইয়া এই বৃদ্ধ ভৃত্যের সমভিব্যাহারে পঞ্চম দিনে পলাইয়া আসিয়াছি।

আমি। তুমি কি সেই অবধি এ পর্য্যন্ত স্ত্রী-বেশই ধরিয়া আছ নাকি?

গুপ্তচর। না। নবাব খাঁ বাহাদুরের সীমা পার করিয়া দিয়া অশ্বারোহি-দ্বয় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমিও ভাড়া চুকাইয়া দিযা পাল্কী-বেহারাগণকে বিদায় দিলাম। তখন স্ত্রী-বেশ ছাড়িয়া পুরুষ-বেশ ধরিলাম,—দীর্ঘ দাড়ি, গেরুয়া বসন, জটা, কমণ্ডলু লইযা সন্ন্যাসী সাজিলাম। বৃদ্ধ ভৃত্যের নিকট এই ক্ষুদ্র ডুগি ও সেতার থাকিত। বাল্যকাল হইতেই গানে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমি পথে এক প্রকাণ্ড বন-বৃক্ষের তলায় বসিয়া এই গানটী বাঁধিয়াছিলাম। এই গানটী আপনা-আপনি কতবার গাহিযাছি, কতবার কাঁদিয়াছি। নির্জ্জন স্থান পাইলেই সেতারে এই গানের আলাপ করিতাম। হলদোয়ানির প্রথম ঘাটি যখন এক ক্রোশ দূরে আছে অনুমান হইল, তখন যোগিবেশ ছাড়িয়া আবার নারী-বেশ ধরিলাম।

আমি। নারী-বেশ হঠাৎ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি?

গুপ্তচর। নারী-বেশে গান খুলিবে ভাল,--গানের জমাট হইবে ভাল,—এই জন্যই নারী-বেশ ধরিয়াছিলাম।

আমি। ইংরেজের জয়, দিল্লীর পতন এবং বাদশা-বেগমের বন্দী হওয়া, এ সকল সংবাদ কিরূপে কোথা হইতে পাইলে?

গুপ্তচর। সর্ব্বপ্রথমে প্রভু-মহাশয় দিল্লীর নিকটস্থ তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে পত্র দ্বারা এ শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই পত্রখানি হেঁয়ালির ভাবে লিখিত, সহজে অর্থ বোধ হইবার যো ছিল না। তাহার দুইদিন পরে ইংরেজের বিজয়-সংবাদ লইয়া এক জন গুপ্তচর খাস দিল্লী সহর হইতে আগমন করে। যিনি চর-প্রেরক, তিনি এক জন ধনাঢ্য জমিদার, এবং আমার প্রভুর বিশেষ বন্ধু। ঐ চর-মুখে আমরা দিল্লীর যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়াছি।

আমি। আর কোন সূত্রে দিল্লীর পতনের সংবাদ পাইয়াছ কি?

গুপ্তচর। এই পতন সংবাদ এক্ষণে বেরিলি সহরময় রাষ্ট্র। মেয়ে ছেলে বুড়ো সকলেই এ সংবাদ লইয়া গোপনে আন্দোলন করিয়া থাকে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহারও বলিবার যো নাই।

আমি। নবাব খাঁ বাহাদুর এ সংবাদ শুনেন নাই কি?

গুপ্তচর। শুনিয়াছিলেন বৈ কি। এ সংবাদ যাহাতে প্রচার না হয়, প্রজাগণ যাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হয়, তাহার জন্য তিনি বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন।

আমি। তিনি কিরূপে এ সংবাদ শুনিলেন? এবং এ কথা ঢাকিবার জন্যই বা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন?

গুপ্তচর। যেদিন দিল্লীর পতন হয়, তাহার পরদিন প্রাতে উঠিয়াই কানা-ঘুষা শুনিতে আরম্ভ করিলাম, ইংরেজের জয় হইয়াছে। এমনও আজগুবি সংবাদ প্রচার হইতে লাগিল, ইংরেজের বড়লাট স্বয়ং বিবাহ করিবেন বলিয়া বেগমকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। দশ-বার ঘণ্টা মধ্যে কিরূপে যে এ সংবাদ দিল্লী হইতে বেরিলি আসিল, তাহাই এখন ভাবিতেছি। এই সংবাদ প্রথম কে আনিল? কে প্রথম প্রকাশ করিল? তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। ক্রমশঃ নবাব বাহাদুরের কানেও এ কথা উঠিল। কিন্তু সহজে তিনি এ সংবাদ বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বিশ্বাস না করুন, সহরবাসিগণ মধ্যে প্রায় সকলেরই ধ্রুব ধারণা জন্মিল যে, সত্য সত্যই ইংরেজের জয় হইয়াছে। ক্রমশঃ আমরা দিল্লী হইতে পত্র পাইলাম, সংবাদ সত্য। দিল্লী হইতে এক জন গুপ্তচর আসিয়াও এ কথার অনুমোদন করিল। এইরূপে বেরিলি সহরবাসী আরও পাঁচ-সাতজনের নিকট দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে, দিল্লীর পতন হইয়াছে; দশ হাজার মুসলমান-সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছে; প্রায় বিশ হাজার মুসলমানকে ইংরেজ কর্ত্তৃক ফাঁসীকাঠে ঝুলান হইয়াছে। ইংরেজের জয় হইয়াছে।

আমি। সহরবাসী অন্যান্য লোকে যখন সঠিক সংবাদ পাইল, তখন কেবল নবাব খাঁ বাহাদুর পাইলেন না কেন?

গুপ্তচর। সঠিক সংবাদ তিনি কেন পাইলেন না, কেমন করিয়া বলিব? এ দুঃখ-সংবাদ তাঁহাকে দিতে কেহ সাহস করে নাই। সে যাহা হউক, যখন পথে-ঘাটে ঘরে-মাঠে কেবল ঐ কথারই জল্পনা হইতে লাগিল, যখন বেরিলি সহরে এক ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, নবাব-পক্ষীয় সৈনিক কর্ম্মচারিগণ যখন কথঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিল,—তখন নবাব প্রকাশ্য দরবারে অতি গম্ভীরভাবে, ঈষৎ ক্রোধের সহিত এইরূপ ঘোষণা করিলেন,—"কে বলিল, দিল্লীর পতন হইয়াছে? এ সমস্তই মিথ্যা কথা। কু-লোকে এ কু-কথা রটাইয়াছে; ইহার মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। আমি আমার প্রজাবৃন্দকে

সত্য করিয়া বলিতেছি, পূজনীয় দিল্লীর বাদশাহ সুস্থ স্বচ্ছন্দ শরীরে আছেন; তিনি একবার নহে, সাতবার ইংরেজ-সেনাকে পরাভূত করিয়াছেন। যেমন সিংহের নিকট মেষশাবক, সেইরূপ দিল্লীর সম্রাটের নিকট ইংরেজ-সেনা আজ অবস্থিত। তোমরা ভয় করিও না, উৎসাহ-হীন হইও না। বাদশাহ যে জীবিত আছেন এবং তিনি যে সম্যগ্রূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। সম্প্রতি তিনি আমাকে মণিমুক্তা-হীরক-খচিত এক বহুমূল্যের পোষাক পুরস্কারস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। দিল্লীর বাদশাহ প্রেরিত দূতগণ সেই পরিচ্ছদ এবং খেলাৎ লইয়া আওলা নামক গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কল্যই আমি দ্রুতগামী উটের সওয়ার পাঠাইয়া সেই পরিচ্ছদ এবং খেলাৎ আনাইতেছি। অতএব দিল্লীর পতন-সংবাদ মিথ্যা।" নবাবের মুখ-নিঃসৃত এই কথা শুনিয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিল। দুইদিন পরে নবাব নাগরা বাজাইয়া ঘোষণা দিলেন,—"খেলাৎ এবং পরিচ্ছদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দীপচাঁদ শেঠের বৃহৎ বাগানে খেলাৎ ও পরিচ্ছদ রক্ষিত হইতেছে। তথায় অদ্য নবাব স্বয়ং যাইয়া খেলাৎ গ্রহণ করিবেন। হিন্দু-মুসলমান প্রজা যে যেখানে আছ, দীপচাঁদের বাগানে সকলে গিয়া হাজির হইও।" মহাসমারোহে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করত নবাব খাঁ বাহাদুর দীপচাঁদের বাগান অভিমুখে চলিলেন। বহু লোকের সমাবেশ হইল। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। খাঁ বাহাদুর সুবর্ণ-হীরক-মুক্তা-মণ্ডিত পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। সর্ব্বলোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই পোষাক দিল্লীর সম্রাটের প্রদত্ত।" নবাবের সম্মানে ২১টা তোপধ্বনি হইল। লোকসকল নবাবকে যাহার যেমন সাধ্য নজর দিতে আরম্ভ করিল। মোহর, টাকা, আধুলি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার বসিয়া গেল। কিন্তু দুঃখ এই, খাঁ-বাহাদুরের এ সুখ, এ আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে সময় নবাব সহচরবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ণমাত্রায় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, সেই সময় একজন ভীমকলেবর অশ্বারোহী ভীমবেগে দীপচাঁদের বাগানে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। সেই অশ্বারোহী নবাবকে এক নির্জ্জন গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেল। সকলে চমকিত এবং ভীত হইল। এই অশ্বারোহীর নাম আলি ইয়ার খাঁ। এই ব্যক্তি অশ্বারোহী দলের একজন অধ্যক্ষ। নবাব দিল্লী-পতনের প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য গোপনে ইহাকে দিল্লী পাঠাইয়াছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, তখনও নবাব নির্জ্জন গৃহ হইতে ফিরিয়া

সভাস্থলে আর উপনীত হইলেন না। দেওয়ান শোভারাম তখন নবাবকে দেখিতে সেই নির্জ্জন গৃহে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, নবাব পীড়িত হইয়াছেন, নবাব এখন আর বাহির হইবেন না,—অদ্য আপনারা সকলে ঘরে যাউন। এই কথা বলিবামাত্র সভা ভঙ্গ হইল। লোকসকল সন্দিগ্ধচিত্তে ভগ্নমনে প্রস্থান করিল।

আমি। আলি ইয়ার খাঁ কি সংবাদ আনিয়াছিল ?

গুপ্তচর। শেষে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আলি ইয়ার খাঁ যখন নবাবকে বলে যে, দিল্লীর পতন হইয়াছে, ইংরেজের হস্তে বাদশাহ বন্দী হইয়াছেন, তখন নবাব অমনি থর থর কাঁপিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছা গেলেন।

আমি। আচ্ছা, তবে বহুমূল্যের পোষাকটী নবাবকে কে পাঠাইয়াছিল ?

গুপ্তচর। পোষাকটী জাল। নবাব নিজেই উহা তৈয়ারী করাইয়া নিজেই পরিয়াছিলেন। কেবল লোক ভুলাইবার জন্য তিনি তাহা দিল্লীর বাদশাহের প্রদত্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, দিল্লীর পতন হয় নাই। সেই ধারণাবশেই তিনি দিল্লীর বাদশাহের নাম দিয়া সেই পোষাক প্রস্তুত করান।

আমি। তার পর কি হইল ?

গুপ্তচর। নবাব সেই দিন হইতে রাজকার্য্য বড় একটা দেখেন না। রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই শোভারাম, সইফ উল্লা খাঁ এবং নিয়াজ মহম্মদ, এই তিন জনের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে।

আমি। ইহারা কেমন রাজকার্য্য করিতেছেন ?

গুপ্তচর। নবাব অপেক্ষা অনেক ভাল। ইঁহারাও কিন্তু 'দিল্লীর পতন' এ কথা সত্য নহে,—সর্ব্বদাই এই সংবাদ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। কোথাও কিছুই নাই, হঠাৎ সেদিন বার জন অশ্বারোহী নবাবগৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আমরা দিল্লী হইতে আসিতেছি। দিল্লীর বাদশাহ ভাল আছেন। ইংরেজ-সৈন্য বহুবার পরাজিত হইয়াছে। ইংরেজের জয়ের আর কোন আশা নাই। দিল্লীর বাদশাহের মোহরাঙ্কিত এই পত্র লউন।" বলা বাহুল্য, এ সমস্তই শোভারামের কৌশল। তিনিই এই অশ্বারোহী দলকে এইরূপভাবে সাজিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি গুপ্তচরকে কহিলাম, "তুমি বিশ্রাম কর, কিছু আহারাদি কর।"

গুপ্তচর কহিল, "বিশ্রামের সময় নাই,—আহারেরও সময় নাই। বড় গুরুতর সংবাদ আছে। শীঘ্র প্রস্তুত হউন। আমি যে কেবল দিল্লীর পতনের সংবাদ দিতে আসিয়াছি তাহা নহে,—ইহা অপেক্ষাও অধিক বিষম সংবাদ দিবার জন্য আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি।"

আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "কি সংবাদ?—কি গুরুতর সংবাদ?"

গুপ্তচর। নির্জ্জনে কহিব। কর্ণেল ক্রশম্যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সম্মুখে আপনাকে এ সংবাদ কহিব। অন্যের নিকট বা অন্যরূপে এ সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে।

আটচল্লিশ

কর্ণেল ক্রশম্যান সেদিন হলদোয়ানিতে ছিলেন না। নেপালের রাজা আমাদের সাহায্যার্থ একদল গোর্খা সৈন্য নাইনিতালে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরিদর্শনার্থই তিনি নাইনিতালে গিয়াছিলেন। আমি, গুপ্তচর, লেফটেনাণ্ট বারওয়েল এবং আট জন রক্ষক সওয়ার—আমরা এই এগারজন তখন অশ্বারোহণে নাইনিতাল যাত্রা করিলাম। নাইনিতালে পৌঁছিয়া দেখি, সাহেবগণ এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে, রুদ্ধদ্বারে গোপনে কি পরামর্শ করিতেছেন। মানব মাত্রেরই তথায় প্রবেশ নিষেধ। সশস্ত্র প্রহরিগণ দ্বারদেশে পাহারা দিতেছে। আমাদের আগমনবার্ত্তা সাহেবগণকে জানাইবার জন্য তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারা কহিল, "কেমন করিয়া সংবাদ দিব? কারণ কোন ব্যক্তিরই ভিতরে যাইবার অধিকার নাই।"

শীতকালের রাত্রে নাইনিতালে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত আমরা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। সভা ভাঙ্গিলে সাহেবগণ বাহিরে আসিলেন। যত বড় বড় উচ্চপদস্থ সাহেব নাইনিতালে ছিলেন সকলেই সেদিন সেই ঘরে একত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে এরূপভাবে দেখিয়াই চমকিত হইলেন। ক্রশম্যান ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সংবাদ কি?" আমি প্রকৃত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। তখন ক্রশম্যান আমাদিগকে লইয়া পুনরায় সেই মন্ত্রণা-গৃহে গেলেন। গুপ্তচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বল, তুমি

কি সংবাদ আনিয়াছ ? যাহা জান ঠিক তাহাই বলিও, একচুল এদিক্ ওদিক্ করিও না।”

চর জোড়হাতে কহিল,—“প্রথম সংবাদ দিল্লীর পতন। দ্বিতীয় সংবাদ, নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ ষোল হাজার সৈন্য একত্র করিয়া হলদোয়ানি এবং নাইনিতাল আক্রমণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইযাছেন। দেওয়ান শোভারামের পরামর্শে এই সকল কাজ হইতেছে। আব বড় অধিক বিলম্ব নাই। সম্ভবত দুই দিন মধ্যে অসংখ্য মুসলমান-সৈন্যদ্বারা হলদোয়ানি পরিবেষ্টিত হইবে। হল-দোয়ানির ১৪ মাইল দূবে ফজল হক্ প্রায সাত হাজার সৈন্য লইয়া সাগ্তা নামক স্থানে ছাউনি করিয়া আছে। আর একজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার নাম কালে খাঁ, প্রায দশ সহস্র সৈন্য লইযা বহেড়ি নামক স্থানে আড্ডা করিয়াছেন। বহেড়ি হলদোযানি হইতে ষোল মাইল দূরস্থ। অতি গোপনে এরূপ সেনাসমাবেশের কার্য্য সংসাধিত হইযাছে। সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, একদল সৈন্য সম্মুখ হইতে এবং অন্য দল সৈন্য পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হলদোয়ানি আক্রমণ করিবে। কিন্তু শত্রুদল এক্ষণে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া এক নতুন কল্পনা কবিযাছে। কালে খাঁর সৈন্য গতকল্য চারপুরা নামক স্থানে আসিযা ছাউনি কবিষাছে। ঐ স্থানে শাগ্রহ তিনি ফজল হকের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবেন। উভয় সৈন্য একত্র হইলে, কালে খাঁ প্রায ষোল হাজার সৈন্যের অধিনাযক হইয়া হঠাং হলদোযানি আক্রমণ কবিবেন। হুজুর ! ইহাই আমাব সংবাদ।”

কর্ণেল ক্রশম্যান কহিলেন, “তোমার সংবাদ সত্য। গত কল্য আমরাও এইভাবের সংবাদ পাইযাছি।”

ক্রশম্যান তখন এক ভীতি-ব্যঞ্জক বংশীধ্বনি করিলেন। আবার নাইনি-তালের প্রধান প্রধান সাহেবগণ রাত্রি ১০টার সময় সেই মন্ত্রণাগৃহে উপনীত হইলেন। আবার রুদ্ধদ্বাবে পরামর্শ হইল। রাত্রি ১১টার সময় আবার সভা ভঙ্গ হইল। আমরা কর্ণেল ক্রশম্যানের সহিত সেই রাত্রেই নাইনিতাল হইতে হলদোয়ানি প্রত্যাগত হই। অদ্যকাব তারিখ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারি, বেলা দশটার সময় নাইনিতাল হইতে প্রধান প্রধান সাহেবগণ হলদোয়ানিতে আসিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ জন ইংরেজ একদল হইয়া উপনীত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহবে আবার একশত ইংরেজ হলদোয়ানিতে আগমন করিলেন। নাইনিতাল সাহেব-শূন্য হইল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ক্রেশম্যান সাহেবের বৃহৎ তাঁবুর ভিতর সাহেবগণ কি একটা পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহারা অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইলাম। কর্ণেল ম্যাক্‌সল্যাণ্ড সাহেব আমাকে বলিলেন,—"অদ্য রাত্রে আমরা এখান হইতে যাত্রা করিয়া বিদ্রোহী সেনাদিগকে আক্রমণ করিব। তুমি চুপে চুপে রেসালাদারগণকে এই সংবাদ জানাও এবং সেনা-নিবাসে যাইয়া যে সকল সৈন্যকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বল।"

আমি এই আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লাইনে আসিলাম এবং অশ্বারোহী সেনাগণকে যোদ্ধৃবেশে সাজিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইতে বলিলাম। এই কথা শুনিয়া ছয় শত সওয়ার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদের মধ্য হইতে তিন শত কার্য্যক্ষম অমিত বলশালী অশ্বারোহীকে মনোনীত করিয়া লইলাম। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং ঘোড়া যুদ্ধের উপযোগী ছিল। তাহাদের ঘোড়াগুলিকে পৃথক স্থানে বাধিতে বলিয়া কর্ণেল সাহেবের আদেশ শুনাইয়া বলিলাম, "তোমরা যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুত থাক। হুকুম পাইবামাত্র ঘোড়ায় জিন আঁটিয়া যাইতে হইবে।" এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া, সাহেবকে আসিয়া সংবাদ দিলাম। সাহেব বলিলেন, যখন আবার প্রয়োজন হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবেন।

এই কথা শুনিয়া আমি বাসায় আসিলাম। কিন্তু তখন আমার অন্য চিন্তা ছিল না, যুদ্ধের চিন্তাতেই আমার মন নিমজ্জিত হইয়াছিল। এ সময়ে কোন্ কাজ করা উচিত, কি করিলে মঙ্গল হইবে, কি কাজই বা বাকী থাকিল, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটী কথা মনে উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ লাইনে গেলাম এবং সেখানে যে সকল শানকারক ছিল, তাহাদিগকে ডাকাইয়া অস্ত্র-শস্ত্রে শান দিতে বলিলাম। বারুদাগার হইতে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টোটা বাহির করিয়া, প্রত্যেক সিপাহীকে ৩০টা করিয়া দিলাম, অবশিষ্ট কার্ট্রিজ দুইটা বাক্সে বন্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য রাখিলাম। যে সকল খালাসী ভিস্তি আমাদের সঙ্গে যাইবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত লোক আনিবার জন্য হাসপাতালে একখানি মাত্র ডুলি এবং ছয়জন কাহার ছিল, কিন্তু তাহাতে কাজ চলিবে না ভাবিয়া নাইনিতাল হইতে আরও ডুলি এবং ডাণ্ডি আনাইলাম।

ডাক্তার বাবু নন্দকুমার মিত্রকে বলিলেন, যে সকল ঔষধ এবং অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা যেন স্থির করিয়া রাখিয়া দেন। যে সকল বাকী বাক্স পেটরা (medicine instruments) লইয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগকে গোছাইয়া স্থির করিয়া রাখিতে বলিলাম। এই সকল কাৰ্য্য নির্ব্বাহ করিতে রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল।

সমস্ত দিন অনরবত পরিশ্রম করিযা অতিশয ক্লান্তি বোধ হইল, বিশ্রাম-লাভার্থ বাসায় আসিলাম। বাসায় আসিয়া বসিতে-না-বসিতে একজন আরদালি আসিয়া সংবাদ দিল, "কর্ণেল সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন।" আমার শ্রান্তি দূর করা আব হইল না, তৎক্ষণাৎ সাহেব-সমীপে উপস্থিত হইলাম। সাহেব বলিলেন, "যুদ্ধের জন্য সমস্ত প্রস্তুত আছে কি না?" আমি অতি বিনয়-নম্রভাবে বলিলাম যে, সকলই প্রস্তুত আছে এবং যেরূপ বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল একে একে তাহাও বলিলাম। কর্ণেল সাহেব তাহা শুনিযা অপরিসীম আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "অভিযানের আর অধিক বিলম্ব নাই; রাত্রি ১০টার সময় সকলকে যাত্রা করিতে হইবে।" অধিকন্তু তিনিও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতে চলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, "নেপালের জঙ্গ বাহাদুর আমাদের সাহায্যের জন্য যে একদল গোর্খা পল্টন পাঠাইয়াছেন, তাহারা গত কল্য নাইনিতালে আসিযাছে, তাহাদের অৰ্দ্ধেক এবং সরকারী যে গোর্খা সৈন্য আছে, তাহাবও অর্দ্ধেক লইতে হইবে। নাইনিতালে কি সিভিল, কি সামরিক বিভাগেব সাহেব, এমন কি সাহেব কেরানীরাও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইযাছেন। তাঁহাদের সকলের সংখ্যা দুই শতের ন্যূন হইবে না। কাশীপুরের জঙ্গলেব দিকে আমাদের যে প্রায় দেড় শত সরকারী হাতী আছে, তাহা পাঠাইয়া দিবার জন্য কাপ্তেন বা (Baugh) সাহেবকে লেখা হইয়াছে; হস্তী দল অতি ত্বরায় আসিতেছে। পদাতি সৈন্যেরা এই সকল হস্তী আরোহণে যাইবে। এক্ষণে তুমি যাও, আর যদি কোন আয়োজনের বাকী থাকে, তাহা হইলে সে কাজ শীঘ্র যাইয়া সম্পন্ন কব। সওযারদিগকে অতি সাবধানে নিঃশব্দে প্রস্তুত হইতে বলিবে, বিউগল (বাঁশী) বাজাইতে নিষেধ করিবে। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র যাও।"

ইহা শুনিবামাত্র আমি দ্রুতপদে আবার লাইনে আসিলাম এবং যাহা করণীয় ছিল তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। আরদালির কাজের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ৩০ জন সওয়ারকে সঙ্গে লইলাম। যে সকল সৈন্য অভিযানের

জন্য প্রস্তত ছিল, পরিদর্শনের জন্য তাহাদিগকে প্যারেড-ভূমিতে লইয়া গিয়া সাহেবদিগকে সংবাদ দিলাম; সাহেবেরা আসিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নাইনিতাল হইতে সৈন্য-সামন্ত ও ঘোড়াসকল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের তিনটী (Mountain Trainguns) পর্ব্বতের ব্যবহারোপ-যোগী কামান ছিল। এক একটী কামান লইযা যাইবার জন্য দুই দুইটী হাতী নিয়োজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী সিপাহীরাই গোলন্দাজের কার্য্য করিত, কিন্তু বিদ্রোহের সময় তাহাদের উপর সন্দেহ হওযাতে সকলকে বিদূরিত করিয়া দেওয়া হইযাছিল। এই বিশ্বাস-হন্তারা বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহী দলের গোলন্দাজের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। যাহা হউক, গোর্খা পল্টনেরা ইহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। কর্ণেল ম্যাক্‌সল্যাণ্ড সাহেবের শিক্ষায় থাকিয়া এই গোর্খারাই অতি অল্পকালমধ্যে গোলন্দাজের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল।

রাত্রি ৯৷৷০ ঘটিকার সময অভিযানের জন্য সকলই প্রস্তত, কেবল হুকুম পাইবার অপেক্ষায আমরা রহিয়াছি। শীতকাল হইলেও আজ রাত্রি তত হিমানীমণ্ডিত নহে। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশ অতি পরিষ্কার, চন্দ্রমা অতি সুনির্ম্মল। শশধরের সমুজ্জ্বল কিরণে পৃথিবী যেন রজতময়ী হইয়া উঠি-য়াছে। যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই সসজ্জ, তাহাদেব অস্ত্র-শস্ত্র চন্দ্রকরপ্রতিবিম্বিত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায চক্‌মক্ করিতেছে। এদিকে অমিততেজা অশ্ব যুদ্ধ-বাসনায় বড় অধীর হইয়া উঠিয়াছে; সম্মুখের পাদ দ্বারা সরোষে মৃত্তিকা খনন করিতেছে। গ্রীবা বক্র কবিযা একবার এদিক্ একবার ওদিক্ দেখিতেছে। খলীন-চর্ব্বনে মুখ ফেনাযুক্ত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হ্রেষারবে প্রান্তর কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। ঘোটকারূঢ় যোদ্ধারা অতি কষ্টে আপন আপন অশ্বের বেগ সংযত করিযা রাখিযাছে। হস্তীরাও আজ রণমদে উন্মত্ত। তাহাদের সুবিস্তৃত পৃষ্ঠে সুন্দর আস্তরণ, অস্ত্রপাণি রণোন্মুখ যোদ্ধৃগণ তাহাতে-সমারূঢ়। এই সকল সেনাকে পৃষ্ঠে করিযা মনের আনন্দে হেলিতেছে দুলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে। যাহা হউক, এখন সকলেই বীরমদে উন্মত্ত, মৃত্যুভয সকলের হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছে, সকলের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে। তাহারা কেবল অধিনায়কের আদেশের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

সেই সময়ে একজন চর শত্রু-শিবির হইতে আসিয়াছিল এবং আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম,

"বিদ্রোহীদের অশ্বারোহী সেনার সামরিক পরিচ্ছদ কিরূপ?" সে বলিল, "বৃটিশসেনার পরিচ্ছদের সহিত শত্রুসেনার পোষাকে কোন প্রভেদ নাই। আমাদের সেনার ন্যায় তাহাদেরও নীলবর্ণের কোট, লাল উষ্ণীষ এবং লাল কোমরবন্ধ।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি সাহেবদের নিকট গিয়া বলিলাম, আমাদের সৈন্যের সামরিক পরিচ্ছদের সঙ্গে বিপক্ষ সেনার পোষাকের কোন পার্থক্য নাই, সকলই একপ্রকার। এমন স্থলে রাত্রে ভ্রমবশতঃ আত্মপর বিবেচনা না করিয়া হয়ত আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি হইতে পারে; সুতরাং ইহার কোন সদুপায় করা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল সাহেব বলিলেন, "এখন আর ইহার কি প্রতিকার করা যাইবে? সময় নাই।" আমি বলিলাম, "যদিও আর সময় নাই বটে, কিন্তু যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে এখনও ইহার প্রতিকারের উপায় আছে।" সাহেব বলিলেন, "যদিও এখন ইহার প্রতিকারের পথ থাকে, তাহা হইলে এখনই তাহা কর, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

আমি আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে বাজারে গেলাম এবং এক দোকান হইতে দুই থান ধোয়া মার্কিন ক্রয় করিয়া আনিলাম। উক্ত থান হইতে ছয় ইঞ্চি চওড়া, চার ফুট লম্বা এইরূপ অনেকগুলি টুক্‌রা করিলাম। তাহার দুই খণ্ড করিয়া সওয়ারদের দুই বাহুর উপর বাজুর ন্যায় বাঁধিতে বলিলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া ফেলিল। আমি তখন সেই সওয়ারদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে লইয়া সাহেব-সমীপে উপস্থিত হইলাম। সাহেব আমার প্রতি সকরুণ কটাক্ষ করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, এখন দূর হইতে অনায়াসে আমাদের সৈন্যকে চিনিতে পারা যাইবে।"

যুদ্ধযাত্রার জন্য আমাদের সকলে প্রস্তুত, আর বিলম্ব নাই। কিন্তু হলদোয়ানি ত অরক্ষিতভাবে রাখা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ নানা স্থানে শত্রুসৈন্য শিবির সংস্থাপন করিয়া আছে; পাছে তাহারা অন্য কোনও পথে আসিয়া বিভ্রাট ঘটায়, এই নিমিত্ত আমরা হলদোয়ানি রক্ষার্থ ২০০ শত গোর্খা সৈন্য ও আর একটী কামান রাখিলাম; অবশিষ্ট সওয়ারগণও রহিল। শত্রুসেনা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিবে স্থির করিয়াছিল, তাহা না হইয়া আমরাই তাহাদের বিনাশ সাধনের জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলাম। রাত্রি যেই ১০টা বাজিল, অমনি আমাদের যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ হইল এবং সেই সঙ্গে এ আজ্ঞাও প্রচারিত হইল যে, যাইবার সময় কেহ কোন কথা

কহিতে পারিবে না। যতদূর সম্ভব আমরা অতি সাবধানে এবং নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

উনপঞ্চাশ

এ সময়ে আমিও অশ্বারূঢ় হইয়া যোদ্ধৃবেশে সাহেবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইতেছিলাম। সর্ব্বাগ্রে আট জন সওয়ার এবং দুইজন দফাদার। তাহার পর জেনারেল টুকপ, কর্ণেল ক্রশম্যান, কর্ণেল ম্যাক্‌সলেন এবং আমি, তারপর সমস্ত অশ্বারোহী দল। তারপর কামানশ্রেণী। অবশেষে হস্তীপৃষ্ঠে পদাতি সেনা। এইভাবে প্রথমে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম। আমি যখন রেসেলার কর্ম্ম করিতাম, তখন আমার বেশভূষা হিন্দুস্থানীদের ন্যায় ছিল, এখনও সেই বেশ, সেই সবই। আমার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া হঠাৎ বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিবার যো ছিল না, সুতরাং আমি সহজে হিন্দুস্থানী সওয়ার হইয়া সৈন্য মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার মনে অন্য কোন চিন্তাই স্থান পাইতেছিল না। কেবল যুদ্ধই ধ্যান এবং যুদ্ধই জ্ঞান হইয়াছিল। সমরসাজে সাজিয়া যুদ্ধে যাইতেছি, হয়ত শত্রুহস্তে নিহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, হয়ত অঙ্গচ্ছেদ হইয়া চিরদিনের জন্য বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিব, এ সকল কথা তখন মনে একবারও উদয় হয় নাই। তখন কেবল যুদ্ধের উৎসাহে মন একেবারে উৎসাহিত হইয়াছিল। কিসে শত্রুসেনার ধ্বংসসাধন করিব তাহাই মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম। তখন আরও এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা হৃদয়মধ্যে তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

আমরা যখন নয় মাইল আসিয়াছি তখন রাত্রি একটা বাজিল। শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমরা অর্দ্ধঘণ্টাকাল একস্থানে বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। সেই নিশীথ সময়ে অন্ধকারময় নির্জ্জন পথ দিয়া আমাদের সৈন্য চলিতে লাগিল।

রাত্রি চারিটা বাজিল, আমরা একটী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি শত্রুদের পিকেট বা কতকগুলি প্রহরী ঘাটি আগুলিয়া আছে। আমাদের অশ্বের পদশব্দে তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—

'কোন্ হ্যায় ?' কর্ণেল ক্রশম্যান তখন সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইতেছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন,—"হামলোক মৌলবী ফজল হক্ সাহেবকা আদমি হ্যায়, নবাব সাহেবসে মিলনে যাতেহেঁ।" এই কথা শুনিয়া তাহারা নিরুত্তর হইল। আমরা দুই শত পদ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিলাম। সেখানে যে সকল লোক প্রহরী ছিল তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ জন হইবে। এই সকল লোককে আমরা তরবারির আঘাতে এবং বর্শাফলকে একেবারে মৃত্যুশয্যায় শায়িত করিলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিয়াছিল কি না, তাহা অন্ধকারে ভাল জানা গেল না। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমাদের তিনজন সওয়ার কিছু আহত হইয়াছিল মাত্র। আমরা এখানে এই শত্রুদলকে শমনসদনে পাঠাইয়া আবার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম।

এখান হইতে চরপুরা প্রায় ৩ মাইল হইবে। কিছুক্ষণ পরে রজনী প্রভাত হইল। বাল-সূর্য্যের লোহিতোজ্জ্বল কিরণে পূর্ব্ব দিক্ বিভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা একটী নিম্ন স্থানে গিয়া ছাউনি করিলাম। এখান হইতে শত্রু-শিবির প্রায় এক মাইল হইবে। কিন্তু তাহাদের ধবলাকৃতি শিবির, তাহাদের সৈন্য-সামন্ত অনায়াসে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। যে নিম্ন ভূমিতে আমরা শিবির স্থাপন করিলাম, তাহা আমাদের বিশেষ সুবিধাকর; ইচ্ছা করিলে আমরা অনায়াসে অলক্ষিতভাবে শত্রু-সেনাদের গতিবিধি দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের নিকট আমরা অদৃশ্যভাবেই রহিলাম। এ বিগ্রহে কর্ণেল ম্যাকস্ল্যাণ্ডই অধিনায়ক ছিলেন, তিনিই ইহার সকল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

হস্তিপৃষ্ঠে যে সকল সেনা আসিয়াছিল, তাহারা অবতরণ করিলে হস্তি-গুলিকে মাহুতেরা জঙ্গলমধ্যে লইয়া গেল। পার্ব্বত্য স্থানে ব্যবহারোপযোগী যে দুইটী কামান আনিয়াছিলাম, তাহা কামানাধারে রাখিয়া যথোপযুক্ত স্থানে বসান হইল এবং সকল সৈন্যকে একত্র করা গেল।

তদনন্তর কি করা কর্ত্তব্য তাহা নির্দ্ধারণের জন্য সাহেবদিগের সমিতি বসিল। এখানে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। ম্যাক্সল্যাণ্ড সাহেব প্রস্তাব করিলেন,—"আমরা যে এখানে আসিয়াছি, এ সংবাদ বিদ্রোহিগণকে জ্ঞাপন করানো উচিত।" কেহ বলিলেন, "একেবারে আমরা সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করি।" কেহ বলিলেন, "আমরা অতি অল্পমাত্র সেনা

লইয়া আসিয়াছি ; যদি আমরা একেবারে বিপক্ষদলের উপর চড়াও হই, তাহা হইলে আমাদের একজন সৈনিকের উপর তাহাদের ২৫ জন লোক পড়িলে নিশ্চয় আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে। এমন স্থলে প্রথমত আমাদের দূর হইতে তাহাদের সঙ্গে কামানের লড়াই করা শ্রেয়ঃ।”

এই পরামর্শ স্থির করিয়া আমাদের পক্ষ হইতে একটী কামানের ফাঁকা আওয়াজ করা হইল। এই শব্দ হইবামাত্র শত্রুপক্ষ হইতে একেবারে ১০টা তোপধ্বনি হইয়া উঠিল। শত্রুদের গোলা ভীমবেগে আমাদের দিকে ছুটিতে লাগিল। কামানের মুহুর্মুহুঃ গভীর নিনাদে পার্ব্বত্য স্থান একেবারে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, আমরা নিম্নভূমিতে আড্ডা করিয়াছিলাম। বিপক্ষদলের গোলা প্রথমত আমাদের মস্তকের পাঁচ হস্ত উর্দ্ধ দিয়া যাইতেছিল ; কিন্তু ক্রমে গোলা আরও নীচে আসিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমরা ভূপৃষ্ঠে লম্বমান হইয়া শুইয়া পড়িতে আদেশ পাইলাম। এইভাবে আমাদের কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে হইল। এদিকে শত্রুরা অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করিয়া আপনাদের বারুদাগার অকারণে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের গোলাবৃষ্টি মন্দীভুত হইয়া আসিলে, আমরা আবার পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলাম।

উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া যুদ্ধবিশারদ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ণেল ম্যাক্সল্যাণ্ড দূরবীক্ষণ দ্বারা শত্রুদের অধিকৃত স্থান বিশিষ্টরূপে পর্য্যবেক্ষণ করত আমাদের দুইটী কামান যথপোযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গোলা চালাইতে আদেশ দিলেন। আমাদের প্রথম দুইটী গোলায় বিপক্ষদের দুইটী কামান বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। আবার কয়টি গোলায় সেইরূপ কয়েকটী তোপ উল্টাইয়া পড়িল। এইরূপে কর্ণেল ম্যাক্‌সল্যাণ্ড সাহেবের বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে এবং তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে বিদ্রোহীদের সকল তোপই বিনষ্ট হইয়া গেল।

কামান নষ্ট করিয়া এবার আমাদের গোলা বজ্রবেগে ঘোররবে শত্রু-সৈন্য মধ্যে পড়িতে লাগিল। কামানের ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিপক্ষ গোলন্দাজদিগের আর তথায় তিষ্ঠানো ভার হইল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। তথাপি নিস্তার নাই, আবার উপর্য্যুপরি গোলার উপর গোলা, তাহাদের সৈন্যমধ্যে পড়িতে লাগিল। এবার শত্রুসেনা অস্থির হইয়া প্রাণভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক্ষণে গোলা চালানো আর উচিত নহে বিবেচনা করিয়া আমাদের কামান

ছোড়া বন্ধ হইল। শত্রুসৈন্য আমাদের দিকে আসিতে লাগিল, আমরা শত্রুসৈন্যের দিকে যাইতে লাগিলাম। এইবার বন্দুকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আমাদের সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্য ১৬০ জন এবং পদাতি এক সহস্র ছিল। কিন্তু এরূপ সুকৌশলে তাহা শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, দূর হইতে অনুমান হইত, আমাদের সঙ্গে ৩ দল অশ্বারোহী এবং ১২ দল পদাতি সৈন্য রহিয়াছে। আমরা দুইটী কামান লইয়া দ্রুতগতিতে ভীমরবে দুর্দ্দমনীয় পরাক্রমে শত্রুসেনা-তরঙ্গ মধ্যে গিয়া পড়িলাম। এখানে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। আমাদের সৈন্যেরা প্রথমত বর্ষার বারিধারার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ শত্রুদের উপর অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা আমাদের ভীষণ আক্রমণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। আমরা তাহাদের অনুসরণ করিলাম। প্রায় এক শত জন বিদ্রোহীর পশ্চাতে আমরা কেবল দশ বার জন ধাবিত হইয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই। যাহা হউক, যে স্থানে যাহাকে পাইলাম তাহাকে হয় অসির আঘাতে, না হয় বর্শার ফলকে কিংবা বেয়নেটের খোঁচায় ভূতলশায়ী করিতে লাগিলাম। এরূপে আমরা পলায়নোন্মত্ত বিপক্ষদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় দুই তিন মাইল গিয়া শেষে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম।

এ সময়ে সমরক্ষেত্রের ভীষণ ভাব দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে স্থান শত্রুশোণিতে একেবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকার মৃতদেহ,—ছিন্নশির, ছিন্নগ্রীব, ছিন্নদেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বা কতকগুলি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গুলিতে কাহার বা জানু, কাহার বা হাত, কাহার বা অন্যান্য অবয়ব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিতেছে। কেহ বা আসন্নকালে আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করিয়া যাতনায় আরও অধীর হইতেছে। মুমূর্ষুদের ঈদৃশ হৃদয়ভেদী কাতরোক্তিতে কিয়ৎকালের জন্য মন বড় বিচলিত হইল। কিন্তু রণক্ষেত্রে এ ভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। যাহা হউক, চারি দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলাম, প্রায় বার শত শত্রুসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া রহিয়াছে।

আমি যখন এই সকল দেখিতেছিলাম, তখন কর্ণেল সাহেব আসিয়া বলিলেন, "যুদ্ধে আমাদের যে সকল সেনা আহত হইয়াছে, তাহাদিগকে ডুলি

করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া- হইয়াছে কি না ? এ সময়ে ডাক্তার নন্দকুমার মিত্রই বা কি করিতেছেন ? তাহা একবার দেখা প্রয়োজন হইয়াছে।” আমরা এখানে উপস্থিত হইলে একটী বড় গাছের তলায় তৎসময়োপযোগী হাসপাতাল করিয়াছিলাম। সাহেবের এই কথা শুনিয়া আমি দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি, আমাদের ষোল জন আহত সিপাহী তথায় রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহার বা তরবারির, কাহার বা গুলির আঘাতে হস্ত-পদ জখম হইয়াছে; কেহই মরে নাই। ডাক্তার নন্দকুমার বাবু বলিলেন যে, “যদিও সব ভাল বটে, কিন্তু তাঁহার বিষম আশঙ্কা হইতেছে, পাছে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে শত্রুরা আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে।” নন্দকুমার বাবু যে একাকী ছিলেন, এমত নহে, তাঁহার জন্য ১২ জন অস্ত্রধারী রক্ষক অনবরত পাহারা দিতেছিল; তথাপি তাঁহার এরূপ ভয় দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। পরে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় আমি সমরক্ষেত্রাভিমুখে চলিলাম।

পথিপার্শ্বে কত শব পড়িয়া রহিয়াছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাতে একটী শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সময়ে সাধারণত বিশেষ সতর্কিতভাবে ছিলাম, শব্দ শুনিবামাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি একজন ভগ্নোরু মুসলমান সিপাহী বসিয়া বসিয়া সেকেলে একটী সুদীর্ঘ হিন্দুস্থানী বন্দুক হস্তে করিয়া, দ্বিতীয় হস্তে পলিতা গ্রহণ করত আমার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র তাহাকে বন্দুকে পলিতা সংযোজিত করিবার অবসর না দিয়া নিষ্কোষিত অসিহস্তে নক্ষত্রবেগে অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। আমার এরূপ ক্ষিপ্রকারিতায় লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং আর কোন উপায় না পাইয়া, তাহার দীর্ঘ বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা আমার ঘোড়াকে খোঁচা মারিতে উদ্যত হইল। আমার ঘোটক অত্যন্ত তেজঃশালী ছিল; সে আপনাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া একেবারে ১০ হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল। ইত্যবসরে উক্ত সিপাহী পুনরায় বন্দুকে রঞ্জুক দিয়া আমাকে গুলি করিবার জন্য পলিতা মাটিতে ঘসিয়া পুনরায় বন্দুকে সংলগ্ন করিবার প্রয়াস পাইল। আমিও আর বিলম্ব না করিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করিলাম। সেও পূর্ব্বের ন্যায় আমার অশ্বকে খোঁচা মারিতে উদ্যত হইল। সুশিক্ষিত ঘোটক এক লম্ফে শত্রু আক্রমণের সীমা অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে পড়িল। এইরূপে সেও আবার বন্দুকে রঞ্জুক দিয়া

পলিতা মাটিতে ঘসিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা বিধিমতে করিতেছে, আমিও তাহার মুণ্ডপাতের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহার কৃতকার্য্য না হইবার পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায় ছিল যে, তাহার বন্দুকটী দেশী, রঞ্জুকে বারুদ দিয়া পলিতা দিতে হইত। বারুদে পলিতা সংযুক্ত করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইতাম, সে আত্মরক্ষার্থ বন্দুক দ্বারা আঘাত করিতে আসিত, আর রঞ্জুকের বারুদ পড়িয়া যাইত। পুনরায় বারুদ দিতে বিলম্ব হইত বলিয়া আমাকে গুলি করিতে পারে নাই। যাহা হউক, আমি তখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এ দুর্ব্বৃত্ত আমার প্রাণ-বিনাশ না করিয়া ছাড়িবে না। আমিও তাহাকে কিন্তু অবসর দিতেছি না। আমারও বিশেষ অসুবিধা এই, আমি অশ্বপৃষ্ঠে রহিয়াছি, সে ভূতলে বসিয়া আছে। তাহার বন্দুক আমার তরওয়াল হইতে বড়, লম্বা; এ জন্য তাহাকে আঘাত করিবার সুবিধা হইতেছে না।

আমরা কিয়ৎকাল এইরূপ পরস্পর বিনাশের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি লেপ্টেনাণ্ট বারওয়েল সাহেব তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"Banerjee! where is your revolver, have you forgotten it.?" অর্থাৎ "তোমার পিস্তল কোথায়? তাহার বিষয় কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?" এই কথা শুনিবামাত্র আমার চেতনা হইল। আমার জিনের সম্মুখে চামড়ায় বাঁধা দুই পার্শ্বে যে দুইটী পিস্তল ছিল, এ কথা আমার তখন আদৌ স্মরণ ছিল না। পিস্তলের নাম হইবামাত্র আমার তখন তাহা মনে পড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ তরবারি দাঁতে ধরিয়া পিস্তলটী ক্ষিপ্রহস্তে যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া শত্রুর মস্তক লক্ষ্য করত একেবারে উপর্য্যুপরি দুইটী আওয়াজ করিলাম। একটী গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, দ্বিতীয় গুলি তাহার বক্ষস্থলে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের বন্দুক মাটীতে পড়িয়া গেল এবং সেও 'লা এলাইল্‌লিল্লা মহম্মদ রসুল উল্লা' বলিয়া পঞ্চত্ব পাইল। এই সময়ে বারেওয়েল সাহেব আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমরা উভয়ে সেই হত সৈনিক পুরুষকে দেখিতে গেলাম। দেখি যে, যুদ্ধের সময় গুলি লাগিয়া তাহার দক্ষিণ জানুর হাড় ভাঙ্গিয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। আমাকে একাকী দেখিয়া আত্মজীবনের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার জিঘাংসাবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু শেষে আমারই হস্তে তাহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইল।

আমরা এখানে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে রণস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমে আমার সঙ্গে চারিজন এবং লেপ্টেনাণ্ট বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে পাঁচ জন সওয়ার আসিয়া জুটিল। কর্ণেল টুরূপ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "যুদ্ধস্থানে যদি আমাদের কোন লোক আহত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তাহাকে হাসপাতালে পাঠাও।"

এই আদেশ পাইবামাত্র আমি তখনই সেই চারি জন সওয়ার সঙ্গে করিয়া যুদ্ধস্থানের চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় এক মাইল দূর গিয়াছি, এমন সময়ে বিদ্রোহীদের পাঁচ জন অশ্বারোহী সেনা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। প্রথমে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, পরে অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। আমরাও অতুল সাহসে দ্রুতবেগে বিপক্ষদের সম্মুখীন হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য একজন বিদ্রোহী সেনা কোথা হইতে অতি দ্রুতবেগে হঠাৎ একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার মস্তক লক্ষ্য করত তরবারির আঘাত করিল। সে প্রহার আমি কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। শত্রুর অসি আমার উষ্ণীষে এবং কপালে লাগিল। আমি তখন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। আহত হইয়া আমার হস্তে যেন দ্বিগুণ বল সঞ্চার হইল; আক্রমণকারী আঘাত করিবার সময় আমার দিকে কিছু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আমি এই অবসরে আমার হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার তরবারি দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আঘাতকারীর কণ্ঠে দারুণ প্রহার করিলাম। আমার তরবারি তাহার কণ্ঠ প্রায় ৩ ইঞ্চি ভেদ করিয়া ফেলিল। সে আর অশ্বের বেগ সংযত করিতে পারিল না, তাহাতেই ঢলিয়া পড়িল; হস্তস্থিত তরবারি ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভূতলে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ সকল বিষয় লিখিতে যত বিলম্ব হইল, তাহার সিকি বা সিকির সিকি সময়ের মধ্যে এ সকল কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাকে ভূমিশায়ী করিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহারা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। আমি পিস্তল লইয়া শত্রুদের উপর গুলি চালাইলাম, একজন জখম হইয়া পড়িয়া গেল; অপর তিনজন প্রস্থান করিল। আমাদের চারিজন সওয়ার তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। আমি আর গেলাম না, কারণ আমার কপালে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে উষ্ণীষ ও দক্ষিণ ভ্রূর উপর চারি অঙ্গুলি চর্ম্ম কাটিয়া চক্ষের উপর

ঝুলিতেছিল, রক্তস্রোতে গাত্রবস্ত্র প্লাবিত করিতেছিল। আমি উক্ত চর্ম্ম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উষ্ণীষের কাপড় দ্বারা তাহা অতি দৃঢ়রূপে বন্ধন করত আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

অনতিবিলম্বে আমার সঙ্গী তিনজন সওয়ার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বিদ্রোহীরা পলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের এক জন সঙ্গী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, এমন কি, সে অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে অক্ষম।" আমি ডুলি আনিয়া উক্ত আহত ব্যক্তিকে শীঘ্র হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম। একজন সওয়ার ডুলির সঙ্গে গেল। আমি দুই সওয়ারকে সমভিব্যাহার করত কর্ণেল টুরুপ সাহেব যেখানে ছিলেন. সেই দিকে অশ্ব চালাইলাম। যাইবার সময় দেখি, রণস্থলের একদিকে লেপ্টেনাণ্ট বারওয়েল এবং তাঁহার পাঁচ জন সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীকে বিপক্ষদের সাত জন সওয়ার আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে; উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। আমরা সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিলাম এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে উপযুক্ত অবসর পাইয়া পিস্তল ছুড়িলাম। গুলি একজনের ঘোড়ার মস্তকে লাগিল, আরোহি-শুদ্ধ ঘোড়াটী মাটীতে বসিয়া পড়িল। এই সময়ে আমার সঙ্গের একজন সওয়ার দ্রুতগতিতে তথায় গিয়া শত্রুপৃষ্ঠে দারুণ বর্শা দ্বারা আঘাত করিল, সে আহত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। বারওয়েল সাহেবের সাহায্যার্থ আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া বিদ্রোহী সেনা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কিন্তু যাইবার সময় তাহার মধ্যে একজন আমাকে গুলি করিল। গুলি আমার পায়ের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়া হাঁটুর অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম না। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে শত্রুদের যে সকল কামান ছিল, তাহা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া হাতীর দ্বারা টানাইয়া আনিলাম। আমাদের সৈন্যেরা বিপক্ষদের যাহা কিছু পাইল, সকলই লুঠপাট করিতে লাগিল। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে বেলা দুইটা বাজিল।

এই সময়ে পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে দামামাধ্বনি হইল। ইহা শুনিয়া আমরা অনুমান করিলাম, বিদ্রোহীরা হয়ত আবার সাজিয়া আসিতেছে। অমনি কর্ণেল ম্যাক্‌সল্যাণ্ড যে দিক হইতে দামামার শব্দে আসিতেছিল, সেইদিকে তোপের মুখ ফিরাইয়া উপর্য্যুপরি সাত আটটা গোলা চালাইলেন। সেই অগ্নিময় লৌহপিণ্ড গভীর গর্জ্জনে বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করত বনস্থলী বিকম্পিত

করিয়া তুলিল। শত্রুরা প্রাণভয়ে কোথায় যে পলাইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

যুদ্ধাবসানে দেখা গেল, আমাদের সৈন্যের দুইজন ইংরেজ আফিসার যোদ্ধা হত এবং নয় জন ইংরেজ আহত হইয়াছেন। অশ্বারোহীদের মধ্যে সাত জন হত, বাইশ জন আহত এবং পদাতি দলের মধ্যে বার জন হত ও উনিশ জন আহত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শত্রু সেনাদলের মধ্যে প্রায় বার শত লোক রণস্থলে প্রাণসমর্পণ করিয়াছে। আর কত জন যে আহত হইয়াছে, তাহা গণনার অতীত। হতাবশিষ্ট ভয়ত্রস্ত বিদ্রোহিগণ প্রাণ লইয়া একেবারে আঠার-উনিশ মাইল দূর বেরিলিতে প্রস্থান করিয়াছিল।

জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া আমরা হলদোয়ানিতে প্রত্যাগত হইলাম। সৈন্যগণের বিজয়-উল্লাসে পথ, প্রান্তর, কানন একেবারে নিনাদিত হইতে লাগিল। কয়েকজন গোর্খা-ভাট বিজয়-গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি নয়টার সময় আমরা হলদোয়ানিতে আসিয়া পৌছিলাম।

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে আমরা পুনরায় বেরিলি সহরে আসিলাম। যেদিন বেরিলি প্রথম প্রবেশ করি, সেই দিন দেখিলাম সহর শূন্যময়। পথে একটীও লোক নাই। দোকান বন্ধ। বড় বড় অট্টালিকা জনমানববিহীন। আমরা যখন বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন আমাদের ঘোড়ার পদশব্দে চারিদিক্ ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আবার বেরিলিতে ইংরেজের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। কিন্তু আর না। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট জীবনী আর লিখিবার উপযুক্ত নহে।

উত্তর

নাইনিতাল পার্ব্বতীয় প্রদেশ

চিলকিয়া

কালাড়ুঙ্গি

কাশীপুর

হলদোয়ানি

মাফাখানা

রুদ্রপুর

পশ্চিম

পূর্ব্ব

মুরাদাবাদ

রামপুর

চারপুরা
(এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়)

বাহেড়ি

বেবিলি

দক্ষিণ